কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা

(Directives of Islam for the Prevention of Adolescent Delinquency: A Survey on Bangladesh's Adolescent Development Centres)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক
আমীর হোসেন
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং- ১৩৬/২০১৫-২০১৬
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

প্রত্যয়নপত্র ii

ঘোষণাপত্র iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iv

ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা vii

প্রতিবর্ণায়ন viiii

সূচীপত্র x

সারণীসমূহের তালিকা xvii

ভূমিকা (১-৯)

প্রথম অধ্যায়

কিশোর: পারিভাষিক বিশ্লেষণ ও পরিচয় **১০-৪৪**

কিশোর: পারিভাষিক বিশ্লেষণ **১১**

কিশোরের সংজ্ঞা **১৩**

কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন **১৬**

কৈশোর ধারণার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ **১৮**

বিভিন্ন দেশে কিশোরের বয়সসীমা **২১**

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কিশোর **২৪**

কিশোরের অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়স **৩১**

ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোর **৩৫**

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপরাধ ও কিশোর অপরাধ **৪৫-৮৭**

প্রথম পরিচ্ছেদ: অপরাধের পরিচয় ও শ্রেণিবিন্যাস **৪৬-৭১**

অপরাধ পরিচিতি ৪৬

অপরাধের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা ৫০

অপরাধ: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ৫৩

অপরাধের শ্রেণিবিভাগ ৫৭

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস ৬৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিশোর অপরাধ পরিচিতি **৭২-৮৭**

কিশোর অপরাধ পরিভাষার উৎপত্তি ৭৩

কিশোর অপরাধ পরিচিতি ৭৪

কিশোর অপরাধী ৮১

অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে পার্থক্য ৮৫

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ: কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব **৮৮-১৮৬**

প্রথম পরিচ্ছেদ: কিশোর অপরাধের কারণ **৮৯-১৬১**

কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা ৮৯

১। জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি ৯১

২। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ৯৭

৩। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ১০০

৪। ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গি ১০১

৫। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ১০২

৬। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ১০৭

৭। শিক্ষণ সংক্রান্ত মতবাদ ১০৮

৮। ব্যক্তিগত বিচ্যুতি বা অনাচার মতবাদ (Anomie Theory) ১০৯

৯। বিবিধ উপকরণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ১১০

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণ ১১৩

(ক) পরিবার ও কিশোর অপরাধ ১১৩

(খ) কিশোর অপরাধের সামাজিক কারণ ১২৫

(গ) কিশোর অপরাধের অর্থনৈতিক কারণ ১৪৮

(ঙ) কিশোর অপরাধের সাংস্কৃতিক কারণ ১৫৯

(ঘ) রাজনৈতিক কারণ ১৬১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ও প্রভাব ১৬২-১৮৬

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ১৬২

(ক) কিশোরদের অপরাধের প্রকৃতি ১৬৫

(খ) কিশোরীদের অপরাধের প্রকৃতি ১৬৮

(গ) কিশোর অপরাধের প্রকৃতি: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ ১৭১

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রভাব ১৮৩

চতুর্থ অধ্যায়

কিশোর : অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য ১৮৭-২২৯

শিশু-কিশোরের অধিকার ১৮৯

১। পবিত্র জন্ম লাভের অধিকার ১৮৯

২। মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার ১৯১

৩। শিশুর সুন্দর নামকরণের অধিকার ১৯২

৪। শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার ১৯৩

৫। বৈষম্যহীন আচরণের অধিকার ১৯৪

৬। সঠিকভাবে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার ১৯৬

৭। শিক্ষালাভের অধিকার ১৯৭

৮। ঈমানের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার ১৯৮

৯। ‘ইবাদত অনুশীলনের অধিকার ১৯৯

১০। নৈতিক শিক্ষার অধিকার ২০০

১১। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অধিকার ২০১

১২। শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অধিকার ২০১

১৩। চিকিৎসা ও পরিচর্যার অধিকার ২০২

১৪। বাসস্থানের অধিকার ২০৩

১৫। মাদক ও যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত থাকার অধিকার ২০৪

১৬। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্য ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অধিকার ২০৫

১৭। সুস্থ পারিবারিক পরিবেশের অধিকার ২০৬

১৮। সুস্থ বিনোদনের অধিকার ২০৬

১৯। শিশুর অবহেলাও অপব্যবহার থেকে নিরাপদ থাকার অধিকার ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

কিশোরের দায়িত্ব-কর্তব্য ২০৮-২২৯

১। পিতামাতার প্রতি কর্তব্য ২০৮

২। ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য ২১৩

৩। পাড়া-প্রতিবেশির প্রতি কর্তব্য ২১৪

৪। শিক্ষকগণের প্রতি কর্তব্য ২১৫

৫। বয়জেষ্ঠদের প্রতি কর্তব্য ২১৬

৬। সঙ্গী ও সহপাঠীদের প্রতি কর্তব্য ২১৭

৭। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ২১৯

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহঃ কার্যক্রম, সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা ২৩০-৩৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৩১-৩১৬

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৩১

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ২৩৩

১। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর ২৩৭

২। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর ২৪৫

৩। কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর ২৫৬

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সাফল্য ২৬২

কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কার্যক্রম ২৬৫

(ক) কিশোর আদালত (Juvenile Court) ২৭৪

(খ) কিশোর হাজত (Remand Home) ২৯১

(গ) ট্রেনিং ইনস্টিটিউট: শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২৯২

(ঘ) প্রবেশন (Probation) ৩০০

(ঙ) প্যারোল (Parole) ৩১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা **৩১৭-৩৩২**

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমাবদ্ধতা ৩১৭

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সমস্যা ৩২১

(ক) প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সমস্যা ৩২৩

(খ) নিবাসীদের সংশ্লিষ্ট সমস্যা ৩২৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিশোর উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন ৩৩৩-৩৭৮

শিশু-কিশোরের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৩৩৫

(ক) শিশু-কিশোরদের জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন ৩৩৬

(খ) সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা ৩৩৮

(গ) জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করা ৩৩৯

(ঘ) সাম্প্রতিক আইনী সংশোধন ৩৪৩

শিশু-কিশোরদের সুরক্ষায় জাতীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ৩৪৫

শিশু আইন, ২০১৩: কিশোর উন্নয়নের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ৩৬২

শিশু কল্যাণ কার্যক্রম ৩৬৭

সপ্তম অধ্যায়

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার: ইসলামের দিকনির্দেশনা ৩৭৯-৪৯০

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলাম ও শিশু-কিশোরের মর্যাদা ৩৮০-৪১১

ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৩৮০

ইসলামি শরী'আহ ৪০৩

ইসলামে শিশু-কিশোরের মর্যাদা ৪০৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিশু-কিশোরের অপরাধমুক্ত জীবনযাপনে ইসলামের নির্দেশনা: প্রতিপালন ও পরিচর্যার গুরুত্ব **৪১২-৪৫০**

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ৪১২

(ক) কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে পরিবারের দায়িত্ব-কর্তব্য ৪১৩

(খ) কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য ৪৩১

(গ) কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-কর্তব্য ৪৩৭

(ঘ) কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য ৪৪৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কিশোর অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে শরী'আতের শাস্তি বিধান ৪৫১-৪৯০

শাস্তির পরিচয় ৪৫১

শাস্তির শ্রেণিবিভাগ ৪৫২

শাস্তি বিধানের মূলনীতি ৪৬১

ইসলামে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ৪৬৩

ইসলামে অপরাধ প্রতিরোধ কৌশল ৪৬৪

(ক) অপরাধীর সংশোধন ৪৬৪

(খ) অপরাধ সংঘটনের পূর্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ৪৬৯

অপরাধ প্রতিরোধে ইবাদতের অভ্যস্তকরণ ৪৭৫

অপরাধ দমনে ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিস্তার ৪৮০

কিশোর অপরাধের বিচারে মহানবী (সা.) এর গৃহীত পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত ৪৮২

শরী'আহ নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা ৪৮৪

❖ **অভিসন্দর্ভের সার্বিক পর্যালোচনা** **৪৯১**

❖ **কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সুপারিশমালা** **৪৯৯**

❖ **উপসংহার** **৫০৫**

❖ **গ্রন্থপঞ্জী** **৫১১**

❖ **পরিশিষ্ট-১: শিশু আইন, ২০১৩** **৫২৯**

❖ **পরিশিষ্ট-২: প্রশ্নমালা** **৫৬১**

সারণীসমূহের তালিকা

সারণী-১: কিশোরের বয়সসীমা: দেশ -এশিয়া অঞ্চল ২২

সারণী-২: কিশোরের বয়সসীমা: দেশ -ইউরোপ অঞ্চল ২৩

সারণী-৩: বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা (মোট জন সংখ্যার %) ২৪

সারণী-৪: The age limits of a child/juvenile provide under various legislation ২৮

সারণী-৫: বিশেষ সুরক্ষা বা সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩০

সারণী-৬: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের পরিবারের ধরন ১১৫

সারণী-৭: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের শিক্ষাগত অবস্থা ১১৭

সারণী-৮: Incidents of Sexual Abuse and Exploitations in 2018 ১২১

সারণী-৯: Distribution of Raped Children by Age ১২২

সারণী-১০: Distribution of Perpetrators by Age ১২৩

সারণী-১১: Population of Bangladesh (Based on Bangladesh Sample Vital Statistics) ১২৯

সারণী-১২: তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (কিউক) নিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের পেশা ১৩২

সারণী-১৩: Rohingya Population In Bangladesh ১৩৩

সারণী-১৪: আবাসিক স্থান অনুযায়ী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (কিউক) নিবাসীদের পরিসংখ্যান ১৩৭

সারণী-১৫: Child Rights Violations in 2018 ১৪১

সারণী-১৬: Literacy Rate of Population 7+ Years ১৪৩

সারণী-১৭: Literacy Rate of Population 7+ Years (Rural Area) ১৪৩

সারণী-১৮: Literacy Rate of Population 7+ Years (Urban Area) ১৪৪

সারণী-১৯: Literacy Rate of Population 15+ Years (Percent) ১৪৪

সারণী-২০: Literacy Rate of Population 15+ Years (Rural Area) ১৪৪

সারণী-২১: Literacy Rate of Population 15+ Years (Urban Area) ১৪৪

সারণী-২২ : Trend of Income Poverty ১৪৯

সারণী-২৩: Poverty Situation ১৪৯

সারণী-২৪: Economically Active Population/ Labour force (Million) 15+	১৫১
সারণী-২৫: Employed Population/ Labour force (Million) 15+	১৫২
সারণী-২৬: Bangladesh Unemployment Rate 2015-2019	১৫২
সারণী-২৭: Bangladesh Unemployed Population (Million)	১৫৩
সারণী-২৮: Consumer Price Index and Inflation	১৫৪
সারণী-২৯: GDP, GNI, Per Capita GDP and GNI at Current Market Prices	১৫৫
সারণী-৩০: বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা	১৬৩
সারণী-৩১: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের অপরাধ (সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত নিবাসীদের ভিত্তিতে)	১৭১
সারণী-৩২: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের অপরাধ (মামলার ধরন অনুযায়ী কেন্দ্রের সকল নিবাসীদের ভিত্তিতে)	১৭২
সারণী-৩৩: The Present Position and Description of three KUKs	২৩৪
সারণী-৩৪: Administrative structure of the Kishor Unnayan Kendra	২৩৬
সারণী-৩৫: নিবাসী শিশু-কিশোরদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ	২৩৮
সারণী-৩৬: নিবাসীদের প্রাত্যহিক কর্মসূচী	২৩৯
সারণী-৩৭: নিবাসীদের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা	২৪০
সারণী-৩৮: টঙ্গী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের কেইস ভিত্তিক পরিসংখ্যান	২৪০
সারণী-৩৯: টঙ্গী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের অপরাধের ধরন	২৪১
সারণী-৪০: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশু-কিশোরের সংখ্যা	২৪২
সারণী-৪১: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত শিশু-কিশোরের সংখ্যা	২৪২
সারণী-৪২: সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে মোট শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা	২৪৩
সারণী-৪৩: বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা	২৪৩
সারণী-৪৪: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পুলের হাট যশোরের জনবল কাঠামো	২৪৬
সারণী-৪৫: একনজরে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোরে অবস্থানরত শিশু-কিশোরদের পরিসংখ্যান	২৪৮
সারণী-৪৬: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যশোর, নিবাসীদের বয়সভিত্তিক পরিসংখ্যান	২৪৯
সারণী-৪৭: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশু-কিশোরের সংখ্যা	২৪৯

সারণী-৪৮: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত শিশু-কিশোরের সংখ্যা ২৫০

সারণী-৪৯: সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে মোট শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা ২৫০

সারণী-৫০: বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা ২৫১

সারণী-৫১: মামলার ধরন অনুযায়ী যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীর পরিসংখ্যান ২৫১

সারণী-৫২: অবস্থানের সময় অনুসারে নিবাসীদের পরিসংখ্যান ২৫২

সারণী-৫৩: আদালতে হাজিরা ভিত্তিক নিবাসীদের পরিসংখ্যান ২৫৩

সারণী-৫৪: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোরে অবস্থানরত শিশু-কিশোরদের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান ২৫৩

সারণী-৫৫: মামলার ধরন অনুযায়ী কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের সংখ্যা ২৫৮

সারণী-৫৬: কিশোরী (বালিকা) নিবাসীদের প্রাত্যহিক কর্মসূচী ২৫৯

সারণী-৫৭: কিশোরী (বালিকা) নিবাসীদের বয়স ভিত্তিক পরিসংখ্যান ২৫৯

সারণী-৫৮: বিচারাধীন/আটকাদেশ ভিত্তিক কিশোরী (বালিকা) নিবাসীদের সংখ্যা ২৬০

সারণী-৫৯: অবস্থানের সময় অনুসারে কিশোরী (বালিকা) নিবাসীর সংখ্যা ২৬০

সারণী-৬০: আদালতে হাজিরা ভিত্তিক কিশোরী (বালিকা) নিবাসীর সংখ্যা ২৬১

সারণী-৬১: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ভর্তিকৃত কিশোরীর সংখ্যা ২৬১

সারণী-৬২: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কিশোরীর সংখ্যা ২৬২

সারণী-৬৩: শুরু থেকে জুন,২০২০ পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশু-কিশোরের সংখ্যা (তিন কেন্দ্রে একত্রে) ২৬৩

সারণী-৬৪: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত পুনর্বাসনকৃত শিশু-কিশোরের সংখ্যা (তিন কেন্দ্রে একত্রে) ২৬৩

সারণী-৬৫: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (তিন কেন্দ্রে একত্রে) ২৯৫

সারণী-৬৬: বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা (তিন কেন্দ্র একত্রে) ২৯৫

সারণী-৬৭: বাংলাদেশে শিশু-কিশোর সংক্রান্ত আইনী কাঠামো ৩৪১

সারণী-৬৮: শিশু কল্যাণ মাত্রা (মন্ত্রণালয় ভিত্তিক) ৩৪৫

সারণী-৬৯: সামগ্রিক শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বাজেট ৩৪৭

সারণী-৭০: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল ৩৫০

সারণী-৭১: এক নজরে সরকারি পরিচালনায় এতিম পুর্নবাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম ৩৭৬

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের গবেষক জনাব আমীর হোসেন কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা"** (Directives of Islam for the Prevention of Adolescent Delinquency: A Survey on Bangladesh's Adolescent Development Centres) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমি এ পাণ্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি গবেষকের একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপিত হয়নি। সুতরাং গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ও

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত **"কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা"** (Directives of Islam for the Prevention of Adolescent Delinquency: A Survey on Bangladesh's Adolescent Development Centres) শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক **ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ,** অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জন বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

(আমীর হোসেন)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন নং ১৩৬/২০১৫-২০১৬
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে নানামুখী প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে অবশেষে **"কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা"** (Directives of Islam for the Prevention of Adolescent Delinquency: A Survey on Bangladesh`s Adolescent Development Centres) শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরেছি। যথাসময়ে বিধিমোতাবেক অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং সাইয়্যেদুল মুরসালিন খাতামুন্নাবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) -এর শানে দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামি চিন্তাবিদ, স্বনামধণ্য শিক্ষাবিদ ও গবেষক, জনপ্রিয় দা'য়ী ও টেলিভিশন উপস্থাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় -এর প্রতি। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণাকর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা এবং দিকনির্দেশনাই ছিল আমার গবেষণাকর্মের পাথেয়। গবেষণার বিষয় নির্বাচন এবং সিনোপসিস প্রস্তুতকরণে পরামর্শ ও সহযোগিতা এবং গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য তিনি আমাকে বারংবার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ফলেই আল্লাহর রহমতে অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতায় আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপ-অধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। তাঁর বারবার অনুশাসনের কারণেই আমি গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে শেষ করতে পেরেছি। এ জন্য তাঁর প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁর যথাযথ তত্ত্বাবধানের কারণেই গবেষণাকর্মটি শেষ পর্যন্ত ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। আমি তাকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত প্রার্থনা করছি।

অভিসন্দর্ভটি রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে যার পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণায় বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে, যার কাছে আমার ঋণ অনেক, তিনি হলেন আমার পরম শিক্ষাগুরু উস্তাজুল আসাতিজা, অনেক মূল্যবান তাফসীর ও হাদীসের বাংলা অনুবাদক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের সিলেবাস প্রণেতা, জীবন্ত কিংবদন্তিতুল্য ইসলামি পণ্ডিত, জ্ঞানতাপস অধ্যাপক আব্দুল মালেক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁর প্রতি আমি অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর মূল্যবান পরামর্শে আমার অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ হয়েছে এবং আমি তাঁর সান্নিধ্যে এসে পরামর্শ গ্রহণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। মহান আল্লাহর নিকট আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও নেক হায়াত কামনা করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা মোসাম্মৎ রাজিয়া বেগম এবং বাবা জনাব আব্দুল মালেক আকন-কে। তাঁদের আন্তরিক দু'আ, স্নেহ-ভালবাসা ও উৎসাহ-উদ্দীপনাই আমাকে এই দুরূহ কাজ সম্পাদনের সাহস যুগিয়েছে। তাঁদের অপরিসীম আত্ম ত্যাগ ও প্রাণান্তর প্রচেষ্টার কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এমনই এক স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে তাঁদের সুস্বাস্থ্য কল্যাণময় জীবন কামনা করছি।

আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর লিখিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষক ও সম্মানিত লেখকগণের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে যথাস্থানে পাদটীকা ও তথ্যসূত্রে সে সকল লেখক ও গবেষকের নাম ও তাঁদের গ্রন্থ বা প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। তবুও এখানে আরেকবার ঐসকল লেখক ও গবেষকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, সমাজ কল্যাণ ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি (বায়তুল মোকারাম), আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরি (তোপখানা রোড, পল্টন) সহ অন্যান্য লাইব্রেরি, বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব, সমাজসেবা অধিদফতরের শ্রদ্ধাভাজন ডিজি, যাদের অনুমতির পত্র পেয়ে আমি বাংলাদেশের তিনটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ, অবস্থান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে পেরেছি। বাংলাদেশ সরকারের তিনটি কিশোর উন্নয় কেন্দ্রের (পরবর্তী সময়ে নাম পরিবর্তিত হয়ে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিণত হয়।) সুপারিনটেনডেন্ট/সুপারভাইজার, সহকারী সুপারভাইজার, প্রবেশন অফিসার, ব্যক্তি সমাজকর্মী অফিসার, সহায়ক স্টাফ এবং উক্ত তিনটি কেন্দ্রের কিশোর-কিশোরী নিবাসী প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে অত্র বিভাগের সম্মানিত সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষকরে বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. রফীকুল ইসলাম এবং ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম -এর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, যাদের ভ্রাতৃত্বসুলভ কর্তব্য, পরামর্শ ও বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতায় আমার এ অভিসন্দর্ভ সমৃদ্ধ হয়েছে।

এছাড়া এখানে নাম উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি এমন অনেক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও সহকর্মীর সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করেছি, তাদেরকেও আমি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। যেসব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন আমাকে তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়া অভিসন্দর্ভটির মাঠপর্যায়ে গবেষণা সম্পন্ন করতে যেসকল শুভাকাঙ্ক্ষীর সহযোগিতা গ্রহণ করেছি, তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

আমার শ্রদ্ধেয় শশুর-শাশুড়ি, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব ও শুভানুধ্যায়ী যারা সবসময় আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার বড় মেয়ে ফাতিহা জাহান মামদুহা দুজানা এবং ছোট মেয়ে ফাতিমা জানা জান্নাতাইন দিয়ানা গবেষণার কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেক সময় আমার সান্নিধ্য, স্নেহ, মায়ামমতা, আদর, ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি আমার আদরের কন্যাদ্বয়ের জন্য আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন ওদেরকে সদা সুখ-শান্তিতে রাখেন এবং কুরআনে হাফেজা ও আবেদা হিসেবে কবূল করেন।

সর্বোপরি আমি আমার সহধর্মিনী নিলুফার ইয়াসমিন -এর কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। গবেষণাকালীন সময়ে আমার ছোট্ট সন্তানদের বাবা-মায়ের আদর-স্নেহ প্রদান, স্কুল-কলেজ ও সাংসারিক দায়িত্ব পালন ছাড়াও গবেষণার বিভিন্ন কাজে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তার সহযোগিতা না পেলে গবেষণাকর্মটি শেষ করা আমার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতো না। আমি তার প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা জানাই। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন!

আমীর হোসেন
পিএইচ.ডি. গবেষক
ও
সহকারী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০

ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ নির্দেশনা

আল-কুরআন, ১০: ২০	=	প্রথম সংখ্যা সূরার ক্রমিক নম্বর ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াত নম্বর
অনু.	=	অনুবাদ
অনূ.	=	অনূদিত
আ.	=	আলাইহিস সালাম
আ.	=	আরবি
ইং	=	ইংরেজি
ইফাবা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
কিউক	=	কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র
খ.	=	খণ্ড
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
খৃ.পূ	=	খৃস্টপূর্ব
জ.	=	জন্ম
ড.	=	ডক্টর
ডা.	=	ডাক্তার/চিকিৎসক
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
পুন.	=	পুনরায়
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত/ পূর্বের উক্তি
ব.	=	বঙ্গাব্দ
বা.	=	বাংলা
বি.দ্র.	=	বিশেষ দ্রষ্টব্য/ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য
মৃ.	=	মৃত, মৃত্যু
র./রহ.	=	রাহমাতুল্লিল্লাহি আলাইহি
রা.	=	রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু/ আনহুমা/ আনহুম

সম্পা	=	সম্পাদনা/ সম্পাদিত
সা.	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হি.	=	হিজরি
A.H	=	Anno Hegirae; After Hijra (হিজরি)
A.D	=	Anno Domini (খ্রিস্টাব্দ)
B.C	=	Before Christ (খৃস্টপূর্বাব্দ)
BLC	=	Bangladesh Law Chronicles
CRC	=	Convention on the Rights of the Child
DLR	=	Dhaka Law Reports
Ed.	=	Edition/Editor/Edited
HDC	=	High Court Devision
Ibid	=	(Ibidem) in the same place, from the same source.
JASB	=	Journal of Asiatic Society of Bangladesh
KUK	=	Kishor Unnoyan Kendra
N.B	=	Note Bene
Op.cit	=	Opera-Citrae
P.	=	Page
PP.	=	Pages
Sec.	=	Section
Vol	=	Volume

প্রতিবর্ণায়ন

[আরবি বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ]

ا	=	অ		ع	=	‘		إي	=	ী
ب	=	ব		غ	=	গ		أى	=	ঈ
ت	=	ত		ف	=	ফ		أُ	=	উ
ث	=	ছ		ق	=	ক		أو	=	উ
ج	=	জ		ك	=	ক		ؤو	=	উ
ح	=	হ		ل	=	ল		عو	=	‘উ
خ	=	খ		م	=	ম		و	=	ূ
د	=	দ		ن	=	ন		وِي	=	বী/ভী
ذ	=	জ		و	=	ওয়া		يُو	=	ইয়ু
ر	=	র		هـ	=	হ		ـَ	=	া
ز	=	ঝ		ء	=	’		ـِ	=	ি
س	=	স		ي	=	য়		ـُ	=	ু
ش	=	শ		ع	=	‘আ		يِ	=	য়ী
ص	=	স		عِ	=	‘ই				
ض	=	দ/য		عُ	=	‘উ				
ط	=	ত		يا	=	ইয়া				
ظ	=	য		يِ	=	য়ি				

বি. দ্রঃ

- উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসৃত হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হয়েছে। কোন কোন বানান বাংলা ভাষায় অধিক প্রচলিত হওয়ার কারণে উল্লিখিত প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি।
- যেসব ‘আরবি শব্দ দীর্ঘদিন ব্যবহারে বাংলা ভাষার অংশবিশেষে পরিণত হয়েছে সেগুলোর বানানে প্রচলিত নিয়ম যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়েছে।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং শত সহস্র-দরুদ ও সালাম সর্বশেষ নবী ও রাসূল সাইয়্যেদুনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর শানে যার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নি'আমত ইসলামকে শাশ্বত জীবন বিধান হেসেবে পেয়েছি। মানুষ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সেরা সৃষ্টি। এ শ্রেষ্ঠত্ব মূলত তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিবেক, সত্যানুসন্ধিৎসা, তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, দানশীলতা, পরোপকার প্রভৃতি মানবিক গুণের কারণে স্বীকৃত। মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা, সহানুভূতি ও মমত্ববোধ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় আসীন করেছে। বিশেষত জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বিচারশক্তিতে অনন্য হওয়ার ফলে গোটা সৃষ্টিলোকে তার মর্যাদা অনন্য। এ অনন্যতার ঘোষণা করে মহান আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি, তাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[১]

মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড পরিহার করে নিজের অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নানারূপ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এর ফলে তার অনন্য মানবিক মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্র অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এ কারণেই অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যুগে যুগে ও দেশে দেশে জ্ঞানী-গুণী, মনীষী, দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক ও মহাপুরুষগণ নানা পন্থা ও পদ্ধতির সন্ধান করছেন। অপরাধের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা, অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান, অপরাধ দমনে কঠোর আইন প্রণয়ন, এমনকি অপরাধীর চারিত্রিক বিশোধনের জন্যও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না; বরং অপরাধ দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, সমাজে অপরাধীর সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যর্থতা শুধু বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোই বরণ করছে না, বরং তথাকথিত উন্নত পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও একই দৃশ্য চোখে পড়ছে।

ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র কল্যাণময় সার্বিক জীবন বিধান। ইসলামে রয়েছে অপরাধমুক্ত সমাজ নির্মাণের মহত্তম দৃষ্টান্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের চেয়ে অপরাধ প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলাম সমাজে অপরাধ সংঘটনের পর কেবল তার প্রতিকার ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে না; বরং অপরাধ সৃষ্টির সুযোগ ও সম্ভাবনার সকল পথকে আগেভাগেই রুদ্ধ করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে ইসলাম মানুষের জৈবিক, মানবিক ও প্রাকৃতিক চাহিদাগুলো যেমন যথোচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও

---

১. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০ (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)

পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে অপরাধ থেকে বিরত থাকতে তাদের সচেতন করে তোলে। এর পরেও কেউ যদি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে তাহলে ইসলাম তার জন্য কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবোত্তর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় অপরাধের ধরন ও মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে আশঙ্কাজনক হারে কিশোর অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিন দিন যেন এ মাত্রা আরো বেড়েই চলছে। বিষয়টি সমাজের চিন্তাশীল মানুষের পাশাপাশি সমাজবিজ্ঞানী, অপরাধ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, আইনবিদ, রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলছে। আমাদের শিশু-কিশোরদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ ও মানদণ্ডে প্রতিপালন ও পরিচর্যার ব্যর্থতা ও অক্ষমতা সুপ্রাচীন। সপ্তম ও অষ্টম শতকে রোমান সমাজে উড়নচণ্ডী, বিচ্যুত ও উচ্ছন্নে যাওয়া শিশু-কিশোরদের জন্য গৃহীত সংশোধন কার্যক্রম সমাজে প্রাচীন কাল থেকে কিশোর অপরাধ ও অপরাধীর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। এরপরে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের অধিকাংশ দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে বিচ্যুত ও অপরাধপ্রবণ বা অপরাধী কিশোরদের শারীরিক শাস্তি প্রদান ও জেল-হাজতে প্রেরণের পরিবর্তে সংশোধনীর জন্য “সংশোধনী প্রতিষ্ঠান” বা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বিচ্যুত ও অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের নিয়ে বর্তমান সময়ে পিতামাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎকণ্ঠা-উদ্বিগ্নতা এবং এর প্রতিকার হিসেবে বিভিন্ন দেশে নানারূপ পদক্ষেপ গ্রহণ তারই ধারাবাহিকতা মাত্র। ১৮৯১ সালে United States of America -এর ইলিনয়স স্টেটে কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠা এবং কিশোর অপরাধের আইনী সংজ্ঞা নিরূপণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে সর্বপ্রথম কিশোর অপরাধের আইনী ধারণার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

প্রচলিত আইন ও সমাজ ব্যবস্থায় কিশোর উন্নয়ন ও সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং কিশোর অপরাধের বিচার ব্যবস্থার পৃথকীকরণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রয়াস হলেও ইসলাম এ ব্যাপারে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতেই প্রয়োজনীয় কার্যকর এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। কিশোরদেরকে অপরপাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখার জন্য ইসলাম মূলত উপযুক্ত প্রতিপালনের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। অপরাধপ্রবণতা মুক্ত হয়ে শিশু-কিশোরদের বেড়ে উঠার জন্য ইসলাম পিতামাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রতিরোধমূলক কর্তব্য নিরূপণ করে দিয়ে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপরেখা প্রণয়ন করেছে, যে সমাজে কোন কিশোরের মনে অপরাধপ্রবণতা দানা বাঁধার সুযোগ থাকে না। এছাড়া ইসলামি শরী‘আহ কিশোরদেরকে ‘গাইরে মুকাল্লাফ’ তথা দায়ভার ও জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত বিবেচনা করে তাদের কৃত অপরাধের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাই এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ, অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে ইসলামের দিকনির্দেশনা সকল সমাজে, যুগোপযোগী এবং ফলপ্রসূ।

বর্তমান সময়ের প্রত্যেকটি আধুনিক সমাজ বা রাষ্ট্র শিশু-কিশোরদের দু'টি সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। প্রথমটি হলো তাদের সন্তানদের সামাজিকীকরণ সমস্যা এবং দ্বিতীয়টি হলো বিচ্যুত ও অপরাধপ্রবণ কিশোরদের পুর্নবাসন সংক্রান্ত সমস্যা। আজ বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের মাত্রা ও পরিধি ক্ষিপ্র গতিতে সম্প্রসারিত হচ্ছে, যা সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য মারাত্মক হুমকিরূপে আবির্ভূত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক ও অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়ে তাদের পূর্বসূরীদের সৎ ও মহৎ মানবীয় গুণাবলীসমূহ পালনের অক্ষমতা প্রদর্শন এবং অগ্রাহ্য করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এছাড়া প্রাপ্ত বয়স্কদের অপরাধ আচরণ যেমন, চুরি, ডাকাতি, চোরাকারবারি, হত্যা, মাদক ব্যবসা প্রভৃতি কিশোর অপরাধ আচরণে অনুপ্রবেশ করছে।

সুদূর অতীত হতে কিশোরদের বিচ্যুত, অনভিপ্রেত আচরণ, অন্যায়-অপকর্ম বয়স্কদের আইন ও বিধিমালার আলোকে বিবেচিত হতো। এর সাথে আরো যুক্ত হয়, আমাদের সমাজের সাধারণ এবং অতিসাধারণ জনগোষ্ঠী, যারা সহজেই একজন বয়স্ক অপরাধীর ন্যায় একজন শিশু বা কিশোরকেও তার যে কোন বিচ্যুত, অনভিপ্রেত আচরণের জন্য ভয়ঙ্কর অপরাধীর কলঙ্কের চিহ্ন প্রদান করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু, ইসলামে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের মর্যাদা বা অবস্থান খুবই সংরক্ষিত এবং এটা স্বীকৃত যে, দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে কিশোররা বয়স্কদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলামের পাশাপাশি আধুনিক সমাজেও কিশোরদের স্বতন্ত্র দায়িত্বশীলতার বিষয়টি ধীরে ধীরে স্বীকৃত হতে থাকে। এভাবে কিশোর অপরাধ সমস্যার সাথে দায়িত্বশীলতা, দায়ী-দোষী অথবা শাস্তি প্রভৃতি পরিভাষা থেকে অধিকন্তু উপলব্দি-অনুধাবন, দিকনির্দেশনা, যত্ন ও নিরাপত্তা, সংরক্ষণ, সংশোধন ও উন্নয়ন ইত্যাদি পরিভাষা অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিশোর অপরাধ সমস্যা নিয়ে গবেষণার মূখ্য কারণ হলো, কিশোর সময়টি ব্যক্তির মন ও মননে অপরাধের প্রবেশকাল, যা আমাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। অপরদিকে, তথাকথিত শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও উন্নতির ফলে আমাদের সমাজ তার অনুজ প্রজন্মের নিকট ইতিবাচক মূল্যবোধ পৌঁছাতে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ বিচ্যুত ও অপরাধপ্রবণ কিশোরই নিজেদেরকে বিরাজমান সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিপক্ষ মনে করে। তাই কিশোর অপরাধ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এ কারণে কিশোর অপরাধ ও সমাজের চোখে কিশোর অপরাধীর অবস্থান ও মর্যাদা সুনির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য যথাসময়ে ফলপ্রসূ কৌশলগত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে এসকল কিশোর অপরাধী একসময়ে পরিণত অপরাধীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এ প্রেরণা থেকেই এ বিষয়ে গবেষণার জন্য সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

আমাদের দেশে কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধনের জন্য স্বল্পপরিসরে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এ উদ্যোগ সমস্যার ব্যাপ্তি ও প্রসারতার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগের তুলনায় খুবই স্বল্প এবং অসংগঠিত। কিন্তু একটি উত্তম ও কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণের জন্য কিশোর অপরাধের মত একটি বিস্তৃত মারাত্মক সমস্যা নিরসনের বিষয়টি অবহেলা বা উপেক্ষা করা যায় না। তাই সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ, দমন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ফলপ্রসূ কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

একজন বিচ্যুত ও অপরাধী কিশোর পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার হতে পারে, হতে পারে নির্যাতনের শিকার, কিন্তু সে কোন অবস্থাতেই সমাজের বোঝা হতে পারে না। তাই মানব সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনা পুনরুদ্ধার ও বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সামাজিক ও আইনী প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার। এই সমস্যার বিস্তার রোধে সমাজের চিন্তাশীলগণের মনে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের গ্রেফতার ও শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ, সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অকৃত্রিম ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অতএব স্পষ্টত প্রতীয়মান এবং অনস্বীকার্য যে, কিশোর অপরাধ সমস্যা সম্পর্কে আরো গভীরভাবে অবগত হওয়ার জন্য ও সমস্যার বিভিন্ন দিক সূক্ষ্মরূপে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রচুর গবেষণা প্রয়োজন। এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কিশোরদেরকে অপরাধমুক্ত রাখা এবং অপরাধপ্রবণ কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন, অনুশাসন ও সমাজব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামের সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের আলোকে আরো কার্যকর ও যুগোপযোগী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, তা উদঘাটনের লক্ষ্যে **"কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা: বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা"** শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

এ গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের কিশোর অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট উপাদানসমূহ উদঘাটন এবং যেসমস্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শিশু-কিশোরদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে, সে কারণগুলো অনুসন্ধানের মাধ্যমে তুলে ধরা। কিশোর অপরাধের প্রকৃতি এবং এর সাথে সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যকারণ উপাদান অনুসন্ধান করা। এ সংক্রান্ত আইনী কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম এবং কিশোর অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার একটি বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করা। সর্বোপরি কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে ইসলামের নির্দেশনাসমূহ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে শিশু-কিশোর বান্ধব একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির রূপরেখা সূত্রবদ্ধ করা এবং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট শিশু-কিশোরসহ সকল শিশুর অপরাধমুক্ত জীবন-যাপনের জন্য ইসলামি নির্দেশনার আলোকে সুপারিশমালা উপস্থাপন করা।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর সমীক্ষা চালিয়ে সরকারের এ মহান উদ্যোগ জাতির প্রত্যাশা পূরণে কতটুকু সফলতা অর্জন করছে এবং কীভাবে আরো বেশি সফলতা লাভ করতে পারে তা বিশ্লেষণ করা হবে প্রস্তাবিত এ গবেষণা কর্মে। মহান আল্লাহর দেওয়া একমাত্র কল্যাণময় জীবনবিধান ইসলাম মহানবী (সা.) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে কিশোর অপরাধমুক্ত সমাজ নির্মাণের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে কীভাবে কিশোর অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হবে এ গবেষণা অভিসন্দর্ভে। প্রস্তাবিত গবেষণা বিষয়ে আমার পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ও সুপারিশ কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে এবং অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আমি দৃঢ় প্রত্যয়ী।

প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় অভিসন্দর্ভের পূর্ণাঙ্গ রূপদানের ক্ষেত্রে একাধিক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে Content Analysis, Descriptive and Purposive Opinion Survey পদ্ধতি। গবেষণা সংশ্লিষ্ট সমালোচনা, পুনর্মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে Content Analysis Methodology ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণা করা হয়েছে প্রধানত তিনটি ধারায়: প্রথমত, এতদবিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা তথ্য সংগ্রহ ও বিন্যাস করে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা। যে বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে, সে বিষয়কে পর্যাপ্ত তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করা এবং তৃতীয়ত, এতদবিষয়ে নতুন অবকাঠামো উপস্থাপন করা। বর্তমানে বাংলাদেশের কিশোর অপরাধীদের একটি নিয়মতান্ত্রিক ও সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি (Descriptive Methodology) ব্যবহার করা হয়েছে। আর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের অপরাধী নিবাসীদের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনার জন্য The Methodology of Purposive Opinion Survey ব্যবহার করা হয়েছে।

কিশোর অপরাধ, এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং সংশোধন ও উন্নয়নের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক বিধায় গবেষণ কর্মের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে এ সম্পর্কিত ইসলামি নির্দেশনা, নীতিমালা, আইন, বিধি-বিধান, তথ্য-উপাত্ত, মতামত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বই, রিপোর্ট, গবেষণা জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, গেজেট এবং অন্যান্য লিখিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের পরিচালিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহকে গবেষণার মাঠপর্যায়ের সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশে সরকার পরিচালিত তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। যথা: (১) টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, গাজীপুর, ১৯৭৬ (২) পুলেরহাট কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর, ১৯৯৫ এবং (৩) কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, গাজীপুর, ২০০২।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য অপরাধের সাথে জড়িত ঐসমস্ত কিশোর-কিশোরীকে নির্ধারণ করা হয়েছে, যারা কিশোর আদালতের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়ার পর বা বিচারাধীন সময়ে সংশোধনী কেন্দ্রসমূহের আওতায় রয়েছে। এক্ষেত্রে Purposive Sampling পদ্ধতিতে উত্তরদাতা নির্ধারণ করা হয়েছে। অপরাধ ও অপরাধীদের বহুমাত্রিকতা এবং বস্তুনিষ্ঠ চিত্র প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত নিবাসী; সংশোধনী পর্যায়ে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে (কিউকে) কমপক্ষে তিন মাস অবস্থান করছে এমন অপরাধীকে গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত কিশোর-কিশোরীদের বয়সের পরিসর ৯ থেকে ১৮ এর মধ্যে।

সর্বশেষ মাঠপর্যায়ে তথ্যানুসন্ধ্যানের সময় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মোট নিবাসীর সংখ্যা ৯২৭ জন ছিল।[২] তন্মধ্যে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ৫৭৬ জন, কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ৮২ জন এবং পুলেরহাট কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ২৬৯ জন। উল্লিখিত তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র-৬০ জন, কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র-১৫ জন এবং পুলেরহাট কিশোরী উন্নয় কেন্দ্র থেকে ৪০ জন) মোট ১১৫ জন নিবাসীকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। যেহেতু পুলিশ কেইসে আগত নিবাসীরা প্রত্যক্ষভাবে অপরাধের সাথে জড়িত তাই শুধুমাত্র পুলিশ কেইসের নিবাসীদেরকে গবেষণার কাজের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রের মধ্যে একটি মাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র এবং নিবাসীর সংখ্যা মোট নিবাসীর একদশমাংশেরও কম, তাই গবেষণার ক্ষেত্রে কিশোরী নিবাসীর সংখ্যা কিশোর নিবাসী থেকে কম নেওয়া হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহের সময়কালে অসুস্থতা এবং অন্যান্য কারণে (টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের ৭ জন, কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের ৫ জন এবং যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের ৩ জন) ১৫ জন নিবাসী ঝরে পড়ে। ফলে, গবেষণায় ব্যবহৃত মোট নিবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০ জনে। যা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে (কিউক) অবস্থানরত মোট নিবাসীর শতকরা ১০.৭৯ ভাগ এবং পুলিশ কেইসে আগত নিবাসীদের শতকরা ১৯ ভাগ।

গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে বিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়ক, দক্ষ গবেষকমণ্ডলী, শিক্ষাবিদ, ইসলামি চিন্তাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ অনুযায়ী একটি উন্মুক্ত (open) ও কাঠামোবদ্ধ (structured) প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাঠামোবদ্ধ (structured) বা নৈর্ব্যক্তিক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্মুক্ত (open) প্রশ্ন প্রস্তুত করা হয়েছে। যেহেতু কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে (কিউকে) অবস্থানকারী নিবাসীদের শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে, সেহেতু তারা সকলে প্রশ্নমালা পূরণে সক্ষম। তাই প্রশ্নমালা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে।

২. উল্লেখ্য যে, প্রতিমাসে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে নিবাসীদের আগমণ ও নির্গমণের ফলে মোট নিবাসীর সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে- (গবেষক)।

গবেষণার মূল উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ পদ্ধতির মাধ্যমে। এছাড়াও অতিরিক্ত হিসেবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্মুক্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা পদ্ধতিও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণাকর্ম চলাকালে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে অনির্ধারিত আলাপ-আলোচনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মটি প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উভয় তথ্য-উপাত্তের উপর নির্ভরশীল। গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উপাত্ত হলো- আইন, অর্ডিনেন্স, বিধি-বিধান, নীতিমালা, আন্তর্জাতিক নিমিত্তসমূহ প্রভৃতি। কিছু প্রাথমিক উপাত্ত পুলিশ স্টেশন, কিউক, কিশোর আদালত, সাধারণ আদালত, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়- অধিদফতর, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন এনজিও এবং এ বিষয়ে বিজ্ঞজনদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছ। গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দ্বৈতীয়িক উপাত্তের উপরও সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উপাত্তের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি দলীল-প্রমাণ, গবেষণা প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দলীল-প্রমাণ, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং পুলিশ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রকাশিত বই, আর্টিকেল, জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, অন্যান্য প্রকাশনী এবং ওয়েবসাইট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যদিও প্রাথমিক উপাত্তই গবেষণার মূল উপাদান কিন্তু দ্বৈতীয়িক উপাত্ত প্রাথমিক উপাত্তকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। Content analysis পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ আইন, নীতিমালা, আন্তর্জাতিক নিমিত্তসমূহ, আদালতের সিদ্ধান্ত, প্রভৃতি থেকে প্রথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের (কিউকের) কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে কিশোর অপরাধী, বিচারক, প্রবেশন অফিসার এবং কিশোর আদালতের সমাজকর্মীদের সাথে সরাসরি আলাপ-আলোচনা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস হতে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা, সম্পাদনা এবং নিরীক্ষণ করা হয়েছে। তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণে বিভিন্ন মতদ্বৈততা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। প্রস্তাবনা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যৌক্তিক দাবী পেশ করা হয়েছে এবং সন্দেহ-সংশয় দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপাত্ত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে Quantitative এবং Qualitative উভয় কৌশলই অবলম্বন করা হয়েছে। এবং Quantitative বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সারণী /Table ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে।

কিশোর অপরাধের ন্যায় একটি জটিল সমস্যা নিয়ে গবেষণা করা সত্যিই কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কিশোর অপরাধের জন্য বিশ্লেষণের একটি সামগ্রিক ও নিশ্চিত বিবরণ প্রদান খুবই দুরূহ ব্যাপার। তাই প্রস্তাবিত এ গবেষণাকর্মটিও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। প্রস্তাবিত গবেষণার শিরোনাম "কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা" নিয়ে সামগ্রিক গবেষণা তেমন একটা নেই বললেই চলে। এর অভাব পূরণ করা খুবই কষ্টকর। কিশোর অপরাধের কারণ ও কিশোর

অপরাধীদের নিয়ে বাংলাদেশে স্বীকৃত পরিসংখ্যান খুবই অপ্রতুল। এমনকি যেসব পরিসংখ্যান রয়েছে তার গ্রহণযোগ্যতা একেবারেই সীমিত। আলোচ্য গবেষণাকর্মের মাঠপর্যায়ের সমীক্ষায় শুধুমাত্র ১৮ বছরের নিচে এবং ৯ বছরের উর্ধ্বে ঐ সমস্ত শিশু-কিশোরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা 'আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত'[৩] হয়েছে এবং অপরাধ সংগঠনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে অবস্থান করছে। সরকার ও এনজিও পরিচালিত 'সেফ হোম' গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। জেলে অবস্থানকারী কিশোর অপরাধীদের গবেষণার আওতায় আনা হয়নি। এই গবেষণায় দেশীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত কোন উন্নয়ন বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাথে আন্তর্জাতিক কোন সংশোধনী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। এছাড়া কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের (কিউক) নিবাসীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন সময় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি উত্তরদাতাকে প্রভাবিত করেছে এবং বিচার সম্পর্কিত বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদানে বিরত থাকতে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে হয়েছে।

উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভটির বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবসৌন্দর্য ও অবয়বকে সুন্দর ও সুচারুভাবে বিন্যস্ত করে উপস্থাপন করার নিমিত্তে এটিকে সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছে। অধ্যায়গুলো আবার একাধিক পরিচ্ছেদে গ্রন্থিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণা শিরোণামে উল্লিখিত পরিভাষাসমূহের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। কিশোরের সংজ্ঞা, শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন, কৈশোর ধারণার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ, কিশোরের বয়সসীমা, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোরের পরিচয় আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অপরাধের পরিচয় ও শ্রেণিবিন্যাস, ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে অপরাধ ও অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস আলোচিত হয়েছে। এছাড়া কিশোর অপরাধের পরিচয়, কিশোর অপরাধী, অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ে প্রচলিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, কিশোর অপরাধের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ এবং বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ও প্রভাব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কিশোরের অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গৃহীত নীতিমালা ও কিশোরের অধিকার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পিতামাতা, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ, পাড়া-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সহপাঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কিশোরের দায়িত্ব-কর্তব্য বিবৃত হয়েছে।

৩. আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু অর্থ এমন শিশু, যে দণ্ডবিধির ধারা- ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত। [*শিশু আইন*, ২০১৩, ২০১৩ সনের ২৪ নং আইন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণমন্ত্রণালয়, ১৮ আগষ্ট, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ২(৩)]

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, কার্যক্রম, নিবাসীদের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, প্রবেশন ও প্যারোল কার্যক্রম, কিশোর অপরাধের বিচার, সর্বোপরি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা উপস্থাপন করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশে শিশু-কিশোরের উন্নয়ন ও সংশোধনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ও আইনী কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। শিশু-কিশোরদের অধিকার সুরক্ষায় এসকল পরিকল্পনা ও আইনের বাস্তবায়ন; অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরী সংশোধন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সর্বোপরি 'শিশু আইন, ২০১৩' পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশ সরকারের শিশুকল্যাণ কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭ম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে ইসলাম ও ইসলামি শরী'আতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং ইসলামে শিশু-কিশোরের মর্যাদা পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিশু-কিশোরের অপরাধমুক্ত জীবনযাপনে পরিবার, সমাজ, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামের দৃষ্টিতে শাস্তি, শাস্তি বিধানের মূলনীতি, অপরাধ প্রতিরোধে ঈমান ও আবশ্যিক ইবাদতসমূহের (সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ) ভূমিকা, কিশোর অপরাধের বিচারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর গৃহীত পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত এবং ইসলামে শাস্তিদানের চূড়ান্ত লক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

"গবেষণার সার্বিক মূল্যায়ন" শিরোনামে অভিসন্দর্ভে বিশ্লেষিত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ ছড়িয়ে পড়ার কারণ, এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার এবং সংশোধন ও উন্নয়ন কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে। অতঃপর বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধনের উপায় "সুপারিশমালা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়াও অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার সংযোজন করা হয়েছে এবং গবেষণায় সহায়ক গ্রন্থাবলির তালিকা "গ্রন্থপঞ্জি" শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে। সর্বশেষে "পরিশিষ্টে" 'শিশু আইন, ২০১৩' এবং গবেষণায় মাঠপর্যায়ের সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা সংযোজিত হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করি যে, এ অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরো ব্যাপকভাবে গবেষণার পথ উন্মুক্ত হবে এবং ভবিষ্যতে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করার জন্য নতুনভাবে প্রেরণা জোগাবে। আমি দৃঢ়ভাবে এও বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণাকর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন হবে এবং সে সাথে এটি বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে দিকনির্দেশনা পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

পরিশেষে এ গবেষণাকর্মের অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ আমার এ প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন!

প্রথম অধ্যায়

কিশোর : পারিভাষিক বিশ্লেষণ ও পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

কিশোরঃ পারিভাষিক বিশ্লেষণ ও পরিচয়

শিশু-কিশোরই হচ্ছে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। একজন ব্যক্তির জীবন পরিক্রমায় তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সময় হচ্ছে কৈশোরকাল। সাধারণত শৈশবকাল থেকে পরিণত বয়সে পৌঁছার মধ্যবর্তী সময়টাকে কৈশোরকাল হিসেবে ধরা হয়। এটি এমন একটি সময় যখন ব্যক্তি অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। মানবের শারীরিক বিকাশের যে স্তরে উল্লেখযোগ্য জৈবিক ঘটনা দ্বারা ব্যক্তি প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে, বয়ঃসন্ধি চিহ্নিত হয়, যা জৈব-রসায়ন, শরীরবৃত্তীয় এবং শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রাথমিক ইঙ্গিত বহন করে- এটাকেই সাধারণত কৈশোর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তবে কিশোরের পরিচয়ে দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন আইন ও বিধিতে রয়েছে বৈপরিত্য ও স্বাতন্ত্র্য। আবার কিশোরের পরিচয় প্রদানে ইসলামের রয়েছে একেবারেই স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। তাই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কিশোরের একক সর্বসম্মত সংজ্ঞা নিধারণ করা খুবই দুরূহ কাজ। কিন্তু শিশু-কিশোরের বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির জন্য, বিশেষ করে আইনী সহযোগিতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের সংজ্ঞায়ন খুবই জরুরী। তাই বক্ষ্যমাণ অংশে আইনী, সমাজতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কিশোরের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

কিশোরঃ পারিভাষিক বিশ্লেষণ

কিশোর মানব জীবনের ঐ সময়টাকে বুঝায়, যে সময়ে সে শিশুকাল অতিক্রম করে কিন্তু পরিণত বয়সে উপনীত হয় না। অর্থাৎ কিশোর হলো কোন ব্যক্তির শৈশব ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার মাঝামাঝি অবস্থা। কিশোর পরিভাষাটি বিশ্লেষণ করলে এর প্রতিপাদ্য বিষয় সহজেই অনুমেয় হবে। তাই কিশোর শব্দটি ব্যাখ্যা ও পরিচয়ের পর একটি সামগ্রিক সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করা হবে। বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, কিশোর শব্দটি সংস্কৃত কিম্+√শ+ওর (ওরন) থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হচ্ছে, "বাল্য ও যৌবনের মাঝামাঝি বয়সী; অপ্রাপ্তবয়স্ক; ১১ থেকে ১৫ বৎসর বয়স্ক। অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, শিশু ও যুবকের মধ্যবর্তী স্তরের পুরুষ।"[১] এর স্ত্রীবাচক শব্দ কিশোরী। সাধারণত কিশোর-কিশোরী বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্তী বয়সের ছেলে-মেয়েদের বুঝায়। কিশোর শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Adolescence, Juvenile, Teenager, Purilis,Young Person প্রভৃতি। এ সম্পর্কিত অধিকাংশ Rules বা Guidelines -এ 'শিশু' এবং 'যুবক'

---

১. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ৭ম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৬৪; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতাঃ সাহিত্য সংসদ, ২০০০খ্রি.) ২৪তম সংস্করণ, পৃ. ১৫২

(“Child” and “Young”) এ পরিভাষা দুটি প্রায়শই ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ বা কিশোর অপরাধের ধরন বোঝানোর জন্য “Adolescence and Juvenile” পরিভাষাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।[২] আর Adolescence শব্দটি adolescens থেকে উৎপন্ন। যা adolescere শব্দের present participle রূপ।[৩] এর অর্থ যৌবনে পদার্পন বা শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পন। শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী কাল বা এ সময়কার প্রবৃদ্ধি, প্রাপ্তকৈশোর, কিশোর, সদ্য যুবক।[৪] Oxford Advanced Learner`s Dictionary তে Juvenile -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “Young people who are not yet adults.”[৫] অর্থাৎ কিশোর হলো এমন যুবক যে এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। Marriam-Webstar Dictionary তে Adolescence -এর পরিচয়ে বলা হয়েছে, “The period of life when a child develops into an adult: The period from puberty to maturity terminating legally at the age of majority.”[৬] অর্থাৎ জীবনের এমন সময়, যখন একজন শিশু পরিণত বয়সে বিকশিত হয়: বয়ঃসন্ধিকাল থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত সময়কাল, আইনগতভাবে সাবালকত্বের মাধ্যমে যার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আরবি পরিভাষায় কিশোরকে সবিয়ুন (صبيٌّ), আর কিশোরীকে (صَبية) বলা হয়। المعجم الوسيط গ্রন্থে কিশোরের পরিচয়ে বলা হয়েছে, صبيٌّ একবচন, এর বহুবচনে صِبيَة وصِبيَان و صُبيان ব্যবহৃত হয়। আর সবিয়ুন (صبيٌّ) বা কিশোর হলো, – الصَغِيرٌ دُون الغُلام او من لم يُفطَمُ بَعدُ অর্থাৎ যুবক নয় এমন শিশু অথবা এমন শিশু যে আর দুগ্ধপান করে না।[৭] আরবি ভাষায় কিশোরের প্রতিশব্দ হিসেবে অধিক ব্যবহৃত শব্দ হলো مراهق او يافع। ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণকারী স্বপ্নদোষের নিকটবর্তী সন্তানকে (مراهق او يافع) মুরাহিক বা ইয়াফি বলা হয়।[৮] আর বিখ্যাত আরবি অভিধান المعجم الوسيط গ্রন্থে মুরাহিক (مراهق) –এর পরিচয়ে বলা হয়েছে, قَارب الحُلم او من قارب الرُشد– অর্থাৎ-স্বপ্নদোষের নিকটবর্তী অথবা প্রাপ্ত বয়স্কের নিকটবর্তী বয়সের ব্যক্তিকে (مراهق) মুরাহিক বলা হয়।[৯]

---

২. Dr. Nahid Ferdousi, *Juvenile Justice System in Bngladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, February,2012), p. 12
৩. “Adolescence” International Encyclopedia of Social Science, http://www.encyclopedia.com
৪. Zillur Rahman Siddiqui (edited), *Bangla Academy English-Bangla Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 1993), p. 12
৫. *Oxford Advanced Learner`s Dictionary* (Uk: Oxford University Press, 5th Edition, 1999), p. 646
৬. https://www.marriam-webstar.com
৭. ইব্রাহীম মাদুকর ও অন্যান্য সম্পাদিত, *আল-মু'জামুল ওসীত* (মিসর: মাকতাবাতুল শুরুকিদ-দৌলাহ, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৫০৮
৮. আবূ মনছুর আছ-ছা'লাবী, *ফিকহুল লুগাহ* (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.), খ. ১, পৃ. ১৭
৯. *আল-মু'জামুল ওসীত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬১

অনেক সমাজেই কিশোরকে যৌবনপ্রাপ্তি এবং শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জনকে বুঝায়। আবার অনেক সমাজে কিশোরকে আরো বৃহৎ আঙ্গিকে দেখা হয়। যা শরীর তত্ত্বীয়, সামাজিক, নৈতিক এবং বিশেষ করে শারীরিক সক্ষমতার সমন্বয়ে বিবেচনা করা হয়। এসব সমাজে কিশোর বলতে সাধারণত ১২ থেকে ২০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের বুঝায় যা টিনেজ শব্দের পরিপূরক বলে মনে করা হয়। এ কৈশোর সময়ে পিতামাতার সাথে মনোমালিন্য এবং আবেগী দূরত্বের সূচনা হয়। তবে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ উন্নয়নের এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য এরকম আবেগী দূরত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে থাকে। এরকম সময়ে একজন কিশোর কালেভদ্রে সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু হতে যৌবনে পদার্পণকালে একটা অনিশ্চয়তাপূর্ণ সময় অতিবাহিত হয়। এ বয়সে সময়ের সাথে সাথে ব্যক্তির গুপ্ত যৌন চাহিদার অভিজ্ঞতা ঘটে, যা পরবর্তীতে উচ্ছ্বাসিত যৌন আবেগে রূপান্তরিত হয়। কৈশোরেই ব্যক্তি যৌন চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার বিষয় জানতে পারে। কতিপয় বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, কৈশোরে সমস্যাসমূহ অনেকের নিকট খুবই তীব্রতর হয় আবার কোন কোন কিশোর সহজেই শান্তিপূর্ণভাবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যায়। আবার অনেকে মনে করেন, আচার-আচরণের ভিন্নতা ও শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কৈশোরকাল তীব্র আবেগপূর্ণ এবং stressful হয়।

কিশোরের সংজ্ঞা

সাধারণত কিশোর (Adolescence/Juvenile) বলতে একজন ব্যক্তির শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কতার মধ্যকার শারীরিক বৃদ্ধি ও উন্নয়নের পরিবর্তনশীল ধাপকে বুঝায়। অন্যকথায় কৈশোর মানুষের বয়সের একটি বিশাল পরিসরকে বুঝায়, যা একজন মানুষ শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যকার সময়কালে অতিবাহিত করে। বর্তমান সময়ে কিশোর পরিভাষাটি সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি দ্বারা স্বীকৃত একটি আইনী পরিভাষা। তাই কিশোরের পরিচয় সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনের জন্য আমরা এখানে কিশোরের কিছু প্রামাণ্য সংজ্ঞা উপস্থাপনের প্রয়াস পাব।

বাংলাদেশের 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১' -তে কিশোর কিশোরীর সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে যে, "কিশোর কিশোরী: কিশোর কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে আঠারো বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বুঝাবে। আর শিশু বলতে আঠারো বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে।"[১০]

বাংলাদেশ শিশু আইন, ১৯৭৪ -এ শিশু-কিশোরের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "Child means a person under the age of 16 years."[১১] অর্থাৎ শিশু বলতে ১৬ বছরের নিচে যে কোন ব্যক্তিকে বুঝায়।

---

১০. *জাতীয় শিশু নীতি*, ২০১১ (ঢাকা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১১ খ্রি.), অনুচ্ছেদ: ২, পৃ. ৪

১১. *The children Act 1974,* section 2(f), (Act no.xxxix of 1974)

বাংলাদেশের 'শিশু আইন, ২০১৩' -তে শিশু-কিশোরের পরিচয়ে বলা হয়েছে, "বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হইবে।"[১২]

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ The Convention on the Rights of the Children (CRC), 1989 -এ কিশোরের পরিচয়ে বলা হয়েছে, "For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier."[১৩] অর্থাৎ এ সনদে ১৮ বছরের নীচে সব মানবসন্তানকে শিশু বলা হবে, যদি না শিশুর জন্য প্রযোজ্য আইনের আওতায় ১৮ বছরের আগেও শিশুকে সাবালক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিখ্যাত অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরাবে কিশোরের পরিচয়ে বলা হয়েছে, الصبى يدعى طفلا حين يسقط من بطن امه إلى ان يحتلم–অর্থাৎ "মায়ের গর্ভ হতে ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে স্বপ্নদোষ হওয়া পর্যন্ত বয়সকালীন মানব সন্তানকে বালক বা কিশোর বলে।"[১৪]

সন্তানদের বয়ঃসন্ধির একটি যুক্তিপূর্ণ ও আধুনিক চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে স্যার রোল্যান্ড উইলসন (১৮৪০-১৯১৯খ্রি.) একটি সুন্দর ও যুগোপযোগী কথা বলেছেন। আর সেটি হলো- যেহেতু ভরণ-পোষণ কোন ব্যতিক্রমমূলক বিষয় নয়, অতএব তার জন্য নাবালকত্বের বয়সটিকে আঠার বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।[১৫]

অ্যামেরিকান ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট ও শিশুবিশারদ Arnold Lucius Gesell (1880-1961Ad.) -এর মতে, "Youth" refers to the years from 10 to 16; to some it refers biological adolescence and to others to a combination of late adolescenc and young adulthood.[১৬] অর্থাৎ যুবক তথা কৈশোর বলতে ১০ থেকে ১৬ বছর বয়সকে বুঝায়; কারো কারো নিকট এটি জীবতত্ত্বিক বয়ঃসন্ধিকাল; আবার কারো মতে এটি বয়ঃসন্ধির শেষভাগ এবং তরুণ পরিণত বয়সের সমন্বিত অবস্থা।

---

১২. *শিশু আইন*, ২০১৩, (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণমন্ত্রণালয়, ১৮ আগষ্ট, ২০১৩), অনুচ্ছেদ: ৪

১৩. *Convention on the Rights of the Child 1989*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, Article: 1

১৪. ইমাম আবূল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরাব* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৪১১হি.), পৃ. ৪০১

১৫. Sir Ronal Knyvet Wilson, *An Introduction to the Study of Ango-Muhammadan Law* (Machigan: W. Thacker/The University of Machigan, 1894), p.*121, এ্যাংলো মোহামেডান ল'*, ধারা নং-১৪০ ও ১৪২

১৬. Arnold Lucius Gesell and Louis Bates Ames, *Youth The Years From Ten to Sixteen* (New York: Harper,1956), p.27

World Health Organization (WHO) কিশোরের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছে যে, “Adolescents as individuals in the 10 to 19 years age group and “youth” as the 15 to 24 year age group. These two overlapping age groups are combined in the group “young people”, covering the age range 10 to 24 years.”[১৭] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সংজ্ঞাটিতে উল্লিখিত বয়সের পরিসর মূলত যুবকের (young people) সংজ্ঞায় বয়সের যে পরিসর উল্লেখ করা হয়েছে ১০ থেকে ২৪ বছর, তার মধ্যে কিশোরের এ সময়কাল অন্তর্ভুক্ত। তাহলে এই সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, কিশোর হলো শিশু ও যুবকের মধ্যবর্তী সময়কাল।

Adolescence এর বর্তমান সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা প্রদান করেন অ্যামেরিকান নৃ-বিজ্ঞানী Clellan Stearns Ford (1909-1972Ad.) and Frank Ambrose Beach (1911-1988Ad.), তারা বলেন, “Adolescence is the period extending from puberty to the attainment of full reproductive maturity. … Different parts of the reproductive system reach their maximal effeciency at different stages in the life cycle; and, strictly speaking, adolescence is not completed until all the structures and processes necessary to fertilization, conception, gestation, and lactation have become mature”[১৮] অর্থাৎ কৈশোর এমন একটি সময়কাল যা বয়ঃসন্ধিকাল থেকে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ প্রজনন ক্ষমতা অর্জন পর্যন্ত ব্যাপ্ত। মানব জীবনের শারীরিক বিকাশের যে স্তরে অসংখ্য শারীরিক গঠন ও বিপাকীয় প্রক্রিয়া, প্রজনন সংক্রান্ত পরিপক্কতা এবং জৈবিক প্রভাব, বা জৈবরসায়ন, শরীরবৃত্তীয় এবং শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রাথমিক ইঙ্গিত বহন করে।

উপরোল্লিখিত বিভিন্ন সংস্থা ও মনীষীগণের প্রদত্ত সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, কিশোর হল ঐ ব্যক্তি যার বয়স এখন আঠার পূর্ণ হয়নি এবং যে শিশুকাল অতিক্রম করে প্রাপ্তবয়স্কতায় পদার্পণের পূর্বসময় অতিবাহিত করছে। আর ইসলামি দৃষ্টিকোণে ঐ মানব সন্তানকে কিশোর বলা হয় যার এখনও স্বপ্নদোষ হয়নি; আর যার এখনও ঋতুস্রাব হয়নি সে হলো কিশোরী।

---

১৭. World Health Organization (WHO), *Handout New Modules: Oriental Programme on Adolescence Health for Health-Care Providers* (Geneva: Department of Child and Adolescent Health and Development,), p.14

১৮. Clellan Stearns Ford and Frank Ambrose Beach, *Patterns of Sexual Behavior* (New York: Harper,1951), pp. 171–172

কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন

কৈশোরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হলো কৈশোর বিদ্রোহী, বিচ্যুত, অমনোযোগী এবং নজিরবিহীন অকুতোভয়। এসময় একজন ব্যক্তি অসংখ্য শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মুখোমুখি হয় এবং তার জীবনে সামাজিক আচার-আচরণসহ নানামুখী সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এ সময়টাকে বয়ঃসন্ধিকাল হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালে শরীর আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং হরমোনগুলো পরিপূর্ণ হয়, যা তার মানব প্রজাতি হিসেবে স্মরণীয় হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্রতর করে তোলে। আর এসব আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই তাকে উপার্জন এবং পারিবারিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। এসময় জীবনের শারীরিক ও মানসিক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। তাই সারা জীবনের সুস্থতা অনেকাংশেই নির্ভর করে এই সময়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের উপর। এই সময়ে শরীর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। মেয়েদের প্রতিমাসে ঋতুস্রাব শুরু হয়। এ সময়ে পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। শারীরিক পরিবর্তনের ফলে ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ গজানো ও মেয়েদের স্তনের আকার বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা বড়দের সামনে আসতে বা এ ব্যাপারে বড়দের জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা পায়। উপরন্ত এ সময়ে তাদের মনে যৌনতা নিয়ে কৌতূহল বা যৌনবাসনার উদ্রেক হয়। তাই তারা সমবয়সী বন্ধু-বান্ধব বা ভিন্ন উপায়ে তাদের কৌতূহল মিটাতে চায়। কিন্তু তারা এসব বিষয়ে কোন উৎস থেকে নির্ভুল তথ্য পায় না বরং অধিকাংশ সময়ই প্রজনন যৌনস্বাস্থ্য বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য পেয়ে থাকে। তাই বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীর সঠিক তথ্য, বন্ধুসূলভ অভিভাবকত্ব ও সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ এ সময় ছেলে-মেয়েদের বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে, সেগুলোর সাথে ইতিপূর্বে তারা পরিচিত হয়নি। এ সময় ছেলেদের যেসব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১। উচ্চতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়;

২। অস্থি ও পেশি শক্ত হয় ও বৃদ্ধি পায়;

৩। ওজন বৃদ্ধি পায়;

৪। হালকা গোঁফের রেখা দেখা দেয় ও দাড়ি গজায়;

৫। বুক ও কাঁধ চওড়া হয়;

৬। নাকে-মুখে ব্রন উঠে;

৭। গোপনীয় স্থানে চুল গজায়;

৮। গলার স্বর ভেঙ্গে যায় ও পরে ভারী হয়ে যায়;

৯। অন্ডকোষ ও লিঙ্গের আকার বৃদ্ধি পায়;

১০। মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়;

১১। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে রেতঃস্খলন হয়।

আর বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের যেসব শারীরিক পরিবর্তন ঘটে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১। উচ্চতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়;

২। ওজন বৃদ্ধি পায়;

৩। স্তনের আকার বেড়ে যায়;

৪। ঋতুস্রাব শুরু হয়;

৫। শরীরের বিভিন্নস্থানে মেদ জন্মে;

৬। নাক-মুখে ব্রন উঠে;

৭। গোপনীয় স্থানে চুল গজায়;

৮। ছেলেদের প্রতি কৌতূহল ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

এসময়ে ছেলে-মেয়েদের মানসিক পরিবর্তনগুলো হলো-

১। ছেলে-মেয়েরা নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক ভাবতে শুরু করে এবং অন্যদের কাছ থেকে সে অনুযায়ী আচরণ প্রত্যাশা করে;

২। স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করতে চায়;

৩। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ ভালবাসে ও তাদের উপর নির্ভর করে;

৪। আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও আত্মকেন্দ্রিকতা সৃষ্টি হয়;

৫। আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে চায়;

৬। নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে চায়;

৭। নিজের সম্পর্কে অন্যদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবনা শুরু হয়;

৮। বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল বাড়ে ও যৌনতা সম্পর্কে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়;

৯। লজ্জাভাব বেড়ে যায়;

১০। মানসিকভাবে অস্থির থাকে এবং যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকে।

উক্ত বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত মানব সন্তানই সমাজে কিশোর-কিশোরী হিসেবে পরিচিত।

কৈশোর ধারণার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ (Historical development of the Concepts of Adolescence):

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কৈশোর হল, একটি ইরা (era) বা অধিকাল। আর অভিধান মতে 'ইরা' (era) শব্দটি ইতিহাসের ঘটনাবহুল বা বৈশিষ্ট্যসূচক বিশেষ সময় (epoch), যুগ ও বৈশিষ্ট্যকে ব্যাপ্ত করে, বিশেষ করে কোন জিনিসের নতুন অধ্যায়কে বুঝায়। এখানে বিশেষ সময় ও বৈশিষ্ট্য (epoch) বলতে নতুন যুগের সূচনা কাল, বিশেষ করে আকর্ষণীয় ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ঘটনাবলী দ্বারা চিহ্নিত কালকে বুঝায়, আর এটিই হচ্ছে পিউবার্টি বা বয়ঃসন্ধিকাল। আর বয়ঃসন্ধিকাল (পিউবার্টি) হচ্ছে শারীরিক বিকাশের যে স্তরে উল্লেখযোগ্য জৈবিক ঘটনা দ্বারা ব্যক্তি প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করে, বয়ঃসন্ধি চিহ্নিত হয়, যা জৈবরসায়ন, শরীরবৃত্তীয় এবং শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রাথমিক ইঙ্গিত বহন করে- যা কৈশোরকাল হিসেবে আখ্যায়িত হয়।[১৯]

হাজার বছর ধরে মানুষ কিশোর এবং এ বয়সের মানুষের আচার-আচরণের বিচিত্রতা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে আসছে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল (৩৮৫-৩২৩ খি.পূ.)-এর রচনায় সর্বপ্রথম কিশোর সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়। তিনি কিশোর-কিশোরীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন, কৈশোরে ছেলে-মেয়ে উভয়ের কণ্ঠস্বর পরিবর্তন এবং মেয়েদের স্তন বৃদ্ধি ও আদ্যঋতু প্রবাহ হয়। ছেলেদের গুপ্ত লোম প্রকাশ পায় ও ধাতু নির্গমন হয়। তিনি কৈশোরের একটি গড় বয়স প্রদান করেন যাতে এসব বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ প্রকাশিত হয়।[২০] এছাড়াও কিশোরের মানসিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়েও তাঁর কৃতিত্ব রয়েছে। তিনি কৈশোরের অসংখ্য স্বাতন্ত্র্য-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, যা পরবর্তীতে শিল্পোত্তর সমাজে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। Aristotle এর মানবজীবনের বয়সভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস তিনটি প্রধান বয়সধারায় বিভক্ত ছিল-Childhood, Youth, এবং Old Age তাঁর মতে, 'Young' পরিভাষাটি ৭ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু প্রাক-খ্রিস্টান যুগের রোমানরা এ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তারা সাধারণত infancy, childhood, adolescence, এবং young adulthood এর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করতেন। শিশু বলতে শুধুমাত্র কথা বলতে পারে না এমন শিশুকেই নয় বরং ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে ৭ বছর বয়স পর্যন্ত সকল মানব সন্তানই infant হিসেবে বিবেচিত হত। অবশ্য সে সময় puerilis দ্বারাও শৈশব বা শিশুকাল বুঝানো হতো। আর প্রায়শই puerilis এবং adolescens সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হত এবং কোন নির্দিষ্ট বয়স ব্যতীত যুবক

---

১৯. "Adolescence" International Encyclopedia of Social Science, http://www.encyclopedia.com
২০. *Ibid*

পুরুষদেরকে বুঝানো হত। অক্টাভিয়নসকে (২৭ খ্রি.পূ -১৪ খ্রি.) ১৯ বছর বয়সে Puer এবং ৩৮ বছর বয়সে Caesar বা কিশোর (adolescens) বলা হত।[২১]

চতুর্দশ শতকের শুরুতে মানব জীবনের সম্প্রসারিত বিভাজন এবং আরো সুনিয়ন্ত্রিত সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়। বায়জান্টাইন সম্রাজ্যের সোনালী যুগের সাহিত্যিকগণ প্রসঙ্গক্রমে কনস্টান্টটাইনদেরকে এ সম্পর্কিত কিছু সংজ্ঞা নির্ধারণের কৃতিত্ব দেন, যাতে ৬টি বা ৭টি বয়সকালের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩য় বয়সকালকে কিশোর বলা হত। এ সম্পর্কে ফিলিপ এরাইজ (১৯১৪-১৯৮৪খ্রি.) উল্লেখ করেন, The third age was called adolescence: during this age the person grows "to the size allotted to him by Nature." Adolescence is followed by youth, the age of greatest strength.[২২] এখানে একজন মানুষের বয়স সীমার ৩য় স্তরকে adolescence বলে উল্লেখ করা হয়। এ সময়ে একজন ব্যক্তি "প্রকৃতি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তার স্বাভাবিক আকৃতিতে উপনীত হয়"। যাকে আমরা পরিপূর্ণ শারীরিক বৃদ্ধি হিসেবে জানি। তার মতে, adolescence যৌবন তথা জীবনের সবচেয়ে শক্তিধর বয়স দ্বারা অনুসৃত হয়। ১৩ শতকের একটি লেটিন বিশ্বকোষের ১৬শ শতকে ফ্রাঞ্চ অনুবাদ হতে এই সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অনুবাদকের জন্য এ কাজটি বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল, কারণ সে সময়ে ফ্রাঞ্চ ভাষায় মানব জীবনকালকে উল্লেখ করার জন্য শুধুমাত্র তিনটি শব্দ ছিল- শৈশব, যৌবন এবং বৃদ্ধ। এই সুন্দরতম প্রভেদসূচক বৈশিষ্ট্য ১৩ শতকের পণ্ডিতগণের দ্বারা সূচনা হয়ে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এসময়ে এসে কিশোর পরিভাষায় প্রকৃত রূপ আবার হারিয়ে যায় এবং কয়েক শতক পর্যন্ত অগোচরে থেকে যায়। এ সময় একজন শিশু ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কের জগতে প্রবেশ করত। মানব বয়সের এই রূপরেখা নিম্ন শ্রেণির মধ্যে অনেক বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[২৩]

১৮৬০ সালে Philippe Ariès (১৯১৪-১৯৮৪খ্রি.) কিশোর সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রদান করেন, যাতে তিনি প্রথমত, infancy এবং childhood এর মধ্যে এবং দ্বিতীয়ত, childhood, adolescence, এবং young adulthood এর মধ্যে বৈসাদৃশ্য নব্য চিন্তা-চেতনার আলোকে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। এসময় জনগণের বৃহৎ অংশের শৈশবকে বিকশিত ও প্রসারিত করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। কিন্তু এর পরেও child, adolescent এবং young adult এর মধ্যে অস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, কারণ মধ্যযুগের প্রথম দিকে স্কুলে বয়স ভিত্তিক কোন উপস্থিতি কিংবা কোন গ্রেডলেভেল ছিল না। সম্ভবত ১৬

---

২১. *Ibid*

২২. Philippe Ariès, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life* (New York: Knopf, 1962, First published as L'enfant et la vie familiale sous I'ancien regime.), p. 21

২৩. "Adolescence" International Encyclopedia of Social Science, http://www.encyclopedia.com

শতকের পরে ২০ বছরের নিচে সকল ছাত্রের জন্য একটি একই নিয়মানুবর্তিতার পদ্ধতি বা অভিন্ন শাসনদণ্ড গ্রহণের মাধ্যমে পার্থক্যসূচক বৈষম্য আরো হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে এটি শুধুমাত্র কনিষ্ঠ ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। "child" বা "youth" এর বৈচিত্র্যময় নানাবিধ সমার্থক পরিভাষা মধ্যযুগে ব্যবহৃত হত কিন্তু তা প্রায় সবই বিস্তৃত পরিসরে বয়স স্তরকেই বুঝানো হত। একজন নিম্ন আয়ের ব্যক্তি যে কোন বয়স নির্বিশেষে "child" শিশু হিসেবে বিবেচিত হত। শিশু-কিশোর পরিভাষার এই ব্যবহার ১৭ শতক পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জনের মাধ্যমেই "childhood" শৈশব অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারত।[২৪]

তবে অষ্টাদশ শতকে এসে কিশোরের একটি পরিষ্কার ধারণা এবং সামাজিক উপলব্ধি জাগ্রত হয়। এ ধারণাকে আরো জনপ্রিয় এবং স্থায়িত্বে রূপদান করে সে সময়কার সাহিত্যের অমর সৃষ্টি দু'টি চরিত্র, একটি সাহিত্য বিষয়ক, যাতে একজন কিশোর বয়সী ব্যক্তির আচার-আচরণ ও বৈশিষ্ট্য চিত্রিত হয়েছে। অপরটি সামাজিক, যাতে জোর করে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করার বিষয় চিত্রিত হয়েছে। অমর এ সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে Philippe Ariès বলেন, A popular concept of adolescence began to take shape during the eighteenth century in "two characters-one literary, as represented by Cherubin, and the other social, the conscript."[২৫]

জনপ্রিয় এ সাহিত্যকর্মের নায়ক চিরুবিন বয়ঃসন্ধির রহস্যময়তা চিত্রিত করেন এবং দেখান যে, ছেলেদের মেয়েলিপনা স্বভাব বা মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ শৈশব থেকেই আবির্ভূত হয়। এটাকে "বিকাশমান ভালবাসার" একটি অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর সমাজে সে সময়ে একটি নির্দিষ্ট বয়সের বালকদের বাধ্যতামূলভাবে রাষ্ট্রের সৈন্যদলে যোগদান করতে হতে। এসময়টাকে তারা কিশোরকাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মানুষ যখন এভাবে adolescence এর ধারণার পরিপূর্ণজ্ঞান লাভ করলো, জীববিজ্ঞানীরা তখন adolescence পরিভাষাকে বয়ঃসন্ধি থেকে শারীরিক বৃদ্ধির পরিসমাপ্তি সময়কালকে গ্রহণ করে প্রাচীনতম ব্যবহারে ফিরে গেল। এরপর ১৭৯৫ সালে সর্বপ্রথম পূর্ববর্তী একশ বছরের কিশোর আচার-আচরণের গবেষণা ক্ষেত্র গ্রহণ করার মাধ্যমে adolescence এর একটি নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা উপস্থাপন করা হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে সময়ের বিবর্তনে কিশোর পরিভাষাটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।

আমেরিকান মনোবিদ G. Stanley Hall (1846-1924Ad.) এবং তার অনুসারী শিক্ষার্থীরা সর্বপ্রথম ১৮৮২ সালে শৈশব ও কৈশোর নিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। এতে তারা শৈশব ও কৈশোরের

২৪. www.encyclopedia.com
২৫. Philippe Ariès, *ibid*, p. 21

কৌতূহল, সামর্থ্য, সমস্যা এবং কল্পনার জগত নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। এরপর তারা শৈশব ও কৈশোরের উপর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য কাজ করেন।[২৬] ঐতিহাসিকদের মতে G. Stanley Hall হলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি কিশোর সাহিত্য রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। G. Stanley Hall -এর পর অস্ট্রেলিয়ান স্নায়ুবিদ ফ্রয়েড (১৮৬৫-১৯৩৯খ্রি.) ১৯০৫ সালে শৈশব ও কৈশোর সম্পর্কে তার প্রথম নিবন্ধ প্রকাশ করেন। G. Stanley Hall কৈশোর (Adolescence) -এর সংজ্ঞায় ১৪ থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত বয়সসীমাকে উল্লেখ করেন। আর ফ্রয়েড মনে করেন adolescence বয়ঃসন্ধিকাল থেকে শুরু হয়ে প্রজনন সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক পরিপক্কতার মাধ্যমে শেষ হয়।[২৭] অতএব উপরোক্ত বর্ণনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসময় সাধারণত কিশোরের নিম্নোক্ত পাঁচ ধরনের উন্নয়ন বা বিকাশ ঘটে।

(১) বুদ্ধিগত উন্নয়ন (Intellectual Development);

(২) শারীরিক উন্নয়ন (Physical Development);

(৩) জৈবিক উন্নয়ন (Sexual Development);

(৪) আবেগীয় উন্নয়ন (Emotional Development) এবং

(৫) ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন (Personality Development)।

বিভিন্ন দেশে কিশোরের বয়সসীমা

কৈশোরকালের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা, সামাজিক রীতি-নীতি, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত আইনে দেশ ও সমাজভেদে নির্দিষ্ট বয়সের ছেলে-মেয়েরা কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হয়। যেমন, বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা হলো ৭ বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত।[২৮] আবার বাংলাদেশের শিশু আইন,২০১৩ -এর অনুচ্ছেদ: ৪ অনুসারে ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু।

কোন কোন আইনে শিশুর বয়স যদি ১৬ বছরের নিচে হয়, আবার কোন কোন আইন মতে ১৮ বছরের নিচে হয়, তাহলে কিশোর বলতে কাদের বুঝাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। শিশু আইন, ১৯৭৪ এবং পরবর্তীতে সংশোধিত 'শিশু আইন, ২০১৩' এ কিশোরকে শিশু হতে পৃথক করে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। শুধুমাত্র শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক (Adult and Child) এ দু'ধরনের ব্যক্তিকে বয়সের ভিত্তিতে পৃথক করা হয়েছে।[২৯] অর্থাৎ

---

২৬. G. Stanley Hall, *The Moral and Religious Training of Children* (New York: *Princeton Review* New Series-9, 1882), pp. 26-48.

২৭. Sigmund Freud, *Three Essays on the Theory of Sexuality*, in *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, First published as *Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie* (New York: Macmillan; London: Hogarth, 1905), Volume 7, pp. 123-245

২৮. পান্না রানী রায়, *অপরাধ বিজ্ঞান* (ঢাকা: উপমা প্রকাশন, ২০১৩খ্রি.), পৃ. ১৭৪

২৯. বোরহান উদ্দিন খান, *অপাধ বিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা, চট্টগ্রাম: কামরুল বুক হাউজ, ২০১৪খ্রি.), পৃ. ২৩৯

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের সংজ্ঞায় শিশু এবং কিশোরকে একই অভিধায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সুতরাং আইনের ভাষায় যারা শিশু আবার তারাই কিশোর। তবে সমাজে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী কোন মানব সন্তানের জন্ম হতে ৭ বছর বা কোন কোন ক্ষেত্রে ৯ বছর পর্যন্ত সময়কে শিশু বা শৈশব এর সময় ধরা হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের (Age of criminal responsibility) ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ৮২ তে বলা হয়েছে যে, ৯ বছরের কম কোন ব্যক্তির আচরণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে না। আবার ধারা ৮৩ অনুযায়ী, ৯ বছরের উপরে কিন্তু ১২ বছরের কম কোন ব্যক্তির কোন কাজ অপরাধ হবে না যদি না ঐ ব্যক্তি তার কৃত কাজের প্রকৃতি ও ফলাফল বুঝতে সক্ষম হয়। অতএব দণ্ডবিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এবং শিশু আইন পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, কিশোর অপরাধী হবে ৯ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক অপরাধী। আর যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তার কাজের প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হয় না সে ক্ষেত্রে ১২ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি। তাই কিশোর অপরাধের দায়-দায়িত্বের এ বিধান থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, মূলত একজন শিশু ৯ বছর বয়স থেকে অথবা ৯ থেকে ১২ বছর বয়সের মধ্যে কিশোর অবস্থায় উপনীত হয়। বিষয়টি আরো সহজভাবে অনুধাবনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত কিশোর অপরাধের বয়সসীমার একটি তালিকা নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হলো-

সারণী-১ঃ কিশোরের বয়সসীমাঃ দেশ -এশিয়া অঞ্চল[৩০] (Age limits of Juvenile Offenders in some Asian countries.)

ক্রমিক	দেশের নাম	বয়সসীমা
১.	মায়ানমার	৭ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত
২.	শ্রীলংকা	৭ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত
৩.	ভারত	৭ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত
৪.	পাকিস্তান	৭ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত
৫.	ফিলিপাইন	৯ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত
৬.	থাইল্যান্ড	৭ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত
৭.	জাপান	১৪ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত
৮.	বাংলাদেশ	৯ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত

৩০. United Nations, *Comparative Survey on Juvenile Delinquency* (New York: Part-iv, Asia and the Far East, 1953), p. 4

সারণী-২: কিশোরের বয়সসীমা: দেশ -ইউরোপ অঞ্চল[৩১]

ক্রমিক	দেশের নাম	বয়সসীমা
১.	ইংল্যান্ড	৮ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত
২.	ফ্রান্স	১৩ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত
৩.	পোল্যান্ড	১৩ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত
৪.	অস্ট্রিয়া	১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত
৫.	জার্মানী	১৪ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত

উপরোক্ত সারণী দু'টিতে বর্ণিত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কিশোর অপরাধীদের বয়সসীমা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধের দায়-দায়িত্বের বয়স এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দেশে সাধারণত ৭ থেকে শুরু হয়। তবে কোন দেশে ১৪ বছরের পূর্বপর্যন্ত দায় মুক্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ১৪ বছর বয়সের পর থেকেই অপরাধী হিসেবে দায়-দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইউরোপ মহাদেশের কোন কোন দেশে ৮ বছর থেকে কৈশোর কাল শুরু হয় এবং কোন কোন দেশে ১৩ এবং কোন কোন দেশে ১৪ বছর থেকে কৈশোরকাল শুরু হয়।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং দেশীয় শিশু আইনের পরিভাষায় ১৮ বছর পর্যন্ত একজন মানব সন্তান শিশু হিসেবে গণ্য হয়। আবার স্বতন্ত্রভাবে একজন কিশোরের বয়সসীমাও ১৮ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাই জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইন, রুলস, গাইড লাইনে বর্ণিত শিশুর সংজ্ঞার মধ্যে কিশোর-কিশোরীও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এসকল আইনে কিশোরকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এসকল আইনের পরিভাষায় যারাই শিশু আবার তারাই কিশোর হিসেবে গণ্য। তবে সারা বিশ্বে কিশোর অপরাপধমূলক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে যেহেতু আরোপিত সর্বনিম্ন বয়স সাত (৭) থেকে চৌদ্দ (১৪) এর মধ্যে; সেহেতু বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক আইন, গাইড লাইন ও রুলসে বর্ণিত শিশুদের মধ্যে যারা উক্ত বয়সে উপনীত হবে তারাই কিশোর হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে আমাদের সমস্যাকে সহজ করে দিয়েছে ২০১১ সালে প্রণীত বাংলাদেশের 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১'। এই নীতিতে কিশোর-কিশোরীদের বয়সসীমা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, কিশোর-কিশোরীর বয়সসীমা হবে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত।[৩২]

অতএব, আমরা উপরোক্ত তথ্য আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে বলতে পারি যে, বিভিন্ন দেশে কিশোর-কিশোরীর বয়সসীমা ৭ থেকে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বয়স স্তরের ভিন্নতা থাকলেও বাংলাদেশ দণ্ডবিধি

৩১. Nords Kog, *Analysing Social Problems* (New York: The Dryden Press, 1950), p.313; আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধ বিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা : কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ১৬৪

৩২. *জাতীয় শিশু নীতি ২০১১*, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: ২, পৃ. ৪

১৮৬০ (সংশোধিত, ২০০৪) -এর ধারা ৮২ ও ৮৩ মোতাবেক কিশোর-কিশোরীর বয়সসীমা ৯ থেকে ১৮ কিন্তু বাংলাদেশের 'শিশু নীতি, ২০১১' অনুযায়ী কিশোর-কিশোরীর বয়সসীমা হবে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছর পর্যান্ত

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কিশোর

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী বর্তমান পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগ শিশু। অর্থাৎ বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ৯৫ লাখ।[৩৩] ২০০৭ সালের বাংলাদেশের জনসংখ্যাতত্ত্বে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ১৩% এর বয়স ৫ বছরের নিচে, ৩৮% এর বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৪৭% এর বয়স ১৮ বছরের নিচে।[৩৪] আর সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যাতত্ত্বে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ২৮.৮% এর বয়স ১৪ বছরের নিচে, ৫৪.৬% এর বয়স ১৫-৪৯ বছরের মধ্যে, ৮.৭% এর বয়স ৫০-৫৯ এর মধ্যে এবং অবশিষ্ট ৭.৯% এর বয়স ৬০ বছর বা এর উর্ধ্বে। নিম্নে এসভিআরএস রিপোর্ট, ২০১৮ (Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018, Published on May 2019) -এর আলোকে বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা (শতাংশ) চিত্র তুলে ধরা হলোঃ

সারণী-৩: বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা (মোট জন সংখ্যার %)[৩৫]

বয়স	২০১৮	২০১৭	২০১৬	২০১৫	২০১৪
০০-১৪	২৮.৮	২৯.৩	৩০.৮	৩০.৮	৩১.৭
১৫-৪৯	৫৪.৬	৫৪.৪	৫৩.৬	৫৩.৭	৫২.৬
৫০-৫৯	৮.৭	৮.৩	৮.১	৭.৮	৭.৯
৬০+	৭.৯	৮.০	৭.৫	৭.৭	৭.৮

সুতরাং এসভিআরএস রিপোর্ট, ২০১৮ -এর পরিসংখ্যানে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই শিশু-কিশোর।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত শিশুর সংজ্ঞানুযায়ী, শিশু সম্পর্কিত সকল আইন ও নীতি ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাংলাদেশে শিশু-কিশোর সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও

---

৩৩. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, "শিশুঃ আইনী ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ", *ইসলামী আইন ও বিচার ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১১ খ্রি.), বর্ষ: ৭, সংখ্যা: ২৭, পৃ. ১০-১১

৩৪. *Third and Fourth Periodic Report of the Government of Bangladesh under the Convention on the Rights of the Child* (Dhaka: Ministry of Women and Children Affairs 2007), p.11

৩৫. Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018 (Published on May 2019), Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division (Sid), Ministry of Planning Government of The People'S Republic Of Bangladesh, Dhaka, Bangladesh, p.xxii

বিধানে এর কিছুটা ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশে কিশোরের একক কোন স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা নেই, যেটিকে আমরা একক মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। বরং বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে শিশু-কিশোরের (Children) সংজ্ঞায় বিভিন্ন রকম পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ড. নাহিদ ফেরদৌসি কিশোর অপরাধীর সংজ্ঞা ও বয়সসীমা নির্ধারণ করাকে বাংলাদেশ আইন ব্যবস্থায় একটি চ্যালেঞ্জ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "Determination of the age of juvenile Delenquents is a significant challenge in the legal system of Bangladesh. The definition of a child or juvenile is not uniform in the laws of Bangladesh. Different legislations provide different age limits of the delinquents but all they are within 12 to 18 years of age.[৩৬]

তাই বলা যায়, বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার মত শিশু-কিশোরের একক কোন সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন নীতি ও আইনের মধ্যে এ সংজ্ঞায় তারতম্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের জাতীয় শিশু নীতিতে কেবল ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের কিশোর হিসেবে ধরা হয়েছে। শিশুদের সুরক্ষাদানকারী সংবিধিবদ্ধ আইনসমূহের (যেমন, কাজ সম্পর্কিত) অধিকাংশতেই যে বয়স পর্যন্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে তা ১৮ বছরের বেশ নিচে, কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র ১১ বছর পর্যন্ত। আরো একটি বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণা এই যে, ১৮ বছর বয়সের অনেক আগেই শৈশব-কৈশোরের সমাপ্তি ঘটে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের সঙ্গে এসব অসামঞ্জস্য এবং সংবিধিবদ্ধ বিভিন্ন আইন ও নীতির মধ্যে এ ধরনের অসঙ্গতির অর্থ হচ্ছে, অনেক শিশুই জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুসারে সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে; যদিও সেটি তাদের পাওয়ার কথা। নিম্নে এ সম্পর্কিত বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনের ভাষ্য তুলে ধরা হলো-

সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ - এ বলা হয়েছে, "বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের সাবালকত্বের বয়স- উপরোল্লিখিত সাপেক্ষে ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের প্রথম তফসিলের ৩২ আদেশের অর্থে মামলার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক ছাড়া প্রত্যেক নাবালক যাহার শরীর অথবা সম্পত্তি অথবা উভয়ের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করা হইয়াছে বা হইবে বা কোন বিচার আদালত কর্তৃক নাবালক ১৮ বছর বয়সসীমা লাভ করিবার পূর্বে ঘোষণা করা হইয়াছে এবং ঐ বয়স সীমায় পৌঁছার পূর্বে যে নাবালকের সম্পত্তি তত্ত্বাবধান কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্তৃক গ্রহণ করা হইয়াছে বা হইবে, এইরূপ নাবালক ১৯২৫ সালের উত্তরাধিকার আইন বা অন্য কোন আইনে কিছু থাকা সত্ত্বেও ২১ বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর সাবালকত্ব লাভ করিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং তৎপূর্বে নহে। উপরোল্লিখিত সাপেক্ষে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্য সব ব্যক্তি ১৮ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সাবালকত্ব লাভ করিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং তৎপূর্বে নহে।"[৩৭] এই আইনে

৩৬. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, p. 9
৩৭. *The Majority Act 1875*, sec:3, (Act No.x of 1875)

সাবালকত্বের বয়স গণনা প্রসঙ্গে বলা হয়, "কোন ব্যক্তির বয়স গণনা করা কালে যেই দিন ঐ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে ইহাকে পূর্ণ দিবস গণনা করিতে হইবে এবং সে ৩ ধারার প্রথম অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হইলে ২১তম বার্ষিকীর শুরুতে ঐ দিবসে, আর যদি ৩ ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে ১৮তম বার্ষিকীর শুরুতে ঐ দিবসে সে সাবালকত্ব লাভ করিয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।[৩৮]

বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ শিশুর তথা কিশোর বয়সসীমা উল্লেখ করে বলা হয়, "শিশু বলিতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার বয়স পুরুষ হইলে একুশ বৎসরের কম এবং নারী হইলে আঠার বৎসরের কম। নাবালক বলিতে পুরুষের ক্ষেত্রে একুশ বৎসরের কম এবং নারীর ক্ষেত্রে আঠার বৎসরের কম যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।"[৩৯] নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ২০০০ -এ বলা হয়, "শিশু অর্থ অনধিক ষোল বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি।"[৪০] শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী, "বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।"[৪১] ম্যাথিউ এ কিং এ্যান্ড রায়ান এক গবেষণায় উল্লেখ করেন, "যে মানব সন্তানের কিছু বোঝার ক্ষমতা নেই তাকে বলা হয় শিশু। এটা নির্ভর করে তার শারীরিক বিকাশ ও জীবনযাপন পরিস্থিতির উপর- বয়স কমবেশি হতে পারে।"[৪২] ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে, ১৬ বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে নাবালক বলে।[৪৩] অভিভাবক ও প্রতিপাল্য আইন, ১৯৮০ অনুসারে ২১ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি নাবালক।[৪৪] দি চিলড্রেন্স এ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুসারে ১৬ বছরের কম বয়সী ব্যক্তি নাবালক।[৪৫]

রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনে এবং সমাজের বিপর্যয় ঠেকানোর জন্য এবং শিশু নির্যাতন বন্ধের জন্য যে আইন করা হয়েছে, তা সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে বাধা নেই; যদি তা ঐ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ও কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। শরী'আতের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিশু আইনের সংজ্ঞা বাধ না সাধলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। অতএব স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণকারী একক কোন আইনের অস্তিত্ব না থাকায় কেউ শিশু বা কিশোর কিনা তা নির্ধারণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনের নিরিখেই নির্ধারণ করতে হবে। যদিও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কিছু নির্ধারিত প্রকল্পে শিশুর বয়সের বিষয়ে সুনির্ধারিত নিয়ম মেনে চলছে তথাপিও দেশের অন্যান্য কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শিশুর বয়স নির্ধারণে

---

৩৮. *সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫*, ধারা-৪
৩৯. *বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন*, ১৯২৯, ধারা- ২/ক ও ২/ঘ
৪০. *নারী ও শিশু নির্যাতন আইন*, ২০০০, ধারা-২/ট
৪১. *শিশু আইন*, ২০১৩, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: ৪
৪২. ম্যাথিউ এ কিং এ্যান্ড রায়ান, *বাংলাদেশে কর্মজীবি শিশু* (ঢাকা: সেভ দি চিলড্রেন, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪১
৪৩. মোঃ মিজানুর রহমান, *পারিবারিক আইন: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ* (ঢাকা: সুফি প্রকাশনী, ২০১৬খ্রি.), পৃ. ১৪৩
৪৪. *প্রাগুক্ত*
৪৫. *প্রাগুক্ত*

কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানা হয় না। যেমন, বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুর বয়সকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশু-কিশোরের বয়স:

১. চাকুরীতে নিয়োগের অনুমতি প্রসঙ্গে- কারখানা আইন-১৯৬৫; দোকান ও প্রতিষ্ঠান আইন-১৯৬৫ এবং শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইন-১৯৮৩ এর ভাষ্য মতে ১২ থেকে ২১ বছরের মধ্যে।
২. শ্রম আইন, ২০০৬ এ শিশু বলতে ১৪ বছর বয়সের নিচের কোন ব্যক্তিকে বুঝিয়েছে।
৩. বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন- ১৯২৯ বিবাহে মেয়েদের জন্য আঠার এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর।
৪. তামাক, সুরা বা অন্য কোন মারাত্মক ড্রাগ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ১৬ বছর।
৫. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বশেষ বয়স ১০ বছর।
৬. সৈন্য বাহিনীতে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ ১৬ বছর অভিভাবকের সম্মতিতে।
৭. ফৌজদারী দায়-দায়িত্বঃ ১২ বছর থেকে সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব এবং ফৌজদারী আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কিত খণ্ডনযোগ্য আনুমানিক বয়সসীমা ৭ থেকে ১১ বছর।
৮. গ্রেফতার, আটক বা কারারুদ্ধের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা (ফৌজদারি দায়-দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত) কোন নির্ধারিত বয়স নেই।
৯. মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে ১৭ বছর; ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন করাদণ্ড ৭ বছর। তবে শর্ত থাকে যে, বয়সের অনুমান সম্পর্কে কোন যুক্তি খণ্ডন করা হয় নাই।
১০. আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া প্রসঙ্গে- যদিও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য কোন সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারিত নেই তবে সাক্ষীকে অবশ্যই প্রশ্ন বোঝা এবং উত্তর দেওয়ার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে।
১১. আদালতে অভিযোগ দায়েরের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে (অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া) ১৮ বছর।[৪৬]

এছাড়া বাংলাদেশের আরো কিছু আইনে শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন বয়সসীমা উল্লিখিত হয়েছে। যার জন্য কিশোরের স্বতঃসিদ্ধ সংজ্ঞা বা বয়সসীমা নির্ণয় করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। নিম্নে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনে শিশু-কিশোরের বয়সসীমার একটি চিত্র উপস্থাপন করা হল-

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪-১৪৫

সারণী-৪: The age limits of a child/juvenile provide under various legislation[৪৭]

	Law	Section	Age Specified (in year)
1	The Christian Divorce Act,1869	Section 3(v)	Boy:below 16 Girl-:below 13
2	The Majority Act,1875	Section 3	Before attaining 18
3	The Guardian & Wards Act, 1890	Section 4(1)	Below 18
4	The Railway Act, 1890	Section 130	Below 12
5	The Bengal Jail Act, 1894	Section 963	Under the age of 15
6	The Code of Criminal Procedure, 1898	Section 497	Below 16
7	The Suppression of Immoral Traffic Act,1933	Section 11,12	Female: under 18
8	The Vagrancy Act, 1943	Section 2(iii)	Under 14
9	The Orphanages 7 Widows Homes Act,1944	Section 2(2)	Below18
10	The Children Act, 1974	Section 2(f)	Below16
11	The National Children Policy, 1994	Section 2	Below14
12	The Women and Children Repression Prevention Act, 2000	Section 2(xi)	A person not over 16 years of age

উপরোল্লিখিত সারণীতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সাবালকত্ব আইন ১৮৭৫ অনুযায়ী শিশু-কিশোরের বয়সসীমা ১৮।[৪৮] 'মুসলিম পার্সোনাল ল' অনুসারে সাবালকত্ব বা ব্যক্তির প্রজনন ক্ষমতা অর্জন বয়ঃসন্ধি, স্বপ্নদোষ হতে শুরু হয়, আর এটা সাধারণত মেয়েদের ক্ষেত্রে ১২ বছর বয়স হতে এবং ছেলেদের ১৫ বছর বয়স হতে হয়ে থাকে।[৪৯] বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯, মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের নিচে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ২১ (একুশ) বছরের নিচে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে।[৫০] অন্যদিকে ছিন্নমূল ও ভবঘুরে আইন

৪৭. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid,* p. 9
৪৮. *The Majority Act,1875,* sec:3
৪৯. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid,* p. 10
৫০. *The Child Marriage Restraint Act, 1929* (Act No.Xix of 1929)

১৯৪৩[৫১] মতে বয়স্ক লোকজনের সাথে ছিন্নমূল শিশুরা অনির্দিষ্টভাবে ছিন্নমূল আশ্রয়কেন্দ্রে নিরুদ্ধ করা যেতে পারে। ১৪ বছরের নিচে শিশুকে বয়স্কদের থেকে আলাদা করে রাখতে হবে।[৫২]

এছাড়াও Bangladesh Labour Code, 2006 অনুসারে ১৪ বছরের নিচে শিশু শিল্প-কারখানায় কাজ করার অনুমতি নেই।[৫৩] এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দেশীয় বিভিন্ন আইনে শিশু-কিশোরের পরিচয়ে যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা The Convention on the Rights of the Child (CRC) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অধিকন্তু, The Children Act, 1974 -এ শিশু আইনে শিশু-কিশোরের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তাতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, ১৬ বছরের নিচে যে কোন ব্যক্তিই শিশু। এটা পরিষ্কার করা হয়নি যে, অপরাধ করার সময় ১৬ বছরের নিচে বয়স ধর্তব্য হবে নাকি বিচাররিক প্রক্রিয়া শুরুর দিন থেকে ধর্তব্য হবে। এর বাইরেও বাংলাদেশে প্রচলিত কিছু কিছু আইনে শিশু-কিশোর হিসেবে কাদেরকে অভিহিত করা যাবে সে সম্পর্কিত বিধানে উল্লেখ রয়েছে:

১. চুক্তি আইনে বলা হয়েছে যে, ১৮ বছর বয়সের কম কোন ব্যক্তি চুক্তি করতে পারে না। এই আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের মানব সন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
২. নিম্নতম মজুরী আইনে ১৮ বছর পূর্ণ না হলে সে শিশু হিসেবে গণ্য হয়।
৩. খনি আইনে ১৫ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।
৪. ১৯৩৯ সালের মটর গাড়ী আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে গাড়ী এবং ২০ বছরের কম বয়সের ব্যক্তিকে বড় গাড়ী চালানোর অনুমতি দেওয়া হয় না।[৫৪]

এছাড়া বাংলাদেশের শিশু বিষয়ক বিভিন্ন নীতি, সংবিধি ও ধর্মীয় আইনে দেয়া শিশুদের বয়সভিত্তিক সংজ্ঞার সাথে গড়মিল দেখা যায়। বাংলাদেশে শিশুদেরকে বিভিন্ন বয়স স্তরে (১৮ বছরের অনেক নিচে) কতিপয় নীতি ও বিধির অধীনে নিম্নে বর্ণিত বিশেষ কিছু সুরক্ষা বা সুযোগ-সুবিধা দেয়া আছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হলো-

---

৫১. *The Vagrancy Act ,1943*, Sec: 2(iii) (Bengal Act No.V11 of 1943)
৫২. Sonia Zaman Khan, *Herds and Shepherds: The issue of Safe Custody of Children in Bangladesh* (Dhaka: BLAST and Save the Children UK,2002), p. 13
৫৩. *The Bangladesh Labour Code, 2006* (Code no.xxxx11 of 2006)
৫৪. *Frist periodic report of the Government of Bangladesh under the Convention of the Rights of Tthe Child (Draft);* Ministry of Women and Children Affairs; Government of People`S Republic of Bangladesh' Dhaka, November-2000

সারণী-৫: বিশেষ সুরক্ষা বা সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বয়সসীমা[৫৫]

	বয়স	আইন	সুরক্ষার ক্ষেত্র
১	৭ বছরের নিচে শিশু	দণ্ডবিধি, ধারা: ৮২	কোন অপরাধের দায়িত্ব আরোপ করা হয় না।
২	৬ থেকে ১০ বছরের শিশু	জাতীয় শিক্ষা নীতি,২০১০	সব শিশুকে স্কুলে পাঠানোর বিধান আছে।
৩	১২ বছরের নিচের শিশু	শিশু শ্রম নিরোধ আইন	দোকান, অফিস, হোটেল বা কোন ওয়ার্কশপের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
৪	১৪ বছরের নিচের শিশু	১। জাতীয় শিশু নীতি, অনুচ্ছেদ: ২(১) ২। শিশু শ্রম রোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৬	১। কলকারখানার কাজে ব্যবহার করা যাবে না। ২। ভবঘুরেদের প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে পৃথক রাখতে হবে।
৫	১৫ বছরের নিচের শিশু	The Bengal Motor Vehicles Rules 1940	পরিবহন খাতের কয়েকটি অংশের কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
৬	১৬ বছরের নিচের শিশু	১। শিশু আইন, ১৯৭৪ ২। The Women and Children Repression Prevention Act, 2000	১। সাধারণ কারাগারে আটক রাখা যাবে না। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। ২। মেয়েরা যৌন মিলনে সম্মতি দিতে পারবে না।
৭	১৮ বছরের নিচের শিশু	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯	মেয়ের বিবাহ আইনসিদ্ধ হবে না।
৮	১৮ বছরের শিশু	শিশু আইন,২০১৩ সংবিধান, ধারা: ১২২ (খ)	প্রাপ্ত বয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হবে। ভোটাধিকার প্রয়োগ করত পারবে।
৯	২১ বছরের নিচের শিশু	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯	ছেলে বিবাহ আইনসিদ্ধ হবে না।
১০	ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে		বয়ঃসন্ধি লাভের পর থেকেই অর্থাৎ মেয়েদের ১২ বছর ও ছেলেদের ১৫ বছর বয়সে শৈশব-কৈশোরের সমাপ্তি ঘটে।

এসব আইন ছাড়াও আরো বিভিন্ন আইনে শিশুর সংজ্ঞায় যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তাতে করে আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে যে, সত্যিকার অর্থে শিশু-কিশোরের সংজ্ঞা কি হবে। এক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩-এর সংজ্ঞাকে গ্রহণ করতে হবে এবং ১৮ বছরের নিচের সবাই শিশু হিসেবে গণ্য হবে। এখানে যদি ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু হয়, তাহলে কিশোর কারা বা কিশোরের বয়স কত হবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কারণ আমরা দেখেছি যে, The Children Act, 1974 এবং পরবর্তীতে সংশোধিত “শিশু আইন, ২০১৩” দু'টি আইনের কোনটিতেই কিশোরের বয়স আলাদাভাবে শিশু হতে পৃথক করে দেখানো হয়নি; অথবা কিশোরকে

৫৫. ড. সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের শিশু ও তার অধিকার* (ঢাকা: ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৭৭), পৃ. ১০

শিশু হতে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। শুধুমাত্র শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক (Adult and Child) এ দু'ধরনের ব্যক্তিকে বয়সের ভিত্তিতে পৃথক করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।[৫৬]

সুতরাং উক্ত আইনসমূহে বর্ণিত শিশুর বয়সসীমা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, যা শিশুর বয়সের শেষ সীমা তাই মূলত কিশোর বয়সেরও শেষ সীমা। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের সংজ্ঞায় শিশু এবং কিশোরকে এই অভিধায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শুধুমাত্র ২০১১ সালের জাতীয় শিশু নীতিতে কিশোর-কিশোরীকে শিশুদের সংজ্ঞার মধ্য হতে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে, শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী সবাই শিশু। এরমধ্যে কিশোর-কিশোরী বলতে ১৪ বছর থেকে ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরকে বুঝাবে। সুতরাং আইনের ভাষায় যারা শিশু আবার তারাই কিশোর। তবে সমাজে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী কোন মানব সন্তানের জন্ম হতে ৭ বছর বা কোন কোন ক্ষেত্রে ৯ বছর পর্যন্ত সময়কে শিশু বা শৈশব এর সময় ধরা হয়। অতএব বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এবং 'শিশু আইন, ২০১৩' পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, কিশোর হবে ৯ থেকে ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি। আর যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তার কাজের প্রকৃতি বুঝতে সক্ষম হয় না সে ক্ষেত্রে ১২ বছর থেকে ১৮ বছর বয়স্ক ব্যক্তি। তাই এ বিধান থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, মূলত একজন শিশু ৯ বছর বয়স থেকে অথবা ৯ থেকে ১২ বছর বয়সের মধ্যে কিশোর অবস্থায় উপনীত হয়। আবার জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ অনুযায়ী ১৪ বছর থেকেই একজন শিশু কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে।

কিশোরের অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়স

'শিশু আইন,২০১৩', 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯' সহ অন্যান্য আইনের দৃষ্টিতে ১৮ বছরের নিচে সবাই শিশু। তাই শিশুর বয়সসীমা থেকে কিশোরকে পৃথক করতে হলে অপরাধমূলক দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধি-বিধানগুলো পর্যালোচনা প্রয়োজন। কেননা সকল আইনেই এ কথা স্বীকৃত যে, কিশোর তার অপরাধের দায়-দায়িত্ব বহন করে শিশু নয়। অন্যভাবে বললে, ৯ বছর বা কোন কোন আইনে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু অপরাধের কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তাই মনোবিজ্ঞানী, অপরাধবিজ্ঞানী ও আইনবিদগণ মনে করেন, যে বয়স পর্যন্ত অপরাধের দায়িত্ব অর্পিত হয় না, তার পর থেকেই মূলত কৈশোরকাল শুরু হয়।

কোন কাজকে কিশোর অপরাধ বা কোন শিশুকে কিশোর অপরাধী (Juvenile Delinquent) হিসেবে চিহ্নিত করতে অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়সসীম খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 'অপরাধমূলক দায়-দায়িত্ব' পরিভাষাটির অর্থ হলো- একজন ব্যক্তি, যে এমন একটি কাজ সংঘটিত করেছে, যা আইনের চোখে অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য এবং সে নিজেই একাজ সংঘটনের জন্য দায়ী। বাংলাদেশে অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়সের

---

৫৬. বোরহান উদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০

বিষয়টি সর্বপ্রথম The Penal Code,1860[৫৭] -এর ৮২ ও ৮৩ ধারায় একীভূত করা হয়। পরবর্তীকালে The Bengal Children Act,1922[৫৮] এবং The Children Act,1974 -এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

The Penal Code,1860 (সংশোধিত ২০০৪ খ্রি.)-এর ৮৩ ধারায় বলা হয়, "Nothing is offence which is done by child above 9 years of age and under 12, who has not attained suffecient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occation."[৫৯] অর্থাৎ ৯ থেকে ১২ বছরের শিশু কোন কর্মই অপরাধ নয়, যদি না ঔ ব্যক্তি তার কৃতকর্মের প্রকৃতি ও পরিণাম বুঝতে সক্ষম হয়। এ বিধান বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, ৯ বছরের নিচে কোন শিশুর যে কোন ধরনের কাজকে অপরাধ হিসেবে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। অপরাধের দায়িত্ব ৯ বছর, শর্তসাপেক্ষে ১২ বছর থেকে অর্পিত হতে পারে। তাই এ আইনের আলোকে এটিই হলো কিশোর বয়সের একেবারেই শুরুর সময়। এভাবে The Penal Code, 1860-এর উল্লিখিত ধারায় এ ক্ষেত্রে অপরপাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিশুর কৃতকর্মের প্রকৃতি, মাত্রা ও ফলাফল অনুধাবনের জন্য বাচ-বিচার করে বুঝার পর্যাপ্ত পরিপক্কতা আছে কিনা তা যাচাই-বাচাইয়ের বিধান রাখা হয়েছে।[৬০]

২০০৪ সালে The Penal Code,1860 সংশোধন করা হয় এবং অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়সসীমা ৭ বছরের পরিবর্তে ৯ বছর নির্ধারণ করা হয়।[৬১] বর্তমানে ৯ বছর থেকে ১২ বছর বয়সের মধ্যে অপরাধমূলক দায়-দায়িত্ব মানসিক পরিপূর্ণতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুসারে অপরাধমূলক দায়-দায়িত্ব আরোপিত হওয়ার বয়স সর্বনিম্ন বয়স ১৬ বছর। The Penal Code,1860 সংশোধন করার পরেও The Penal Code, 2004 এবং The Children Act,1974 পরবর্তীতে সংশোধিত 'শিশু আইন, ২০১৩'-এর সাথে সরাসরি বৈপিরিত্ব বা দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে ২০১৩ সালের শিশু আইন'কে সকল Act ও Penal Code -এর উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।[৬২]

---

৫৭. *The Penal Code,1860* (Act No.XLV of 1860)

৫৮. *The Bengal Children Act, 1922* (The Bengle Act No.11 of 1922). Now repealed by the section 74 of The Children Act, 1974.

৫৯. *The Penal Code*,1860, Sec:83

৬০. Ministry of Social Welfare, *Juvenile Justice Probation Officer Best Prctices and Procedures Manual,* by Bangladesh Legal Reform Project,Part-B, Prepared By Department of Social Services(DSS) with Canadian Juvenile Justice Specialist,2008,p.10

৬১. *The Penal Code* (Amended), 2004 Sec: 83 (Act No.XLV of 1860)

৬২. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৪

শিশু-কিশোরের বয়স ১২ বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই সে তার কৃতকর্মের জন্য পুরোপুরি দায়িত্বশীল। যদিও '২০১৩ সালের শিশু আইন' এ অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়স ১৮ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে ১৮ বছরের নিচে যে কোন শিশুকে অপরাধমূলক সাধারণ দায়-দায়িত্ব থেকে বিমুক্ত করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে তারা বংলাদেশে কিশোর অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত বা বিবেচিত হবে। এ সম্পর্কে ড. নাহিদ ফেরদৌসি বলেন, "Any Child who is 16 yesars or below, is absolved of criminal responsibility and they will be dealt with as a juvenile in Bangldesh."[৬৩] ড. নাহিদ ফেরদৌসি এ বক্তব্য মতে ১৬ বছরের নিচে (বর্তমান শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নিচের) সকল শিশুর কৃত যে কোন ধরনের অপরাধ কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সুতরাং দেখা যায় যে, শিশুর বয়স ৯ বছরের নিচে হলে তার অপরাধমূলক কোন দায়-দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ বাংলাদেশ দণ্ডবিধি মোতাবেক ৯ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তির কোন কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। ৯ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর মানসিক পরিপূর্ণতার উপর নির্ভর করে অপরাধমূলকদায়-দায়িত্ব বর্তাবে। অর্থাৎ ৯ বছরের উপর কিন্তু ১২ বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তির কোন কাজ অপরাধ হবে না যদি না ঐ ব্যক্তি তার কৃত কাজের প্রকৃতি ও ফলাফল বুঝতে সক্ষম হয়। আর ১২ বছর বয়স থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু বা কিশোর বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিতে কিশোর অপরাধী হিসেবে অপরাধমূলক দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে। অর্থাৎ ১২ বছরের বেশি বয়স্ক ব্যক্তির কোন কাজ বাংলাদেশের প্রচলিত দণ্ডবিধি বা অন্য কোন অপরাধ আইনে অপরাধের সংজ্ঞায় পড়লে তা কিশোর অপরাধ হবে।

আন্তর্জাতিক আইনে কিশোর সম্পর্কে কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা নেই। পক্ষান্তরে The Convention on the Rights of the Child (CRC),1989 -তে ১৮ বছরের নিচে সকল ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'The Beijing Rules', 'The UN Rules for the protection of Juveniles Deprived of their Librerty', 'Riyadh Guidelines' সহ কোন Rules বা Guidelines -এ এমন কোন পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা হয়নি যে, যা শিশু বা কিশোরের পরিচিতি বা সংজ্ঞা হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[৬৪] বরং অধিকাংশ Rules বা Guidelines -এ 'শিশু' এবং 'যুবক' ('Child' and 'Young') এ পরিভাষা দু'টি প্রায়শই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ বা কিশোর অপরাধের ধরন বোঝানোর জন্য অপরাধ ও বিচ্যুত আচরণের (delinquency) সাথে 'Juvenile' পরিভাষাটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

৬৩. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, p. 102

৬৪. *Ibid*, p. 11

The Convention on the Rights of the Child (CRC),1989 আর্টিকেল ৩ -এ অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের সর্বনিম্ন বয়সের বিষয়ে কিছু বিষয় আবশ্যিক করেছে। যেমন, সেখানে বলা হয়, "States Parties shall seek to promote the establishment of laws, procedures, authorities and institutions specifically applicable to children alleged as, accused of, or recognized as having infringed the penal law, and, in particular: (a) The establishment of a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law."[৬৫] এই কনভেনশনে অপরাধমূলক কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোন বয়স উল্লেখ করা হয়নি।

The Beijing Rules -এর ৪. ১ নং আর্টিকেলে বলা হয়, "In those legal systems recognizing the concept of the age of criminal responcibility for juveniles, the beginning of that age shall not be fixed at too low age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity."[৬৬] এই আর্টিকেলের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট করা হয় যে, বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি, কালচার, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কারণে অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের সর্বনিম্ন বয়সের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ভিন্নরূপ রয়েছে।

The Convention on the Rights of The Child (CRC)-এবং The Beijing Rules -এ অপরাধমূলক দায়দায়িত্বের সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে, 'যে বয়সে শিশুরা দণ্ডবিধি লঙ্ঘন করার সামর্থ্য নেই বলে অনুমেয় হয়', তা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্র পক্ষকে বলা হয়েছে। কিন্তু অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের সর্বনিম্ন বয়সসীমা যদি খুব কম বয়সে নির্ধারণ করা হয় অথবা যদি এর সর্বোচ্চ বয়সসীমা না থাকে তাহল দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত ধারণা মূল্যহীন।

তাছাড়া, শিশু বা কিশোরের বিচার কিশোর আদালতে হবে নাকি সাধারণ আদালতে হবে এটা নির্ণয়ের জন্য শিশু বা কিশোরের বয়স নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে অনেক শিশুর জন্ম রেজিস্ট্রেশন না থাকায় বা জন্ম নিবন্ধন সার্টিফিকেট না পাওয়ার কারণে শিশু বা কিশোরের বয়স নির্ণয় করা খুবই দুরূহ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় যখন কোন শিশু বা কিশোরকে আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত করা হয় আর বিচারককে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়, যারা

---

৬৫. *The Convention on the Rights of the Child (CRC),1989,*ibid, Article: 40/3

৬৬. *The Beijing Rules,* Article: 4.1 *Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),* Resolation-40/33 of 29 November,1985

অধিকাংশ সময়ই শিশুর ভুল বয়স উপস্থাপন করে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও যেসব শিশুরা আইনের সংস্পর্শে আসে তাদের বয়স নির্ণয়ে নির্ভরযোগ্য কোন হিসাব নেই।

অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়স নির্ণয়ে একক কোন মানদণ্ড না থাকা কিশোর অপরাধের বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি প্রধান সমস্যা। সরকার জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ "The Convention on the Rights of the Child (CRC)" বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিদ্যমান শিশু আইন, ১৯৭৪ রহিতক্রমে এতদসংক্রান্ত একটি নতুন আইন প্রণয়ন করেন যা শিশু আইন, ২০১৩ নামে খ্যাত। আর শিশু আইন, ২০১৩ -তে শিশুর বয়সসীমা ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। আর 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১' -তে এই শিশুদের মধ্য থেকে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী সকলকে কিশোর-কিশোরী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১' অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স থেকেই কিশোরের অপরাধমূলক দায়-দায়িত্ব শুরু হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোর

ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোরের সংজ্ঞা ও বয়সসীমা নির্ধারণের পূর্বে মানবজীবনচক্র সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা যেতে পারে। মহান আল্লাহ মানুষের জীবন চক্রকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অসীম রহমতে মানব সন্তান শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও পৌঢ়কাল পেরিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

অর্থঃ "হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে থেকে থাক, তাহলে ভেবে দেখো, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, এরপর সৃষ্টি করেছি বীর্য থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পরিপূর্ণ অথবা অপূর্ণ গোশত থেকে– তোমাদের নিকট আমার কুদরত প্রকাশ করার জন্য। আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্টকালের জন্য মায়ের গর্ভে স্থির রাখি। এরপর তোমাদেরকে আমি **শিশু** হিসেবে বের করে আনি, যেন পরে তোমরা **পরিণত** বয়সে পৌঁছতে পার। তোমাদের কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় **যৌবনের** আগেই, কাউকে কাউকে অত্যন্ত **বৃদ্ধ বয়স** পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা হয়, এমন বৃদ্ধ বয়স যে, তারা যা জানত, তাও তাদের মনে থাকে না।"[৬৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

---

৬৭. আল-কুরআন, ২২: ৫

ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ – অর্থ: "তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর তোমাদেরকে বের করেছেন পূর্ণ শিশু হিসেবে, এরপর (তিনি এমন ধারাবাহিকতা ঠিক করে দিয়েছেন) যেন তোমরা যৌবনে উপনীত হও, তারপর বৃদ্ধ হয়ে যাও। অবশ্য তোমাদের কারো কারো মৃত্যু বৃদ্ধ হওয়ার আগেই হয়ে থাকে। যেন তোমরা তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময়কাল পূর্ণ করতে পার এবং যেন তোমরা (আল্লাহর কুদরাত) অনুধাবন করতে পার।"[৬৮]

বর্ণিত আয়াতে কারীমা দু'টিতে মহান আল্লাহ মাতৃ গর্ভে মানব সন্তানের বেড়ে উঠা থেকে জীবন চক্রের কতিপয় স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ় উল্লেখযোগ্য। মানব জীবনের বিবর্তিত এই স্তরগুলোকে আরবি অভিধানে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন- মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন সময়কে (جنين) জানীন, ভূমিষ্ট হওয়া থেকে সাতদিন বয়সের সন্তানকে সাদীগ (صديغ), দুগ্ধপানকারীকে রাযী' (رضيع), দুধ ছাড়ানো সন্তানকে ফাতীম (فطيم), নিজে নিজে চলা-ফেরা করতে পারা সন্তানকে দারিজ (دارج), দুধের দাঁত পড়া সন্তানকে মাছগুর (مَثغُور), দাঁত পড়ার পর দাঁত উঠা সন্তানকে মুছাগ্‌গির (مُثغِّر), দশ বছর অতিক্রমকারী শিশুকে মুতার'আরি' (مترعرع), ভাল-মন্দের পার্থক্য নিরূপণকারী স্বপ্নদোষের নিকটবর্তী সন্তানকে মুরাহিক/ ইয়াফি' (مراهق او يافع), স্বপ্নদোষ হলে তাকে হাযাওয়ার (حَزَور), উপর্যুক্ত সকল অবস্থাকে বলা হয় গোলাম (الغلام), গোঁফ কালো হলে তাকে বাকল (بقل), ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছরের মধ্য বয়সের লোককে শাববুন (شاب), ষাট বছর বয়সে উপনীত হলে কাহলুন (كهل) এবং ষাট বছর বয়সের পরবর্তী সময়কে হারিম (هرم) বলে।[৬৯]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুলবারীতে উল্লেখ করা হয় যে, মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন সময়কে জানীন (جنين), ভূমিষ্ট হওয়া থেকে দুগ্ধপানকালীন সময়কে রাযী' (رضيع), দুধ ছাড়ানো সন্তানকে ছাবিয়্যুন (صبي), ৭ বছর বয়স থেকে হয় গোলাম (الغلام), এবং ১০ বছর বয়স থেকে ইয়াফে' (يافع), ১৫ বছর বয়স থেকে হাযাওয়ার (حَزَور), ২৫ বছর বয়স থেকে কামাদ (قمد), ৩০ বছর বয়স থেকে 'আনত্বানত্বা (عنطنط), ৪০ বছর বয়সে মামেল

৬৮. আল-কুরআন, ৪০: ৬৭
৬৯. আবূ মনছুর আছ-ছা'লাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

(مل), ৫০ বছর বয়সে কাহালুন (كهل) , অতঃপর ৮০ বছর বয়সে শায়খ (شيخ) এবং পরবর্তী সময়কে হারিম (هرم) বলে।[৭০]

সুতরাং কিশোরকাল মানবজীবন চক্রের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তবে মানব জীবনের কোন সময়টাকে বা কতটুকু সময়কে কিশোর হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে তা নিয়ে বিভিন্ন সমাজ, রাষ্ট্র, প্রচলিত আইন, ইসলামি আইনের মধ্যে ভিন্নতা বা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলামি আইনবিদগণ কিশোর বলতে ঐ ছেলেদের বুঝিয়েছেন যাদের ইহতিলাম (احتلام)[৭১] বা স্বপ্নদোষ শুরু হয়নি এবং কিশোরী বলতে যাদের হায়েয (حيض)[৭২] বা মাসিক স্রাব হয়নি এমন মেয়েদেরকেই বুঝিয়েছেন।[৭৩]

ইসলাম কৈশোর কালের সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়স উল্লেখ না করে বিশ্বজনীন ও বাস্তবসম্মত নীতি হিসেবে বয়ঃপ্রাপ্তিকে চূড়ান্ত সীমা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বালিগ বা বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ হিসেবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলে তারা আর কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হবে না; বরং বয়ঃপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। ছেলে-মেয়েদের বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণগুলো হলো ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় ইহতিলাম বা স্বপ্নদোষ হওয়া। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, واذا بلغ الاطْفَالُ مِنْكُمُ الحُلُم فلْيسْتاْذِنُوْا كما اسْتاْذن الَّذِيْن مِنْ قبْلِهِمْ- অর্থ: "আর তোমাদের সন্তানরা স্বপ্নদোষ[৭৪] হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছলে অর্থাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠগণ।"[৭৫] এছাড়াও মেয়েদের হায়েয বা মাসিক স্রাব ও গর্ভবতী হওয়ার মাধ্যমে বয়ঃপ্রাপ্তি প্রমাণিত হতে পারে।[৭৬] এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসংখ্য হাদীসে বিভিন্ন প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীগণের নিকট থেকে কিশোরের বয়স্কতার মাপকাটির জন্য নিম্নোক্ত পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

---

৭০. ইবন হাজর আসকালানী, *ফাতহুল বারী বিশারহি সহীহিল বুখারী*, অধ্যায়: আশ-শাহাদাত, বাব: বুলুগিস-সিবইয়ানি ওয়াশ-শাহাদাতিহিম (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, তাবি), খ. ৫, হাদীস নং-২৬৬৪, পৃ. ২৭৯

৭১. ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সঙ্গে দ্রুতবেগে পুরুষ বা নারীর বীর্য নিসৃত হওয়াকে ইহতিলাম (احتلام) বলা হয়। (বি.দ্রঃ সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিকহী*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলুমিল ইসলামী, ১৩৯৭ হি, পৃ. ১০১)

৭২. হায়েয (حيض) শব্দের অর্থ প্রবাহ বা স্রাব। প্রাপ্ত বয়স্কা নালীর জরায়ূ থেকে রোগ-ব্যাধি ব্যতীত প্রতি মাসের কয়েকদিন যে রক্ত নির্গত হয় তাকেই হয়েয বলে। (সা'দী আবূ জীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭)

৭৩. ইমাম আল-কাসানী, *বাদা'ইউস সানাঈ'* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬হি.) খ. ৭, পৃ. ১৭২; ইবন হাজর আসকালানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৪৭

৭৪. আয়াতে ব্যবহৃত الْحُلُم শব্দটি ইহতিলাম (احتلام) শব্দ থেকে উদ্ভূত ক্রিয়াবিশেষ্য। এর অর্থ স্বপ্নদোষ। (বি.দ্রঃ ইমাম আবূল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫)

৭৫. আল-কুরআন ২৪: ৫৯

৭৬. ইমাম মুহিউস-সুন্নাহ আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি.) খ. ২, পৃ. ১২

وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ-[৭৭], عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ-[৭৮], وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ-[৭৯],أَنْبَتَ الشَّعْرَ-[৮০], وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى

يَكْبُرَ- [৮১],وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ- [৮২]

অর্থাৎ-বালকের যতক্ষণ না নিদ্রা অবস্থায় রেতস্খলন হয়, প্রাপ্তবয়স্ক হয়, যৌবনে উপনীত হয়, বিশেষ স্থানে চুল গজায়, পরিণত বয়সে উপনীত হয়, সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন হয় ততক্ষণ সে বালক। সুতরাং পরিবত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত নিদর্শনগুলোই হলো কোন ব্যক্তির সাবালকত্বের পরিমাপক। তবে উল্লিখিত লক্ষণগুলোর কোনটিই যদি কারো মধ্যে প্রকাশিত না হয়, সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বয়স নির্ধারণের মাধ্যমে বালিগ বা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করা যায়। তবে ইসলামি আইনবিদগণ কিশোর-কিশোরীর বয়সের চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ) ও মালিকী আইনবিদদের মতানুযায়ী, যে ছেলের ইহতিলাম বা বীর্যপাত হয়নি, তার আঠার বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সে কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যে মেয়ের ইহতিলাম বা বীর্যপাত হয়নি, তার সতের বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকে কিশোরী বলে গণ্য করা হবে।[৮৩]

অন্যদিকে কোন ছেলে-মেয়ের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার কোন লক্ষণ যদি আদৌ প্রকাশ না পায়, তাহলে পনের বছর বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তারা উভয়ই কিশোর-কিশোরী হিসেবে বিবেচিত হবে বলে ইমাম শাফি'ঈ (রহ), ইমাম আহমদ (রহ), হানাফী আইনবিদ ইমাম মুহাম্মদ (রহ) ও আবূ ইউসুফ (রহ) সহ অধিকাংশ আইনবিদ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৮৪] এপ্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর একাধিক হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বালেগ হওয়ার বয়স ও নিদর্শন সম্পর্কে হাদীস হতে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ- فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ-

---

৭৭. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, অধ্যায়: আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদ: আল মাজনূন ইয়াসরিকু আও ইউসিবু হাদ্দা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৪০১

৭৮. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০২

৭৯. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামে' আত-তিরমিযী*, কিতাবুল হুদুদ/আবওয়াবুল হুদুদি আন রাসূলিল্লাহি (সা.), বাব: মা যাআ ফিমান লা ইয়াজিবু আলাইহিল হদ্দ (রিয়াদ: মাকতাবাতল মা'আরিফ, ১৪১৭ হি.),হাদীস নং-১৪২৩

৮০. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০৪

৮১. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৩৯৮

৮২. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৩৯৯

৮৩. ইমাম আল-কাসানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

৮৪. *প্রাগুক্ত*

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে পরিদর্শন করলেন। তখন আমি ছিলাম চৌদ্দ বছরের যুবক। কিন্তু তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেননি। পুনরায় তিনি আমাকে খন্দকের যুদ্ধের দিন পরিদর্শন করলেন। তখন আমার বয়স ছিল পনের বছর। এবার তিনি আমাকে (যুদ্ধে যাবার) অনুমতি দিলেন। হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী নাফে' বলেন, আমি উমর ইবনে আব্দুল আযীযের (র) নিকট গেলাম। এসময় তিনি ছিলেন মুসলিম জাহানের খলীফা। আমি তার সামনে এ হাদীস বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যকার সীমারেখা। অতঃপর তিনি তাঁর সমস্ত গভর্নরদের নিকট লিখে পাঠালেন, যে ছেলের বয়স পনের বছর হয়েছে তার নাম সৈনিকদের তালিকাভুক্ত করে নাও। আর যার বয়স এর চেয়ে কম তাকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত কর।[৮৫] ইবন মাজার বর্ণনায় প্রথমে উহুদ যুদ্ধের ও পরে খন্দক যুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে। অর্থাৎ উক্ত ঘটনাটি এই দুই যুদ্ধকালীন সময়ের ঘটনা। ইমাম আবূ দাউদের অনুরূপ এক বর্ণনায় এসেছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ-

অর্থ: আহমদ ইবন হাম্বল (র) ইবন উমার (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাকে উহুদের যুদ্ধের সময় নবী করিম (সা.)-এর সামনে হাজির করা হয়, আর এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর। ফলে তিনি আমাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেননি। এরপর তাকে নবী করিম (সা.)-এর সামনে খন্দকের যুদ্ধের সময় উপস্থিত করা হয়। আর এ সময় তার বয়স ছিল পনের বছর। তখন নবী করিম (সা.) তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন।[৮৬] উছমান ইবন আবি শায়বা (র) উবায়দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাবী নাফে' (র) উমার ইবন আব্দুল আযীয (র) এর নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেন। উমার ইবন আব্দুল আযিয (র) হাদীসটি শ্রবণ করে বলেন, এ হলো বালক ও প্রাপ্তবয়স্কদের মাঝে সময়সীমা।[৮৭]

---

৮৫. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ). *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুশ-শাহাদাত, বাব: বুললূগুস সিবইয়ানি ওয়া শাহাদাতিহিম (রিয়াদ: আল-কুতুবুস সিত্তাহ, ২০০০), হাদীস নং-২৬৬৪; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল-ইমারাত, বাব: বায়ানু সিন্নিল-বুলুগ (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৯হি.), হাদীস নং-১৮৬৮

৮৬. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাব: আওয়ালু কিতাবিল হুদুদ, বাব: ফি গুলামি ইউসিবুল হাদ্দ প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৪০৬

৮৭. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ-
(ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০৭; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী , *জামে' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুস সীয়ারি আন রাসূলিল্লাহি (সা.) বাব: মা যায়া ফিন নুযুলি আলাল হুকমি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৫৮৪; আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি, *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবলি হুদুদ, বাব: মান লা ইয়াজিবু আলাইহিল হাদ্দ, রিয়াদ, জেদ্দাহ: দারুসসালাম,২০০৭, হাদীস নং-২৫৪১)

আবূ দাউদ এর একাধিক বর্ণনায় শিশুদের কিশোরে পরিণত হওয়ার বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ-

অর্থঃ মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) আতিয়া কুরাযী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমিও কুরায়যা গোত্রের বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, (যাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল)। সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং যাদের নাভীর নিচে চুল উঠেছিল, তাদের হত্যা করা হয়েছিল। আর যাদের (নাভীর নিচে) চুল উঠেনি, তাদের হত্যা করা হয়নি। আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম, যাদের তখনো নাভীর নিচে পশম উঠেনি। ফলে আমাকে হত্যা করা হয়নি।[৮৮] অপর এক বর্ণনায় এর সাথে আরো কিছু শব্দ যুক্ত করে বর্ণিত হয়েছে, حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي مِنْ السَّبْيِ-অর্থঃ মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমায়র (রা.) এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। রাবী আরো বলেন, এরপর তারা আমার লজ্জাস্থান উলংগ করে দেখে যে, সেখানে কোন পশম গজায়নি। ফলে তারা আমাকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখে।[৮৯] উল্লিখিত হাদীসসমূহ হতে বুঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোরের বয়সসীমা হলো ১৫ বছর। অর্থাৎ ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত একজন ব্যক্তি কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবেন। আর ১৫ বছর পুর্ণ হলে সে একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে গণ্য হবে।

ফকীহগণের দৃষ্টিতে মেয়ে শিশু বালিগা বা সাবালকে উপনীত হবে- যখন তার হায়েয হওয়া শুরু হবে। যেমন হাদীসে এসেছে,

قَالَ مُغِيرَةُ احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -

অর্থাৎ-মুগীরাহ (র) বলেন, বারো বছর বয়সে আমি সাবালক হয়েছি। আর মেয়েরা সাবালেগা হয় হায়িয হলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের যেসব মেয়েরা ঋতুস্রাবের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে - - - সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত (সূরা আত-ত্বালাক: ৪)।[৯০]

সাবালকত্ব বা বালেগ -এর পরিচয় দিয়ে বিধিবদ্ধ ইসলামি আইনে উল্লেখ করা হয়, “সাবালকত্ব বা বালেগ বলতেঃ (ক) কোন পুরুষের স্বপ্নদোষ বা পনের বৎসর বয়স হওয়া, যা আগে কার্যকর হয়; এবং (খ) কোন

৮৮. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০৪
৮৯. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০৫
৯০. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুশ-শাহাদাত, বাব: বুললূগুস সিবইয়ানি ওয়া শাহাদাতিহিম, প্রাগুক্ত,পরিচ্ছেদ নং-১৬৫৯

মহিলার ঋতুবতী বা গর্ভধারণক্ষম হওয়া, অথবা পনের বৎসর হওয়া, যা আগে কার্যকর হয়; তা বুঝাবে।[৯১] ইমাম কুরতুবী বালেগ হওয়ার চিহ্ন উল্লেখ করে বলেন, والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء: (الاحتلام والسن المخصوص والانبات) واثنان يختصان بالنساء وهما: الحيض والحبل– অর্থাৎ-বালেগ বা বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ পাঁচটি। এর মধ্যে তিনটি নারী-পুরুষ উভয়ের সাথে সমভাবে সংশ্লিষ্ট। এ তিনটি হলো স্বপ্নদোষ হওয়া, নির্দিষ্ট বয়স হওয়া ও বিশেষস্থানে লোম গজানো এবং অবশিষ্ট দু'টি কেবল নারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ মাসিক ঋতু হওয়া, গর্ভ ধারণক্ষম হওয়া।[৯২] যার স্বপ্নদোষ হয় না তার ক্ষেত্রে ঈমাম শাফিঈ' (র), আহমাদ (র) ও আওযাঈ (র)-এর মতে বালেগ হওয়ার বয়স ১৫ বৎসর। ইমাম মালেক (র), আবূ হানীফা (র) ও অন্যদের মতে যার স্বপ্নদোষ হয় না তার ক্ষেত্রে ১৭ বৎসর। ইমাম আবূ হানীফা (র) এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী বালেগ হওয়ার বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৯ বৎসর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৭ বৎসর। অপর এক মত অনুযায়ী ১৮ বৎসর।[৯৩]

আর কিশোরের নিম্নতম বয়সসীমা সম্পর্কেও মতভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিধানে ৭ থেকে কিশোরের বয়স শুরু বলে ধরে নেওয়া হয়। যেমন, বাংলাদেশে কিশোর অপরাধীর বয়সসীমা হলো ৭ বছর থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত।[৯৪] বাংলাদেশ 'শিশু আইন, ২০১৩' -তে বলা হয়, এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ৯ (নয়) বৎসরের নিম্নের কোন শিশুকে কোন অবস্থাতেই গ্রেফতার করা বা, ক্ষেত্রমত, আটক রাখা যাইবে না।[৯৫] আর ফতওয়ায়ে আলমগীরিতে সর্বনিম্ন বয়স সম্পর্কে বলা হয়েছে নয় বছর। নয় বছরের পূর্বে যদি কোন বালিকার ঋতুস্রাব হয় তাহলে তা হায়েয বলে গণ্য হবে না।[৯৬] এ ব্যাখ্যা থেকেও মেয়ে শিশুর মুকাল্লাফ হওয়া বা প্রাপ্ত বয়স্ক বা সাবালকত্বের নিম্নতম বয়স নয় বছর। শরী'আতের দৃষ্টিতে ছেলে শিশুর সাবালকত্বে পদার্পণের নিদর্শন হচ্ছে দাড়ি-গোঁফ গজানো এবং স্বপ্নদোষ হওয়া। উপরিউক্ত নিদর্শন দেখা গেলে ছেলে-মেয়ে শিশুত্ব থেকে শরী'আতের মুকাল্লাফ হয়ে যায়। অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ হয় এবং শরী'আতের বাধ্যবাধকতা আরোপ হয়। তখন আর সে শিশু শরী'আতের বাধ্যবাধকতার আওতামুক্ত থাকে না।[৯৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস থেকে শিশুদের মুকাল্লাফ বা শরী'আতের বিধিবিধান পালনে বাধ্য-বাধকতার বয়সসীমা সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ইবাদত করার উপযুক্ত বয়স প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ– অর্থাৎ "তোমাদের

---

৯১. মুহাম্মদ মূসা ও মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক (সংকলিত), *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮), খ. ১, পৃ. ৪৮৫
৯২. আবি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমাদ ইবন আবি বকর আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লিআহকামিল কুরআন* (বৈরুত: মুয়াসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৭ হি.), খ. ৬, পৃ. ৬২
৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩
৯৪. পান্না রানী রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪
৯৫. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৪৪ (১)
৯৬. সম্পাদনা পরিষদ, *ফতওয়ায়ে আলমগীরি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি), খ. ১, পৃ. ৩৬
৯৭. নূরুল মুমেন, *মুসলিম আইন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৪২-১৪৩; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

সন্তানদের সাত বছর বয়সে পদার্পন করতেই সালাত আদায়ের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে পদার্পণ করে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।”[৯৮] এই হাদীস থেকে শরী'আতের দৃষ্টিতে কিশোরের নিম্নতম বয়স সাত বছর এবং দশ বছর বলে বোঝা যায়। অর্থাৎ, শিশুর শরী'আত পালনের জন্য মুকাল্লাফ বা দায়িত্বশীল হওয়ার পূর্বপ্রস্তুতিমূলক বয়স শুরু দশ বছর বয়সে। উল্লিখিত হাদীসে শিষ্টাচার ও ইবাদতে অভ্যস্ত করার জন্য এই আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজেই দেখা যায় যে, একজন ব্যক্তির কিশোর বয়স এখান থেকেই শুরু। অর্থাৎ একজন শিশু ৭ থেকে ১০ বছর বয়সে উপনীত হলেই কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে আর তাকে ইসলামি বিধিবিধানে অভ্যস্ত করানোর জন্য আদেশ ও উপদেশ প্রদান করতে হবে।

ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) এর নিম্নোক্ত বিধান হতে একজন কিশোরের সর্বোচ্চ বয়সসীমা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, যখন কোন সন্তানের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হবে অথচ তার থেকে কোন প্রকার আলামত প্রকাশ হবে না তখন তাকে মালের মালিক বানিয়ে দেয়া যাবে। তবে ইমাম শাফে'ঈ ও আবূ ইউসুফ (র) -এর মতে তার কাছে সব মাল সোপর্দ করা যাবে না। তারা কুরআনের থেকে দলীল দিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً– অর্থাৎ-“এতিমের অর্থ–সম্পদের নিকটেও যেয়ো না, তবে সঠিক নিয়মে, সদভাবে এতিমের সম্পদ ব্যবহার করতে পার, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়।”[৯৯] পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন,

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ---وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ–

অর্থ: “নির্বোধ মালিকদের হাতে তোমাদের সে সম্পদ তুলে দিয়ো না, যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের দায়িত্বে দিয়েছেন ও তোমাদের জীবিকা লাভের অবলম্বন করেছেন। --- ইয়াতীমদেরকে যাচাই করবে, যতক্ষণ না তারা বিবাহযোগ্য হয়। তাদের মধ্যে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের নিকট তাদের সম্পদ ফিরিয়ে দেবে। ইয়াতীমরা বড় হয়ে যাবে ভেবে অপচয় করে তাদের সম্পদ তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না।”[১০০] ইমাম সারাখসী বলেন, এ আয়াত যেহেতু রহিত হয়নি সুতরাং এ হুক্মও বলবৎ আছে।[১০১]

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে বলা হয়েছে যে, শিশুরা বিশেষ প্রকৃতি ও জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশের মাপকাঠিতে তিনভাগে বিভক্ত। (১) বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়, (২) বালেগ হওয়ার পরবর্তী সময়, (৩) বালেগ হওয়ার

৯৮. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, অধ্যায়: আস-সালাত, অনুচ্ছেদ: মাতা ইউমারুল গুলামু বিস-সালাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯৫

৯৯. আল-কুরআন, ১৭: ৩৪

১০০. আল-কুরআন, ৪ : ৫-৬

১০১. শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইবন আহম্মদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৩২৬হি.), খ. ২৮, পৃ. ৪৯৮

আগেই জ্ঞান-বুদ্ধির যথেষ্ঠ বিকাশ। ইয়াতীম শিশুর অভিভাবকগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, ইয়াতীম শিশুর মধ্যে যে পর্যন্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ লক্ষ্য না কর, সে পর্যন্ত তাদের বিষয় সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিও না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ বুদ্ধি-বিবেচনার বয়সসীমা কী? কুরআনের অন্য কোন আয়াতেও এর কোন শেষ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। এজন্য কোন কোন ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, যদি কোন ইয়াতীমের মধ্যে যথেষ্ঠ বয়স হওয়ার পরও বুদ্ধি-বিবেচনার লক্ষণাদি দেখা না যায়, তবে অভিভাবক তার হাতে বিষয়-সম্পত্তি তুলে দিতে পারবে না। সমগ্র জীবন এ সম্পত্তি তার তত্ত্বাবধানে রাখতে পারবেন। আয়াতে শিশুর বালেগ হওয়ার বয়সসীমা বলতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে বয়সের কোন সীমা উল্লেখ না করে বলেছে: إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ অর্থাৎ তারা যখন বিয়ের বয়সে পৌঁছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বালেগ হওয়া বয়সের সীমার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং বালেগ হওয়ার যেসব লক্ষণ রয়েছে, সেগুলোই এক্ষেত্রে ধর্তব্য। সুতরাং শিশু যখন বিয়ে করার যোগ্যতা লাভ করবে, তখনই তাকে বালেগ বলে গণ্য করা হবে। এ যোগ্যতা কোন কোন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ১৩-১৪ বছর বয়সেও প্রকাশ পেতে পারে। তবে যদি কোন বালক বালিকার ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার লক্ষণ অদৌ প্রকাশ না পায়, তবে সেক্ষেত্রে বয়স গণনা করেই তাকে বালেগ বলে ধরতে হবে। কোন কোন ফকীহর মতে, এ বয়স বালকদের ক্ষেত্রে ১৮ এবং বালিকাদের ক্ষেত্রে ১৭ বছর। কারো কারো মতে, বালক-বালিকা উভয়ের ক্ষেত্রে পনের বছর বালেগ হওয়ার সময়সীমা। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, পনের বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর শরীরে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ না পেলেও বালক এবং বালিকা উভয়কেই শরী'আতের দৃষ্টিতে বালেগ বলে গণ্য করতে হবে।[১০২]

ইবন নুযাইম যইন উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম (৯২৭-৯৭০ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'বাহরুর রায়িক শরহি কানযুদ দাকাইক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, অধিকাংশ ইমামের মতে বালক প্রাপ্তবয়স্ক হয় ১৯ বছর বয়সে। আর নারী প্রাপ্তবয়স্ক হয় হায়েজ অথবা স্বপ্নদোষ হলে। আর তা যদি না হয় তাহলে তার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময় হল ১৭ বছর। তথা কারো যদি ১৭ বছর পর্যন্ত কোন হায়েজ না হয় তাহলে তাকে ১৭ থেকে প্রাপ্তবয়স্ক বলে ধরে নেওয়া হবে।"[১০৩] ইমাম আবুল হাসাল আল-আশ'আরী সাবালকত্বের বয়সসীমা নির্ধারণের আলোচনায় ৭টি অভিমত উল্লেখ করেছেন-

১. শিশুর বুদ্ধির পরিপক্কতা না হওয়া পর্যন্ত সাবালক হয় না। বুদ্ধির উন্মেষের প্রমাণ হচ্ছে মানুষ ও পশুর মধ্যে ক্ষতি ও উপকারের বিষয়ে পার্থক্য বোঝা। তা ছাড়া বিদ্যা অর্জনের সামর্থ্যবান হওয়া।

---

১০২. মুফতী মুহাম্মদ শফী, *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, মাওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২৭৫

১০৩. ইবন নুযাইম যইন উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম, *বাহরুর রায়েক শরহি কানযুদ দাকাইক* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াত-তুরাসিল 'আরাবি, ১৪২২ হি.), খ. ৫, পৃ. ১১১-১১২

২. মনীষী মুহাম্মদ ইবন আব্দুল ওয়াহাব আল-জাযায়েরী বলেন, শিশুর সাবালকত্ব হচ্ছে বুদ্ধির এমন পরিপক্কতা যার দ্বারা সে নিজেকে পাগল যা করে তা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

৩. বাগদাদের তৎকালীন পণ্ডিতগণ বলেন, সুস্থ ও মুকাল্লাফ হওয়া এবং সুস্থ ও পাগলের পার্থক্য বোঝার সক্ষমতা শরী'আতে শিশুর সাবালকত্বের নির্দশন।

৪. আল্লামা ছুমামা ইবনে আশরাস আন নুমাইরির মতে, মানব শিশু সাবালকত্ব লাভ করে তখন যখন সে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, সে আল্লাহ, রাসূল, কিতাব প্রভৃতি বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়- তখন সাবালক হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. অধিকাংশ মুতাকাল্লিমীন (যুক্তিবিদ) -এর মতে, মানব শিশুর মধ্যে বুদ্ধির পরিপূর্ণতাই হচ্ছে সাবালকত্বের প্রমাণ।

৬. অধিকাংশ ফিকহবিদ-এর মতে, দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক থাকা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হওয়া শিশুর সাবালকত্বের নিদর্শন অথবা তার বয়স ১৫ বছর হওয়া। তবে কোন কোন ফকীহ শিশুর নাবালকত্বের বয়সসীমা ১৭ বছর মনে করেন।

৭. কিছু সংখ্যক পণ্ডিতের মতে, তার বুদ্ধির অধিকাংশ প্রতিবন্ধকতা দূর না হওয়া পর্যন্ত বয়স ত্রিশ বছর এবং স্বপ্নদোষ হলেও শিশুত্ব হারাবে না। অর্থাৎ সাবালকত্ব লাভ করবে না।[১০৪]

উপরোক্ত বিশ্লেষণে শিশু-কিশোরের সামগ্রিক সংজ্ঞা নিরূপণে জাতীয় নীতি, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞায় বেশ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। উক্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে প্রদত্ত শিশু-কিশোরের সংজ্ঞা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শিশু আইনের দৃষ্টিতে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তার সমন্বিত একটি সময়সীমা গ্রহণ করাই যৌক্তিক। তাই শিশু সম্পর্কিত সকল আইন, নীতি ও অনুশীলন এ বয়সের সকল মানব সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অতএব ১৮ বছরের নিচে সবাই ক্ষেত্রবিশেষে শিশু-কিশোর। কিন্তু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ এবং বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতির আলোকে শিশুর সংজ্ঞার সাথে ইসলাম প্রদত্ত শিশু-কিশোরের সংজ্ঞায় আপাত দৃষ্টিতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শরী'আতের মুকাল্লাফ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছেলে-মেয়েকে শিশু-কিশোর বলা হয়। সর্বোপরি বলা যায়, যে বয়সে কারো উপর ইসলামি শরী'আতের বাধ্যবাধকতা থাকে না বা বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয় না; সেই বয়সের ব্যক্তিই শিশু-কিশোর হিসেবে বিবেচিত হবে।

---

১০৪. আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাইল, *মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন*, মুহাম্মদ মুহীউদ্দিন আব্দুল হামিদ সম্পাদিত (আল কাহেরা: মাকতাবাতু আন নাহদাতু আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৯), খ. ২, পৃ. ১৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

অপরাধ ও কিশোর অপরাধ

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ: অপরাধের পরিচয় ও শ্রেণিবিন্যাস

অপরাধ পরিচিতি

অপরাধ মানব সমাজের মতই একটি আদি সামাজিক ব্যাধি। মূলত অপরাধ মানুষের অন্তর্নিহিত কুপ্রবৃত্তির বাহ্যিক অভিব্যক্তি। মহান আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে অনেক মহৎ গুণাবলীর অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন, যুগৎপতভাবে মানুষ ষড়রিপুর দ্বারাও তাড়িত। ফলশ্রুতিতে মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত অসদভিলাসের তাড়নায় নানা অন্যায় ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। মহান আল্লাহ আদম (আ.) কে প্রথম মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করে পরম সুখের স্থান জান্নাতে স্থান দেন। কিন্তু আল্লাহর আদেশ অমান্য করে গন্ধম ফল খাওয়ার কারণে তাকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম অপরাধ সংঘটিত হয় হযরত হাবিলকে হত্যার মাধ্যমে। সে রক্তপাত হতে শুরু করে অদ্যাবধি পৃথিবীতে নানা ধরনের অপরাধ যেমন, হত্যা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি প্রভৃতি বিরাজমান। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে, অপরাধ মানব সমাজের মতো আদি ও চিরন্তন।[১]

অন্যদিকে অপরাধী ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ সম্পর্কে মানুষ ও সমাজের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক এবং চিরন্তন। অপরাধ এবং অপরাধীর আচরণে সমাজের মানুষকে করে তোলে উদ্বিগ্ন, সৃষ্টি করে কৌতূহল এবং জাগিয়ে তোলে তার মধ্যে অপরাধ দমনের এক সমাজকল্যাণমূলক সদিচ্ছা। আর সে উদ্ভাবন করার প্রয়াস অব্যাহত রাখে অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কর্মপন্থা।[২] সমাজ সচেতন যে কোন মানুষকেই অপরাধ এবং অপরাধী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে দেখা যায়। সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ, কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাংবাদিক স্মরণাতীতকাল থেকেই তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় এবং লেখায় অপরাধ এবং অপরাধীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি অপরাধীর শাস্তি ও মর্মান্তিক পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। হোমারের (খৃ.পূ. ৯ম শতাব্দী) কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে অপরাধের কাহিনী। শেক্সপিয়ারের (১৫৬৪-১৬১৬খ্রি.) হ্যামলেট, মার্চেন্ট অব ভেনিসের শাইলক এবং এন্টিনিও ইত্যাদি কাহিনীতে মূলতঃ অপরাধ এবং মানবীয় আচরণের এক বিশেষ চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

অপরাধ সম্পর্কে কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি তৈরি হয়েছে এবং এখন এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এসব মূলত অপরাধ, অপরাধীর আচরণ এবং তার পরিণাম সম্পর্কে মানব মনের কৌতূহলের বহিঃপ্রকাশ।[৩] জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা, শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সম্প্রীতির বিরুদ্ধে অপরাধ ও অপরাধী এক বিরাট চ্যালেঞ্জ।

---

১. বিচারপতি আব্দুস সালাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১১খ্রি.), খ. ২, পৃ.৮৫
২. মোহাম্মদ আবু জাফর খান, "অপরাধ দমনে ইসলাম", *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৭৯
৩. বোরহান উদ্দীন খান ও মনজুর কাদের, *অপরাধবিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২০১৪খ্রি.), পৃ. ৬২

সমাজ তথা রাষ্ট্রকে তাই নাগরিকের জীবন, সম্পদ এবং স্বাধীনতা রক্ষা এবং শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আইন তৈরি করতে হয়। আইনের প্রয়োগ করে অপরাধীকে চিহ্নিত করে তার শাস্তির বিধান করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এজন্য পৃথিবীর সব দেশেই রয়েছে অপরাধ দমন আইন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং সর্বোপরি বিচার, শাস্তি ও জেল ব্যবস্থা।

সর্বোপরি অপরাধ এবং অপরাধী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণাও চলে আসছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অপরাধবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা হচ্ছে। এ সত্ত্বেও অপরাধ সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজন স্বীকৃত তেমন কোন সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এমন একটি সংজ্ঞা নেই যা সর্বজন স্বীকৃত তথা সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য। কেননা, অপরাধ পরিভাষাটি খুবই জটিল ও আপেক্ষিক। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতিগত ভিন্নতাকেই অপরাধের সার্বজনীন কোন সংজ্ঞা ও ধারণা না থাকার পেছনে দায়ী বলে ধরা হয়।[৪] এর সঠিক ও পরিপূর্ণ স্বরূপ নির্ণয় করা বেশ কষ্টকর। কারণ অপরাধের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ভর করে কোন দেশ বা সমাজের মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ তথা দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতির উপর। কোন কাজ এক দেশে যা অপরাধ, অন্য দেশে তা অপরাধ নয়, এক সময়ে যা অপরাধ অন্য সময়ে তা অপরাধ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বে হিন্দু সমাজে সতীদাহ প্রথা[৫] কোন অপরাধ ছিল না, কিন্তু বর্তমানে তা অপরাধ। কোন সমাজে মদ্যপান অপরাধ নয়, আবার কোন সমাজে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ইউরোপীয় সমাজে রাষ্ট্র এবং ধর্মের বিরুদ্ধে যে কোন কাজকেই কেবলমাত্র অপরাধ হিসেবে ব্যাখ্যা দেওয়া হত। আর তাই ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহী আচরণ ছিল অন্যতম অরাধমূলক কাজ; কিন্তু হত্যাকে তখনও অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি।[৬] ইসলামি দেশসমূহে যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশা এক ধরনের অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু আমেরিকা বা পশ্চিমা দেশগুলোয় একে অপরাধ বলা হয় না; বরং সামাজিক প্রথা হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। বর্তমান সমাজকে সংগঠিত সমাজ বলা হয়। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশের সমাজ ব্যবস্থাই কতিপয় আইন-কানুন ও নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আর এ সব আইন ও নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী কাজকেই বর্তমান সমাজে অপরাধ বলা হচ্ছে। তবে অপরাধকে সাধারণত তিনটি দৃষ্টিকোণে ব্যাখ্যা করা যায়-

---

৪. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা* (ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১১), পৃ. ২৭৪

৫. সতীদাহ প্রথা স্বামীর শব দাহের সঙ্গে বিধবা স্ত্রীকে জীবন্ত দাহ করার পূর্বেকার হিন্দুধর্মীয় প্রথা। সংস্কৃত 'সতী' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে এমন সতীসাধ্বী রমণীকে বোঝায় যিনি তার স্বামীর প্রতি চূড়ান্ত সততা প্রদর্শন করেন এবং তার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতিও থাকেন সত্যনিষ্ঠ। কিন্তু একটি আচার হিসেবে সতীদাহের অর্থ হলো মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সহমরণের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা এবং ওই অনুষ্ঠানে তূরীবাদক জনতার মাঝে স্বামীর শেষকৃত্যের চিতায় আরোহণ করা। কবে এবং কিভাবে এ ধরনের আচার ধর্মীয় প্রথারূপে গড়ে উঠেছে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। গ্রিক লেখক ডিওডোরাস (আনু. ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) এক সতীদাহের ঘটনার বর্ণনা দেন। এই বর্ণনার সঙ্গে আঠারো শতকের প্রচলিত সতীদাহ ব্যবস্থার প্রায় অবিকল মিল রয়েছে। অতীতে বিশ্বের বহু সমাজে মানুষের আত্মাহুতি প্রথার অস্তিত্ব ছিল বলে নৃবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকরা মোটামুটি একমত। রাজপুতরা খুব ঘটা করে এই অনুষ্ঠানটি পালন করত। কিন্তু বাংলাসহ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে হিন্দুদের কোন কোন বর্ণের লোকেরা এই অনুষ্ঠান পালন করত ভিন্নতরভাবে। তুর্কি ও মুগল যুগে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা সফল হয় নি। (বি.দ্রঃ সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া* , ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইট, সতীদাহ প্রথা)।

৬. N.V. Paranjape , *Criminology And Penology* (Alahbad: Central Law Publication, 2005), p. 3

(১) সামাজিক দৃষ্টিকোণ;

(২) আইনগত দৃষ্টিকোণ এবং

(৩) বয়সগত দৃষ্টিকোণ।

(১) সামাজিক দৃষ্টিকোণ

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ হলো সমাজ বিরোধী কাজ। অর্থাৎ অপরাধ হলো ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ড বা আচরণ যেগুলো সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের পরিপন্থী।[৭] এতে করে এ সমস্ত কর্মকাণ্ড সার্বিক সমাজ জীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে সমাজ জীবনকে অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খল করে তুলতে যথেষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। আবার সমাজের মানুষ মাত্রই দলবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সে ক্ষেত্রে অপরাধ হলো ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ড যা সমাজের মানুষের দলবদ্ধ জীবনযাপন তথা দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং দলের সার্বিক অস্তিত্বের জন্য হুমকীস্বরূপ। অপরাধের সামাজিক দৃষ্টিকোণ বর্ণনা করে মার্কিন সমাজ ও অপরাধবিজ্ঞানী Elmer Hurber Johnson (1917 B.) বলেন, "Crime is an act which the group regards as sufficiently menacing to its fundamental interests to justify formal reaction to restrain the violator."[৮] অর্থাৎ অপরাধ হলো ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ড যা সমাজের মানুষ দলবদ্ধ জীবনযাপন তথা দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী বা হুমকীস্বরূপ মনে করে অপরাধীকে সংযত করতে যে কোন ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সমর্থন করে।

আবার মার্কিন ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী Harry Elmer Barnes (1889-1968 AD.) and Negley K. Teeters (1896-1971)-এর মতে "Crime is a form of antisocial behavior that has violated public sentiment to such an extent as to be forbidden by statute."[৯] অর্থাৎ অপরাধ হলো সমাজবিরোধী কাজ যা দেশের গঠনতন্ত্র বিরোধী এবং জনমত পরিপন্থী।

(২) আইনগত দৃষ্টিকোণ

অন্যদিকে আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অপরাধ হলো আইন ভঙ্গমূলক কাজ। আইন মানুষের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে প্রণীত হয়। প্রতিটি সমাজেই এই আইনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরপত্তা বিধান করা হয়। এ সমস্ত আইন সমাজের সদস্যদেরকে একদিকে বেশ কিছু কাজ ও আচরণ করার অনুমতি প্রদান করে, অন্যদিকে এই আইন-ই আবার তাদেরকে কতিপয় কর্মকাণ্ড ও আচরণ করা থেকে বিরত রাখে। কাজেই অপরাধ হলো ঐ সমস্ত কাজ ও আচরণ করা যার জন্য আইন অনুমতি প্রদান করে না অথবা ঐ সমস্ত

---

৭. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪

৮. Elmer Hurber Johnson, *Crime, Correction and Society* (Illinois :The Dorsey Press ,1968), p.11

৯. Harry Elmer Barnes and Negley K. Teeters, *New Horizons in Criminology* (New York: McGraw Hill Book,1959), p.70

কাজ না করা যা আইনগতভাবে অবশ্য পালনীয় বা করণীয়। উল্লেখ্য, এ সমস্ত কাজ ও আচরণ করা বা না করার জন্য আইনগতভাবে শাস্তির বিধান থাকে। অপরাধের আইনগত দৃষ্টিকোণ বর্ণনা করে মার্কিন অপরাধবিজ্ঞানী Paul W. Tappan (1911-1964 AD.) বলেন, "Crime is an intentional act or omission in violation of criminal law, committed without defence or justification, and sanctioined by the law as a felony or misdemeanor."[১০] অর্থাৎ কোন ধরনের প্রতিরক্ষা বা আত্মপক্ষ সমর্থন ব্যতীত অপরাধ আইন ভঙ্গকারী এমন উদ্দেশ্যমূলক কাজ বা ভুলকে অপরাধ বলে, যা আইন দ্বারা গুরুতর অপরাধ বা অপকর্ম হিসেবে অনুমোদিত।

আইনগত ও সামাজিক দিক ব্যতীত ধর্মীয় ও মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকেও অনেক সময় অপরাধকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অপরাধ হলো ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ড যেগুলো করা ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ। বিশ্বের প্রতিটি ধর্মেই মানুষ ও বিশ্বজগতের জন্য ক্ষতিকর এমন কর্মকাণ্ড ও আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধকে এক ধরনের অস্বাভাবিক ও বিচ্যুত আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে অপরাধ হলো, এমন এক ধরনের আচরণ বা কর্মকাণ্ড যার সাথে অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক আচরণ ও কর্মকাণ্ডের সামঞ্জস্যতা থাকে না।

(৩) বয়সগত দৃষ্টিকোণ

অপরাধ বিবেচনার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দু'টি দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও অপরাধকারীর বয়সের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। কেননা যে কোন বয়সের ব্যক্তির ক্ষেত্রে সামাজিক আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ও আইন ভঙ্গকারী সকল আচরণ ও কর্মকাণ্ডই যে অপরাধ বলে বিবেচিত হবে তা নয়। বরং এগুলোকে যদি অপরাধমূলক বলে বিবেচিত হতে হয় তবে অবশ্যই সেগুলো একটা নির্দিষ্ট বয়সসীমার উর্ধ্বের ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হতে হবে। যেমন শিশুর কোন কাজই অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না যদিও তার কাজটি সমাজের দৃষ্টিতে সমাজ বিরোধী কিংবা আইনের দৃষ্টিতে আইনের সাথে সাংঘর্ষিক হোক না কেন। শিশু আইন, ২০১৩[১১] ও বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ (The Penal Code,1860)[১২] -তে অপরাধের দায়-দায়িত্বের বয়সসীমা ৯ বছর বলে উল্লেখ করা হয়। দণ্ডবিধির ৮৩ ধারা মতে ৯ থেকে ১২ বছরের শিশুর কোন কর্মই অপরাধ নয়।[১৩] তাহলে দেখা যায় যে, কোন কাজ অপরাধ কিনা তা বিবেচনার জন্য সামাজিক ও আইনগত দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি বয়সগত বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

---

১০. Paul W. Tappan , *Crime, Justice and Correction* (New York: McGraw Hill Book ,1960), p.10

১১. *শিশু আইন*, ২০১৩, (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণমন্ত্রণালয়, ১৮ আগষ্ট ,২০১৩), অনুচ্ছেদ: ৪৪

১২. *The Penal Code,1860* (Act No.XLV of 1860) (The Penal Code, Amendment Act,2004, Act No.XXIV of 2004)

১৩. *The Penal Code,1860*, Sec:83, ibid

অপরাধের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা

অপরাধের আভিধানিক অর্থে বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে, "দোষ, ত্রুটি, আইনবিরুদ্ধ কাজ, দণ্ডনীয় কর্ম, পাপ, অধর্ম।"[১৪] অপরাধের আরবি পরিভাষায় আল-জারীমাহ ও আল-জিনায়াত (الجناية و الجريمة) ব্যবহৃত হয়। জিনায়াত অর্থ দণ্ডযোগ্য অপকর্ম।[১৫] জিনায়াত (جناية) শব্দটি جني ধাতু হতে উদ্ভূত ক্রিয়ামূল, বহুবচনে جنايات ব্যবহৃত হয়। অর্থঃ অন্যায়, অপরাধ, পাপ ইত্যাদি।[১৬] অপরাধের অপর আরবি পরিভাষা আল-জারীমাহ (الجريمة) অর্থ অপরাধ, পাপ, গুনাহ।[১৭] আল-জারীমাহ শব্দটি আল-জুরম (الجرم) থেকে উদ্ভূত। আল-জুরম (الجرم) শব্দটির বহুবচনে আল জুরূম ও আজরাম (جروم, أجرام) ব্যবহৃত হয়। আল-জুরম (الجرم) শব্দটি জীম অক্ষরে পেশ যোগে অর্থ পাপ, সীমালঙ্ঘন প্রভৃতি।[১৮] আর مُجْرِم অর্থ অপরাধী। পবিত্র কুরআন[১৯] ও রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে[২০] শব্দটি অপরাধী ও পাপাচারী অর্থে ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজিতে অপরাধকে crime, offense বলা হয়।[২১]

Merriam Webster Online Dictionary -তে crime এর অর্থে বলা হয়েছে যে, Crime is a regrettable or blameworthy act. Related word: outlawry, gangsterism, hooliganism, racketeering, malfeasence, misconduct, wrongdoing, evil, immorality, sin, wickedness, corruption, depravity, malefaction, misdeed, misdoing, offence, transgression, trespass."[২২]

Crime এর অর্থে *Oxford Advanced Learner`s Dictionary* -তে বলা হয়েছে, Crime is an act that is foolish or morally wrong. An offence for which one may be punished by law, Activities that involve breaking the law.[২৩]

---

১৪. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৭ম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৪০
১৫. ইমাম ইসমাঈল ইবন উমর ইবন কাছীর (রহ), *আল-মিসবাহুল মুনীর ফিতাহযীবি তাফসীর ইবন কাছীর* (বৈরুতঃ দারুস সালাম, ১৪২০১১ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৪৪
১৬. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫), ২১০পৃ. ৩৭৪
১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২
১৮. ইমাম আবূল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *লিসানুল 'আরাব* (আল কাহেরাঃ দারুল হাদীছ, ১৪০২হি.), খ. ২, পৃ. ২৫৮
১৯. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ –অর্থ: লক্ষ্য করে দেখুন, পাপাচারীদের পরিণতি কত ভয়ঙ্কর হয়েছিল। (আল-কুরআন, ৭: ১৩৩)
২০. إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ- (ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী, *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবঃ ফাদায়িল, বাবঃ তাওক্বিরুহু সা. বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৯হি, হাদীস নং-২৩৫৮)
২১. J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Macdonald and Events Ltd,1980), p.121
২২. Merriam webster online dictionary,www.merriam-webster.com/
২৩. Jonathan Crowther (edited), *Oxford Advanced Learner`s Dictionary* (UK: Oxford University Press,5th edition, 1999), p.276

Thesaurus and Encyclopedia of crime এ crime -এর পরিচয়ে উল্লেখ করা হয় "An act committed, or omitted in violation of law forbidding or commanding it and for which punishment is imposed upon conviction.Unlawful activity, statistics relating to violent crime. A serious offence, especially one in violation of morality. An unjust, senseless, or disgraceful act or condition: It it`s a crime to squander our country`s natural resources.[২৪]

অপরাধ হলো এমন কিছু করা যার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর শাস্তি আরোপিত হয়; বে-আইনী কাজ করা; মারাত্মক দোষ বা পাপ, বিশেষত নৈতিক স্খলন; অন্যায্য, বিবেক-বর্জিত বা অপ্রীতিকর কাজ বা অবস্থা।[২৫]

Merriam webster online dictionary-তে অপরাধের পরিচয়ে বলা হয়, "Crime is an illegal act which someone can be punished by rhe government; especially: a gross violation of law."[২৬]

এছাড়াও অপরাধ সম্পর্কে বিভিন্ন অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ বিভিন্ন ধরনের মত পোষণ করে থাকেন। অপরাধ সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য সে সম্পর্কে কয়েকটি মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে।

১। সমাজবিজ্ঞানী Gillin John Lewis (1871-1958 Ad.) অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "অপরাধ হচ্ছে এমন ধরনের কাজ যা সমাজবদ্ধ মানুষ মূলতঃ সমাজের জন্য ক্ষতিকারক বলে মনে করে। শুধু তাই নয়, ক্ষতিকারক ঐসব কাজের শাস্তি বিধানে সমাজবদ্ধ মানুষেরা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে।"[২৭]

২। সমাজবিজ্ঞানী Samul Koeing (1972 Ad.) বলেন, সমাজ বা গোষ্ঠী দ্বারা দৃঢ়ভাবে অসমর্থিত -এমন সব মানবীয় আচরণকে অপরাধ বলা যেতে পারে। যেহেতু সমাজ ভেদে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে ধারণা বর্তমান এবং যেহেতু প্রতিটি সমাজই পরিবর্তনশীল, সেহেতু অপরাধমূলক আচরণ চূড়ান্ত নয়; বরং তা আপেক্ষিক।[২৮]

৩। ইতালিয়ান অপরাধবিজ্ঞানী Garofelo Raffaele (1851-1934 Ad.) অপরাধের একটি সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেন। অপরাধের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি 'স্বাভাবিক অপরাধ' (Natural

২৪. Free online Dictionary, *Thesaurus and Encyclopedia of crime*
২৫. *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৫
২৬. *Merriam Webster Online Dictionary*, ibid
২৭. Gillin John Lewis , *Criminology and Penology* (New York: Green Wood Press, 1977), p. 9
২৮. Koeing Samul, *Sociology* (New York: Barnes and Noble, 1969), p. 318

Crime) নামক একটি পরিভাষার অবতারণা করেছেন। স্বাভাবিক অপরাধ হচ্ছে এমন সব কাজ যা মানুষের সহানুভূতি (Pity) এবং সততার (Probity) মৌল নৈতিক আবেগকে আঘাত করে। এসমস্ত মৌল নৈতিক আবেগ একই সমাজে যুগে যুগে এবং বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নরূপ নিতে পারে। যুগের ব্যবধানের কারণেই হোক বা সামাজিক ভিন্নতার কারণেই হোক, মানুষের এই মৌল আবেগের উপর আঘাত হানে, এমন সব কাজই হচ্ছে স্বাভাবিক অপরাধ। তিনি আরো বলেন, অপরাধমূলক আচরণ হতে হলে তাকে অবশ্যই সামাজিকভাবে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হতে হবে।[২৯]

সুতরাং দেখা যায়, মানুষের আবেগকে আহত করে এবং সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর, এমন সব মানবীয় আপচরণই হচ্ছে অপরাধ। উল্লেখ্য, প্রত্যেকটি সমাজই নিজস্ব প্রথা এবং অনুশাসন দ্বারা পরিচলিত। আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিও এ প্রথা থেকে গড়ে উঠে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের সে সব আচরণকে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়, যা সামাজিকভাবে একদিকে যেমন ক্ষতিকারক, অন্যদিকে প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও অনুশাসন পরিপন্থী। উপরন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্রথা এবং অনুশাসনের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠা দৃষ্টিভঙ্গিতে একদিকে যেমন ভিন্নতা লক্ষণীয়, অন্যদিকে যুগের ব্যবধানে সে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আসে পরিবর্তন। তাই অপরাধের সমাজতাত্ত্বিক সংজ্ঞা স্থান ও কালভেদে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে।[৩০]

৪। রোমান দার্শনিক সেনেকার (Lucius Annaeus Seneca, 1265 Ad.) মতে, "মানুষ স্বভাবত পাপাচারী এবং সমাজ বা রাষ্ট্র মানুষের পাপাচারের ফলশ্রুতি। মানুষ স্বভাবতই দুষ্ট প্রকৃতির এবং এ কারণে মানুষ সব সময় পাপকার্যে লিপ্ত থাকে। পাপ কার্যের জন্য মানুষের শাস্তি বিধানই রাষ্ট্রের প্রধান কাজ, তার নৈতিক উন্নতি সাধন নয়।"[৩১] সিনেকার কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি দেশের প্রচলিত আইন, জেল-হাজত, কারাবাস, পুলিশী ব্যবস্থা, মৃত্যুদণ্ড কোনটার মাধ্যমেই মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন হয় না। এ সব ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের অপরাধমূলক কাজের শাস্তিই প্রদান করা হয়ে থাকে। সামাজিক নিয়ম-কানুন মানুষেরই সৃষ্টি এবং মানুষই তা আবার লঙ্ঘন করে। সমাজের আইন যারা তৈরি করেন, তারাই পরবর্তীতে সেই আইন ভঙ্গ করেন। এভাবে মানুষের তৈরি আইন মানুষই ভঙ্গ করে মানুষের চোখেই অপরাধী হয়ে যায়। এর কারণ হিসেবে মানুষের অপরাধপ্রবণ আচরণ বা স্বভাবকেই দায়ী করা যায়।

উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, অপরাধের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর তা হলো:[৩২]

(১) অপরাধমূলক কাজটি আইনগত বা সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ হতে হবে।

২৯. Garofelo Raffaele, *Criminology* (Bostom: Univesity of Mechigan Library,1914), pp. 33-34
৩০. বোরহান উদ্দীন খান ও মনজুর কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১
৩১. মো. আবু জাফর খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১
৩২. ড. মো: নুরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫-২৭৬

(২) অপরাধমূলক কাজটি সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা তথা স্বাভাবিক সমাজ জীবনের জন্য প্রতিবন্ধক এবং এটি সমাজের ক্ষতিসাধন করে।

(৩) সমাজের জন্য ক্ষতিকারক অপরাধমূলক কাজটি পূর্বপরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত আবার কখনও অনিচ্ছাকৃত হতে পারে।

(৪) অপরাধমূলক কাজটি সাধারণত উদ্দেশ্য প্রণোদিত বা সুবিবেচনা প্রসূত হয়ে থাকে।

(৫) অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে চিন্তা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়।

(৬) অপরাধের ক্ষেত্রে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ কোন কিছু ক্ষতিকর দিক ও বাস্তবায়িত কাজ- এ বিষয়গুলোর মধ্যে কার্যকারণগত সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়।

(৭) অপরাধমূলক কাজটির ক্ষেত্রে আইনগত শাস্তি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

অপরাধঃ ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামি আইনের দৃষ্টিতে শরী'আহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ করা এবং শরী'আতে নির্দেশিত কাজ বাস্তবায়িত না করা এ দু'টোকেই অপরাধ বলা হয়েছে। অপরাধ বলতে শরী'আতের এমন আদেশ ও নিষেধ বুঝায় যা লঙ্ঘন করলে হদ্দ বা তা'যীর প্রযোজ্য হয়।[৩৩] সুতরাং শরী'আহ যে কাজ নিষিদ্ধ করেছে এবং নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সে কাজে লিপ্ত হলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে-এমন প্রতিটি কাজে লিপ্ত হওয়া। অনুরূপভাবে শরী'আহ যে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে, এবং না করা শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে -এমন প্রতিটি কাজ না করা অপরাধ।[৩৪] সাধারণ আইনের সাথে এ সংজ্ঞার কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা সাধারণ আইনে অপরাধ হচ্ছে সে কাজ যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব যা করতে পূর্বাহ্নে নিষেধ করা হয়নি, তা করা নিশ্চয়ই অপরাধ হতে পারে না। ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায়, –الجرائم فى الشريعة الاسلامية بانها محظورات شريعة زجره الله عنها بحد او تعجير অর্থাৎ- অপরাধ বলতে শরী'আতের এমন আদেশ ও নিষেধ বোঝায়, যা লঙ্ঘন করলে হদ্দ অথবা তা'যীর প্রযোজ্য হয়।[৩৫] শরী'আতের আদেশ ও নিষেধ লঙ্ঘন বলতে বোঝায় এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যা করতে শরী'আতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এমন কাজ ত্যাগ করা, যা করতে শরী'আতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লামা জুরজানী অপরাধের পরিচয়ে বলেন, –قال الجرجانى: الجناية كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها অর্থাৎ-আল-জিনায়াত বা অপরাধ হলো এমন নিষিদ্ধ কর্ম, যার কারণে ব্যক্তির নিজের বা অন্যের উপর ক্ষতি আরোপিত

৩৩. আবূল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-মাওয়ার্দী, *আল-উলায়াতুদ-দীনিয়া ফিল আহকামিস সুলতানিয়্যা* (বৈরুতঃ দারুল কুতুবুল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৭৮খ্রি.), পৃ. ২৭৩; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৮৬
৩৪. আব্দুল কাদের 'আওদাহ, *আত-তাশরী' আল-জিনাঈ আল-ইসলামী* (বৈরুতঃ দারুল কিতাবিল আরাবি, তা.বি), খ. ১, পৃ. ৬৬
৩৫. সম্পাদিত, *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ* (কুয়েতঃ ওয়ারাতিল আওকাফ ওয়াশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৯ হি. ২সংস্করণ), খ. ১৬, পৃ. ৫৯;
৩৬. আবূল হাসান আলী ইবন মুহাম্মদ ইবন হাবীব আল-মাওয়ার্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯

হয়।[৩৬] কোন কর্ম করা বা কর্মপরিত্যাগকে অপরাধ গণ্য করার জন্য তার মধ্যে নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকতে হবে-

(ক) কোন কর্ম করলে অথবা না করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য হবার জন্য তার সমর্থনে নস (نص)[৩৭] বিদ্যমান থাকতে হবে।

(খ) যে কর্মটি করলে অথবা না করলে অপরাধ হয় তা বাস্তবে কার্যকর হতে হবে।

(গ) অপরাধীকে শরী'আতের মুকাল্লাফ অর্থাৎ মুসলমান, বালেগ ও বুদ্ধিমান হতে হবে।[৩৮]

جناية و جريمة –এর পরিচয়ে 'আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ' ইসলামি ফিকহ বিশ্বকোষে আল-মাওয়ার্দীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, الجريمة فى الشريعة الاسلامية:الجريمة بانها محظور شرعي نهى الله عن فعله اما بحد او تعزير والمحظور هو عمل امر نهى الله عنه اوعدم عمل امر امربه–অর্থাৎ-ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় জারিমাহ বা অপরাধ হলো এমন কাজ, যে কাজ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তা করা এবং যে কাজ করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন, তা না করা এবং যা লঙ্ঘনের জন্য হদ্দ অথবা তা'যীর প্রযোজ্য হয়।[৩৯]

হানাফী আলিমগণ অপরাধের পরিভাষিক সংজ্ঞায় বলেন, (واصطلاحا عرفها الحنيفة بانها: اسم لفعل محروم هل بالنفس اوالاطران قال العينى فى شرح الهداية بى جنايت الحج المراد بما فعل ما ليس المحرام ان يفعله.) "অপরাধ হচ্ছে সে নিষিদ্ধ কাজ যা কোন ব্যক্তি বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। আর আল্লামা আইনী হিদায়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন, জিনায়াতুল হাজ্জ ঐসব কাজ যেগুলো ইহরাম পরা অবস্থায় নিষিদ্ধ।" শাফিঈ' আলিমগণের মতে অপরাধের সংজ্ঞা হচ্ছে, وعرفها الشافعية بانها كل مزهق للروح او مبين للعضو "প্রাণনাশকারী বা অঙ্গহানিকর প্রত্যেকটি কাজই হচ্ছে জিনায়াত বা অপরাধ।" মালিকী আলিমগণের মতে অপরাধের সংজ্ঞা হচ্ছে, وعرفها المالكية بانها: اتلاف مكلف غير حربى نفس انسان معصوم او عضو او معنى او معنى قائما به او جنبه عمواً او خطأ بتحقيق او تهمه. অর্থাৎ-"হারবী শত্রু নয়, এমন কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণনাশ বা অঙ্গব্যবচ্ছেদই অপরাধ; চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক, যথার্থ কারণে হোক আর নেহাত অপবাদের ভিত্তিতেই হোক।" আর হাম্বলী আলিমগণের মতে অপরাধ হচ্ছে,

عرفها الحنابلةً بانها: كل فعل عنوان على الابدان بما يوجبُ قصاصاً او نحوه.

---

৩৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৩৭. পবিত্র কুরআনের আয়াত ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর হাদীসকে নস বলা হয় (বি.দ্র: মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান, *কাওয়াইদুল ফিকহ*, ১৯৬১খ্রি, পৃ. ১২৬)

৩৮. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ, ২০০১খ্রি.), খ. ১, পৃ. ২৪৬

৩৯. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

অর্থাৎ-"সাধারণভাবে এমনসব কাজই অপরাধ যা মানবদেহের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং যার ফলে কিসাস বা ঐ জাতীয় দণ্ড অপরিহার্য হয়।"[৪০]

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, হানাফীগণের দৃষ্টিতে অপরাধ হচ্ছে সে নিষিদ্ধ কাজ যা কোন ব্যক্তি বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। শাফিঈগণের মতে, প্রাণনাশকারী বা অঙ্গহানিকর কাজই হচ্ছে জিনায়াত বা অপরাধ। মালিকীগণের মতে, হারবী শত্রু ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে হোক আর অনিচ্ছাকৃতভাবেই কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণনাশ বা অঙ্গব্যবচ্ছেদ; চাই তা যথার্থ কারণে হোক আর নেহাত অপবাদের ভিত্তিতেই হোক। আর হাম্বলীগণের মতে, সাধারণভাবে এমনসব কাজই জিনায়াত পদবাচ্য যা মানবদেহের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় এবং যার ফলে কিসাস বা ঐ জাতীয় দণ্ড অপরিহার্য হয়।

ইমাম আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী (১০২৫-১০৮৮হি.) বলেন, اما فى الاصطلاح الفقهِى فالجنايةُ اسمُ لفعلِ مُحرَّم شرعا سواءَ وقّع الفعلُ على نفسٍ اومال او غير ذالك –لكن عرف الفقهاء جرى على اطلاق اسم الجماعة على الافعال الواقعة على نفس الانسان او اطرافه وهى القتل والجرح والضرب– অর্থাৎ- ফিকহী পরিভাষায় জিনায়াত বা অপরাধ হচ্ছে, সেসব কাজের নাম যা কোন ব্যক্তি (প্রাণ), কোন সম্পদ বা ইত্যাকার কোন কিছুর বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। কিন্তু ফিক্‌হবেত্তাগণ তা কেবল মানুষের জীবন বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপকর্মের নাম বলে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন আর সে অপকর্মগুলো হচ্ছে হত্যা, যখম করা বা কাউকে প্রহার করা।[৪১] সাধারণভাবে অপরাধের তিনটি মাত্রা রয়েছে:[৪২]

১। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরী'আতের মূলনীতি লঙ্ঘন;

২। অপরাধী পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হবে;

৩। অপরাধীর এ কাজ অপরাধরূপে গণ্য হবে।

১। শরী'আতের এ মূলনীতির তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ যে কাজই করবে, অপরাধ আইনের চোখে তা মুবাহ দোষমুক্ত কাজ। তবে যে কাজটি নিষিদ্ধ করে আইনের কোন ধারা উদ্ধৃত হয়েছে, কেবলমাত্র সে কাজটি করাই অপরাধ বলে গণ্য হবে। সে অপরাধের একটা শাস্তিও সুনির্দিষ্ট হতে হবে, যা সেই অপরাধকারীর উপর প্রয়োগ করা হবে।

---

৪০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ খারাশী, *শরহুল মুখতাসারুল জালিল লিল-খারাশী* (মিশর: বিলমাতবাআতিল কাবরি আল-আমিরিয়্যাহ, ১৩১৭হি.), খ. ৮, পৃ. ২৪০

৪১. ইমাম আলাউদ্দিন আল-হাসকাফী, *আদ-দুর্‌রুল মুখতার*, কিতাবুল জিনায়াত (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৬৯৭; আব্দুল কাদের 'আওদাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪; ইবন নুযাইম যইন উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম, *বাহরুর রায়েক শরহি কানযুদ দাকাইক* (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াত-তুরাসিল 'আরাবি, ১৪২২ হি.), খ. ৯, পৃ. ৩

৪২. *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৭-৮৯

২। ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতার মূলনীতি, এ পর্যায়ে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অপরাধকারীর সাথে অপরাধের সংশ্লিষ্টতা। অর্থাৎ আইন যে কাজটি অপরাধ বলে গণ্য করছে, সে কাজটি করলে তার সাথে সে কাজটির সম্পর্ক বিবেচনা ও প্রমাণ করা। কেননা এসম্পর্ক প্রমাণিত হলেই সে তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি পাওয়ার অধিকারী। ফৌজদারী অপরাধ কাজের দায়িত্বশীলতার প্রমাণের জন্য জরুরী হচ্ছে কাজটি ও অপরাধীর মধ্যকার সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ। শরী'আহ এবং প্রধান অপরাধ আইনসমূহে বস্তুগত সম্পর্কের পাশাপাশি তাৎপর্যগত সম্পর্কের ব্যাপারটিও বিবেচনা করার পক্ষপাতি। ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতা সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণের সমস্ত নির্দশন ইসলামি শরী'আতের আওতাধীন। তাই দৃষ্টিকোণটি সম্পূর্ণরূপে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র কুরআনের ঘোষণায় ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্বশীলতা ও শাস্তির ব্যাপারে ইচ্ছা, এখতিয়ার ও গুনাহের মূলনীতি বিধৃত। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى- وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى- وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى-

অর্থাৎ-"কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কাজের দায় বহন করবে না, মানুষ তাই পায় যা সে করে, মানুষকে অচিরেই তার কাজ দেখানো হবে।"[৪৩] এ আয়াতে মানুষের দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্র হচ্ছে যে মানুষ সুস্থ, স্বাধীন, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও ইচ্ছা ক্ষমতাসম্পন্ন। এরকম ব্যক্তির উপর ফৌজদারী অপরাধের দায়িত্ব চাপানো যেতে পারে; অন্যথায় নহে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে,

مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ- অর্থ: "যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর কুফরি করে, তবে কুফরিতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়; কিন্তু তার হৃদয় ঈমানে পরিতৃপ্ত অবিচলিত থাকে, তার কোন শাস্তি হবে না। কিন্তু যে কুফরির জন্য তার হৃদয় উন্মুক্ত করে রাখে তার উপর রয়েছে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি।"[৪৪]

একথা স্পষ্ট যে, অপরাধীকে পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিমান হতে হবে। কেননা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সুস্থ অনুভূতিসম্পন্ন নয়। তার ইচ্ছা ক্ষমতা আছে বলেও মনে করা যায় না। নাবালেগ ব্যক্তিও তারই মত। কেননা পূর্ণবয়স্কতা সেই বিবেক-বুদ্ধির ধারক, যা শরী'আহ পালনে বাধ্য হওয়ার জন্য জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, واذا بلغ الاطْفالُ مِنْكُمُ الحُلُم فلْيسْتأْذِنُوا كما اسْتأذن الَّذِيْن مِنْ قبْلِهِمْ– অর্থ: "আর তোমাদের সন্তানরা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তখন তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে, যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে পূর্ববর্তী লোকেরা (তাদের বয়স্করা)।"[৪৫] এজন্যই ইসলামে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, নিদ্রিত ব্যক্তি, পাগল এই তিন শ্রেণির লোকের অপরাধ ধরা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ الصبى **حتى يحتلم** والنائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق– অর্থাৎ

৪৩. আল-কুরআন, ৫৩: ৩৮-৪০
৪৪. আল-কুরআন, ১৬: ১০৬
৪৫. আল-কুরআন, ২৪: ৫৯

"তিন জনের অপরাধ ধরা হয় না। বালক- যতক্ষণ না পূর্ণবয়স্ক হয়, নিদ্রিত ব্যক্তি- যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং পাগল- যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।"[৪৬] আল্লামা আমদী বলেন, "বিবেকবান লোকেরা সম্পূর্ণ একমত যে, শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- তাকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে, শরীয়ত পালনের দায়িত্ব অনুভবকারী হতে হবে। অ-সচেতন বালক হয়ত তা বুঝে যা বুঝে সচেতন বালক কিন্তু তার বোধশক্তি সংকীর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ। শরীয়তদাতা পূর্ণবয়স্কতাকে তার বুঝ-সমঝে পূর্ণত্বের মানদণ্ড বানিয়েছেন।"[৪৭]

৩। মানুষ কার্যত অপরাধ করলেই তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। মনের চিন্তা বা কল্পনা গণনার যোগ্য নয়। ইসলামি আইনের মূল কথা, মানুষের মনে যা কিছুই উদয় হয়, সেজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না। অতএব, শুধু চিন্তা বা সংকল্প গ্রহণ করাতেই কেউ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না।[৪৮] সুতরাং অপরাধ সাব্যস্ত করতে এর সমর্থনে নস বিদ্যমান থাকতে হবে যা সংশ্লিষ্ট কাজ হারাম ঘোষণা করে এবং সে কাজে লিপ্ত হলে শাস্তি নির্ধারণ করে। এরপর যে নসটি সংশ্লিষ্ট কাজকে হারাম ঘোষণা করে, সে নসটি নিষিদ্ধ কাজ করার সময় আইনত বলবৎ থাকা। সর্বোপরি কাজটি যে করেছে তাকে অবশ্যই পূর্ণবয়স্ক ও পূর্ণসুস্থ হতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, অপরাধ হলো সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় আইন বিরোধী ঐ সমস্ত কর্মকাণ্ড, অস্বাভাবিক ও বিচ্যুত আচরণ, যা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্য রাষ্ট্রীয় আইনে অথবা ধর্মে শাস্তির বিধান থাকে।

অপরাধের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Crime)

অপরাধ পরিভাষার ন্যায় এর শ্রেণিবিন্যাসও জটিল ও বিস্তৃত একটি বিষয়। অপরাধ ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের যে পরিমাণ ক্ষতি করে তার উপর ভিত্তি করে আইনে অপরাধকে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে। এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাস প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী ক্ষতির আপেক্ষিকতার উপর নির্ভরশীল। অপরাধ, অপরাধের প্রকৃতি, অপরাধের কারণ, বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অপরাধের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে পুলিশ বিভাগ, আদালত, সংশোধনাগার ও অন্যান্য সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো অপরাধকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন রকম শ্রেণিবিন্যাস করে থাকে। অপরাধমূলক আচরণ ও কর্মকাণ্ডের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অপরাধসমূহ মূলত বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং এগুলো ভিন্ন ভিন্ন

---

৪৬. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল হুদুদ, বাবু ফীল মাজনুনি ইয়ুসরিকা আও ইউসিবু হাদ্দান (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯হি.), হাদীস নং- ৪৪০১

৪৭. ইমাম আলী ইবন মুহাম্মদ আমদী, *আল-আহকামু ফি উসূলিল আহকাম* (রিয়াদ: দারুল সামি'ঈ, ১৪২৫হি.), পৃ. ২১৫; মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ২৭

৪৮. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮-২৮

প্রকৃতির। তাই অপরাধের কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাগ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তারপরও সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর শ্রেণিবিভাগ করার চেষ্টা করেছেন। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় উদ্দেশ্যে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাসের চেষ্টা চলে আসছে বহুদিন থেকে। অপরাধ মানেই তা সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ এবং আইনগত দিকের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তবে এই লঙ্ঘনের মাত্রাগত ভিন্নতাও অপরাধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মার্কিন অপরাধবিজ্ঞানী Edwin H. Sutherland (1883-1950Ad.) and Donald R.Cressey (1919-1987 Ad.) অপরাধকে তাই বর্বরতা ও নৃশংসতার প্রেক্ষিতে দুই ভাগে ভাগ করেছেন:

(১) গুরুতর অপরাধ (Felonies): যে সমস্ত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ভয়াবহ প্রকৃতির এবং সমাজের উপর যাদের মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে সেগুলোকেই সাধারণত গুরুতর অপরাধ বা felonies -এর আওতাভুক্ত করা হয়। এধরনের অপরাধের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড বা রাষ্ট্রীয় কারাগারে প্রেরণ।

(২) সাধারণ বা লঘু অপরাধ (Misdemeanors): তুলনামূলকভাবে কম নৃশংস বা বর্বর আচরণ ও কর্মকাণ্ডসমূহকে সাধারণ অপরাধ তথা অপকর্ম বা misdemeanor হিসেবে ধরা হয়। এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হলো জরিমানা নির্ধারণ অথবা স্থানীয় কারাগারে প্রেরণ।[৪৯]

আইনের দৃষ্টিতে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস

অপরাধের ক্ষতিকর দিক, আইন ও শাস্তির ধরন ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে আইনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে অপরাধকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাসকে সনাতন শ্রেণিবিন্যাস বলা যেতে পারে। যথা- ১। রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধ (Treason) ২। মারাত্মক অপরাধ (Felonies) ৩। লঘু অপরাধ (Misdemeanors)।

নেদারল্যান্ডের অপরাধবিজ্ঞানী বঙ্গার (W. Adrian Bonger, 1876-1940) অপরাধীদের (Motive) উদ্দেশ্য বিচার করে অপরাধকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেন। যেমন,

(ক) অর্থনৈতিক অপরাধ (Economic Crimes)

(খ) যৌন অপরাধ (Sexual Crimes)

(গ) রাজনৈতিক অপরাধ (Political Crimes) ও

(ঘ) অন্যান্য অপরাধ (Miscellaneous Crimes)। [৫০]

পরিসংখ্যানগত সুবিধার দিক থেকে অপরাধকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

ক) ব্যক্তি সংক্রান্ত বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (Crime against person)

---

৪৯. Edwin H. Sutherland and Donald R.Cressey, *Principles of Criminology* (Chicago: University of Chicago Press,1985), p. 16

৫০. W. Adrian Bonger, *Criminality and Economic Conditions* (Boston: Little Brown and Company, 1916), pp.536-37; Harry Elmer Barnes and Negley K. Teeters, *ibid*, p.126

খ) সম্পত্তি সংক্রান্ত বা সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (Crime against property)

গ) ন্যায় বিচার, শৃঙ্খলা ও জনসার্থ বিরোধী অপরাধ (Crime against public decency, public order and public justice)।[৫১]

বঞ্চিত সমাজে প্রচলিত অপরাধপ্রবণতা প্রায় ক্ষেত্রে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও প্রতিকূল পরিবেশের ভূমিকা মুখ্য। এগুলো প্রত্যক্ষ কোন কারণ না হলেও এমন অবস্থা বা আবহ সৃষ্টি করে যার প্রেক্ষাপটে নিম্নশ্রেণি বা শ্রমজীবী শ্রেণির মানুষের ব্যক্তিত্বজনিত ত্রুটি বা আচরণগত সমস্যা দৃষ্টিগোচর হতে পারে। শৈশবে বস্তিবাসীদের গৃহে স্থান হয় না; দিন-রাতের বেশি সময় গৃহের বাইরে অবস্থান করে। মত্ত হয় এমন সব তথাকথিত বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে যা অনেকটা আচরণ বিচ্যুতির মধ্যে পড়ে। শৈশব থেকে তারা শিকার হয় অযত্ন, অবহেলা, বঞ্চনা ও শোষণের। এমতাবস্থায়, তাদের মনে স্থান লাভ করে অসুস্থ এক চেতনা যা সমাজে উপযুক্ত ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে এবং তাদের সঠিক পন্থায় গড়ে তুলতে বাঁধার সৃষ্টি করে। বিচ্যুত আচরণই হয় তাদের জীবনের মূলমন্ত্র। সামজিক মূল্যবোধ থেকে শিক্ষা নেয়ার সীমিত সুযোগের মধ্যে এমন এক সংস্কৃতির আবর্তে তারা লালিত হয় যেখানে তাদের জীবন বাঁধা থাকে বিচ্যুত আচরণের সংশ্লিষ্টতার সাথে। W.B Miller-এর মতে এই সংশ্লিষ্টতাগুলো হচ্ছে- Trouble, Toughness, Smartness, Excitement, Fate and Autonomy.

বঞ্চিত সমাজের পরিণত বা অপরিণত বয়সের মানুষের মূল্যবোধগত চেতনা স্বাভাবিক নিয়মেই মধ্যবিত্ত সমাজে লালিত বোধের ন্যায় নয়। মানবাচরণের এমন কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা বিনোদনমূলক কাজ রয়েছে যা অনেকটা গোধুলি লগ্নের ন্যায় অস্পষ্ট। এগুলোকে অপরাধ বলা হবে, না এরূপ কিছু কাজ স্বাভাবিক বলে মনে করা হবে- সে ব্যাপারে বক্তব্য অস্পষ্ট। বছরের কোন দিনে, উৎসবে, খেলা-ধুলায়, পান-অভ্যাসে সমাজের লোকজন অনেক কিছু সানন্দে গ্রহণ করে যদিও Ideal norm এর প্রকৃত বিচারে অনেক কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়। তাই পরিসংখ্যানের প্রয়োজনে যে তিন প্রকারের অপরাধের কথা বলা হয়েছে তার সাথে যুক্ত হতে পারে-

১। মান-সম্পন্ন আচরণ সংক্রান্ত (Offence against conduct standard);

২। মাদকাসক্তি (Narco-offence);

৩। যৌন অপরাধ ও অন্যান্য অসাদাচরণ (Sex offence and misbehaviour);

৪। জুয়া খেলা ও শ্বেত প্রতারণা (Gambling and white cheating)।[৫২]

---

৫১. Edwin H. Sutherland and Donald R.Cressey, *ibid,* p. 17

৫২. আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা : কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ৫৭

সমাজবিজ্ঞানী আব্দুল হাকিম সরকার 'অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সমাজবিজ্ঞানে অপরাধের আইনী শ্রেণিবিন্যাসের তেমন কোন মূল্য নেই। তাই সামাজিক স্তরভেদে অপরাধের তারতম্য হয়। খুব সাধারণভাবে বিবেচনা করলে এরূপ একটা অবস্থা চোখের সামনে ফুটে উঠে:

১। অপরাধের গুপ্ত সংঘবদ্ধ শক্তি (Underworld of criminality);

২। উচুঁ মহলে অপরাধের সংঘটিত শক্তি (Upper world of criminality);

৩। বঞ্চিত সমাজে অপরাধ প্রবণতা (Criminality at the lower society);

৪। সাধারণ অপরাধ উপ-সংস্কৃতি (Common Criminal Sub-culture)।[৫৩]

আলোচ্য শ্রেণিবিন্যাসের প্রত্যেকটি উদ্যোগ অপরাধের ধরনে সামাজিক স্বার্থ ক্ষুণ্নের দিকটি সক্রিয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরী অঙ্গরাজ্যের দণ্ডবিধিতে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাসকে একটি আদর্শ শ্রেণিবিন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে এগুলো উল্লেখ করা হলো-

১। সরকার ও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে অপরাধ;

২। বিচার ব্যবস্থা ও বিচার প্রশাসনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ;

৩। সরকারী অফিস, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কর্মরত ব্যক্তিদের অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ;

৪। ব্যক্তি জীবনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ;

৫। সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ;

৬। সরকারি রেকর্ড, মুদ্রা, যন্ত্রাংশ ও নিরাপত্তার প্রতি কৃত অপরাধ;

৭। গণ-শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরোধী অপরাধ;

৮। বিবিধ অপরাধ ও

৯। বিবিধ ধারা ও সংজ্ঞা।[৫৪]

আইনবিদ পাউন্ড (Nathan Rescoe Pound, 1870-1964 Ad.) অপরাধের শ্রেনিবিন্যাস করেছেন ও তাতে কিছু ভিন্ন ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তিনি নিম্নোক্তভাবে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস করেছেন:

১। ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (Crime against person); ২। সাধারণ নৈতিকতা বিরোধী অপরাধ (Crime against morality);

৩। গণনিরাপত্তা জনিত অপরাধ (Crime relating to public safety);

৪। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তাজনিত অপরাধ (Crime relating to the security of social institutions);

---

৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮

৫। সামাজিক সম্পদ ও সম্পত্তির নিরাপত্তার প্রতি অপরাধ (Crime relating to the security of social resources and private property)।[৫৫]

অপরাধের শ্রেণি বিভাগসমূহে উল্লেখিত এ সমস্ত অপরাধ ছাড়াও আরো দুই ধরনের বিশেষ অপরাধ রয়েছে যেগুলো যথাক্রমে "Victimless Crime" এবং "White Collar Crime" হিসেবে পরিচিত। "Victimless Crime" -এর আওতায় রয়েছে মাদকাসক্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া ইত্যাদি। এ ধরনের অপরাধ সরাসরি অন্য মানুষকে প্রভাবিত করে না। অন্যদিকে রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রশাসনিক উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি, চোরাচালান, ঘুষ, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অপরাধসমূহ "White Collar Crime" হিসেবে বিবেচিত হয়।[৫৬]

লর্ড ম্যাকেলের শ্রেণিবিন্যাস ও বাংলাদেশের দণ্ডবিধি

লর্ড থমাস ব্যাবিংটন ম্যাকেলের(১৮০০-১৮৫৯খ্রি.) নেতৃত্বে ১৮৩৭ সালে তৎকালীন ভারতে এক আইন কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনের অন্যান্য সদস্য ছিলেন ম্যাকলিওড, এন্ডারসন ও মিলার। ১৮৩৭ সনে গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের নিকট আইন কমিশন দণ্ডবিধির খসড়া দাখিল করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নেস পিকক এবং অন্যান্য একাধিক বিচারপতি আইন কমিশনের দাখিলকৃত খসড়াটি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ১৮৬০ সালে খসড়া দণ্ডবিধি লেজিসল্যাটিভ কাউন্সিলে পাশ হয়। ইন্ডিয়ান প্যানালকোড নামে ১৮৬২ সালের ১ জানুয়ারী থেকে দণ্ডবিধি ভারতে বলবৎ করা হয়।[৫৭] লর্ড ম্যাকেল আইনবিদ ছিলেন না, ছিলেন সাহিত্যিক। আইনবিদ না হয়েও তার প্রণীত ভারতীয় দণ্ডবিধি সারা বিশ্বে অনবদ্য সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। উল্লেখ্য, আজ অবধি এই দণ্ডবিধি প্রায় অবিকল অবস্থায় ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা এবং মায়ানমারে বলবৎ রয়েছে। দণ্ডবিধিতে সংবিধিবদ্ধ করার জন্য লর্ড ম্যাকেল অপরাধের যে ধরনের শ্রেণিবিন্যাস করেন নিচে তাই উল্লেখ করা হলো-

১। রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ;

২। সামরিক চাকুরী সংক্রান্ত অপরাধ;

৩। গণশান্তি পরিপন্থী সংক্রান্ত অপরাধ;

৪। বেসামরিক সরকারী কর্মচারী সংক্রান্ত ও নির্বাচন সংক্রান্ত অপরাধ;

৫। সরকারী কর্মচারীদের আইনানুগ কর্তৃত্ব অবমাননা সংক্রান্ত অপরাধ;

৬। বিচার ও প্রশাসন সংক্রান্ত অপরাধ;

৭। মুদ্রা ও সরকারী স্ট্যাম্প সংক্রান্ত অপরাধ;

---

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

৫৬. মোঃ নুরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮

৫৭. বি. দ্র: Universal's Guide to Judicial Service Examination (New Delhi: Universal Law Publishing Co, 2011), p. 2

৮। গণ-নিরাপত্তা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত অপরাধ;

৯। ধর্ম সংক্রান্ত অপরাধ;

১০। জীবন ক্ষুণ্নকারী অপরাধ;

১১। সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ;

১২। বিবিধ অপরাধ;

১৩। বিবিধ ধারা ও সংজ্ঞাসমূহ।[৫৮]

পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে অপরাধকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেকর্ড রাখা হয়। ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (FBI) এবং পুলিশ বিভাগে উল্লিখিত দুই শ্রেণিতে অপরাধকে বিভক্ত করে পরিসংখ্যান রাখা হয়। প্রথম শ্রেণির অপরাধের মধ্যে প্রধান ৭টি অপরাধ অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১৫টি অপরাধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পুলিশ বিভাগে অপরাধ রেজিস্ট্রারকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে অপরাধগুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রথম খন্ড: ১। অপরাধজনক নরহত্যা;

(ক) খুন এবং খুন নয় এমন হত্যা;

(খ) অবহেলাজনিত হত্যা;

২। ধর্ষণ;

৩। দস্যুতা ও ডাকাতি;

৪। মারাত্মক আক্রমণ ও গুরুতর আঘাত;

৫। সিঁদেল চুরি;

৬। চুরি;

(ক) ৫০ ডলারের অধিক চুরি;

(খ) ৫০ ডলারের কম মূল্যমানের মালামাল চুরি;

৭। মোটর সাইকেল বা মোটরগাড়ি চুরি।

দ্বিতীয় খণ্ড:

(১) সামান্য আক্রমণ বা আঘাত;

(২) জালিয়াতি ও মুদ্রা নকল;

(৩) প্রতারণা;

(৪) চোরাই মাল গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয় বা অধিকারে রাখা;

৫৮. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০

(৫) অবৈধ অস্ত্র গ্রহণ বা অধিকারে রাখা;

(৬) বেশ্যাবৃত্তি বা বেশ্যাখানা পরিচালনা;

(৭) যৌন অপরাধ;

(৮) পরিবার ও শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ;

(৯) মাদক আইন ভঙ্গ;

(১০) মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো;

(১১) উচ্ছৃঙ্খল আচরণ,

(১২) জুয়া খেলা;

(১৩) ট্রাফিক আইন ভঙ্গ;

(১৪) সন্দেহজনক গ্রেফতার

(১৫) অন্যান্য অপরাধ।[৫৯]

বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগে পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পুলিশ স্টেশন, সার্কেল এএসপি অফিস ও পুলিশ সুপারের অফিসে অপরাধের পরিসংখ্যান রাখার ব্যবস্থা আছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের সময় এ সমস্ত পরিসংখ্যান হতে তথ্য নেওয়া হয়। পুলিশ বিভাগে সাধারণত অপরাধকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে রেজিস্ট্রারভুক্ত করা হয়। এই দুই শ্রেণির অপরাধ হলো জঘন্য অপরাধ এবং জঘন্য নয় এমন অপরাধ।

(ক) জঘন্য অপরাধ (Henious Crime)

(১) ডাকাতি;

(২) খুন;

(৩) অন্যান্য নরহত্যা;

(৪) ধর্ষণ;

(৫) দস্যুতা;

(৬) সিঁদেল চুরি;

(৭) এসিড নিক্ষেপ;

(৮) মুদ্রা নকল ও স্ট্যাম্প জালিয়াতি;

(৯) টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বৈদ্যুতিক তার চুরি;

(১০) গবাদি পশু চুরি;

---

৫৯. বি.এল. দাস, *অপরাধ বিজ্ঞান* (ঢাকা/ চট্টগ্রাম: কামরুল বুক হাউস, ২০০১খ্রি.), পৃ. ১৪৬-১৪৭

(১১) মারাত্মক জখম;

(১২) অবৈধ অস্ত্র গ্রহণ বা অধিকারে রাখা;

(১৩) যৌন অপরাধ।

(খ) জঘন্য নয় এমন অপরাধ

(১) চুরি;

(২) দাঙ্গা-হাঙ্গামা;

(৩) প্রতারণা;

(৪) মাদক আইন ভঙ্গ;

(৫) জুয়া খেলা;

(৬) ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন;

(৭) গণ উপদ্রব;

(৮) উচ্ছৃঙ্খল আচরণ;

(৯) চোরাই মাল গ্রহণ ও ক্রয়-বিক্রয়;

(১০) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় গ্রেফতার;

(১১) বিবিধ অপরাধ।[৬০]

এছাড়া অপরাধবিজ্ঞানীগণ অপরাধের পাশাপাশি অপরাধীরও শ্রেণিবিন্যাস করেছেন। অপরাধবিজ্ঞানী বার্নস ও টিটমাসের মতে, অপরাধীকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

ক) ভদ্রবেশী অপরাধী;
খ) প্রতারণা ও আত্মসাৎকারী অপরাধী এবং
গ) নাশকতামূলক রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত অপরাধী।[৬১]

অপরাধবিজ্ঞানের জনক (Lombroso) লম্ব্রসো অপরাধীর শ্রেণিবিভাগ করতে গিয়ে অপরাধীদের জৈবিক বা দৈহিক কারণকে বিবেচনায় এনেছেন। তার মতে, অপরাধীর শেণিবিভাগ নিম্নরূপ:[৬২]

(ক) সাময়িক বা অনিয়মিত অপরাধী (Occassional Criminal)ঃ সাময়িক বা অনিয়মিত অপরাধীদের মাঝে আবার বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

---

৬০. বি.এল. দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮
৬১. বোরহান উদ্দীন খান ও মনজুর কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭২
৬২. মোঃ নুরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬-২৭৭

১. কল্পনাপ্রবণ অপরাধী: কল্পনার বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক সময় অপরাধ করে। এ ধরনের অপরাধীরা এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অপরাধ করে যখন তার উদ্দেশ্য থাকে তার আত্মসম্মান বা মান-মর্যাদা রক্ষা করা।

২. অভ্যাসগত অপরাধী: অভ্যাসগত অপরাধীদের বেলায় জন্মগত কোন অস্বাভাবিক জৈবিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। সেক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ও ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণের ফলেই তাদের আচরণে মাঝে মাঝে ভারসাম্যহীনতা পরিদৃষ্ট হয়।

৩. পরিবেশ নির্ভর অপরাধী: বিশেষ পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও অবস্থার কারণেই এ ধরনের অপরাধীরা অপরাধমূলক আচরণ ও কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

(খ) আবেগপ্রবণ অপরাধী (Emotional Criminal): অনেক সময় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে এমন ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা দেখা যায় যারা মানসিক চাপের শিকার অথবা যাদের অনেক আবেগ ও ব্যাকুলতা অবদমিত অবস্থায় থাকে। এমতাবস্থায় তারা তাদের মানসিক চাপ অথবা অবদমিত আবেগ হতে নিজেদেরকে মুক্ত করতে অপরাধমূলক আচরণের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

গ) জন্মগত অপরাধী (Born Criminal): জন্মগত অপরাধীরা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অনগ্রসর এবং এদের সাথে আদিম মানবের দৈহিক গঠনের কিছুটা মিল রয়েছে। Lombroso -এর মতে যাদের মধ্যে আদিম মানবের প্রভাব লক্ষণীয় তারাই জন্মগত অপরাধী।

ঘ) নৈতিক উন্মাদ বা বিচার বুদ্ধিহীন অপরাধী (Masked Epiletic Criminal): মূর্খ, দুর্বল, অবসাদগ্রস্ত রোগী, মৃগীরোগী, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি, মূর্ছা রোগী ইত্যাদি ব্যক্তিরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এবং এরাই বিচার বুদ্ধিহীন উন্মত্ত অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত।

ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস

অপরাধের প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস উল্লেখের পর বক্ষ্যমান অংশে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাসের ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তাবিদদের ধ্যান-ধারণা বিশ্লেষণ করা হবে। মুসলিম আইন বিজ্ঞানীরা অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস করতে গিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে অপরাধকে শ্রেণিভুক্ত করেছেন। তাঁরা শাস্তির মাত্রা বিবেচনায় অপরাধকে নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন।[৬৩] যথা-

১। হদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধ

যেসব অপরাধের জন্য হদ্দ বা নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ হদ্দ এর আওতাভুক্ত অপরাধের শাস্তির পরিমাণ ও ধরন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। শরী'আহ দাতা এই হদ্দকে আবশ্যিক বা ফরযরূপে ধার্য করেছেন। শরী'আহ কর্তৃক এই হদ্দ নির্ধারিত হয়েছে। আর হদ্দযোগ্য অপরাধ সাতটি। যথা: (১) যিনা বা ব্যভিচার, (২) যিনার মিথ্যা দোষারোপ বা অপবাদ, (৩) মদ্যপান, (৪) চুরি, (৫) ডাকাতি, (৬) ধর্মত্যাগের অপরাধ ও (৭) বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহীতা অপরাধ।[৬৪] এ অপরাধের শাস্তি রহিত করা যায় না। এমনকি কাযী বা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কেউই এ অপরাধ মাফ করতে পারে না। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারের শাস্তি উল্লেখ করে বলেন,

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ – وَلَاتَأْخُذْ كُمْ بِهِمَا رَافَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ – وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْ مِنِيْنَ–

অর্থাৎ-ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ –তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে। আল্লাহর বিধান কার্যকর করায় তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[৬৫]

২। কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ

কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ মূলত হত্যা পর্যায়ের অপরাধ। অর্থাৎ যেসব অপরাধের শাস্তি হিসেবে কিসাস (মৃত্যুদণ্ড বা অঙ্গহানি) অথবা দিয়াত (রক্তপণ) নির্ধারণ করা হয়েছে সেসব অপরাধকেই কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই পর্যায়ের অপরাধের দণ্ডও শরী'আহ দাতা কর্তৃক সুনির্ধারিত। যেমন, কতলে আমদ (قتل عمد), কতলে শিবহি আমদ (قتل شبه عمد), কতলে খাতা (قتل خطا) এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি সাধনের অপরাধসমূহ কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধ। তবে এই কিসাস সুনির্ধারিত শাস্তি হদ্দ থেকে কয়েকটি দিক দিয়ে ভিন্ন প্রকৃতির।

---

৬৩. *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৮৯; গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬
৬৪. আব্দুল কাদের 'আওদাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৬৩৪-৩৫
৬৫. আল-কুরআন, ২৪: ২

প্রথমতঃ হদ্দ পর্যায়ের অপরাধের জন্য যদি প্রশাসনে মামলা দায়ের হয়ে থাকে তাহলে ‘হদ্দ’ ক্ষমার অযোগ্য শাস্তি। কেননা এ শাস্তিটা আল্লাহর হকরূপে গণ্য। আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর ইবনিল ‘আস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, تَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ– অর্থাৎ- যতক্ষণপর্যন্ত ‘হদ্দ’ পর্যায়ের কোন অপরাধ তোমাদের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তোমরা পরস্পরে মিলে মাফ করে দিতে পার। আর যদি আমার নিকট ‘হদ্দ’ পর্যায়ের অপরাধ পেশ করা হয়ে গেলে তা অবশ্যই কার্যকর হবে।[৬৬] কিন্তু কিসাস-তা হত্যার অপরাধের দরুন হোক বা তার চাইতে কম মানের অপরাধে হোক, তা যার উপর সংঘটিত হয়েছে তার ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার আছে, অথবা তার অভিভাবকও ক্ষমা করতে পারে। কেননা তা মূলত তারই হক।

দ্বিতীয়তঃ হদ্দসমূহে সে অপরাধের মামলা দায়ের হওয়ার পর সুপারিশ করা জায়েজ নয়। তবে কোন শরী‘আহ বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, ‘কযফ’ বা যিনার মিথ্যা দোষারোপে তা করা যেতে পারে। প্রথম কথাটির দলীল হচ্ছে,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا–

অর্থাৎ-হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, মাখযুমী সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলার ব্যাপরে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। যে কিনা চুরি করেছিল। সহাবাগণ বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে কে কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রিয় পাত্র উসামা (রা.) ছাড়া কেহ এ সাহস পাবে না। তখন উসামা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সঙ্গে কথা বললেন। এতে তিনি বললেন, হে উসামা! আল্লাহ তা‘আলার দেওয়া নির্ধারিত শাস্তি বিধানের (হদ্দে) ক্ষেত্রে তুমি সুপারিশ করতে এসেছো? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা কোন সম্মানিত লোক যখন চুরি করত তখন তারা তাকে রেহাই দিয়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তার উপর শরী‘আতের শাস্তি প্রয়োগ করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মদ (সা.) এর কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে তবে অবশ্যই মুহাম্মদ (সা.) তাঁর হাত কেটে দিবে।[৬৭] এই হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হদ্দ সংক্রান্ত শাস্তির বিধানে কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি বা ফয়সালার ভার মানুষ তথা কাযী বা

৬৬. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবু হুদুদ, বাবঃ আল আফুউ আনিল হুদুদি মা লাম তাবলগিস সুলতান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৩৭৬

৬৭. ইমাম আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল হদ্দ, বাবঃ কারাহিয়্যাতিশ শাফা‘আতে ফিল হাদ্দে ইযা রুফেয়া ইলা সুলতান (আল কাহেরাঃ মাকতাবাতুস সাফা, ১৪২৩হি.), হাদীস নং-৬৭৮৮; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল হুদুদ, বাবঃ কাত‘উস সারিকিশ শারিফে ওয়া গাইরিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৮৮

বিচারকের উপর রাখেননি। বরং এটা আল্লাহর পক্ষ হতে সুনির্ধারিত। অবশ্য কিসাস পর্যায়ের অপরাধে সুপারিশ জায়েজ। কেননা তা মানুষের অধিকারের পর্যায়।

তৃতীয়তঃ হদ্দ কার্যকর করা রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের দায়িত্ব। মুসলিম ইবনে ইয়াসার বর্ণনা করেছেন, সাহাবীদের একজন বললেন, যাকাত, হদ্দসমূহ, ফাই এবং জুমু'আর নামায প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রশাসকের দায়িত্বভুক্ত। ইমাম তাহাভী এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, কোন সাহাবী এর বিপরীত মত দিয়েছেন বলে আমরা জানি না। পক্ষান্তরে কোন কোন শরী'আহ বিশেষজ্ঞের মতে, কিসাস তো যার উপর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাকে অথবা তার অভিভাবককেই তা কার্যকর করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই জন্য তা ক্ষমা করা বা দীয়াতের বিনিময়ে ক্ষমা করতে রাযী হওয়ার অধিকার তার রয়েছে।

চতুর্থতঃ হদ্দসমূহে বিনিময় গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কেননা তা আল্লাহর হক। এটা কার্যকর করার ব্যাপারে পারস্পরিক সম্মতি-অসম্মতির কোন অবকাশ নাই। অপরদিকে কিসাস বান্দার হক হওয়ার কারণে পারস্পরিক সম্মতি বা বিনিময় গ্রহণ করে ক্ষমা করা বৈধ।

৩। তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ

শরী'আহ যে সব অপরধের শাস্তি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেনি, তাই এই পর্যায়ের অপরাধ। অর্থাৎ যেসব অপরাধের জন্য তা'যীরমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেসকল অপরাধই তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ। হদ্দ, কিসাস ও দিয়াতের আওতাভুক্ত অপরাধসমূহ ব্যতীত অন্যসব অপরাধ তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধ। তা'যীরের আওতাভুক্ত অপরাধের শাস্তি শরী'আতে নির্ধারণ করা হয়নি বরং শাস্তি নির্ধারণের বিষয়টি সরকার বা তার প্রতিনিধির তথা কাযীর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার অথবা বিচারক অপরাধীর শাস্তি নির্ধারণ করে দিবেন। তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পক্ষ অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলে সরকার বা বিচারক অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন না।[৬৮]

ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের দৃষ্টিকোণ হতে অপরাধ দু'প্রকার-

১। ইচ্ছাকৃত অপরাধ

যে সব অপরাধের মধ্যে অপরাধীর অপরাধপ্রবণতা বিদ্যমান রয়েছে অর্থাৎ অপরাধী ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ বা নিষেধ লঙ্ঘন করায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সে সব অপরাধকে ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলে। ইচ্ছাকৃত অপরাধের শাস্তির পরিমাণ কঠিনতর তবে এক্ষেত্রে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া যায় না।

৬৮. *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৯০

২। অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাবর্হিভূত অপরাধ

যে সব অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীর মধ্যে অপরাধের প্রবণতা বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ অপরাধী ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ বা নিষেধ লঙ্ঘন করেনি বরং ভুলবশতঃ অপরাধী কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, সে সব অপরাধকে অনিচ্ছাকৃত অপরাধ বলে। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের শাস্তির পরিমাণ হালকা, শুধুমাত্র অসাবধানতা ও অসতর্কতার দরুন শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।[৬৯]

ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক থেকেও অপরাধ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত-

১। ইতিবাচক অপরাধ

ইসলামি শরী'আহ অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ করা নিষিদ্ধ, সে সমস্ত কাজে লিপ্ত হলে তাকে ইতিবাচক অপরাধ বলা হয়। যেমন, চুরি, শরাব পান ইত্যাদি।

২। নেতিবাচক অপরাধ

ইসলামি শরী'আতে যে সমস্ত কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে সকল কাজ না করাকে নেতিবাচক অপরাধ বলা হয়। ইতিবাচক অপরাধ নেতিবাচক উপায়েও সংঘটিত হতে পারে এবং এর জন্য অপরাধী শাস্তি ভোগ করবে।[৭০]

ফকীহগণ সামগ্রিকভাবে অপরাধকে তিনভাগে বিভক্ত করেন

১। মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ (الجناية علي النفس)

২। মানব দেহের বিরুদ্ধে অপরাধ (الجناية علي مادون النفس)

৩। মানব সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ (الجناية علي ما هو نفس من وجه دون وجه)[৭১]

১। মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ

হত্যাকে মানব জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। হত্যা বলতে কোন কিছুর আঘাতে, অস্ত্রের সাহায্যে, বিষ প্রয়োগে বা অন্য কোন উপায়ে মানুষের প্রাণনাশ করাকে বোঝায়। হত্যাই সর্বাধিক মারাত্মক অপরাধ। একজন মানুষের জীবন বাঁচানো যেমন গোটা মানব জাতির জীবন বাঁচানোর সমতুল্য; তেমনি একজন মানুষের জীবন সংহার করাও গোটা মানব জাতির জীবন সংহারের তুল্য। এজন্যই ইসলামে হত্যা জঘন্যতম অপরাধ। মহান আল্লাহ সূরা মায়িদাতে মানব হত্যার ভয়াবহতা উল্লেখ করেন, مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ-অর্থাৎ-"এ কারণেই আমি বণী ইসরাঈল জাতির জন্য এ বিধান দিলাম যে, কেউ কাউকে হত্যা করলে তার শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া অথবা কেউ দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়

৬৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
৭০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০
৭১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

সৃষ্টি করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছাড়া কেউ যদি কাউকেও (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে তাহলে সে যেন সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ যদি কারো জীবন রক্ষা করে সে যেন সমস্ত মানুষের জীবনই রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এরপরও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবেই থেকে গেল।"[৭২]

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا-অর্থাৎ "কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ হত্যাকারীর উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন, তাকে অভিশাপ দেবেন এবং তার জন্য ভয়াবহ শাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।"[৭৩] তাই মহান আল্লাহ মানব হত্যা থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا-অর্থাৎ-"তোমরা একে অন্যকে হত্যা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি অসীম দয়ালু।"[৭৪]

ভুলক্রমে বা অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিধান উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا-

অর্থাৎ-"কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়। তবে ভুলক্রমে হত্যা করা হলে তার কথা আলাদা। যে মুমিন কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা করে সে মুমিন একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে এবং নিহতের স্বজনরা যদি ক্ষমা না করে তাহলে তাদেরকে রক্তপণ প্রদান করবে। যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় ও মুমিন হয় তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। নিহত ব্যক্তি যদি এমন গোত্রের লোক হয়, যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে তার স্বজনকে রক্তপণ দেবে ও একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। যে হত্যাকারীর রক্তপণ দেওয়া ও মুমিন দাস মুক্ত করার সাধ্য নেই সে বিরতিহীনভাবে দু'মাস সাওম পালন করবে। এ বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে তওবা হিসেবে নির্ধারিত। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী।"[৭৫]

২। মানব দেহের বিরুদ্ধে অপরাধ

মানব প্রাণের সংহার না করে মানবদেহে যে কোন ধরনের আঘাতকে মানব দেহেরে বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। যখন কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির দৈহিক যন্ত্রণা, ক্ষতি, অসুখ, বৈকল্য বা জখম ঘটায় অথবা কোন

৭২. আল-কুরআন, ৫: ৩২
৭৩. আল-কুরআন, ৪: ৯৩
৭৪. আল-কুরআন, ৪: ২৯
৭৫. আল-কুরআন, ৪: ৯২

ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটিয়ে তার দেহের কোন অঙ্গ বা তার বিশেষ অংশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তখন ঐ ব্যক্তি আঘাত করেছে বলে গণ্য হবে। দেহের বিরুদ্ধে অপরাধকে আবার কয়েকভাগে ভাগ করা হয়। (১) ইতলাফে উদবু (অঙ্গহানি) (২) ইতলাফে সালাহিয়্যাতি উদবু (অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া) (৩) শিজাজ (মুখমণ্ডলে আঘাত করা বা মাথা ফাটানো) (৪) জুরহ (আহত করা)।[৭৬]

৩। মানব সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ

যে সব অপরাধের ক্ষতি ব্যক্তি পর্যায় ছাড়িয়ে মানব সমাজের উপর অর্পিত হয় সে সব অপরাধকে মানব সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। এগুলো হলো চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটি অপরাধের শাস্তির পরিমাণ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। এছাড়া মদ্যপানের শাস্তি হাদীস ও সাহাবা কেরামের ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি মানব সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধের আওতাভুক্ত।

অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনান্তে একথা বলা যায় যে, অপরাধের সর্বজন স্বীকৃত কোন শ্রেণিবিন্যাস নেই। প্রত্যেক দেশ বা সমাজ ভিন্নভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস করে থাকে। অপরাধের আইনী শ্রেণিবিন্যাস, সংবিধিবদ্ধ শ্রেণিবিন্যাস বা পরিসংখ্যানগত শ্রেণিবিন্যাস প্রত্যেকটিতেই জটিলতা রয়েছে। জটিলতা দূর করার জন্য আইনবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা অদ্যাবধি প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের গুরুত্ব অপরাধ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে নেই বললেই চলে। স্যার টমাস স্টিফেন অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেন, এ ধরনের বিভ্রান্তিকর শ্রেণিবিন্যাস থাকার চেয়ে না থাকাই উত্তম। ব্যক্তি বা সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী বা আবেগ অনুভূতি ইত্যাদির ভিত্তিতে অপরাধকে শ্রেণিবিন্যাস করার চেষ্টা হয়েছিল অনেক আগেই। এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাসের ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর কোন মূল্য নেই, একথা সর্বজনবিদিত। আইনকে সংবিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অপরাধের শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, যৌক্তিক ভিত্তিতে অপরাধসমূহকে শ্রেণিবিন্যাস করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু অপরাধ বিজ্ঞানীদের নিকট এ প্রকার শ্রেণিবিন্যাসেরও খুব বেশি গুরুত্ব নেই। রাষ্ট্রীয় কার্যে অপরাধের পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সারা দেশের অপরাধ পরিস্থিতি জানা সম্ভব অপরাধের পরিসংখ্যান হতে। সরকারী নীতি নির্ধারণ, অপরাধ দমন ও নিবারণ এবং আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নের সম্ভাব্য পরিকল্পনা প্রণয়নে অপরাধের পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া হয়। সরকার ও পুলিশ বিভাগের প্রশাসনিক প্রয়োজনে অপরাধের পরিসংখ্যানগত শ্রেণিবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।[৭৭]

---

৭৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৭৭. বি.এল. দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮-১৪৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিশোর অপরাধ পরিচিতি

কিশোর অপরাধ একটি সামাজিক সমস্যা। সকল সমাজেই এর অনিবার্য উপস্থিতি রয়েছে। তবে প্রকৃতি ও মাত্রাগত দিক থেকে তা ভিন্ন এবং বিচিত্র। প্রতিটি শিশুই ফিতরাত তথা স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে।[৭৮] তার পিতা-মাতা ও আর্থসামাজিক পরিবেশ তাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। এতে অনেক সময় শিশু-কিশোর মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত হয়। ফলে একটি নিষ্পাপ শিশু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভিন্ন একটি পরিচয় ও স্বভাবে গড়ে উঠে, যে পরিচয় ও স্বভাব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাম্য নয়। বর্তমান আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় যাকে বিচ্যুত বা অপরাধী কিশোর হিসেবে চিহ্নিত করে থাকে। বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান হারে কিশোর অপরাধ যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ফলে এটি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হতে পারে। যা একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এ বিষয়টি উল্লেখ করে Mohammad Afsar Uddin বলেন, Juvenile delinquency is a problem thar persists in our society; and also all over the world to a perceptible degree. The problem has been given so much added emphasis in recent years that some are included to believe that a variable epidemic of delinquent behavior among juvenile has engulfed the whole society.[৭৯]

---

৭৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হতে এ মর্মে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ–

অর্থ: "প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে। যেমন চতুষ্পদ যন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ?" (ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাযিয, বাব: মা কিইলা ফি আওলাদিল মুশরিকিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৮৫; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল কাদার, বাব: মা'আনা কুল্লি মাওলুদি ইউলাদু আলাল ফিতরাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৫৮)। ইমাম আবূ দাউদ এ প্রসঙ্গে অনুরূপ এক হাদীস উল্লেখ করেন। মহানবী (স) বলেন, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ كَمَا تَنَاتَجُ الْإِبِلُ مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ مِنْ جَدْعَاءَ– অর্থ: "প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, নাসারা রূপে রূপান্তরিত করে। যেভাবে উট পূর্ণাঙ্গ পশশুই জন্ম দেয়, তাতে তোমরা কোন কাটা দেখ কি?" (ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, আওয়ালু কিতাবিস সুন্নাতি, বাব: ফি যারারিল মুশরিকিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৭১৪, ৪৭১৬)। সুতরাং হাদীসের ভাষ্য হতে স্পষ্টত দেখা যায় যে, শিশু সন্তানের পিতা-মাতা ও আর্থসামাজিক পরিবেশ তাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়। ফলে শিশু-কিশোররা মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়ে অপরাধ প্রবণতার দিকে ধাবিত হয়। বর্তমান বিশ্বে ক্রমবর্ধমান হারে কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে এটি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে পরিণত হতে পারে। যা সমাজ বা রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ইসলাম আল্লাহ মনোনীত মানব কল্যাণকর একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামে কিশোর অপরাধের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। আর পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ– অর্থ: "অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং আল্লাহ যে সৎপ্রকৃতি অনুসারে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর দেয়া সে প্রকৃতির অনুসরণ করুন। বস্তুত আল্লহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না" (আল-কুরআন, ৩০: ৩০)।

৭৯. Mohammad Afsar Uddin, *Juvenile delinduency in Bangladesh* (Dhaka: University of Dhaka,1993), p.7

শিশু-কিশোরদের উন্নতি ও অগ্রগতির উপর নির্ভর করে দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি। তাই শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের একটি অংশ কোন কারণে অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য চরম হুমকি ও সুস্থ সমাজ জীবনের প্রতিবন্ধক হোক তা কারো কাম্য নয়। নিম্নে কিশোর অপরাধের পরিচয় তুলে ধরা হলো-

কিশোর অপরাধ পরিভাষার উৎপত্তি

কিশোর অপরাধ একটি বৃহদাঙ্গিক পরিভাষা (Umbrella Term)। এর আওতাধীনে আসে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য কার্যকলাপ।[৮০] মূলতঃ এটি একটি অস্পষ্ট পরিভাষা (vague term), কেননা স্থান-কাল-পাত্র ভেদেই কোন কাজকে কিশোর অপরাধ হিসেবে ধরা হয় অথবা হয় না। যদিও সাধারণভাবে কিশোর বয়সীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধমূলক কাজকেই কিশোর অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; কিন্তু এ ধারণাটিও কিশোর অপরাধকে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে না। কেননা সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে যেমন অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে তেমনি ঠিক কোন বয়সে ছেলে বা মেয়েকে কিশোর বা কিশোরী হিসেবে ধরা হবে তার ক্ষেত্রেও সমাজ ও দেশ ভেদে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[৮১] এ প্রসঙ্গে কিশোর অপরাধ বিশ্লেষক Mohammad Afsar Uddin বলেন, "The concept of juvenile delinquency has been vaguly and imprecisely defined in many countries; a clear definition would be most useful in the formulation of workable programmes for the prevention of juvenile delinquency. In finding out a workable definition, it should be remarked that juvenile delinquency is not a mere legislative concept as it is sometimes taken to be.[৮২]

কিন্তু তাই বলে কিশোর অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা যে থেমে আছে তা নয়; বরং বিভিন্ন সমাজচিন্তাবীদ, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, অপরাধবিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এই কিশোর অপরাধকে সংজ্ঞায়নের বহু চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শাস্তির ক্ষেত্রে কিশোর এবং বয়স্কদের অপরাধের মধ্যে পার্থক্য করার প্রচলন ছিল না। তখন পর্যন্ত একই আদালতে বয়স্ক এবং কিশোর উভয় কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিচার এবং একই ধরনের শাস্তি প্রদান করা হত। এতে ফল হয়েছিল মারাত্মক। কেননা, কিশোররা কারাগারে অপরাধীদের সংস্পর্শে এসে আরো বেশি আক্রমণাত্মক এবং অপরাধমূলক আচরণে অভ্যস্ত

---

৮০. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১
৮১. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭
৮২. Mohammad Afsar Uddin, *ibid,* p.4

হয়ে উঠত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এ বিষয়টি অনেকের দৃষ্টিতে আসে এবং কিশোর ও বয়স্ক অপরাধীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ এবং তাদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থায়, ভিন্ন আদালতে বিচারের সুপারিশ আসতে থাকে।

শিল্প বিপ্লবের পরবর্তী কালে কিশোর এবং বয়স্ক অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পায়ন ও নগরায়নের ফলে সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি নানাবিধ সমস্যাও দেখা দেয়, যার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি অন্যতম। এ সময় অপরাধ, অপরাধ দমন এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানব দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতিতে কিশোর অপরাধের বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।[৮৩]

১৪৮৪ সালে উইলিয়াম কক্সসন সর্বপ্রথম 'Delinquent' পরিভাষাটিকে দোষী ব্যক্তির প্রচলিত অপরাধ বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও ১৬০৫ সালে ইংরেজ কবি সেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক Macbeth এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[৮৪] রোমানরা কোন ব্যক্তির উপর আরোপিত কর্ম অথবা কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা বুঝাতে 'Delinquent' শব্দটি ব্যবহার করত বলে জানা যায়।[৮৫]

কিশোর অপরাধ পরিচিতি

অপরাধের সাথে বয়সের সম্পর্কটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সমাজবিরোধী বা আইনবিরোধী যে কোন কাজই অপরাধ বলে বিবেচিত হলেও সব বয়সের বেলায়ই ঐ ধরনের কাজকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় না। অর্থাৎ বয়স ভেদে অপরাধমূলক কর্মটি বিচার্য।[৮৬] একজন ব্যক্তির জীবনে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয় যখন তার কোন কাজই অপরাধ বলে বিবেচনা করা যায় না। এই সময়কালটি কত বছর বয়স পর্যন্ত ধরা হবে তা নির্ভর করে কোন দেশের অপরাধ আইনের উপর। যেমন, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৮২ ধারায় ও শিশু আইন ২০১৩ -তে বলা হয়েছে যে, ৯ বছরের নিচে কোন শিশুর কোন কাজকেই অপরাধ বলে বিবেচনা করা যাবে না।[৮৭] আবার একই আইনের ৮৩ ধারাতে উল্লেখ আছে যে, ৯ বছরের উর্ধ্বে এবং ১২ বছরের নিচে যে কোন শিশু বা কিশোরের কাজকেও অপরাধ বলে বিবেচনা করা হবে না; যদি না সে বিশেষ কোন সময় বা পরিস্থিতিতে তার কৃতকর্মের প্রকৃতি এবং ফলাফল সম্পর্কে বুঝার এবং বিচার করার ক্ষমতা অর্জন করে।[৮৮] কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট বয়সকালীন সময়ে তার যে কোন কার্যক্রমকে অপরাধ বলে বিবেচিত মনে না করলেও অপরাধবিজ্ঞানীগণ কিশোরদের আচরণ তথা কার্যকলাপের উপর সমধিক গুরুত্বারেপ করে থাকেন। কেননা, সামাজিকীকরণ

৮৩. ড. বোরহান উদ্দিন খান ও মঞ্জুর কাদের, *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা/চট্টগ্রাম: কামরুল বুক হাইস, ফেব্রুয়ারী, ২০১৪), পৃ. ২২৬
৮৪. Dr.N.V. Paranjape, *Criminology and Penology,* ibid, p. 486
৮৫. *Ibid,* p. 486
৮৬. ড. বোরহান উদ্দিন খান ও মঞ্জুর কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫
৮৭. *The Penal Code,1860,* sec:82, Act XLV of 1860; *শিশু আইন*, ২০১৩, প্রগুক্ত, অনুচ্ছেদ: ৪৪
৮৮. *Ibid*

প্রক্রিয়ায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্ম, মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসন এবং সর্বোপরি আইনের দৃষ্টিতে ন্যায়-অনায় সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা হয়।

কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা নিরূপণ করা বেশ কষ্টসাধ্য। কেননা, যদি বলা হয় যে, কিশোর বয়সীদের দ্বারা সংঘটিত সামাজিক মূল্যবোধ এবং নিয়ম-পদ্ধতির ভঙ্গকর কাজই কিশোর অপরাধ, তাহলে সংজ্ঞাটি স্থান-কাল অনুসারে বিবেচনা করতে হয়। কারণ রাষ্ট্র, শহর, গ্রাম বা এলাকাভেদে সামাজিক মূল্যবোধ ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। এক সমাজে যা মূল্যবোধ বিবর্জিত কাজ অন্য সমাজে তা হয়তবা মূল্যবোধ বিবর্জিত নয়। অধিকন্তু, কোন কিশোরের জন্য কোন একটি বিশেষ কাজ অপরাধমূলক কিনা তা নির্ধারিত হয় ঐ কিশোরের পিতা-মাতার সামাজিক শ্রেণিগত মর্যাদার উপর। কেননা, একই সমাজে এমন অনেক পরিবার রয়েছে যাদের ছেলে-মেয়েরা নিত্যনতুন ফ্যাশন ও চালচলনের অনুসারী এবং তাদের পরিবার এ বিষয়ে বেশ উদার দৃষ্টি পোষণ করে। এমন পরিবার রয়েছে যারা ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা নিন্দনীয় বলে মনে করে না। অপরপক্ষে, এ ধরনের আচরণ অন্যান্য পরিবারের দৃষ্টিতে আপত্তিকর আর সেহেতু তা কিশোরদের জন্য অপরাধমূলক। মার্কিন কিশোর অপরাধ বিশেষজ্ঞ Sol Rubin কিশোর অপরাধের সংজ্ঞায় নির্ণয়ের জটিলতার কথা উল্লেখ করে বলেন, “There is enough controversy to this answere that what is socially unacceptable to one group may not be acceptable to another, but it is the legality that decides.”[৮৯]

কোন কাজ কিশোর অপরাধমূলক কিনা তা আরো কিছু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। সমাজ বা রাষ্ট্রের আইন এবং সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনোভাবের উপর নির্ভর করে কোন কাজ কিশোরদের জন্য অপরাধমূলক কিনা। সমাজ ও রাষ্ট্র ভেদে আইন এবং নেতাদের মনোভাবের তারতম্য হয় বিধায় কিশোর অপরাধ সব সমাজে এবং সমাজপতিদের কাছে একই রকম বলে বিবেচিত হয় না।[৯০] অনেক সময় বলা হয় যে, কিশোর আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কিশোরই হচ্ছে ‘কিশোর অপরাধী’। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কিশোর আদালতের রায় বা অপরাধ নিরূপণ পদ্ধতি দেশ ও সমাজ ভেদে বিভিন্ন রূপ নেয়। তাই চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায় যে, কোন কিশোর অপরাধী কিনা তা নির্ভর করে পিতামাতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সর্বোপরি কিশোর আদালতের বিচারকের মনোভাবের উপর।[৯১]

কিশোর অপরাধ পরিভাষাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Juvenile Delinquency, Adolescence Delinquency। আর Delinquency শব্দটি ল্যাটিন Delinquer শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ to omit

---

৮৯. Sol Rubin , *Crime and Juvenile Delinquency* (NewYork: Oceana Publications,1958), p.45
৯০. ড. বোরহান উদ্দিন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭
৯১. Haskell.M.R, *Crime and delinquency* (USA: Rand McNally College Publishing Company, 1974), p. 369

অর্থাৎ বাদ দেওয়া, বর্জন করা, উপেক্ষা করা ইত্যাদি। Dr.N.V. Paranjape বলেন, “The term Delinquency has been derived from the Latin word Delinquer which means to omit.”[৯২]

Oxford Advanced Learner`s Dictionary -তে Delinquency -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “Delinquency, Crime, usually not of a serious kind, especially as committed by young people.”[৯৩] আর Juvenile Delinquent -এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Juvenile Delinquent: A young person, not yet an adult, who is guilty of a crime.[৯৪] অর্থাৎ- এখনও প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি এমন তরুণ ব্যক্তি কোন অপরাধের জন্য দায়ী হলে তাকে কিশোর অপরাধ বলে।

সাধারণত অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের দ্বারা সংঘটিত অসামাজিক ও আইন-শৃঙ্খলাবিরোধী কার্যকলাপকে কিশোর অপরাধ বলা হয়। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত অপরিণত বয়সের বা কিশোর-কিশোরীদের অবাঞ্ছিত কাজকে কিশোর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিশোর অপরাধ এবং কিশোর বিচ্যুতি ধারণা তাদের অন্তর্নিহিত সহজাত অর্থের দিক থেকে পরিপূরক। কিন্তু সাহিত্য জগতে এর প্রতুল ব্যবহার সত্ত্বেও বিচ্যুত আচরণের ধারণাটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নয়। তাই পরিভাষাগত এ জটিলতার কারণে কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত বিশ্লেষণে কিশোরের বিচ্যুত আচরণকেও বুঝাবে।

১৯৫০ সালে আগস্ট মাসে লন্ডনে অপরাধ এবং অপরাধীদের বিচার সম্পর্কে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে কিশোর অপরাধের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কিশোর অপরাধের সংজ্ঞার উপর অতিশয় গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে এটা বলা হয় যে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা সংঘটিত সব ধরনের আইন ভঙ্গমূলক এবং খাপছাড়া বা অসংগতিপূর্ণ এমন আচরণ যা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নয়- এ সবই কিশোর অপরাধ।[৯৫]

অপরাধবিজ্ঞানী সুলম্যান (Harry Manuel Shulman) তার Juvenile Delinquency in American Society গ্রন্থে বলেন, Juvenile Delinquency spells the loss of control of

---

৯২. Dr.N.V. Paranjape, *ibid*, p. 486

৯৩. *Oxford Advanced Learner`s Dictionary* (Uk: Oxford University Press, 5th Edition, 1999), p.308; Haskell.M.R, *ibid*, p.369

৯৪. *Ibid*,p. 646

৯৫. Dr.N.V. Paranjape, *ibid*, p. 240

family and society over a portion of the growing generation. অর্থাৎ-"অপ্রাপ্তবয়স্ক বাড়ন্ত জনগোষ্ঠীর উপর পরিবার ও সমাজের নিয়ন্ত্রণহীনতাকে কিশোর অপরাধ বলে।"[৯৬]

সমাজকর্ম অভিধানের সংজ্ঞানুযায়ী, "Juvenile delinquency is in a jurisdiction, a pattern of antisocial behavior by juveniles that would be regarded as criminal in nature if committed by adults. অর্থাৎ-বয়স্করা যেসব আচরণ করলে অপরাধ হিসেবে গৃহীত হয় যেসব আচরণ কিশোর কর্তৃক সংঘটিত হলে তাকে কিশোর অপরাধ বলে।" [৯৭]

বিখ্যাত মনীষী Hang Chung Mo এর মতে, "Delinquency is nothing but an act of non-conformity to community standard." অর্থাৎ সমষ্টির আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী যে কোন কাজকেই কিশোর অপরাধ বলা যায়।[৯৮]

Mohammad Afsar Uddin বলেন, Juvenile delinquency may be defined in simple words as anti-social tendencies in the young and youthful.[৯৯] অর্থাৎ-সহজ ভাষায় নবীন ও কৈশোরপ্রাপ্তদের মধ্যে সমাজ বিরোধী প্রবণতাকে কিশোর অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

Lowell Juilliard Carr (1885-1963Ad.) কিশোর অপরাধের সংজ্ঞায় বলেন, "Delinquency has actually many different menings.They are-(1) Legal delinquents (those committing anti-social acts as defined by law) (2) Detected delinquents (those detected who reach an agency) (3) Alleged delinquents (those apprehended and brought to court) and (4) Adjudged delinquents (those found guilty)."[১০০]

Mohammad Afsar Uddin, সমাজ বিজ্ঞানী বার্ট (But) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "Delinquency as accurig is a child when his antisocial tendencies appear so grave that he becomes or ought become that subject of official action." অর্থাৎ কোন শিশুকে তখনই

---

৯৬. Mohammad Afsar Uddin, *ibid,* p.5

৯৭. Robert L. Barker (Edited), *Social Work Dictionary* (Washington DC: NASW Press,2013), p. 202

৯৮. Hang Chung Mo, *sociological study of juvenile offfenders in Taiwan*, (Taiwan: 1964), p.5; আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১; Mohammad Afsar Uddin, *ibid,* p.4

৯৯. Mohammad Afsar Uddin, *ibid,* p.5

১০০. Lowell Juilliard Carr, *Delinquency control* (New York: Harper and brother's, 1950), pp. 89-92; Abdul Hakim Sarker, *Juvenile Delinquency: Dhaka city experience* (Dhaka: Human Nursery for Development, 2001), p. 45

অপরাধী বলে মনে করতে হবে, যখন তার অপরাধ বা সামাজ বিরোধী প্রবণতার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[১০১]

বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী আব্দুল হাকিম সরকার বলেন, "Delinquency ordinarily refers to the anti-social acts committed by persons under a given age which are either specifically forbidden by law or may lawfully be interpreted as requiring some from of official action. Some opine, juvenile persons having committed delinquencies are neglected youngsters, some others term them as young criminals. According to some, they are at one end, victims of circumstances, also victimizers at the other. The modern concept of delinquency is, it cannot be denied, a criminal one."[১০২]

কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Dr. N.V. Paranjape মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী Ruth Sholen Cavan (1896-1993 Ad.) এবং Ferdinand এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "সমাজ কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত আচরণ প্রদর্শনে কিশোরদের ব্যর্থতাই কিশোর অপরাধ।"[১০৩] তারা আরো বলেন, "Juvenile delinquency consists of misbehavior by children and adoloscents that leads to referral to the juvenile court."[১০৪] অর্থাৎ দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধ হলো সমাজ ও আইন বিরোধী এমন সব কার্যকলাপ যা কিশোর কর্তৃক সংঘটিত হয় এবং যা সমাজের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বাঁধা ও হুমকিগ্রস্ত করে তোলে।

সমাজ ও আইন বিরোধী কাজ স্বাভাবিকভাবে অপরাধমূলক বলে বিবেচিত হলেও যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিবেচিত তা হলো বয়সের বিষয়টি। বয়সের কারণেই কিশোর অপরাধীকে সাধারণ অপরাধী অপেক্ষা ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই Robert L. Barker (B.1937 Ad.) বলেন, কিশোর অপরাধ হলো, "In a jurisdiction, a pattern of antisocial behavior by juveniles that would be regarded as criminal in nature if committed by adults."[১০৫] কিশোর অপরাধ এবং কিশোর অপরাধীর সাথে বয়সের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টির আরো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় John Eric প্রদত্ত বক্তব্য থেকে। তিনি বলেন, "Juvenile delinquent as a person between 8 and 16

---

১০১. Mohammad Afsar Uddin, *ibid*, p.5
১০২. Abdul Hakim Sarker, *ibid*, p. 45
১০৩. Dr. N.V. Paranjape, *ibid*, p. 486
১০৪. *Ibid*, p. 487; ড. বোরহান উদ্দিন খান ও মঞ্জুর কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮
১০৫. Robert L. Barker, (Editor), *ibid*, p.55

years of age, who violates a law ordinarily the law does not hold a child under 8 years of age legally responsible for anti-social behavior."[১০৬]

আমেরিকান Children's Bureau কিশোর অপরাধের আইনগত সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "কিশোর দ্বারা সংঘটিত রাষ্ট্রীয় আইন এবং মিউনিসিপাল অর্ডিন্যান্স বিরোধী সব কাজই কিশোর অপরাধ। অধিকন্তু কিশোর কর্তৃক যে কোন মারাত্মক সমাজবিরোধী কাজ যা সমাজের অন্যান্য সদস্যদের হস্তক্ষেপ করে এবং যা অপরাধীর নিজের এবং সমাজের মঙ্গলের পথে হুমকিস্বরূপ তাও কিশোর অপরাধ।"[১০৭] যেসব কিশোরদের পুলিশ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করে অপরাধের ক্ষেত্র থেকে কুঁড়িয়ে নিয়ে যায় এরা সবাই এক অর্থে কিশোর অপরাধী। কেননা, তাদের আচরণ আপত্তিকর বা অপরাধমূলক বলেই পুলিশ গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত অনেক কিশোরকেই তাদের কৃতকর্মের ভুল দিকটি ধরিয়ে দিয়ে এবং সৎ পথে চলার পরামর্শ দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। কিশোর অপরাধের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এটাও বলা হয় যে, কিশোর বয়সীরা যে সব কাজ করলে সমাজ ও কিশোর জীবন বিপজ্জনক হয়ে পড়ে সেটাই কিশোর অপরাধ।

আইনগত দিক থেকে কিশোর অপরাধ বলতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক আইন বিরুদ্ধ দণ্ডনীয় কর্ম সম্পাদন করাকেই বুঝায়। এ প্রসঙ্গে ১৯৮০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত ২য় কংগ্রেস অধিবেশনে কিশোর অপরাধের নির্ধারিত সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়- "Juvenile Delinquency should be understood the commission of an act which is commited by an adult, would be considered a crime." অর্থাৎ-কিশোর অপরাধ বলতে কমিশন সে কাজকে বুঝায়, যে কাজ একজন বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হলে অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়।"[১০৮]

১৯৫১ সালে কেমব্রিজ সামারবাইল যুব গবেষণা হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সমাজবিজ্ঞানীরা কিশোর অপরাধ চিহ্নিতকরণে তিনটি বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনা করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তাদের সুপারিশকৃত এসব বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

(ক) অশোভন আচরণের তীব্রতা;
(খ) অপরাধের মাত্রা প্রায়শ সংগঠিত হওয়া;
(গ) প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ ও সমাজব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব।[১০৯]

---

১০৬. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮
১০৭. U.S Department of Health, Education and Welfare DHEN, *Juvenilwe Courts Statistics* (Washington, D.C: DHEN Publication No. (SRS) 73-03452, 1972)), p.7
১০৮. C.N. Shankar Rao, *Sociology: Primary Principles of Sociology* (Delhi: S. Chand Limited, 2006), p. 543
১০৯. Edlin Power and Helln Winter, *"An Experiment in the Prevention of Delinquency"* (Colombia University Press: The Cambridge Sumervile Youth Study, New Yourk, 1951), p. 27

কিশোর অপরাধকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হোক না কেন তা যে অপরিণত বয়সে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, আইন কানুন ও মূল্যবোধ বিরোধী অশোভন আচরণ এ ব্যাপারে সকলে একমত। তবে যে বয়সে অপরাধ করলে একজন কিশোরকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে সে বয়সসীমায় দেশভেদে ভিন্নতা রয়েছে। তবে মোটামুটি কিশোরের বয়সসীমাকে ১৬ থেকে ২১ পর্যন্তই সীমিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিশু আইন ১৯৭৪ অনুসারে ১৬ বছরের নিচে বয়স্কদের শিশু-কিশোর হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের ৮ থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত বালক-বালিকাদেরকে কিশোর হিসেবে বিবেচনা করা হত। পরবর্তীতে শিশু আইন, ২০১৩ অনুসারে ১৮ বছরের নিচে বয়স্কদের শিশু-কিশোর হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে।

মোহাম্মদ আফসার উদ্দিন কিশোর অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে একটি পর্যবেক্ষণমূলক সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, "Psychologist, Sociologist, Psychiatrists or Social workers have attached different meanings to the term. To most of the parents, juvenile delinquents are other peoples, children who behave objectionably. To lawers they are children and though unacceptable to society but minors are free from punishment, while it is administered to the young of certain age. To Psychologists they are youngsters whose special type of behaviour patterns show deviation from acceptable norms.To court judges, they are simple neglected children who have been brought into the world by parents who turned their backs on their offsprings and left them at mercy of the environment, while to us juvenile delinquents is characterized as that type of behaviour by the adults who violate specific legal norms of the norms of particular social institutions in sufficient frequency and seriousness so as to provide a firm basis for legal action against the behaving individuals or groups."[১১০]

অতএব দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধ একটি বিস্তৃত পরিভাষা। এটি কিশোরদের সব ধরনের বিদ্রোহমূলক এবং হিসাত্মক কার্যাবলীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। এমনকি ভিক্ষাগ্রহণ, ভবঘরামীপনা, অশ্লীলতা, পিতা-মাতার টাকা চুরি করা, নেশা পান, তাস, জুয়া খেলা ইত্যাদি কাজও কিশোর অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত কিশোর কর্তৃক অপরাধ আইন বিরোধীসহ সব ধরনের অসামাজিক আচরণই কিশোর অপরাধ যা যথা সময়ে সংশোধন করা না গেলে এসব অপরাধ গুরুতর রূপ নিতে পারে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর এসব কাজের জন্য কাউকে বয়স্ক অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১১০. Mohammad Afsar Uddin, *ibid*, pp.5-6

সমাজবিজ্ঞানী, অপরাধবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের উপরোক্ত সংজ্ঞাসমূহের বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে কিশোর অপরাধের বিষয়ে সর্বজনীন কোন সংজ্ঞা এখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পায়নি। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক সংঘটিত দেশীয় আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, আদর্শ, ও মূল্যবোধের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডকেই কিশোর অপরাধ বলে। কিশোর অপরাধ ও অপরাধী সম্পর্কে এমন নানা ধরনের ব্যাখ্যা থাকলেও বৃহত্তর আঙ্গিকে কিশোর অপরাধকে তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়। **প্রথমতঃ** সংকীর্ণ অর্থে কিশোর অপরাধ হলো, শিশু বা কিশোর কর্তৃক আইন ভঙ্গমূলক কাজ। **দ্বিতীয়তঃ** ব্যাপক অর্থে কিশোর অপরাধ হলো, শিশু বা কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত আইন ও অধ্যাদেশ বিরোধী কাজ বা তাদের এমন কিছু আচরণ যা সাধারণ জীবনযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং যা তাদের নিজের ও সমাজের স্বার্থের ক্ষতিকর। **তৃতীয়তঃ** আরো ব্যাপক অর্থে কিশোর অপরাধ হলো কিশোরদের আক্রমণাত্মক ব্যবহার, প্রশাসনের প্রতি তাদের সম্মানের অভাব অথবা সামাজিক উপযোজনের বিচ্যুতধরন, যদিও এর সবগুলো সবসময় আইনের লঙ্ঘন তা নয়, তবে সমষ্টির (community) জন্য অসুবিধাজনক।[১১১]

কিশোর অপরাধী

কিশোর অপরাধী হলো ঐসমস্ত শিশু-কিশোর যারা পূর্বোক্ত বক্তব্যের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যে সমস্ত শিশু-কিশোর আইন ভঙ্গমূলক, সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ বিরোধী এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরকেই কিশোর অপরাধী হিসেবে ধরা হয়। তবে কিশোর অপরাধীদেরকেও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনোঃস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে দেখা হয়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধী হলো সেই কিশোর যে তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক সংগঠনগুলোর সাথে খাপখাইয়ে চলতে সক্ষম নয় বা ব্যর্থ হয় এবং সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে।

আবার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ কিশোরকেই অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করা হয় যে, তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সাংস্কৃতিক মূল্যবাধের পরিপন্থী আচরণ করে এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে মনোঃস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যখন বিচার করা হয় তখন ঐ কিশোরকেই অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যে তার নিজের আচরণকে সঠিক মনে করে এবং তার নিজস্ব কর্মকাণ্ডের কারণে অন্য ব্যক্তির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কি না তা বিচার করতে ব্যর্থ হয়। এ ধরনের কিশোর অপরাধীরা মানসিকভাবে বেশ চঞ্চল, বেপরোয়া এবং খাপছাড়া স্বভাবের হয়ে থাকে।[১১২]

---

১১১. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮
১১২. ড. বোরহান উদ্দিন খান ও মঞ্জুর কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, কিশোর পরিবার, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সমিতির সংস্পর্শে আসে এবং সে জানে যে এর প্রতিটা ক্ষেত্রেই রয়েছে কতিপয় সামাজিক বিধান এবং বিধান কার্যকর করার ব্যবস্থা। এইসব সামাজিক পরিবেশে কিশোর কিশোরীরা চারিত্রিক মহৎগুণ অর্জন করে। কিন্তু মাঝে মধ্যে ঐ সব সংগঠনের কিছু নিয়ম বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধাচারণ করে অথবা কার্যত ঐসব সংঘ ত্যাগ করে অপরাধমূলক আচরণে লিপ্ত হয়। অতএব সমাজতাত্ত্বিক অর্থে কিশোর অপরাধী হচ্ছে সেই কিশোর যে তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে খাপখাইয়ে চলতে ব্যর্থ হয় এবং সামাজবিরোধী কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে কৈশোরকাল মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ অধ্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানব সন্তানের উপর বিভিন্ন শরঈ বিধি-বিধান ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব আরোপিত হয়। এর আগ পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীরা গায়রে মুকাল্লাফ বা শরী'আতে বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতামুক্ত হিসেবে বিবেচিত। অর্থাৎ এ সময়কাল পর্যন্ত কিশোর-কিশোরীরা শরঈ বিধি-বিধান পালন হতে অব্যাহতি পায়। এ প্রসঙ্গে সিহাস সিত্তার অন্যতম প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আবূ দাউদে বর্ণিত আছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ مُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسِلْهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ–

অর্থাৎ-হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমার (রা.) এর নিকট একজন পাগলীকে উপস্থিত করা হয়, যে যিনা করেছিল। তিনি (রা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এ সময় আলী (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে জানতে চান। তখন তাকে বলা হয়, সে অমুক গোত্রের একজন পাগল মহিলা। সে যিনা করায় তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন আলী (রা.) বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনো। উক্ত মহিলাকে ফিরিয়ে আনা হলে হযরত আলী (রা.) হযরত উমার (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আমীরুল মু'মিনিন! আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে? তারা হলো- (১) পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ না সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হয় (২) নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালক ছেলে-মেয়ে যতক্ষণ না (পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন হয়) প্রাপ্তবয়স্ক হয়। তখন উমার (রা.) বলেন, হ্যাঁ। হযরত আলী (রা.) জানতে চান তবে কেন এই পাগলীকে পাথর মেরে হত্যা করা হচ্ছে? তখন হযরত উমার (রা.) বলেন, এখন আর এরূপ করা হবে না। হযরত আলী (রা.) বলেন, আপনি তাকে ছেড়ে দিন। তখন উমার (রা.) তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকবীর পাঠ

করতে থাকেন।"[১১৩] এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কিশোর যদি অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয় বা অপরাধ সংঘটিত করেও থাকে, তবুও তাকে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত না করে বরং তার কৃতকর্মকে ভুল হিসেবে বিবেচনা করে শাস্তি প্রদান না করা এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইমাম তিরমিযীর (র) এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ–

অর্থ: "তিন ব্যক্তির উপর থেকে দণ্ডবিধি রহিত করে দেওয়া হয়েছে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়; শিশু অপ্রপাপ্তবয়স্ক যতক্ষণ না প্রাপ্তবয়স্ক বা সাবালক হয় এবং বেহুশ ব্যক্তি যতক্ষণ না তার হুশ ফিরে আসে।[১১৪] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট থেকে বনূ কুরায়যা গোত্রের সন্ধিচুক্তি ও যুদ্ধপরাধের বিচার সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদের বর্ণনায় এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ–

অর্থ: মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) আতিয়া কুরাযী (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও কুরায়যা গোত্রের বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম (যাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল)। সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং যাদের নাভীর নিচে চুল উঠেছিল, তাদের হত্যা করা হচ্ছিল। আর আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম, যাদের তখনো নাভীর নিচে পশম উঠেনি। ফলে আমাকে হত্যা করা হয়নি।[১১৫] অপর এক বর্ণনায় আছে রাবী আরো বলেন, فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي مِنْ السَّبْيِ– অর্থাৎ-এরপর তারা আমার লজ্জাস্থান উলংগ করে দেখে যে, সেখানে কোন পশম গজায়নি। ফলে তারা আমাকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখে।[১১৬]

সুতরাং উপরোক্ত বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, কিশোরের উপর আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনজনিত অথবা মানুষের অধিকার ক্ষুন্নকরণ জনিত কারণে তাদের উপর শরী'আ নির্ধারিত হুদূদ[১১৭] ও কিসাস[১১৮] পর্যায়ের শাস্তি প্রযোজ্য নয়।

---

১১৩. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, অধ্যায়: আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদ: ফিল মাজনূন ইয়াসরিকু আও ইউসিবু হাদ্দা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৩৯৯

১১৪. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামে' আত-তিরমিযী*, কিতাবুল হুদুদ, বাব: মা যাআ ফিমান লা ইয়াজিবু আলাইহিল হদ্দ (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৭ হি.), হাদীস নং-১৪২৩

১১৫. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৪০৪

১১৬. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০৫

১১৭. হুদুদ শব্দটি হদ (حد) শব্দের বহুবচন। আর হদ শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা। এ জন্যে দারোয়ানকে হাদ্দাদ বলে। কারণ সে মানুষকে অবাধে প্রবেশ থেকে বিরত রাখে। শাস্তিকে হদ্দ বলার কারণ হচ্ছে, শাস্তি মানুষকে বিভিন্ন প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। ইসলামি শরীআতের পরিভাষায়, এমন কতিপয় অপরাধের শাস্তিকে হদ বলে যা শরী'আত প্রণেতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (বি.দ্র: ইমাম আলাউদ্দিন আল-কাসানী, *আল-বাদা'য়ে ওয়াস সানা'য়ে*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল আরাবি, ১৯১০, খ. ৭, পৃ. ৩৩)

তবে জনস্বার্থে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাদেরকে সংশোধনমূলক তা'যীরী[১১৯] শাস্তি প্রদান করার নির্দেশনা ইসলামি আইনে বিদ্যমান রয়েছে। কেননা নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম, বালেগ-নাবালেগ নির্বিশেষে যে কোন বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন অপরাধীর উপর তা'যীর কার্যকর হবে।[১২০] আমাদের সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ সংক্রান্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যে নির্দেশনা রয়েছে, সেখানে এ বিষয়ের বিধান দেখতে পাই।"[১২১]

এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল আযীয 'আমির এর অভিমতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু-কিশোর ব্যভিচার অথবা চুরি অথবা ডাকাতির মতো অপরাধ করলে সামাজিকভাবে তাকে অপরাধী বলে গণ্যই করা হবে না- এমনটি মনে করা সঠিক নয়, কেননা তা হবে আইনের অপব্যাখ্যা মাত্র। বরং উত্তম হলো যে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অপরাধের ন্যায় শিশু-কিশোরের অপরাধও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো- শর্তপূরণ না হওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের উপর সুনির্দিষ্ট শাস্তি যেমন-হুদূদ, কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। তবে কোন শিশু-কিশোর যদি শরী'আতের সুনির্দিষ্ট শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে অথবা সুনির্দিষ্ট তা'যীরী অপরাধসমূহের মধ্যে কোন একটি অপরাধ সংঘটন করে তাহলে তার অপরাধের মাত্রা ও বয়সের উপযুক্ততা বিচার করে সংশোধনমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামি আইনে কোন বাধা-নিষেধ নেই।[১২২] অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোর অপরাধ বলতে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে কর্তৃক শরী'আতের এমন আদেশ-নিষেধের লঙ্ঘনকে বুঝায়, যা করলে তা'যীর প্রযোজ্য হবে।

---

১১৮. কিসাস শব্দটি قص শব্দ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর অর্থ কর্তন করা বা সমতা। ইসলামি আইনজ্ঞগণের মতে, ব্যক্তির ক্ষত, অঙ্গহানী কিংবা মৃত্যুর কারণে অপরাধীকেও শাস্তিস্বরূপ ক্ষত সৃষ্টি করা, অঙ্গহানি কিংবা হত্যা করা। অথবা, অপরাধী যে পদ্ধতিতে অপরাধ সংঘটিত করেছে, তদ্রূপ পদ্ধতিতে তাকে শাস্তি বিধান করার নাম কিসাস। (বি.দ্রঃ ইবনে মানযুর, *লিসানুল আরাব*, বৈরুতঃ মাকতাবাআ আলামিয়্যাহ,খ. ৮,পৃ.৩৪১; *আল-মুজামুল ওয়াসিত*, তুরস্কঃ দারুল দাওয়াহ, ১৯৮৯,পৃ. ৭৪০; আব্দুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী আল-জিনাঈ*, লেবাননঃ মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৯হি., খ. ১, পৃ. ৬৬৩)। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

অর্থঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর হত্যার ব্যাপারে কিসাসের হুকুম ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তবে তার উত্তরাধিকারীর পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হলে ন্যায়সঙ্গত হুকুম অনুসরণ করতে হবে এবং ইহসানের সাথে রক্তঋণ আদায় করতে হবে" (আল-কুরআন, ২: ১৭৮-১৭৯)।

১১৯. তা'যীর শব্দটি আল-উযরু শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ হলো শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া, নিষেধ করা, সাহায্য করা ইত্যাদি। ইসলামি আইনের পরিভাষায় যে সব অপরাধের জন্য শরী'আতের নির্দিষ্ট কোন শাস্তি বা কাফফারা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি, সেসব অপরাধের শাস্তিকে তা'যীর বলে। (বি. দ্রঃ সা'দী আবূ জীব, *আল-কামূসুল ফিকহী*, করাচীঃ ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলুমিল ইসলামি, ১৩৯৭ হি. পৃ. ১০১)

১২০. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৬

১২১. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৯৫

১২২. ড. আব্দুল আযীয 'আমির, *আত-তাযীরু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* (আল-কাহেরাঃ দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৪২৮ হি.), পৃ. ৫৮

অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে পার্থক্য
(Differences between Crime and Juvenile Delinquency)

কিশোর বয়স মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সময়। এসময় ছেলে মেয়েরা স্বাধীনচেতা ও অত্যধিক আবেগপ্রবণ থাকে। এ বয়সে কেউ নিজেকে গড়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। আবার কেউ সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। শিশু আইন ২০১৩ অনুসারে ১৮ বছরের নিচে কোন শিশু-কিশোর কর্তৃক সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী এবং আইনভঙ্গমূলক কাজই কিশোর অপরাধ। তবে শিশু-কিশোর বয়সের মধ্যে অপরাধ করলে তা শাস্তিযোগ্য হয় না। অপরদিকে প্রাপ্তবয়স্ক কোরন ব্যক্তি কর্তৃক সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী এবং আইনভঙ্গমূলক যে কোন কাজই অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক যে কোন অপরাধের জন্য তাকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং এ জন্য তাকে বিধি মোতাবেক শাস্তি ভোগ করতে পেতে হয়। সাধারণভাবে অপরাধ ও কিশোর অপরাধ উভয়ই অপরাধ হিসেবে গণ্য। তথাপি তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নোক্ত ছকে অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে পার্থক্য দেখানো হলো-

পার্থক্যের বিষয়		অপরাধ	কিশোর অপরাধ
১	সংজ্ঞা	প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের দ্বারা সংঘটিত আইন ও সমাজ বিরোধী কাজকে অপরাধ বলে।	অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের দ্বারা সংঘটিত আইন ও সমাজ বিরোধী কাজকে কিশোর অপরাধ বলে।
২	বয়স	বয়সভেদে সধারণত অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। কেউ যদি প্রাপ্তবয়সে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত কর্ম করে তবে সে অপরাধী। অপরাধীর বয়স কিশোরের উর্ধ্ববয়স্ক ।	আর সে যদি অপ্রাপ্ত বা কিশোর বয়সে অপরাধ করে তাহলে সে কিশোর অপরাধী। এ ক্ষেত্রে কোন বয়সসীমা পর্যন্ত কিশোর হবে তা সমাজই নির্ধারিত করবে। বিভিন্ন দেশে কিশোর অপরাপধীর বয়সের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। সাধারণত এ তারতম্য ১৬ থেকে ২১ বছর পর্যন্ত উঠানামা করে। আমাদের সমাজে সাধারণত ৯ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়স্কদের কিশোর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
৩	কারণগত পার্থক্য	অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অপরাধীরা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে বেশি অপরাধ করে থাকে।	আর কিশোর অপরাধীরা মানসিক ও সামাজিক কারণে বেশী অপরাধ করে থাকে।
৪	অপরাধের ধরন	প্রাপ্তবয়সে যে সব অপরাধমূলক আচরণে অপরাধীরা জড়িত হয়, অপ্রাপ্তবয়সে কিশোররা কিন্তু সেসব কর্মের চেয়ে অন্য ধরনের কর্মে বেশি জড়িত হয়।	
৫	পরিকল্পনা	পরিকল্পিত ও সুচিন্তিভাবে অপরাধ করা হয়।	অপরাধ করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার তেমন প্রাধান্য নেই।
৬	উদ্দেশ্য	বস্তুগত লাভ এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করাই অপরাধের উদ্দেশ্য।	কিশোর অপরাধে বস্তুগত লাভ এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রাধান্য থাকে না।
৭	সংঘবদ্ধতা	অপরাধীরা অপরাধীচক্রের সাথে সংঘবদ্ধ	কিশোর অপরাধীরা সাধারণত অপরাধীচক্রের

		থাকে।	সাথে সংঘবদ্ধ থাকে না।
৮	মানসিক অবস্থা	অপরাধীদের মানসিক অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে।	কিশোর অপরাধীরা মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে।
৯	আচরণগত	আচরণগত বা স্বভাবগত কোন পরিবর্তন নেই।	আচরণ ও স্বভাবে বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা সম্ভব।
১০	সংশোধন	অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা হয়।	কিশোর অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনের জন্য সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়।
১১	শাস্তির ধরন	বয়স্ক অপরাধীর বেলায় সংশোধনের চেয়ে বা সংশোধনের পাশাপাশি শাস্তির উপরও গুরুত্ব দেয়া হয়। তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবনসহ যেকোন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়।	কিশোর অপরাধীদের বিবেচনার ক্ষেত্রে তাদের কৃত অপরাধের জন্য শাস্তির চেয়ে বরং সংশোধনমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়। এছাড়া শর্তাধীনে মুক্তিদান বা লঘুদণ্ড প্রদানের বিধান রয়েছে।
১২	বিচার ব্যবস্থা	বয়স্ক অপরাধীর ক্ষেত্রে সাধারণত তার অপরাধের কারণ এবং তার ব্যক্তিত্বের চেয়ে - সে কেন অপরাধ করল সে বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয় এবং প্রচলিত আইন ও প্রচলিত আদালতে বিচার করা হয়।	কিশোর অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে কিশোরের ব্যক্তিত্ব এবং যে পারিপার্শ্বিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে অপরাধ করেছে তার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং প্রবেশন আইনে কিশোর আদালতে বিচার সম্পন্ন হয়।
১৩	অপরাধের মূল্যায়ন	প্রচলিত আইনের ধারা অনুসারে অপরাধকে মূল্যায়ন করা হয়।	প্রচলিত আইনের ধারা অনুসারে নয় বরং প্রচলিত রীতি-নীতি এবং মূল্যবোধের আলোকে কিশোর অপরাধকে মূল্যায়ন করা হয়।
১৪	আইনজীবী	প্রাপ্তবয়স্কদের অপরাধের বিচারে আইনজীবী নিয়োগ করা হয়।	অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের বিচারে আইনজীবী নিয়োগ করার কোন সুযোগ নেই।
১৫	প্রস্তুতি	অপরাধের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি থাকে।	সাধারণত পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই অপরাধ করে থাকে।
১৬	ধরন	ছোট-বড় সব ধরনের অপরাধ করে থাকে।	ছোট-খাট অপরাধ করে থাকে।
১৭	হাজত খানা	এ ধরনের অপরাধীকে সাধারণ হাজতে রাখতে হয়।	কিশোর অপরাধীকে কিশোর হাজত বা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখতে হয়।
১৮	পরিমাণগত	অপরাধের পরিমাণ কম।	অপরাধের সংখ্যা বেশি।
১৯	অনুশোচনা	অপরাধ সংঘটন করে কোন অনুশোচনা বা অনুতাপ করে না।	অপরাধের জন্য অনুশোচনা করে এবং লজ্জিত হয়।

এছাড়াও কিশোর অপরাধ স্থান থেকে স্থানে, সময় থেকে সময়ে এবং এক মৌসুম থেকে অন্য মৌসুম অনুযায়ী পৃথক রূপ ধারণ করতে পারে। এছাড়া আরও একটি বিষয় বিবেচনায় আনা যেতে পারে যে, সমাজে এমন কিছু কাজ আছে যা শিশুদের জন্য নিষিদ্ধ, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নয়। যেমন: ধুমপান, মদ্যপান, জুয়াখেলা ও এরূপ

আরো অনেক কিছু। অপরাধ ও কিশোর অপরাধের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বয়সের প্রশ্ন; অর্থাৎ নির্ধারক হচ্ছে অপরাধীর প্রকৃত বয়স কত এবং প্রচলিত আইনের সংজ্ঞায় কি আছে। কিশোর অপরাধের একটি আলাদা সামাজিক ও আইনগত বৈশিষ্ট্য আছে। নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে এর মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়ে থাকে:

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বয়স ও কৃত অপরাধ আচরণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তার জবাবদিহিতার বিষয় অনুধ্যান ও পরীক্ষার অধীনে আনা উচিৎ। অনুধ্যান ও পরীক্ষার এই কাজে ব্যক্তির অপরাধ করার পূর্ব ইচ্ছা, কোন কাজের পরিণাম সম্পর্কে আগাম ধারণা বা তা বিচার করার ক্ষমতা, ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মত যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পাওয়া উচিৎ।

(খ) শিশুর সামাজিক আনুগত্য নিশ্চিতকরণে পিতামাতার দায়িত্ব চিরন্তন এবং এটি সর্বজনীন স্বীকৃতও বটে। শিশুর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় পিতামাতার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণে বৃহত্তর সমাজ প্রতিরক্ষার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত আইনগত ব্যবস্থা থাকা উচিৎ।

(গ) শিশুর উপর রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্ব সকল গণতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত। পিতৃমাতৃহীন, পরিত্যক্ত, অবহেলিত ও বিচ্যুত শিশুদের রাষ্ট্রের যেমন অভিভাবকত্ব রয়েছে; তেমনি কিশোর অপরাধীদেরকেও রাষ্ট্রীয় অভিভাবকত্ব প্রদান করা দরকার।

অতএব, এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে কিশোর অপরাধের বিষয়টি কোন অজুহাতে অবহেলা করার মত বা তরুণ অপরাধী হিসেবে বিবেচনা করার সুযোগ নেই। যদি কেউ আইনগতভাবে কিশোর-অপরাধী হিসেবে সংজ্ঞায়িত হয়, তাকেও কোনভাবে 'অপরাধী' হিসেবে আচরণ করা যাবে না। কারণ, আইনগত 'কিশোর অপরাধ' প্রত্যয়টি দীর্ঘ সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর কিশোর অপরাধ ও অপরাধের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়েছে। তবে এটি সত্য যে, 'কিশোর অপরাধ' বিষয়টি প্রাপ্ত বয়স্কের 'অপরাধের' খুবই কাছাকাছি এমন একটি অবস্থা এবং যা মানবজীবনে দ্রুত একাকার হয়ে যেতে পারে। তবে নির্দিষ্ট বয়সসীমার নিচে ব্যক্তিদের দ্বারা কৃত অপরাধের বিষয়ে কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে যেসব বক্তব্য প্রচলিত রয়েছে তাতে বিভিন্ন দেশে বা সমাজে নানা পার্থক্য দেখা যায়।[১২৩] তাই বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে কিশোরের বয়সসীমা ১৮বছর অর্থাৎ ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত একজন ব্যক্তি কিশোর হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতীয় মানদণ্ডে প্রত্যেক দেশেই কিশোরের বয়সসীমা নির্ণয়ে স্বকীয়তা বা ভিন্নতা রয়েছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় কিশোরের বয়সসীমার ভিন্নতা রয়েছে। তবে এ ভিন্নতার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালার আলোকে কিশোরদের অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্ধারিত হয়।

১২৩. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৩

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ : কারণ, প্রকৃতি ও প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ: কিশোর অপরাধের কারণ

কিশোর কেন অপরাধপ্রবণ হয় বা কেন সে অপরাধ সংগঠিত করে-এ প্রশ্নটি খুবই সহজ, কিন্তু কিশোর অপরাধের সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল। এর পরিপূর্ণ উত্তর পাওয়া মোটেও সহজসাধ্য বিষয় নয়। কোন একটি বিশেষ উপাদান বা অবস্থাকে কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে দেখানো যায় না বরং এ ক্ষেত্রে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন উপাদান, পরিবেশ ও অবস্থাকে সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীগণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। অপরাধের কারণতত্ত্ব পর্যালোচনায় কিশোর অপরাধ সম্পর্কে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব বেরিয়ে আসে। তথাপিও অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন আঙ্গিকে কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস চালিয়েছেন। তাদের এসকল অনুসন্ধানের ফলে কিশোর অপরাধের সম্ভাব্য নানা কারণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা

সমগ্র বিশ্বে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তি, সমাজবিজ্ঞানী, অপরাধবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ সংস্কারকগণ সর্বদা কিশোর অপরাধ নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আসছেন। এ সমস্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নানা উপায়ে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁরা নানা প্রেক্ষাপটে এই সমস্যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। অ্যামেরিকান সমাজবিজ্ঞানী Heney Donald Mckay (1899-1980Ad.) তার বিখ্যাত 'Juvenile Delinquency in Urban Areas' শীর্ষক গ্রন্থে কিশোরদের অপরাধপ্রবণতার কারণ সম্পর্কে বলেন, আধুনিক সমাজে বহু বিকল্প শিক্ষা প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে, এতে একজন শিশু তার লক্ষ্যার্জনে নানামুখী শিক্ষা প্রক্রিয়ার অভ্যস্ত হতে হয়, যার তার মনে দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে। তার মতে, অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় সামাজিক ব্যবস্থার সাধারণ মূল্যবোধের বিষয়ে জোর না দিয়ে ব্যক্তির ইচ্ছানুযায়ী লক্ষ্যে সফলভাবে পৌঁছানোর বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দেয়ার মাধ্যমে। তার এই বক্তব্যের সমর্থনে কিছু শর্তের বিষয়ে ইঙ্গিত দান করেন।

(ক) নমনীয় ও পরিবর্তনশীল সামাজিক মর্যাদা কাঠামোতে বস্তুসম্পদ ক্ষমতা ও খ্যাতির প্রতীক হওয়া।

(খ) সম্পদ দখলের লক্ষ্যে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা।

(গ) নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তিতে সনাতন সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্রমদুর্বলতা।

(ঘ) মর্যাদার সংগ্রামে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে উদ্যমহীনতা।

(ঙ) এরূপ একটি বিশ্বাসে মানুষ তাড়িত হয় যে, সকলেরই অভিজাত জীবনে প্রবেশের অধিকার আছে। যদি ব্যক্তি যা চায়, তা না পায় তাহলে তার মধ্যে এ ধারণার জন্ম হয় যে, সে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[১]

১. Clifford, R Shaw and Henry Donald Mckay, *Juvenile Delinquency in Urban Areas* (Chicago: Chicago University Press, 1949), p.121

সমাজের শ্রেণি-কাঠামো কিশোর অপরাধ সৃষ্টিতে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট। Walter B Miller (1920-2004 Ad.) তার উল্লেখযোগ্য অবদান "Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency" প্রবন্ধে কিশোর অপরাধের জন্য সমাজের শ্রেণি-কাঠামোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, নিম্ন শ্রেণির শিশু-কিশোরদের অপরাধমূলক কার্যকলাপে ধাবিত করার ক্ষেত্রে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার রয়েছে, "His postulation is that lower class pre-occupation with Trouble, Toughness, Smartness, Excitement, Fate and Autonomy tends to encourage delinquent behavior among the adolescents as they ardently seek to gain status and solidarity with other lower class boys."[২] অর্থাৎ-তাঁর ধারণা এই যে, Trouble, Toughness, Smartness, Excitement, Fate ও Autonomy'র সাথে নিম্নশ্রেণির আবদ্ধতা অপরাধমূলক আচরণে উৎসাহ যোগায়। এর কারণ হচ্ছে, শিশু (ছেলে) নিম্নশ্রেণির অন্যান্য শিশুর সঙ্গে সংহতি সৃষ্টি করে মর্যাদা অর্জনে ব্যাপৃত হয়। আবার মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে Toughness এর তুলনায় finess ও sophistication কে অধিক মূল্য দেওয়া হয়। সঙ্গদল ও তরুণ সংস্কৃতি মধ্যবিত্ত শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দানা বাধার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।[৩]

কিশোর অপরাধের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানীগণ ও আইনবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয় করেছেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবী (১৮৮৯-১৯৭৫খ্রি.), সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩খ্রি.), আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানের জনক সিজার লম্ব্রোসো (১৮৩৫-১৯০৯খ্রি.), সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়ম হিলি (১৮৬৯-১৯৬৩খ্রি.) এবং Augusta F. Bronner প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের নির্ণীত কারণগুলো হচ্ছে, অসৎসঙ্গ, কৈশোরের অস্থিতিশীল আবেগ, কিশোর বয়সের যৌন অভিজ্ঞতা, মানসিক দ্বন্দ্ব, প্রেম অভিমান, অশ্লীল চলচ্চিত্র, নিম্নমানের চিত্তবিনোদন, কর্মক্ষেত্রের অসন্তোষ, আবেগপ্রবণ হয়ে উঠা, দৈহিক গঠনজনিত সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি।[৪] বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯খ্রি.) কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তে মানুষের মনোজগতের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ

---

২. Walter B. Miller, "Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency", *The Journal of Social Issue*,14, 1958, p.78

৩. Joseph W. Scott and Edmund W. Vaz, "A Perspective On Middle Class Delinquency", *Canadian Journal of Economics and Political Science*, Vol. 29,1963, p.64; আবদুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (ঢাকা: কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৬৫-১৬৬

৪. C.N. Shankar Rao, *Sociology: Primary Principles of Sociology* (Kalkata: S. Chand Limited, 2006), p. 544

করেছেন।[৫] অতএব, দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ে যেসব তত্ত্ব প্রদান করা হয়েছে, সেসব তত্ত্বে কেউ জৈবিক, কেউ ভৌগলিক, কেউ জন্মগত, কেউ অর্থনৈতিক, কেউ ধর্মীয় আবার কেউ সামাজিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। যিনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেছেন তিনি সে দৃষ্টিকোণ থেকে কারণ নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। নিম্নে অপরাধ সংঘটনের কারণ নির্ণয়ে কয়েকটি তত্ত্বের উপর আলোকপাত করা হলো-

১। জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি (Hereditary or Constitutional Theory)

অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে যেসব দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, সেসবের মধ্যে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলকভাবে প্রাচীন। আধুনিক অপরাধবিজ্ঞানের জনক সিজার লম্ব্রসো (Cesare Lombros)[৬] কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে জৈবিক প্রভাবকে দায়ী করেছেন।[৭] Seaser Lombroso-এর 'Born Criminal Type', থিওরি মতে "A typical criminal could be identified by certain anatomical traits such as slanting forehead, abnormal size of ears, irregular arrangement of teeth and so on.[৮] বংশগতি বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জৈবিক বৈশিষ্ট্য কিশোর অপরাধের অন্যতম একটি কারণ। শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে যে দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেটিই তার বংশগতি। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ব্যক্তির মন-মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা প্রভৃতি বিষয় বংশগতির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়ে থাকে। জন্মগতভাবে শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে এক সময় তারা অস্বাভাবিক আচরণ ও অপরাধমূলক কর্মে জড়িয়ে পড়ে।[৯] জন্মগত শারীরিক ও মানসিক ত্রুটিগুলো যেমন মাথার খুলি স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট বা বড় হয়, গাঢ় ও ঘন ভ্রু, চেপ্টা নাক, প্রশস্ত হাতের তালু, প্রশস্ত কান, ঘন চুল, লম্বা বাহু, চোখ বসা, হাতে-পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল, সংকীর্ণ কপাল, অসামঞ্জস্য দাঁত, দুর্বল চিত্ত, ক্ষীণ বুদ্ধি, আত্মনিয়ন্ত্রণহীন, অসৎ প্রকৃতি ও বেদনার প্রতি অতি সংবেদনশীলতা ইত্যাদি।[১০] জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুসমর্থনকারীরা মনে করেন, উপর্যুক্ত ত্রুটিগুলো থেকে পাঁচটি ত্রুটি শিশু-কিশোরের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে

---

৫. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রানী নাথ, *মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ* (ঢাকা: ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০০৩খ্রি.), পৃ. ২০৭-২০৯; বোরহান উদ্দীন খান, *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা: প্রভাতী প্রকাশনী, ১৯৯৫খ্রি.) পৃ. ১১৩

৬. Cesare Lombroso, was an Italian criminologist, physician, and founder of the Italian School of Positive Criminology. He was born on 6 November 1835 at Veron in Italy and died on October 19, 1909 in Italy. (Wikipedia)

৭. উবুদুস সিরাজ, *ইলমুল ইজরাম ওয়া ইলমুল ইকাব* (কুয়েত: কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩হি.), পৃ. ১৮৩

৮. Abdul Hakim Sarker, *Juvenile Delinquency Dhaka City Experience* (Dhaka: Human Nursery for Development, 2001), p. 67

৯. উবুদুস সিরাজ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

১০. Stephen Schafer, *Theoretical Criminology* (New York: American Book, Straford Press, 1969), p.120; বোরহান উদ্দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪; বিএল দাস, *অপরাধবিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা: কামরুল বুক হাউস, ২০০১খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৭৬

অপরাধকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[১১] নিম্নে লম্ব্রোসোর দৃষ্টিতে একটি আদর্শ মুখমণ্ডলের পরিমাপসহ অবয়ব দেওয়া হলো-

Figure-1: Face masurements based on Lombroso's criminal anthropology

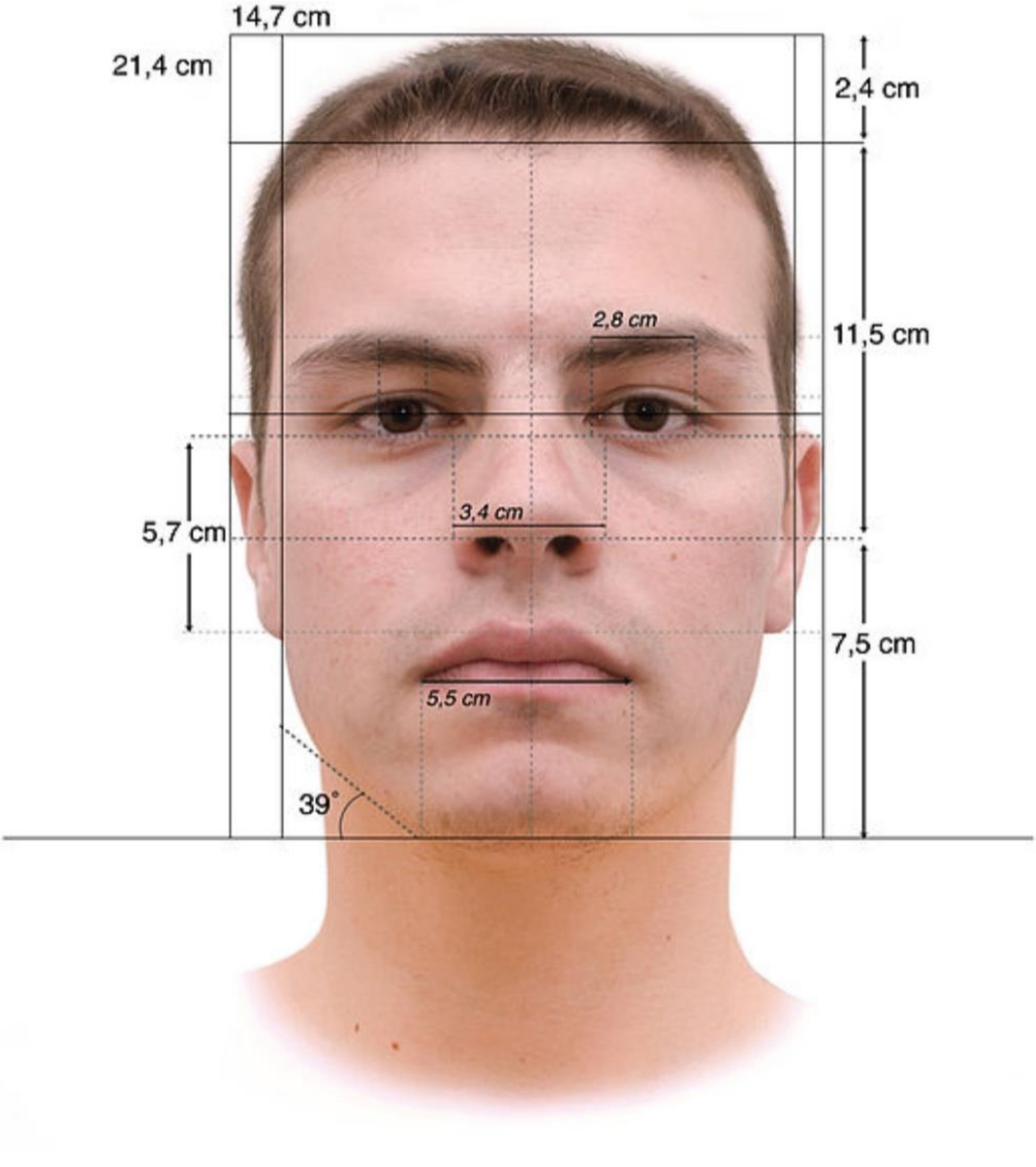

উপরোক্ত মুখমণ্ডলের চিত্রটি সিজার লম্ব্রোসোর অপরাধ নৃ-বিজ্ঞানের ধারণার আলোকে চিত্রিত হয়েছে। লম্ব্রোসোর মতে মুখমণ্ডলের উপরোক্ত পরিমাপের মধ্যে কোন অংশে কম বেশি হলে বা অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিতে পারে।

১১. ইবরাহীম আব্দুহু আশ-শুরফাবী, *জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার'ঈ* (আল-কাহেরা: দারু আহলিল কুরআন, ১৪২৩হি.), পৃ. ২২-২৩

William H. Sheldon অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত কিশোরের মধ্যে একটি গবেষণা পরিচালনা করে শরীরের আকৃতি এবং মেজাজের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি সমাজবিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কিশোরদের শ্রেণিবিন্যাস করেন এবং তাদেরকে প্রধান তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেন। তার এই শ্রেণিবিন্যাস Abdul Hakim Sarker তার গবেষণাকর্ম "Juvenile Delinquency Dhaka City Experience"-এ উল্লেখ করেন, "He made ratings of the delinquents on the basis of antisocial charecteristics and classified them into three physical types: (1) endomorph (solf and fat) অর্থাৎ নরম তুলতুলে শরীর; (2) mesomorph (muscular and athletic body) অর্থাৎ পেশীবহুল পালোয়ানি শরীর; (3) ectomorph (thin and fragile) অর্থাৎ সরু ও ভঙ্গুর শরীর।"[১২]

মার্কিন মনোবিজ্ঞানী W. Healy (1869-1963Ad.) শিকাগো শহরে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কিশোর অপরাধীদের ৩১% এর দৈহিক বিকাশ অস্বাভাবিক।[১৩] এছাড়াও ইতালিতে সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, দৈহিক অস্বাভাবিকতা দূর করা গেলে কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ থেকে রক্ষা করা যেতে পারে।[১৪] তবে কিশোর অপরাধের কারণ হিসেবে বংশগতিকে দায়ী করলে, একই ব্যক্তির একাধিক সন্তানের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচরণের জন্য কী কারণ -সে ব্যাপারে প্রশ্ন জাগ্রত হয়। যদি বংশ গতিকেই অপরাধের কারণ মনে করা হয়, তাহলে ইসলামের দৃষ্টিতেও মানুষকে তার কম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা অযৌক্তিক হবে। কেননা বংশগতির বিষয়ে মানুষের কোন ক্ষমতা নেই। আর মহান আল্লাহ একজনের ভার অন্য জনের উপর কখনও চাপিয়ে দেন না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى–অর্থ: "প্রত্যেকে তার নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী, কেউ কারো কাজের দায় বহন করে না।"[১৫] অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ– অর্থ: "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। এরপর তিনি তোমাদেরকে শোনার ক্ষমতা দিয়েছেন, দেখার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং হৃদয় দিয়েছেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"[১৬] বংশগতি তথা জন্মগতভাবে কোন মানব সন্তানই অপরপাধী হয়ে জন্মায় না।

---

১২. Abdul Hakim Sarker, *ibid*, p. 67
১৩. মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল* (ঢাকা: অনার্স পালিকেশন্স, ২০১২খ্রি.), পৃ. ২৭৭
১৪. মো. আমিনুল হক, *বিকাশ মনোবিজ্ঞান* (ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০১২), পৃ. ১৪১
১৫. আল-কুরআন, ৬: ১৬৪
১৬. আল-কুরআন, ১৬: ৭৮

ফিতরাতের উপর প্রত্যেক মানব সন্তানের জন্ম। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে এ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।[১৭] অতএব পবিত্র কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতসমূহের আলোকে বলা যায় যে, বংশগতি তথা জন্মগতভাবে কোন শিশু-কিশোর অপরাধী হতে পারে না। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে কোন অপরাধ কর্মের জন্য তার বংশগতি দায়ী হতে পারে না।

জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধের কারণ অনুসন্ধানের ব্যাখ্যাগত তারতম্য রয়েছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যায় মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পরিচয় মেলে। এ সত্ত্বেও অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

প্রথমতঃ অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে সকল জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা যে সাধারণ সূত্রটির উপর নির্ভর করে তা হলো, মানব আচরণ শারীরিক গড়নের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন ব্যক্তির আচরণ বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত, এ জন্য যে, তারা শারীরিক গড়নে বিভিন্ন। এ সূত্র অবলম্বনে এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, মানুষের মধ্যে কতিপয় জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ব্যবধান রয়েছে এবং সেগুলোর কারণেই মানুষের আচরণের মধ্যে বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যাগুলোর যুক্তি এবং পদ্ধতি সহজে বোধগম্য। কারণ, এক্ষেত্রে মনে করা হয় যে, বিশেষ বিশেষ ধরনের শারীরিক গড়ন ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ বিশেষ ধরনের অপরাধপ্রবণতার জন্য দায়ী। আবার পদ্ধতিগত দিক থেকে জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যাগুলো পরিসংখ্যানের সাহায্য গ্রহণ করে এবং তা শারীরিক গড়ন এবং মানুষের আচরণের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক খোঁজার প্রয়াস পায়। প্রায় সব জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা এ কথা অনুমান করে যে, অপরাধীরা নিরাপরাধীদের থেকে শারীরিকভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অস্বাভাবিক ত্রুটিপূর্ণ বা খুঁতযুক্ত। আর তাই তারা জৈবিকভাবে নিকৃষ্ট।[১৮] জৈবিক দৃষ্টিভঙ্গি আবার মুখমণ্ডলের গড়ন ও মস্তিস্কের খুলির গড়নের উপর ভিত্তি করে দু'ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। যথা-

(এক) ফিজিওনোমী (Physionomy)

মুখমণ্ডলের গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবীয় আচরণ সম্পর্কিত মতবাদের নাম ফিজিওনোমী (Physionomy)। T. Baptise Della Port (1535-1615 Ad.) এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা।[১৯] তার মতে মুখমণ্ডলের বিশেষ ধরনের গড়ন ও বৈশিষ্ট্য কোন ব্যক্তির অপরাধপ্রবণতার মূল কারণ এবং কোন ব্যক্তির ঐ বিশেষ ধরনের গড়ন ও বৈশিষ্ট্য না থাকলে বুঝতে হবে তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা নেই বললেই চলে। যদিও তিনি মানুষের অন্যান্য দৈহিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব অস্বীকার করেননি। অষ্টাদশ শতকে এ মতবাদকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেন সুইস পণ্ডিত John Caper Lavoter (1741-1801 Ad.)। তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ

১৭. বি.দ্রঃ ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ), *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়ঃ আল যানাইয, অনুচ্ছেদঃ মা কীলা ফি আওলাদিল মুশরিকীন (আল কাহেরাঃ মাকতাবাতুস সাফা, ১৪২৩হি.), খ. ১, হাদীস নং- ১৩৮৫

১৮. বোরহান উদ্দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬

১৯. Stephen Schafer, *ibid*, p.113

“Physionomical Fragments” -এ মুখমণ্ডলের গড়ন এবং আচরণ সম্পর্কে তার প্রচুর পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে দাবী করেন যে, মানবীয় আচরণ এবং মুখমণ্ডলের গড়নের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের মুখাকৃতি এবং আচরণ সম্পর্কে Lavoter যে সিদ্ধান্তে আসেন, তা যে সব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, তা হল দাড়ি, চোখ, থুতনী, নাক এবং মুখমণ্ডলের অন্যান্য অংশ।[২০]

(দুই) ফ্রেনোলজী (Phrenology)

ফিজিওনোমী ব্যক্তি আচরণ মূল্যায়নে তার মুখমণ্ডলের গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের উপর গুরাত্বোরোপ করে। কিন্তু মানবীয় আচরণ নির্ণয়ে মুখমণ্ডলের গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না বিধায় ফিজিওনোমীর তত্ত্বের কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে আরও যুক্তিনির্ভর একটি বিষয়ের উন্মেষ ঘটে, যার নাম ফ্রেনোলজী (Phrenology)। ফ্রেনোলজী হচ্ছে এমন একটি বিষয়, যেখানে মস্তক খুলির (Skull) গড়ন ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মানবীয় আচরণ সম্পর্কে পঠন-পাঠন ও গবেষণা করা হয়। এ ক্ষেত্রে অনুমান করা হয় যে, মস্তক খুলির কোন বিশষ ধরনের গড়ন ও বৈশিষ্ট্য অপরাধপ্রবণতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী।[২১] এ তত্ত্ব উদ্ভব ও বিকাশের ধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত পথে এগিয়ে নিয়ে যান Franz Joseph Gall (1758- 1828 Ad.)।

অপরাধবিজ্ঞানী সিজার লম্ব্রোসোর মতে, অপরাধীরা জন্মগতভাবেই অপরাধী হয়ে জন্মায়। তার মতে, মানব সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন অংশের আকৃতি নির্দিষ্ট ধরনের হলে তার মাঝে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সে অপরাধ করবেই। সিজার লম্ব্রোসোর মতবাদ অনুযায়ী নিরাপরাধীদের থেকে অপরাধীদের পৃথক করা যায় এমন দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যা তাদের দেহে দূর পূর্বপুরুষের লুপ্তপ্রায় জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ এখনও বহন করে।[২২] অর্থাৎ তার মতে ঐসব ব্যক্তিরাই অপরাধী যাদের দেহে মানুষের পূর্বপুরুষের অবিকশিত শারীরিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পায়। এ হিসেবে তাই অপরাধীরা মানব বিবর্তনের ক্রমধারায় এমন একটা স্থান অধিকার করে আছে যে, তারা এখনও যেন পূর্ণ বিকশিত সভ্য নিরাপরাধ মানুষে পরিণত হয়নি। চার্লস ডারউনের (১৮০৯-১৮৮২ খ্রি.) মানুষের ক্রমবিবর্তন মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সিজার লম্ব্রোসো মত প্রকাশ করেন যে, মানব বিবর্তনের প্রথম দিকের একটি পর্যায়ের সঙ্গে অপরাধীর জৈবিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় এবং পূর্ণ বিকশিত আধুনিক পূর্ণাঙ্গ মানুষের উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অপরাধীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিকৃষ্টতর। আর তাই তারা স্বাভাবিকভাবেই অধুনিক সভ্যতার সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে অক্ষম। সামাজিক প্রথা ও মূল্যবোধের সঙ্গে চলতে অক্ষম নিকৃষ্ট দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ তার পারিপার্শিক সমাজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়; আর তা তাকে অপরাধের দিকে চালিত করে। লম্ব্রোসো মনে করেন, যে অপরাধী সে

২০. Vold B. George, *Theocratical Criminology* (USA: Oxford University Press,n.d), p.19
২১. *Ibid*, p.19
২২. Stephen Schafer, *ibid*, p.120

জন্মগতভাবেই অপরাধী।[২৩] সিজার লম্ব্রোসো সহস্রাধিক কয়েদীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধীদের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক অস্বাভাবিক এবং কিম্ভূতকিমাকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন যা অপরাধীকে চিহ্নিত করতে সহায়ক বলে বিবেচিত। মূলতঃ এসব অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য লুপ্ত আদিম মানবের পরিচয় বহন করে এবং এরাই পূর্ণ বিকশিত আধুনিক সভ্য মানব সমাজের সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে অক্ষম বিধায় অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি এ ধরনের বেশ কিছু অস্বাভাবিক শারীরিক বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রণয়ন করেন। যেমন-

১. অসামঞ্জস্যপূর্ণ মুখমণ্ডল (Aysmetrical face);

২. বৃহদাকার এবং অতিবিকশিত চোয়াল (Large and excessive dimention of jaw);

৩. ত্রুটিপূর্ণ চোখ (Defective eyes);

৪. অস্বাভাবিক কানের আকৃতি (Unusual ear);

৫. পশ্চাদগামী কপাল (Receding forehead);

৬. বক্রাকৃতির নাক (Twilled nose);

৭. মাংসল এবং স্ফীত ঠোঁট (Fleshy and swollen lips);

৮. অপর্যাপ্ত দাড়ি (Scant beard);

৯. পশমী চুল (Wooly hair);

১০. দীর্ঘ বাহু (Long arms);

১১. অস্বাভাবিক দন্তোদগম (Abnormal dentition);

১২. অস্বাভাবিক থুতনি (Abnormal chin);

১৩. ত্রুটিপূর্ণ বক্ষস্থল (Defective thorax);

১৪. অস্বাভাবিক এবং অসামঞ্জস্য যৌনাঙ্গ (Abnormal and inconsisten sex organ);

১৫. অতিরিক্ত সংখ্যক আঙ্গুল (Supernumerary fingers);

১৬. মস্তিস্কের দুই মেরুর মধ্যে ভারসাম্যহীনতা (Imblance of the hemispheres of the brain);

১৭. অস্বাভাবিক মস্তক (Abnormal head) প্রভৃতি।[২৪]

কোন নরগোষ্ঠীর সাধারণ মস্তকাকৃতির থেকে ভিন্নতর মস্তক অপরাধপ্রবণতার একটি লক্ষণ। সিজার লম্ব্রোসোর এ কথাগুলো সমালোচনার চোখে দেখলে মনে হয় আধুনিক যুগে এ অপরাধতত্ত্ব অচল। লম্ব্রোসোর এ মতবাদকে

২৩. Stephen Schafer, *ibid*, p.126
২৪. *Ibid*, pp.127-28

অনেক অপরাধবিজ্ঞানীই সমালোচনা করেছেন আবার অনেকে এ মতবাদকে একেবারেই গ্রহণ করেননি। ড. গোরং তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি হাজার হাজার অপরাধী এবং নিরাপরাধীর তুলনামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন, দৈহিক অস্বাভাবিকতা মোটেই অপরাধ করার মূল কারণ নয়। অবশ্য লম্ব্রোসো তার জীবনের শেষের দিকে বলেন, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে মানুষ অপরাধ করে।[২৫] অপরাধ বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে, অপরাধকরণ তত্ত্বে লম্ব্রোসো কোন সুস্পষ্ট কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবুও তার অবদান বিপুল। কারণ অপরাধতত্ত্ব আলোচনা করতে গেলে লম্ব্রোসোর কথা উঠবেই অন্তত এ কারণে যে, মানুষ জন্মগত অপরাধী কি না।

২। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

অপরাধ সৃষ্টির পেছনে মনস্তাত্ত্বিক কারণও বিশেষ প্রভাব রাখে। মানুষের ব্যক্তিগত ও মানসিকতার সুষ্ঠু বিকাশ না হলে ব্যক্তির মাঝে অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। মানসিক দুর্বলতা, মানসিক বিকার ও বিপর্যস্ততা মানুষকে অপরাধমূলক কাজে প্রবৃত্ত করে। সুস্থ ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা অর্জনে যখন মানুষের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়, তখনই মানুষ অপরাধ করতে বাধ্য হয়। মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়, দুর্বল চিত্ত, মনোদৈহিক ব্যাধি প্রভৃতির কারণে মানুষ অপরাধ করে। অপরাধ-প্রবণতার জন্য যেসব মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি দায়ী তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রত্যাখাত হওয়া, অতিরিক্ত আদর, স্নেহ, অতিশাসন, পিতামাতার দাম্পত্যকলহসহ অন্যান্য অস্বাভাবিক আচরণ, ব্যর্থতা, হতাশা, অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, পিতামাতার উচ্চাশা ইত্যাদি।

এ মতবাদের প্রবর্তক হলেন সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud)।[২৬] সিজার লম্ব্রোসো যেখানে বলেছেন, জন্মগত হেতু মানুষ অপরাধ করার প্রবণতা পায়, সেখানে ফ্রয়েড এর মত হল জন্মগত নয়; বরং পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতিতে সাধারণত মানুষের আবেগ পরিপূরণে বিঘ্ন ঘটে, ফলে মানুষ অপরাধী হয়। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের দু'ধরনের মৌলিক সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে। যথা, জীবন প্রবৃত্তি (life Instinct) এবং মরণ প্রবৃত্তি (Deth Instinct)। জীবন প্রবৃত্তি মানুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন বাসনা, ভালবাসা প্রবৃত্তির চাহিদার মূলে সক্রিয়। জীবন প্রবৃত্তি মানুষকে বেঁচে থাকার, তার বংশ বৃদ্ধির এবং সর্বোপরি তার অস্তিত্ব বজায় রাখার পেছনে এক দুর্দমনীয় অনুপ্রেরণা বা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। অপরপক্ষে মরণ প্রবৃত্তি ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এবং

---

২৫. হামজা হোসেন, *অপরাধবিজ্ঞান* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯৫খ্রি.) পৃ. ৮৪

২৬. সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Frud), ১৮৫৬ সালে মোরাভিয়ার অন্তর্গত ফ্রাইবার্গ নামক ছোট শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জেকব এবং মাতার নাম এ্যামিলিয়া নাথানস। তিনি ১৮৭৩ ডাক্তারী পড়ার জন্য ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৮৮১ সালে ডাক্তারী পাস করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Essentials of Psycho-Analysis. ১৯৩৯ সালে তিনি মারা যান। (বি. দ্রঃ *Encyclopedia Americana*, USA: American Corporation, 1924, vol-12, pp. 83-87)

সর্বোপরি ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। মরণবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ হিংষা-দ্বেষ ইত্যাদির আশ্রয় নেয় এবং যে কোন ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হয়।[২৭]

ফ্রয়েডের উপর্যুক্ত তত্ত্বটি অপরাধ বিশ্লেষণে বেশ খানিকটা সহায়ক। কেননা, জীবন প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে মানুষ চায় অর্থপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে। সে তার মৌলিক চাহিদাগুলো যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা,বস্ত্র, বাসস্থান, যৌন লিপ্সা ইত্যাদি মেটানোর জন্য তৎপর থাকে। এসব পূরণের পন্থা ও পদ্ধতি সর্বদাই সহজ নয়। কারণ এসব চাহিদা মেটাতে ব্যক্তিকে বাস্তবতার সম্মুখীন হতে হয় এবং হতে হয় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। অন্যদিকে মরণ প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে ব্যক্তি একদিকে যেমন হিংসা, দ্বেষ এবং ধ্বসাংত্মক মনোভাবেরেই শুধু পরিচয় দিচ্ছে তা নয়, সেগুলো ব্যর্থ হলে ফ্রয়েড কথিত মরণ প্রবৃত্তির অমোঘ নিয়মে আত্মহত্যার মত অপরাধে লিপ্ত হতে চায়। শুধু তাই নয়, মরণ প্রবৃত্তি আক্রমণাত্মক প্রেষণা বা তাড়না সৃষ্টি করে। এ কারণে কোন ব্যক্তি কারো বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং অনেক সময় মরণ প্রবৃত্তির পথে যতসব অন্তরায় রয়েছে, তাকে দূর করার জন্য সে আক্রমণাত্মক এবং আপোষহীন পন্থা বেছে নেয়। সর্বপরি জীবন এবং মরণ প্রবৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ তার বিভিন্ন কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকে এবং তা স্বাভাবিকভাবেই মানুষকে প্রায়ই অপরাধ প্রবণতার ইন্ধন যোগায়।[২৮]

সিগমুন্ড ফ্রয়েড এর মতবাদের সমর্থনে অপরাধপ্রবণ কিশোরের ব্যক্তিত্ব কাঠামো বর্ণনা করে Earl Rabb and Gertrude J Selznick বলেন, The structure of a delinquent personality has been identified as follows: (a). Suffering from emotional deprivation; (b). Failure in respect of internalizing moral principles and emotional rasons; and (c). Aggressive response towards authority.[২৯]

আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে মানসিক গুণাবলীর সুষ্ঠু বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের অভাবে শিশু-কিশোররা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। এজন্যই প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড অবদমিত কামনাকে অপরাধের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩০]এ ব্যাপারে বার্ট্রান্ড রাসেলের মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "বেশিরভাগ নিষ্ঠুরতার জন্ম হয় শৈশবকালীন বঞ্চনা এবং নিপীড়নের কারণে। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ হলে মনের কোমল অনুভূতিগুলো নষ্ট হয়ে তার বদলে জন্ম নেয় হিংসা, নিষ্ঠুরতা এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাব। এছাড়া ব্যক্তিগত আবেগীয় সমস্যাও কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এধরনের কিশোররা

---

২৭. Clavin S. Hall and Gradner Lindzey,*Theories of Personality* (New York: Jehon Willeyssons,1966), p.40
২৮. বোরহান উদ্দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪
২৯. Earl Rabb and Gertrude J. Selznick, *Major Social Problems* (New Yourk: Herper and Row Publishers,1964, 2nd Ed.), p. 47
৩০. Robert C. Trojanowicz, *Juvenile Delinquency Concepts and Control* (New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1978), p.55

খুব সহজেই অনিয়ন্ত্রিত আবেগে আক্রান্ত হয়ে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সুখ ও সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হয় এবং অপরাধ সংঘটন করে।[৩১] এজন্যই অনেক মনোবিজ্ঞানী কিশোর অপরাধের জন্য বাধাগ্রস্ত আবেগকে দায়ী করে থাকেন।

কিশোর অপরাধ সংঘটনে উপর্যুক্ত কারণগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সক্রিয় থাকতে পারে। তবে কিশোর অপরাধের প্রধান ও মূল কারণ হলো মানসিক। কেননা মানুষের প্রতিটি কর্মই মনের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম তার নিয়ত অনুসারে হয়ে থাকে।[৩২] আর মানসিক বিকাশ সঠিক ও সুন্দর প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন না হলে শিশু-কিশোরদের আচরণে বিরূপ প্রভাব পড়ে যা তাকে অপরাধপ্রবণতার দিকে ধাবিত করে। মানব মন মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর সুষ্ঠু লালন ও বিকাশ সাধন করলে তা ভাল কাজ সম্পাদন করে। আর লালন ও বিকাশ সাধনে ত্রুটি হলে তা দ্বারা মন্দ কর্ম বা অপরাধ সংঘটিত হয়। মনের এ বিপরীতমুখী দ্বিবিধ আচরণের বাস্তব তত্ত্ব পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا –فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا– قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا– وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا–

অর্থ: "শপথ মানুষের এবং শপথ সে সত্তার, যিনি মানুষকে সুঠাম করেছেন; এরপর যিনি মানুষকে তার খারাপ কাজ ও ভাল কাজের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে পরিচ্ছন্ন রেখেছে সেই নিশ্চিত কল্যাণ লাভ করেছে। আর ব্যর্থ হয় সে ব্যক্তি যে নিজেকে অপবিত্র করে।"[৩৩] আর মানব মন পবিত্র করা প্রসঙ্গে নু'মান ইবন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলছেন,

الا وان فى الجسد مضغةً اذا صَلحت صلح الجسدُ كلهُ واذا فسدت فسد الجسدُ كلهُ الا و هى القلب–

অর্থাৎ-"সাবধান! শুনে রেখো, দেহে একটি গোশতের টুকরা আছে, যখন তা সুস্থ ও ভাল থাকে তখন সমস্ত শরীর ভাল থাকে। এবং যখন তা নষ্ট ও বিকৃত হয়ে যায় তখন সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়। যেনে রেখো সেটি হলো ক্বালব বা অন্তর।"[৩৪] সুতরাং দেখা গেল যে, মনস্তাত্ত্বিক কারণেও শিশু-কিশোর অপরাধ করতে পারে।

---

৩১. মো. আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭

৩২. যেমন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে,

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

(ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ), *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: বাদউল ওহী, অনুচ্ছেদ: কায়ফা কানা বাদউল ওয়াহী ইলা রাসূলিল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-০১)

৩৩. আল- কুরআন, ৯১: ৭-১০

৩৪. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ), *সহীহুল বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২

৩। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি

অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। আবার অর্থের প্রাচুর্যও অপরাধপ্রবণতা সৃষ্টি করে। সম্পদের অসম বণ্টন, বেকারত্ব, দরিদ্র্যতা ও মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি কারণে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে বিচিত্র ধরনের অপরাধ বা অপকর্ম সংঘটিত হয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, পতিতাবৃত্তি, সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ অর্থনৈতিক কারণেই সৃষ্টি হয়। এ মতবাদের প্রবক্তা সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.) ও ফ্রেড্রিচ এঞ্জেলস (১৮২০-১৮৯৫খ্রি.)। কার্ল মার্কস এর মতে কিশোর অপরাধসহ সবধরনের অপরাধের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ।[৩৫] তাদের মতে চুরি, ডাকাতি শুধু অভাব-অনটন পীড়িত সাধারণ মানুষ করে না; বরং বৃহৎ শিল্পপতিরা রাহাজানি ও লুটপাট করে থাকে। তাঁরা ‘উদ্বৃত মূল্য’ আবিষ্কার করে বলেন, উৎপাদন ও বণ্টন বৈষম্যের ফলে সমাজের এক শ্রেণির লোক ক্রমশঃ সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রলেতারিয়েতে পরিণত করে পুঁজিপতিরা ক্রমশঃ উদ্বৃত মূল্যের সবটুকু আত্মসাৎ করে বুর্জোয়া বা ধণিক শ্রেণিতে পরিণত হচ্ছে। শ্রমিকরা ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেয়ে পথে বসে যাচ্ছে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে।[৩৬]

তাই অপরাধের কারণ নির্ণয়ে সমাজতন্ত্রীদের উৎস কার্ল মার্কস ও ফ্রেড্রিচ এঞ্জেলস এর মতামত। তাদের মতে, অপরাধ হল অর্থনৈতিক দুরাবস্থার উপজাত সৃষ্টি। তারা অর্থনীতির গরমিলের জন্য অপরাধ সংখ্যার উঠতি-পড়তি হিসাব করে দেখিয়েছেন। অবশ্য এ হিসাব-নিকাশ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে নির্ধারিত। E. H. Sutherland (1883-1950 Ad.) and E. R. Gressey তাদের এ মতবাদের সমালোচনা করে বলেন, “Neverthless, the school may properly be called scientific, for it began with general hypothesis and collected factual data in a manner which enabled others to repeast the work and test their conclusion”[৩৭] এ মতবাদে বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে মানুষ অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। অপরাধপ্রবণতার জন্য অর্থনৈতিক কারণ উল্লেখযোগ্যভাবে দায়ী হলেও এ কথা ঠিক যে, মানুষ শুধু অর্থনৈতিক কারণেই অপরাধে লিপ্ত হয় না। কেননা, এ ক্ষেত্রে জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও ভৌগলিক কারণও রয়েছে। মার্কসবাদীদের সুপারিশ অনুযায়ী উৎপাদন যন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ ঘটিয়ে যদি সামাজিক মালিকানা সৃষ্টি করা হয়, তাতে সমাজ হতে অপরাধ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হবে। কিন্তু তাদের এ বক্তব্য যে পুরোপুরি বাস্তবসম্মত তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

অমার্কসবাদীগণ মনে করেন, উৎপাদন যন্ত্রে সামাজিক মালিকানার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিগণ উৎপাদন কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে, যেমনঃ শ্রমিক, ব্যবস্থাপক, বিশেষজ্ঞ, পরামর্শদাতা প্রমুখ তারা প্রত্যেকেই

---

৩৫. অধ্যক্ষ মো: আলতাফ হোসেন, *অপরাধ বিজ্ঞান* (ঢাকা: মুহিত পাবলিকেশন, ২০১০খ্রি.), পৃ. ২৩৬

৩৬. হামজা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

৩৭. Edwin Hardin Sutherland and Donald Ray Cressey, *Pinciples of Criminology* (New York: Lippincott Company, 1955), p. 80

মানুষ- সবাই এক এক জন ব্যক্তি। লোভ-লালসা, কামনা, অর্থলিপ্সা ও ক্ষমতা, সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অর্জনের সম্পৃক্ততা ইত্যাদি মানবীয় সহজাত বৈশিষ্ট্য ঐসব ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বর্তমান থাকে। এর ফলে তারা যে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে মোটেই অপরাধে লিপ্ত হবে না, এমনটি জোর করে বলা যায় না। আপাতত কথিত বৈষম্যহীন সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যদিও ব্যক্তি মালিকানায় উৎপাদন যন্ত্র রাখার সম্ভাবনা নেই বা সম্ভাবনা সীমিত, তথাপি মুনাফা অর্জন, উৎকোচ লেন-দেন, সামাজিক সম্পদ আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধমূলক আচরণের পন্থা একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে, এ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না।[৩৮]

৪। ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইতিহাসবেত্তা, সমাজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীগণ মানব আচরণ ভৌগলিক প্রভাবের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল বলে মনে করেন। অপরাধমূলক আচরণ যেহেতু এক ধরনের মানবীয় আচরণ সেহেতু তার উপর ভৌগলিক উপাদানসমূহের প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না। কেননা, সামাজিক জীবনের উপর ভৌগলিক প্রভাব এতই ব্যাপক যে, জনসংখ্যা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ও পানীয়, অর্থনৈতিক জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, ধর্ম, শিল্পকলা, সাহিত্য, রাজনীতি, সভ্যতার উত্থান-পতন ইত্যাদির উপর এব প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।[৩৯] এই মতবাদটি কিশোর অপরাধ এলাকা ধারণার কাছাকাছি। যা মূলত Clifford and others প্রতিষ্ঠা করেন।[৪০] তাদের যুক্তি হলো- দেখা যায় যে, গ্রাম অঞ্চল অপেক্ষা শহর অঞ্চলে অপরাধের পরিমাণ অনেক বেশি। শহরের প্রাণ কেন্দ্র হতে ক্রমান্বয়ে অবস্থানগত ক্রম দুরত্বের সাথে অপরাধপ্রবণতাও ক্রমহ্রাসমান হতে থাকে। এই মতবাদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিশোর অপরাধের মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে এবং শহরের ঘিঁচি ঘিঁচি বস্তি এলাকাকে অপরাধের প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

এ মতবাদের প্রবক্তা এডলফ কুয়েটলেট (১৭৯৬-১৮৭৪ খ্রি.) এবং এ এম গোরী (১৮০২-১৯৬৬ খ্রি.)। উভয়ই ফ্রান্সের অধিবাসী। ১৮৩০-১৮৮০ সাল পর্যন্ত এ মতবাদের জোর প্রচার চলে এবং ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে এ মতবাদের অনেক অনুসারী জোটে। অবশ্য এ মতবাদকে আরো জোরদার করেন লেভীন ও লিন্ডস্মিথ। এর মূল বক্তব্য হল অপরাধ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয় এবং দেশের কতিপয় অঞ্চলে অপরাধপ্রবণতার উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হয়। কারণ ভৌগলিক অবস্থান ও অপরাধ করার সুযোগের উপর অপরাধের উর্ধ্বগতি নির্ভর করে। অপরাধবিজ্ঞানী লম্ব্রোসো বলেন, সমতলভূমিতে সাধারণত খুন জখম কম দেখা যায়, পাহাড়ী অঞ্চলে কিছু এবং পার্বত্য অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী খুন জখম হয়ে থাকে।[৪১] জলবায়ুর তারতম্যের জন্য অপরাধের হারে যেমন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, ঠিক তেমনি আবহাওয়ার তারতম্য অপরাধের উপর প্রভাব রাখে। অন্যদিকে জলবায়ূর

---

৩৮. বোরহান উদ্দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১
৩৯. P. Sorokin, *Contemporary Sociological Theories* (New York: Harper and Row,1724), pp.99-193
৪০. Clifford, R Shaw and Henry Donald Mckay, *ibid*, P. 63
৪১. Gillin John Lawis, *Criminology and Penology* (USA: Green Wood Press, 1977), p. 71

প্রভাবজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার অনেক শিশু-কিশোর পারিবারিক পরিবেশের বাইরে উদ্বাস্তু ও ভাসমান হিসেবে বেড়ে উঠে। বিধায় ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত এসব কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া অরণ্যে ঘেরা দূর্গম পাহাড়ী এলাকা, চরাঞ্চল ও সীমান্তবর্তী এলাকার কিশোর-কিশোরীরা তুলনামূলক অপরাধপ্রবণ হয়।[৪২]

এ মতবাদ পর্যালোচনা করে লক্ষ্য করা যায়, অপরাধ করার প্রচুর সুযোগ থাকলে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু কেন বৃদ্ধি পায় এবং তার মূল সূত্র কী, এ ব্যাপারে তারা কোন কারণ প্রদর্শন করতে পারেননি। কিশোর অপরাধের সাথে ভৌগলিক পরিবেশের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যেমন মরু এবং গ্রীষ্ম প্রধান এলাকার মানুষ সাধারণত রুক্ষ স্বভাবের ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে থাকে।

৫। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

অপরাধ ও কিশোর অপরাধের কারণ বিশ্লেষণে 'সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি' সর্বপ্রথম আলোচনা করেন অপরাধবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী David Emile Durkheim (1858-1917Ad.)।[৪৩] তিনি বলেন, "The more weakened the group to which one belongs the less one depends on it, the more one consequently depends only on oneself, one recognizes no other rules of conduct than what are founded on one's private interests.[৪৪] অর্থাৎ সামাজিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর সদস্য তাদের নিজেদের উপর খুব কম নির্ভর করে, সে শুধু নিজের উপরই ভরসা করতে চায়, এতে তারা এমন চিরায়ত সামাজিক ক্রিয়াশীল রীতি-নীতি পায় যা তাদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে। ফলে তারা সামাজিক নিয়ম-নীতির প্রতি উদাসসীন থাকে এবং বিকল্পপন্থায় উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাপৃত হয়। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মতবাদ মূলত সামাজিক বিশৃঙ্খলার ও জটিলতার প্রেক্ষিতে জন্ম নিয়েছে। 'সামাজিক বিশৃঙ্খলা' ধারণা সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজের ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের দুর্বল কার্যক্রমকে আমাদের সামনে প্রকাশ করে। তাছাড়া নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ছোঁয়ার ফলে পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কমিউনিটি খুবই কম কার্যকরী এবং সংযোগশীল ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সদস্যদের উপর কাযকরী নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা হারিয়েছে, বিশেষ করে অনুজদের নিকট ঐতিহ্যগত মৌলিক মানবতাবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক নিয়ম-নীতি হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে। তাই

৪২. ড. এ. এইচ. এম. মোস্তাফিজুর রহমান, *সামাজিক সমস্যা* (ঢাকা: লেখা-পড়া, ২০১১খ্রি.), পৃ. ২২৭

৪৩. ফ্রান্সের অন্যতম সমাজবিজ্ঞানী ও অরাধবিজ্ঞানী ডেভিড ইমেল ডুর্খেইম। তিনি ১৮৫৮ সালে ফ্রান্সের এপিনাল শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালে রাজধানী প্যারিসে মারা যান। তিনি সমাজ বিজ্ঞানকে একাডেমিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন। সামাজিক স্তরবিন্যাস সংক্রান্ত মতবাদ প্রদান করে তিনি অমর হয়ে আছেন। কার্লমার্কস, ম্যক্স ওয়েবার এবং ডব্লিউ.ই.বি ডুবিস এর সাথে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের প্রধান কারিগর হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। (Wikipedia.com)

৪৪. David Emile Durkheim, *Suicide:A Study in Sociology*, Trns. Johan A. Spoulding and George Simpson (New York: The Free Press, 1951), p.87

সামাজিক অনাচার বা বিশৃঙ্খলার অভিগমনে কিশোর অপরাধ বা অপরাধ আচরণ হলো সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ অর্জনে পরাজিত বা ব্যর্থতার ফল। সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক মূল্যবোধ সুশৃঙ্খলভাবে ও ক্রিয়াশীল হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে নৈতিকমূল্যবোধের মানদণ্ড সমাজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাধারণত সামাজিক ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের অবক্ষয় দু'টি প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করা হয়ঃ (১) সমাজের ঐতিহ্যবাহী গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রিয়াশীলতার অভাব বা লোপ পাওয়া; (২) আধুনিক জীবনের নৈতিক মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব।

মানুষ একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে শুধু পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না; বরং সেই পরিবারের ব্যবহারিক নিয়ম-কানুন শিখে, সামাজিক মূল্যবোধ ধারণ করে। বড় হয়ে সমাজের সাথে তার যোগাযোগ হয়। এ সমাজ শুধু একটি লোকের ব্যবহারের আচরণকে সংযত করে না, তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনও মেটায়। বর্তমানে শহর এলাকার আধুনিক পরিবার শিশুদের কাজকর্ম, খেলা-ধুলা ও মানসিক বিকাশের অগুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। পিতা বা পিতামাতা উভয়ই বাড়ীর বাহিরে কাজে ব্যস্ত থাকায় শিশু-সন্তানকে তারা পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। ফলে শিশুকে ভদ্রতা, নম্রতা, নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়। এভাবে শিশুরা পারিবারিক শিক্ষা ও স্বাভাবিক নৈতিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিক যুগে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবন কিছুটা উন্নতর হয়েছে কিন্তু এটা ছিনিয়ে নিয়েছে পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি বৃহৎব্যাপ্তি। এভাবে পরিবার ক্রমেই শিশু-কিশোরের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। তাই পিতামাতা, স্থানীয় মুরুব্বী এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি চিরায়ত শ্রদ্ধাবোধ উঠতি যুবকদের নিকট তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না।

আধুনিক সমাজে একটি শিশু বা কিশোর খুব দ্রুত গতিতে তার পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যান্য দলের সঙ্গে মিশছে, লোকজন গ্রাম ছেড়ে বসবাসের জন্য শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। ফলে মানুষ পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হতে দূরে সরে যাচ্ছে। আবার বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র ও ইন্টারনেটসহ তথ্য-প্রযুক্তি বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার সংবাদ সর্বসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। এর ফলে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত আদর্শের সাথে এসবের মোটামুটি একটা সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে। এতে ব্যবহারিক জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটছে। অপরাধবিজ্ঞানী Rabb and Selznick এই দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে বলেন, "There are also many value conflicts in the present day society which weaken traditional values by loosening the individual's ties to traditional groups in a society. Such as:

ক. Conflict between sets of values (মূল্যবোধের বিভিন্ন সেটে'র দ্বন্দ্ব);
খ. Conflict between ends and means (লক্ষ্য ও সংস্থানের দ্বন্দ্ব) এবং
গ. Conflict between goals and achievement (লক্ষ্য ও প্রাপ্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব)।[৪৫]

---

৪৫. Earl Rabb and Gertrude J. Selznick, *ibid*, pp. 51-52

ক। মূল্যবোধে বিভিন্ন সেটে'র দ্বন্দ্ব (Conflict between sets of values)

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজে বিভিন্ন আঙ্গিকে নৈতিক মূল্যবোধ ধারণ করা হয়। সাধারণত এ মূল্যবোধের মানদণ্ড সমাজে অঞ্চল, ভাষা, ধর্ম, ধর্মীয় গোষ্ঠী, আদিবাসী, আকাশ সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতিভেদে তৈরি হয়। অর্থাৎ একেক অঞ্চলের মূল্যবোধ একক রকম; আবার ভিন্ন ভাষা-ভাষির সামাজিক মূল্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন। মূল্যবোধের এই ভিন্নতা ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি নির্ভরও হতে পারে। আধুনিক কালে নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে সামাজিক গতিশীলতা, গণযোগাযোগের ব্যাপক উন্নতি এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তি উক্ত নানামুখী 'মূল্যবোধ সেট' এর মুখোমুখী হচ্ছে। ব্যক্তি ধর্মগত দিক থেকে যে মূল্যবোধ ধারণ করে, কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চল, ভাষা বা সংস্কৃতির কারণে বিপরীত বা ভিন্ন মূল্যবোধের মুখোমুখি হতে পারে। অথচ দুই বা ততোধিক দ্বান্দ্বিক 'মূল্যবোধ সেট' যদি কোন ব্যক্তির উপর ক্রিয়াশীল থাকে তাহলে কোনটাই পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয় না। ফলে ব্যক্তির মনে উক্ত মূল্যবোধের কোনটির প্রতি দোদুল্যতা, বিরোধ অথবা উপেক্ষা জন্ম নেয়। এ অবস্থায় উঠতি কিশোরের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ড বজায় রাখা কষ্টকর হয়।

খ। লক্ষ্য ও পদ্ধতির মধ্যে দ্বন্দ্ব (Conflict between ends and means)

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রবল প্রবণতা ও প্রচেষ্টা রয়েছে। এ জন্য একজন ব্যক্তি আজীবন প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজ-সংস্কৃতি একজন ব্যক্তির লক্ষ্যে পৌঁছানোর সফল প্রচেষ্টার জন্য সাধারণভাবে বৈধ উপায়ের উৎসাহিত করে না বরং অবৈধ উপায়ের প্রতি বেশি উৎসাহিত করে। সমাজের অসাধুতা, দুর্নীতি, সম্পদের অসম বণ্টন, আইনের ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘন, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি প্রভৃতিও কোন কোন সময় সামাজিক অনিষ্ট এবং অন্যান্য সমাজবিরোধী আচরণ উপহার প্রদান করে। বর্তমান বস্তুজাগতিক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি শুধুমাত্র তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টায় মত্ত। কিন্তু সবাই বৈধপন্থায় লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে না। যার যার লক্ষ্য ও গন্তব্যে পৌঁছার জন্য যেকোন পন্থা অবলম্বনে তৎপর থাকে চাই তা বৈধ হোক বা অবৈধ হোক, সমাজের জন্য কল্যাণকর বা অকল্যাণকর হোক। উপরোক্ত বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে উঠতি শিশু-কিশোর সামাজিক দ্বান্দ্বিক মূল্যবোধ ধারণ করে। সমাজবিজ্ঞানী বোরহান উদ্দীন খান বলেন, মানুষের চাহিদা সীমাহীন। কিন্তু যোগানের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ একে অপরের যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সঙ্গে নিজের অবস্থানটি তুলনা করে এবং অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা অতিশয় উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠে। এ ধরনের অদম্য উচ্চাভিলাষ মানুষকে তার লক্ষ্য অর্জনে যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করে।[৪৬] যা কিশোরদের অপরাধপ্রবণ মন-মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

---

৪৬. বোরহান উদ্দীন খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪

গ। লক্ষ্য ও প্রাপ্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব (Conflict between goals and achievement)

জীবন-জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা ও অর্জনের সম্ভাব্যতার মধ্যে বিস্তর দূরত্ব থাকার কারণে নৈতিক মূল্যবোধ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। যারা সমাজে সুবিধাবঞ্চিত, পরিত্যক্ত বা অবহেলিত এবং সাধারণভাবে নিম্ন আর্থ-সামাজিক স্তরে বসবাস করে তাদের জন্য এটা চরম সত্য। সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যের প্রেক্ষিতে যখন কোন আদর্শ অলভ্য মনে হয় তখন এমন একটি বোধ তৈরি হয় যে, মানুষের মধ্যে প্রচলিত এসব আদর্শের কী মূল্য আছে। যা কোন কোন সময় তাদের বঞ্চনার উৎস হিসেবে সমাজ ও সমাজের নিয়ম-কানুনের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণের জন্ম দেয়।

সভ্যতা কোন পদার্থ নয়; তবে ব্যবহারিক নিয়ম-কানুন বা আদর্শ মেনে চলতে শেখায়। এ আদর্শগুলো এমনভাবে গ্রথিত, একটিতে যদি দোষ থাকে, তখন সব আদর্শই ব্যাহত হয়। প্রত্যেক সমাজে মানুষের ব্যবহারিক যে আইন থাকে, তা অমান্য করলে সামাজিক শাস্তি যেমন, একঘরে করে রাখা অর্থাৎ সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে রাখা, তেমনি আবার রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত শাস্তিও আছে। তাই সমাজ বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, শিশু-কিশোরের অপরাধপ্রবণতার জন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ প্রভাব রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী William Healy (1869-1963 Ad.) এবং Augusta F. Bronner কিশোর অপাধের কারণ হিসেবে সামাজিক পরিবেশের প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন।[৪৭] সামাজিক রীতিনীতির জটিলতার জন্য মানুষ অপরাধ করে থাকে। গ্রামের সহজ-সরল মানুষ শহরে এসে জটিল রীতিনীতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। এমনকি শহুরে সমাজে আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ-সুবিধা না পেয়ে মানুষ এর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়।

মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য অনুকরণপ্রিয়তা। সমাজে মানুষ বসবাস করতে গিয়ে এমন সব ব্যক্তিদের আচার-আচরণ, রুচি এবং ফ্যাশনের অনুকরণ করে, যা ব্যক্তির মনকে আকৃষ্ট করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় সমাজবদ্ধ মানুষ একে অপরের আচরণকে নকল করে এবং স্বাভাবিকভাবেই এসব অনুকরণ ব্যক্তির আচাররূপে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, অপরাধ হলো সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা হতে সৃষ্ট। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Gabriel Trade (১৮৪৩-১৯০৪খ্রি.) বলেন, একজন অপরাধী খুন, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি যখনই করে, ধরে নিতে হবে যে, সে অন্য কাউকে অনুকরণ করছে।[৪৮]

সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের জনক David Emile Durkheim (1858-1917 Ad.) এর মতে, "Crime is a natural and ineritable incident of social evolution. Some individual freedom

---

৪৭. মো. আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪

৪৮. Gabriel Trade (Trans:Rapelje Howell), *Penal Philosophy* (New Brunswick: Transaction Publicshers, 2001), p. 323

must exist if progress is to continue but freedom is always abused by certain groups and so crime is the price that we must pay for progress.”[৪৯] মূলকথা অপরাধ হলো সমাজ-প্রগতির অনিবার্য সহজাত অংশবিশেষ। প্রগতির জন্য কিছুটা ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রয়োজন। এ স্বাধীনতা কিছুসংখ্যক দল অপব্যবহার করে। এজন্য প্রগতির খাতিরে অপরাধকে হজম করতে হয়।

তাই দেখা যায়, সমাজের প্রত্যেক লোক আইন-কানুন মেনে চলে না। তার কারণ হয়তবা মানুষের জন্মগত ভিন্নতা। মানুষের স্বকীয়তা, শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রভেদসমূহ ও সামাজিক পরিবর্তনের মূলসুর অবলম্বনে প্রতিটি মানুষ যেন আলাদা। সামাজিক বিপর্যয় ও পরিবর্তনের সাথে সুযোগ-সুবিধামত ভদ্রলোকেরাও অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। তাই বলা চলে “If social disorganization persists crime and delinquency tend to become institutionalised in certain areas and nighbourhoods, which not only attract law violatiors, but also produce and protect them. It is in to law violation develope and the principal roots of professional and organized crime flourished.[৫০] অর্থাৎ-অনিয়ন্ত্রিত সমাজের নির্দিষ্ট এলাকা ও তার আশেপাশে অপরাধ এবং কিশোর অপরাধ প্রতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করে, যা শুধুমাত্র আইন ভঙ্গকারীদেরকেই প্রলুব্ধ করে না, বরং অপরাধের প্রসার এবং তাদের রক্ষায়ও ভূমিকা পালন করে। এর ফলে আইন ভঙ্গ এবং পেশাদার ও সংঘটিত অপরাধ বৃদ্ধি পায়

মোদ্দকথা, সমাজবিজ্ঞানীরা এক কথায় বলতে চেয়েছেন, স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব, প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি ও সভ্যতার বিরোধের ফলে মানুষ অপরাধ করে। এ প্রতিযোগিতার মূল উৎস হলো সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গনের ফল। আমেরিকান অপরাধবিজ্ঞানী Donald R. Taft এসকল সামাজিক কারণ গ্রহণ করে বলেছেন, জন্মবৃত্তান্ত মনোসমীক্ষণ ছাড়া অপরাধের কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। তিনি আরো বলেন, “Crime grows out materialistic minded society with its striving for prestige and wealth.”[৫১] অর্থাৎ-বস্তুজাগতিক মানসিকতা নির্ভর সমাজে প্রতিপত্তি ও সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় অপরাধ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং সামাজিক আদর্শ ও আদর্শ বিরোধিতার মধ্যে অপরাধ নিহিত আছে, এ কথা অনেকে বিশ্বাস না করলেও সমাজবিজ্ঞানীদের এ কথা আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতির বিবর্তনের ভেতরে অপরাধ উপজাত সৃষ্টি হয়।

---

৪৯. David Emile Durkheim, *ibid, p.88;* হামজা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২
৫০. Robert G. Caldwell, *Criminology* (NewYork: the Ronald Press company,1956), p. 178
৫১. Donald R. Taft, *Criminology: A Cultural interpretation* (New York: Macmillan Company, 1950), Chapter-15

৬। ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ে অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ সমাজের ধর্মীয় দিকটি গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ করেছেন। তারা কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে সমাজের ধর্মহীনতা বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন না করাকে বিশেষভাবে দায়ী করেছেন। তাদের মতে শিশু-কিশোর ধর্মপালন থেকে দূরে থাকার কারণে মহান আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতাবোধ তৈরি হয় না। আখেরাত বা পরকালীন জীবন সম্পর্কে অজ্ঞাত ও উদাসীন থাকে। ফলে তারা সহজে অপরাধপ্রবণ হতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রখ্যাত বিট্রিশ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবী (Arnold Joseph Toyenbee, 1889-1975 Ad.) উল্লেখ করেন যে, "বর্তমানে ধর্মহীনতাই অন্যান্য অপরাধের ন্যায় কিশোর অপরাধের কারণ।"[৫২] ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নীতি-নৈতিকতা, ধর্ম-কর্ম পালন থেকে বিরত থাকা এক কথায় ধর্মহীনতা কিশোর অপরাধের উৎস। একজন শিশু শৈশব থেকেই নৈতিকতা শিক্ষা লাভ করলে এবং পরিবারে সততা ও নৈতিকতার চর্চা দেখলে সে শিশুটিও নৈতিকতা ও মানবিকতাবোধে অভ্যস্ত হয়ে যায়। ফলে তার দ্বারা অপরাধ কর্ম সংঘটন সম্ভব হয় না।

এপ্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ– অর্থাৎ "প্রত্যেক নবজাতক (মানব সন্তান) ফিতরাত বা স্বভাবধর্মের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মাতাপিতা তাকে ইয়াহুদী অথবা নাসারা অথবা অগ্নি উপাসক বানায়, যেমন চতুষ্পদ জন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ?"[৫৩] আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে এরশাদ করেন, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ–অর্থাৎ-"অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং আল্লাহ যে দীনের (ফিতরাতের) উপর মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহর দেয়া সে দীনের (ফিতরাতের) অনুসরণ করুন। বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।"[৫৪] পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত বাণী এবং মহানবী (সা.) এর হাদীস থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক মানব সন্তান ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। আর যদি শৈশব হতে শিশুটি নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা না পায়, ধর্ম-কর্ম না করে

---

৫২. Arnold Joseph Toyenbee, *Civitization On Trail* (London: Oxford University Press, 1st edition,1948), p.171

৫৩. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানায়িয, বাবঃ ইযা আসলামা সাবিয়্যু ফামাতা হাল ইউসাল্লা আলাহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৫৮, ১৩৫৯; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ক্বদর, বাবঃ মা'আনা কুল্লি মাওলুদিন ইউলাদু আলাল ফিত্বরাত (করাচীঃ মাকতাবাতুল বুশরা, ১৪৩২ হি.), হাদীস নং-২৬৫৮

৫৪. আল-কুরআন, ৩০ : ৩০

কিংবা পরিবারে এর চর্চা না দেখে তাহলে তার অপরাধপ্রবণতায় জড়ানো খুবই সহজ। আর একথাটিই আরনল্ড টয়েনবী তাঁর মতবাদে উল্লেখ করেছেন।

৭। শিক্ষণ মতবাদ (The Learning Theory)

কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে শিক্ষণ সংক্রান্ত মতবাদ হলো শিশু-কিশোর যেভাবে স্বাভাবিক আচার-আচরণ, কথা-বার্তা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষালাভ করে তদ্রুপ বিচ্যুত ও অপরাধমূলক আচরণও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকেই শিক্ষা নেয়। পরিবারের অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যদি অনৈতিক বা সমাজ বিরোধী কর্মকণ্ডে নিয়োজিত থাকে তাহলে পরিবারে কিশোর অপরাধ সমস্যা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। যদি পরিবারের সদস্যদের কেউ চোরাকারবারি, মাদক ব্যবসা, অস্ত্রবাজি, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত থাকে তাহলে ঐ পরিবারের সন্তানরাও একই পেশায় জড়িয়ে পড়বে। কোন কোন সময় অপরাধী পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন তাদের সন্তানকে অপরাধমূলক কাজের দিকে ঠেলেও দেয়। যেভাবে পিতামাতা, ভাই-বোনদের চরিত্র ও নৈতিকতা একজন শিশু-কিশোরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনভাবেই তাদের অপরাধমূলক কাজও শিশু-কিশোরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি পরিবারের বড় সন্তানের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা থাকে তাহলে ছোটদের মাঝেও একইভাবে অপরাধপ্রবণতা বিস্তার লাভ করে থাকে। এ ব্যাপারে সমাজবিজ্ঞানী আব্দুল হাকিম সরকার, Rhodes -এর উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, “The child sleeping in the same room with its parents sees and overhears things from which the better to do are shielded. Seeing and hearing this the shadow of father jealously fall across the young and impressionable mind. It is suppressed and ferments in the concious. But it is not suppressed forever. Under some sudden stress, if emerges not as hatred of the father, but of authority generally, the policeman or even law-abiding citizen.”[৫৫]

তাই কিশোর অপরাধ অনুধাবনে অ্যামেরিকান সমাজবিজ্ঞানী E. H. Sutherland (1883-1950 Ad.) এর Differntial Association[৫৬] তত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মতবাদের ভিত্তিতে কিশোর অপরাধের নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য চিত্র অনুধাবন করা যায়:[৫৭]

---

৫৫. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-১৬৮

৫৬. In criminology, differential association is a theory developed by Edwin Sutherland proposing that through interaction with others, individuals learn the values, attitudes, techniques, and motives for criminal behavior. The differential association theory is the most talked about of the learning theories opf deviance. www.wikipedia.com

৫৭. Edwin Hardin Sutherland and Donald Ray Cressey, *ibid*,p.80

(ক) একজন শিশু নিজ আচরণ পদ্ধতি তার নিকটজন থেকে গ্রহণ করে। একজন শিশুর যদি সমাজ বিরোধী কিংবা অপরাধপ্রবণ কিশোরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বা মিলা-মিশা থাকে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে সমাজবিরোধী বা অপরাধমূলক প্রবণতা লাভ করবে।

(খ) একজন কিশোরের স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা ও অপরাধী মনস্তাত্তিক চাহিদার কোন ভিন্নতা বা তফাৎ নেই; বরং সে যে ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির সম্মুখীন হয় সেটা ভিন্নতর। যেমন একটি দল, যার সামাজিক স্বীকৃতি প্রয়োজন এমন একজন সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে শিখালো ভেন্ডালিজম বা হৈ-হাঙ্গামা হলো স্বীকৃতি অর্জন বা পরিচিতি লাভের অন্যতম সেরা পদ্ধতি। এই প্রশিক্ষণের ফলে শিশুটি অপরাধমূলক আচরণ করলেও সে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে অপরাধপ্রবণ নয়। আবার বিপরীতদিকে সে যখন অপরাধমুক্ত শিশুদের সাথে মিলিত হবে তখন তার আচরণ অপরাধী কিশোরের ন্যায় হবে না। তাই দেখা গেল যে, সঙ্গী ও পরিবেশের প্রভাবে কিশোর ধীরে ধীরে অপরাধপ্রবণ হয়।

(গ) অপরাধী কিশোর সঙ্গীর কৌশল হতে তার অনুকরণের মাধ্যমে অপরাধীর আচরণ কিশোরের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরাধী কিশোরের অপরাধ কৌশলদ্বারা আকৃষ্ট হয়ে শিশু-কিশোর নিজেও তা আয়ত্ত করতে চায়। ফলে একজন শিশু পরোক্ষভাবে আইন-শৃঙ্খলাভঙ্গের আচরণ দ্রুততার সাথে ধারণ করে এবং সমাজের নির্দেশনার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়।[৫৮] শিশুর চারপাশের সকল সামাজিক-সাংস্কৃতি উপাদান এবং এর প্রভাব সম্ভবত তার শিক্ষণ পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গঠন করে। কোন আইন বা কাজের প্রতি শিশুর আচরণ অবশ্যই তার সম্প্রদায়ের উক্ত আইন বা কাজের প্রতি বা উক্ত কাজ করার সঠিক পন্থা কী সে সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়। সর্বোপরি একজন শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা তার ব্যক্তিগত অনুসঙ্গী, যাদের সে খুবই সমীহ করে, সেসব গোষ্ঠী, দল বা ব্যক্তির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

৮। বিচ্যুতি বা অনাচার মতবাদ (Anomie Theory)

Anomie অর্থঃ সামাজিক নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধের কোন কিছু হতে ব্যক্তিগত বিচ্যুতি বা অনাচার যাতে একজন ব্যক্তি সমাজের আচার-আচরণের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হন। Anomie অর্থ হলো স্বাভাবিক নৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডের অভাব। এটি সর্বপ্রথম ফ্রান্স সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম (১৮৫৮-১৯১৭ খ্রি.) ১৮৯৩ সালে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Devision of Labor in Society-তে তুলে ধরেন।[৫৯] তিনি তাতে নির্দেশ করেন যে, কিভাবে নিয়ম-নীতি একজন পালন করে বা তার উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, আবার অপরজন তা কিভাবে ভেঙ্গে বা নষ্ট করে দেয়। ফলে জনসাধারণ একে অপরের সাথে কিভাবে আচরণ করবে তা স্থির

৫৮. *Ibid*

৫৯. The idea of anomie means the lack of normal ethical or social standards. The concept first emerged in 1893, with French sociologist Emile Durkheim. Durkheim`s theory was based upon the idea that the lack of rules and clarity resulted in psychological status of worthlessness, frustration, lack of purpose, and despair. http://study.com>academy>anomie

করতে পারে না। ফলে তিনি বিশ্বাস করেন, Anomie হলো এমন এক অবস্থা, যে অবস্থায় মানুষের আচরণের মানদণ্ড বা প্রত্যাশিত আচরণ স্পষ্ট নয়।[৬০] এটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভুলত্রুটি ও দুর্বলতা। K Merton এর মতে একজন ব্যক্তিকে তখনই অনাচারে ঠেলে দেওয়া হয়, যখন ব্যক্তিটি আন্তরিকতার সাথে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় লেগে থাকার পরেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সাধনে প্রত্যাখাত হয়। অথচ যেখানে অন্যান্য ব্যক্তিরা সাধারণভাবেই ঐসব উদ্দেশ্য অর্জন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে সে নিম্নোক্ত যে কোন একটি পন্থা বেছে নিয়ে এই উভয় সংকটের প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। (১) নতুন প্রথা উদ্ভাবন (Innovation): কাঙ্খিত সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিকল্প প্রথা বা রীতিনীতি উদ্ভাবনের মাধ্যম। (২) পশ্চাদপসরণ (Retreatism): সামাজিক-সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া উভয়কে পরিত্যাগ করার মাধ্যম। (৩) বিরুদ্ধাচারণ (Rebellion): সমাজ কর্তৃক পছন্দকৃত পন্থার বাহিরে ভিন্ন কোন উপায় ও উদ্দেশ্য বিকল্পভাবে গ্রহণ করে।

এটা প্রমাণিত হয় যে, প্রথাসিদ্ধপন্থায় সাংস্কিৃতক উদ্দেশ্য সাধনের পরিবর্তে বিচ্যুত ব্যক্তি বিকল্প পন্থায় তার উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে। যা একে একে তাকে অপরাধী আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত করে। Albert K. Cohen (1918-2014 Ad.) এ সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ করেন এবং শ্রমিক শ্রেণির যুবকরা যেসব সামাজিক দ্বন্দের সম্মুখীন হয় সেসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে গ্যাং আচরণ নিয়ে ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করেন।[৬১] তিনি প্রমাণ করেন যে, একটি সমাজের কেন্দ্রীয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং সামাজিক পন্থার মধ্যে ব্যাপক অমিল রয়েছে, যা শ্রমিক শ্রেণির যুবকদেরকে অপরাধী আচরণ করার জন্য উত্তেজিত করে। Richard Cloward and Lloyd E Ohlin একইভাবে ইঙ্গিত করেন যে, আমেরিকান সমাজে অপরাধ প্রতিপালনের একটি অন্যতম মৌলিক অবস্থা হচ্ছে কিশোরদের নিকট অবৈধ সুযোগ-সুবিধার সহজলভ্যতার তুলনায় বৈধ সুযোগ-সুবিধার দুর্লভতা।[৬২]

৯। বিবিধ উপকরণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিবিধ উপকরণভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এমন একটি মতবাদ, যাতে মনে করা হয় যে, কোন একটি নির্দিষ্ট কারণে নয়; বরং নানাবিধ কারণে একজন কিশোর অপরাধী হতে পারে। উইলিয়াম হেলি (William Healy,1869-1963 Ad.) এ মতবাদ প্রচার করেন। তিনি একজন বিট্রিশ-আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত কিশোর অপরাধ বিষয়ক গ্রন্থ 'Individual Delinquent V2: A Textbook of Diagonisis and Prognosis for all Concerned in Understanding Offenders' -এ বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন,

৬০. David Emile Durkheim (Trns. George Simpson),*The Devision of Labor in Society* (New York: The Free Press of Glencoe,4th printing, 1960), p. 365
৬১. Albert K. Cohen , Alfred and Schussler, *The Southerland Papers* (Bloomington: Indian University Press,1955), p.119
৬২. Richard Cloward and Lloyd E. Ohlin, *Delinquency and Opportunity* (New York: Free Pree,1960), p.65

একটা অপরাধ একটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়। উক্ত অবস্থাটি অপরাধ সংঘটনের সংশ্লিষ্ট একটা factor অর্থাৎ অন্যতম কারণ বা উৎপাদক। তবে অপরাধ সংঘটিত হতে অনেকগুলো কারণ বা factor থাকতে পারে। তার মধ্যে একজন লোক দু'একটা কারণ উত্তীর্ণ হতে পারে। তাই বলে জীবনের সব অবস্থাই যদি চলার পথের পরিপন্থী হয়, তবে সে ব্যক্তি অপরাধী না হয়ে পারে না। তাঁর এ মতবাদকে সমর্থন করে Elliot এবং Merrial বলেন, "The delinquent child is generally a child handicapped not by one or two, but usually by seven or eight counts. We are safe concluding that almost any child can overcome one or two handicaps, such as death of one part or proverty and poor health. However, if the child has a drunker unemployed father and an immoral mother is mentally deficent, is taken out an early age and put to work in a factory and in a crowded home in a bad neighbourhood, nearly every factor in the environment may seem to militate against him."[৬৩]

অর্থাৎ একজন অপরাধপ্রবণ কিশোর একটি বা দু'টি বিষয়ে সুবিধাবঞ্চিত হয় না বরং সাত বা আটটি বিষয়ে সুবিধাবঞ্চিত হয়। আমরা একটা নিরাপদ উপসংহার এভাবে দিতে পারি যে, একজন শিশু-কিশোর তন্মধ্যে দু'একটা কারণ উত্তীর্ণ হতে পারে। যেমন পিতা-মাতার একজনের মৃত্যু, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহানি। যদি একটি শিশুর পিতা নেশাগ্রস্ত এবং বেকার বলে চিহ্নিত হয় এবং তার নীতিভ্রষ্ট মা যদি মানসিকভাবে কিছুটা অস্বাভাবিক হয় এবং এ অবস্থায় অল্প বয়সেই শিশুটি বিদ্যালয় থেকে নিয়ে গিয়ে কোন কারখানায় কাজ দেওয়া হয় এবং সে যদি খারাপ প্রতিবেশি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে একটি জনাকীর্ণ বাড়ীতে বসবাস করে, তাহলে বলা যায় যে, এই শিশুটির অপরাধপ্রবণতার জন্য উল্লিখিত প্রতিটি উপাদানই এক একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

এ ধরনের অবস্থায় কোন ব্যক্তির অপরাধপ্রবণতা ব্যাখ্যায় কোন বিশেষ তত্ত্ব তেমন কার্যকর বলে বিবেচিত হবে না; বরং এ ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতার জন্য উল্লিখিত প্রতিটি উপাদানই এক একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এ ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতার কারণ বিশ্লেষণে এক বা বহুমুখী উপাদানের আশ্রয় নিতে হবে।[৬৪] সুতরাং বলা যায়, শিক্ষায়ন, নগরায়ন, শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন লোপ পাওয়া, বাসা বদল ও সংস্কৃতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সামঞ্জস্যহীনতা, পত্র-পত্রিকা, সিনেমা, টেলিভিশন, অসামাজিক ছবি, ভিসিআর, বিজ্ঞাপন, ম্যাগাজিন প্রভৃতি অশ্লীল যোগাযোগ মাধ্যম, বস্তি এলাকার সৃষ্টি, চিত্ত বিনোদনের অভাব ও অসামাজিক চিত্তবিনোদন, পারিবারিক ত্রুটি, সামাজিক অস্থিরতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, ও অপরাধ, উচ্চাভিলাষী জীবনের স্বপ্ন, সামাজিক সুযোগ-সুবিধার অসম বণ্টন ও প্রবঞ্চনা মানুষকে অপরাধপ্রবণ করে তুলে। তাছাড়া

---

৬৩. Mabel Agnes Elliot and Francis E. Merrial, *Social Disorganisation* (New York: Harper and Brothers,1941), p.111
৬৪. Edwin Hardin Sutherland and Donald Ray Cressey,*ibid,* p. 93

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অবৈধভাবে সরকার পরিবর্তন, হরতাল, ধর্মঘট প্রভৃতি কারণেও নাশকতামূলক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বহু রাজনৈতিক অপরাধ সংঘঠিত হয় এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

বিচার ব্যবস্থায় ক্রটিপূর্ণ সংগঠন, জটিল প্রক্রিয়া ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক সময় নিরাপরাধ লোকও শাস্তি পায় এবং প্রকৃত অপরাধী আইনকে ফাঁকি দিয়ে বড় বড় আইনজ্ঞ নিযুক্ত করে শাস্তি থেকে রেহাই পায়। ফলে নির্দোষ ব্যক্তি আইন, আদালত ও প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে ক্রমে দাগী অপরাধী হয়ে পড়ে। সর্বোপরি বর্তমানে অপরাধীরা অনেক জটিল ও অভিনব পন্থায় অপরাধ করছে। অপরাধ সংঘটনের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিতে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। অথচ অপরাধীদের সনাক্ত ও ধৃতকরণের যন্ত্রপাতি আবিস্কৃত হলেও পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়নি। এ ছাড়া পুলিশের দুর্নীতি, দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাব, সীমিত ক্ষমতা ও অসহায়ত্ব প্রভৃতি কারণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অপরাধীর অপরাধ করার সাহস, অপরাধের ধরন ও মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপরাধতত্ত্বের উক্ত পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অপরাধের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কাহিনী, দৃষ্টিভঙ্গি, পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। কেউ আকৃতি নিয়ে অপরাধ নির্ণয় করেছেন, কেউ প্রকৃতি দিয়ে, কেউ জন্ম উৎস দিয়ে, আবার কেউ সামাজিক বিবর্তনের মধ্যে অপরাধের মূল কারণ নিহিত বলে ঘোষণা করেছেন। অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে সামাজিক সংগঠন ও পুলিশের সন্দেহজনক তদন্ত, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে গ্রেফতার, আর গ্রামের ব্যক্তিগত শত্রুতার শিকারে পরিণত হয়ে কিছু লোক বাকী জীবন অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে। তাদের সংখ্যা নগণ্য হলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মত নয়। অতএব দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন কারণ বা অবস্থা এককভাবে দায়ী নয়; বরং অর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত, পারিবারিক মূল্যবোধ, মানসিক বিকাশের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ কারণে একজন শিশু অপরাধপ্রবণ হতে পারে।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের কারণ (Core Reasons of Juvenile Delinquency in Bangladesh):

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ একটি বড় ধরনের সামাজিক সমস্যা এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এজন্য বহুমুখী ও বিচিত্র কারণ দায়ী। এর পেছনে রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দৈহিক, বংশগত, রাজনৈতিক, মানসিক, নৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, ভৌগলিক কারণসহ অসংখ্য কারণের সমাহার। অনেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে কিশোর অপরাধের প্রধান কারণ বলে মনে করেন। ২০০৩ সালের 'World Youth Report'-এ এমতেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। রিপোর্টে বলা হয়, "The socio-economic structure and condition of Bangladesh is the root cause of juvenile offence."[৬৫] শিল্পায়ন, শহরায়ন ও তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশে যে বিচ্ছিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট বহুমাত্রাবিশিষ্ট কিশোর অপরাধ সমস্যা শুধু যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই নয়, বরং বহুমাত্রিক কিশোর অপরাধ সমস্যা ও এর প্রতিকার কোন পথে ও পদ্ধতিতে সম্ভব সেটি এখন আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ও কারণ নির্ণয়ে সাধারণ যে দৃষ্টিভঙ্গি সমূহ প্রচলিত রয়েছে বাংলাদেশেও অপরাধ ও কিশোর অপরাধের কারণ, প্রকৃতি ও ধরন নির্ণয়ে প্রত্যেকটি দৃষ্টিভঙ্গিই কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(ক) পরিবার ও কিশোর অপরাধ

কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পরিবারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কেননা পরিবার মানুষের প্রাচীনতম সংগঠন এবং সমাজ জীবনের মূলভিত্তি। এখানেই শিশুর জন্ম হয়, তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। তাই সন্তানের সুস্থ-স্বাভাবিক মানসিক গঠন ও বিকাশের জন্য পরিবারের ভূমিকা অপরিহার্য। পিতামাতার মধ্যে সম্প্রীতিময় দাম্পত্য জীবন যেমন শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশে সহায়তা করে তেমনি তাদের মনোমালিন্য ও কলহ-বিবাদ সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। যা শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণ হতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।[৬৬] অনুরূপভাবে পরিবারের অগ্রজ সদস্যরা অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকলে তা পরিবারে কিশোর সদস্যদের মাঝেও প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ পায়। তাই সমাজবিজ্ঞানী, মনেবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীগণ একমত যে, শিশুর অপরাধপ্রবণতার বীজ অনুপ্রবেশ এবং বিকাশ হয় পরিবার হতে। নিম্নে আধুনিক পরিবারের কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হলো যা কিশোর অপরাধ আচরণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখে বলে প্রতীয়মান হয়-

---

৬৫. *World Youth Report*, 2003, p.193

৬৬. আহমদ মুহাম্মদ কুরাইয, *আর-রিয়া'আতুল ইজতিমা'ইয়াহ লিল আহদাছিল জানিহাইন* (দামিশ্ক: মাতবা'আতুল ইনশা, ১৪০০হি.), পৃ. ১৮০-১৮১; মো. আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫

১। ভগ্ন পরিবার (Broken Family)

পরিবার হচ্ছে সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আর পরিবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শিশু-কিশোর। শিশু-কিশোর পরিবারের মাধ্যমে যে শিক্ষা পায় তা তাদের জীবনে স্থায়ীভাবে প্রভাব ফেলে। সাধারণত পিতামাতার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, ভদ্রতা এবং আদর্শ দ্বারা সন্তান প্রভাবিত হয়। পিতামাতার দ্বন্দ্ব, মৃত্যু, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের প্রতি অযত্ন, পারিবারিক শৃঙ্খলার অভাব প্রভৃতি শিশুদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত করে এবং এটা তাদেরকে একটি অস্বাভাবিক জীবনের দিকে ধাবিত করে। আধুনিক একক পরিবারে শিশু প্রায়ই পিতামাতাকে কাছে পায় না, পিতামাতার আদর-স্নেহ ও পারিবারিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। শহুরে অনেক একক পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চাকুরিজীবী। মাতৃস্নেহ ও পিতার নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ দু'টিই শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় হলেও দুর্ভাগ্যক্রমে শিশু এসময়ে প্রয়োজনীয় আদর-স্নেহ, পারিবারিক মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে শিশুর যথাযথ মানসিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে।

তালাক সমস্যা শিশুর জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তালাকের সংখ্যাধিক্য অগনিত শিশুকে স্বাভাবিক জীবন-যাপন, পিতামাতার আদর-স্নেহ এবং একই সঙ্গে সামাজিক শিক্ষাদান হতে বঞ্চিত করছে। এরূপ অবহেলিত শিশু-কিশোর বয়স্ক অপরাধী কর্তৃক অপব্যবহার ও নিজ স্বার্থে ব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণ হতে পারে। ফলশ্রুতিতে তারা বিভিন্ন অপরাধ চক্রের ভয়ানক সদস্য ও কুখ্যাত অপরাধীতে পরিণত হতে পারে। এটি কিশোরদের স্বাভাবিক অচরণের পরিবর্তে অপরাধমূলক আচরণের অন্যতম প্রধান কারণ। সমাজবিজ্ঞানী নাহিদ ফেরদৌসি ছিন্ন পরিবারকে কিশোর অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, "Juveniles of broken families are easily involved in illegal activities. অর্থাৎ ভঙ্গুর পরিবারের কিশোররা সহজেই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে।"[৬৭] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আফসার উদ্দিন পরিচালিত অনুসন্ধানটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধীর শতকরা ৩৭ ভাগ ভগ্ন পরিবার থেকে আসে।[৬৮] আর গবেষকের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের উপর পরিচালিত জরিপের তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে তাদের নিম্নোক্ত পারিবারিক কাঠামো পাওয়া যায়:

---

৬৭. Dr. Nahid Ferdousi, *Juvenile Justice System in Bangladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2012), p.112

৬৮. Mohammad Afsaruddin, *Juvenile Delinquency in Bangladesh* (Dhaka: university of Dhaka, 1993), p. 27

সারণী-৬: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের পরিবারের ধরন (Types of Family of the Inmates in the Three KUK's)[৬৯]

পরিবারের ধরন	কেসের সংখ্যা	শতকরা হার
পিতামাতা একসাথে বসবাস করেন	১৪	১৪%
পিতামাতা আলাদা বসবাস করেন	৪৮	৪৮%
পিতামাতা উভয়ই বা কোন একজন মৃত্যুবরণ করেছেন	৩৮	৩৮%
মোট	১০০	১০০%

কিউকের (কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র) উক্ত তিনটি কেন্দ্রের নিবাসীদের জরিপে দেখা যায় যে, প্রায় ৪৮% নিবাসী ভগ্ন পরিবার থেকে এসেছে, যাদের পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে এবং তারা তাদের শিশু-সন্তানদের প্রতি কোনরূপ পিতৃ-মাতৃস্নেহ প্রদর্শন না করে আলাদা আলাদাভাবে বসবাস করছেন। এর পরেই নিবাসীদের প্রায় ৩৮% এসেছে এমন পরিবার থেকে, যেখানে পিতামাতা একজন কিংবা উভয়ই মারা গিয়েছেন। সংখ্যার দিক থেকে এরপরেই রয়েছে ১৪% নিবাসী যারা এমন পরিবার থেকে এসেছে যাদের পিতামাতা জীবিত আছেন এবং তারা একত্রে বসবাস করছেন। এই পরিসংখ্যানে স্পষ্টতই দৃশ্যমান হয় যে, কিশোর অপরাধ ও আমাদের অস্থিতিশীল পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে একটা মজবুত সম্পর্ক রয়েছে।

২। পিতামাতার অপর্যাপ্ত শাসন ও অভিভাবকত্ব (Insufficient Parental Care and Guardianship)

পিতামাতাই হচ্ছে সন্তানের সর্বোত্তম শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক। পিতামাতা যদি সঠিক শাসন ও তত্ত্বাবধান করতে না পারেন তাহলে শিশুরা অপরাধপ্রবণ হতে পারে। যে শিশুর আচরণ পিতামাতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রিত হয় সে শিশু স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠে। আর যে শিশুটি ধারণা করে যে তার কার্যকলাপ পিতামাতার অজ্ঞাত থেকে যাবে এবং তার খোঁজ-খবর পিতামাতা রাখে না, সে শিশুটির অপরাধী হওয়ার রাস্তা প্রশস্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ পিতামাতা দিনমজুর বা শ্রমজীবী হওয়ায় তারা সামাজিক মূল্যবোধের শিক্ষা হতে বঞ্চিত রয়েছে। ফলে একদিকে দরিদ্র্যতা অন্যদিকে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে পিতামাতা সন্তানের প্রতি যথার্থ মনোযোগ দিতে পারেন না। তারা অধিকাংশ সময়ই তাদের জীবিকা নির্বাহে ব্যয় করেন। ফলে সন্তানরা তাদের পিতামাতার আদর-স্নেহ, ভালবাসা, নৈতিক মূল্যবোধ

---

৬৯. সূত্র: মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা, *কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ* (টঙ্গী, কোনাবাড়ী ও যশোর), সমীক্ষা কাল: জুলাই-জুন, ২০১৯-২০২০। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র- ১৫ থেকে ১৯, সেপ্টেম্বর, ২০১৯; যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র-৫ থেকে ৯ অক্টোবর, ২০১৯ এবং কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র-১০ ও ১১ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.। (উল্লেখ্য যে, কিশোর-উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে সর্বমোট তিনটি ধাপে মাঠ জরিপকর্ম পরিচালনা করা হয়। প্রথম ধাপে: টঙ্গী, কোনাবাড়ী ও যশোরের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন, মাঠ সমীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, প্রকাশনা প্রভৃতি সংগ্রহ করা; দ্বিতীয় ধাপে: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ভিত্তিক সময়সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত নিবাসী ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়- গবেষক।)

ও অনুশাসন থেকে বঞ্চিত হয়। একইভাবে ধনী ও দরিদ্র পরিবারের সদস্যরা প্রয়শই বাসস্থানের বাইরে দূরে কোথাও কাজ করেন এবং তাদের সন্তানদেরকে স্নেহ-মমতা-ভালবাসা এবং প্রয়োজনীয় যত্ন ও সময় দিতে ব্যর্থ হন। পিতামাতার সাহচর্যের এই সময়টা শিশু-কিশোর অন্যান্য সঙ্গীদের সাথে কাটায়। অভিভাবকত্ব বঞ্চিত হয়ে পিতামাতার অনুপস্থিতিতে সন্তানরা মন্দ সাথীদের সংস্পর্শে আসে এবং ঝুঁকিপূর্ণ অন্যায়-অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৩। পরিবারিক মূল্যবোধের অভাব

শিশু-কিশোররা মূলত পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকেই মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা অর্জন করে থাকে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ পরিবারের কর্তা নিম্নশ্রেণি এবং শ্রমজীবী। এসব পরিবারের নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা বিরাজ করে। তাই তাদের সঠিক মানবীয় মূল্যবোধ থাকলেও অভাবের তাড়নায় মূল্যবোধ চর্চা ব্যাহত হয়। আবার উচ্চবিত্তশ্রেণি আরো বেশি সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের জন্য আরো বেশি দুর্নীতিপরায়ণ ও অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে। সঙ্গত কারণেই এসকল পরিবারেও মূল্যবোধের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আর পরিবারে যদি উপযুক্ত নীতি-নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের চর্চা না থাকে তাহলে উক্ত পরিবারের পরবর্তী বংশধর তথা শিশু-কিশোরদের নিকট হতে নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রত্যাশা করা যায় না। অশিক্ষিত নিম্ন আয়ের পিতামাতা তাদের সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত উপার্জন করতে পারেন না। সারা সময়ই ভাত-কাপড়ের প্রয়োজন মেটানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন। ফলে নিজ পরিবার তথা সন্তান-সন্ততিকে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে মূল্যবোধ শিখাতে ব্যর্থ হন। তাছাড়া শিক্ষার অভাবে পিতামাতা নিজেরাও সঠিক মূল্যবোধ ধারণ করতে পারেন না। এ পরিস্থিতিতে তাদের সন্তানের মৌলিক নৈতিকতা ও নীতিবোধ খুবই কম বিকশিত হয়। আর এরকম ভঙ্গুর মানসিক অবস্থায় বেড়ে উঠা শিশুরা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে।

৪। শিক্ষার নিম্নমান

দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ সন্তান শিক্ষার সুযোগ পায় না। মৌলিক শিক্ষার অভাবে তাদের মধ্যে ব্যক্তি জীবনের ভাল-মন্দ, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ভাল ও মন্দের পার্থক্য মানদণ্ড গড়ে উঠে না। ফলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রের ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত ও ভাল-মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে না। সাধারণত তারা গঠনমূলক ভাল বুদ্ধি বা ধারণা বর্জিত হয় এবং নিজেকে অনৈতিক কাজের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে। নিম্নোক্ত সারণীতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের শিক্ষার অবস্থা তুলে ধরা হলো:

সারণী-৭: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের শিক্ষাগত অবস্থা (Educational conditiun of the inmates in the Three KUK's)[৭০]

শিক্ষার স্তর	উন্নয়ন কেন্দ্রের নাম				শতকরা হার
	টঙ্গী	যশোর	কোনাবাড়ী	মোট	
নিরক্ষর	৯	৮	৫	২২	২২%
১ম শ্রেণি- ৫ম শ্রেণি	৩৬	২২	৩	৬১	৬১%
মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ- ১০ম শ্রেণি)	৬	৫	২	১৩	১৩%
এইচএসসি	২	২		৪	৪%
মোট উত্তরদাতা	৫৩	৩৭	১০	১০০	১০০%

বাংলাদেশের তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (কিউক) নিবাসীদের মধ্যে পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে, দরিদ্র পরিবারে শিক্ষার হার একবারেই নিম্ন। অধিকাংশ শিশু-সন্তান কোন কিছু বুঝে উঠার আগে বাল্য বয়স থেকেই উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে যায়। শিশু শ্রমিক হিসেবে তাদের শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। ফলে তাদের শারীরিক প্রবৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়। শারীরিক ও মানসিক অপরিপূর্ণতার কারণে তাদের চিন্তা ও মানসিক শক্তি দুর্বল প্রকৃতির হয়। তাই তারা কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে সহজেই অপরাধ কর্মে জড়াতে দ্বিধা করে না। উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় প্রায় তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের মধ্যে ২২% নিবাসী কোন বিদ্যালয়েই গমন করেনি। আর ৬১% নিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছে, কিন্তু সামান্য কয়জন মাত্র প্রাথমিক সমাপনী শেষ করতে পেরেছে। মাধ্যমিকে পা দিয়েছে মাত্র ১৩% নিবাসী, এদের মধ্যে মাধ্যমিক পর্যায় শেষ করার সংখ্যা খুবই কম। আর শুধুমাত্র ৪% নিবাসী মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হতে পেরেছে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (কিউক) নিবাসীদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ না থাকায় তারা সবাই ঝড়ে পরার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তাই অনেক সমাজবিজ্ঞানীই মনে করেন যে, শিক্ষার এ নিম্ন হারের কারণে বস্তিবাসী ও নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হয়।

৫। উপার্জনের জন্য পরিবারের চাপ

আমাদের সমাজে দরিদ্র্যতার সাথে সখ্যতা এবং মানসম্মত কাজের ব্যবস্থা না থাকায় পিতামাতা বা পরিবার ঐতিহ্যগতভাবেই অভাব নিয়ে দিনাতিপাত করে। এসমস্ত পরিবারের পিতা-মাতা বা অভিভাবক পরিবারের অভাব মোচনের জন্য তাদের সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যতকে জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার পেছনে অর্থ খরচ না

৭০. সূত্র: মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা, *প্রাগুক্ত*

করে বরং তাদেরকে উপার্জন করার জন্য বাধ্য করে। কিশোর-কিশোরীর যে সময়টা সঙ্গী-সাথীদের সাথে খেলা-ধুলা আর পিতামাতার আদর-স্নেহে কাটানোর কথা, সে সময়টিতে তারা ব্যস্ত থাকে উপার্জনের কাজে। ফলে শিশু-কিশোরের যে মানসিক বিকাশ ও বৃদ্ধির কথা ছিল সেটা না হয়ে খর্ব ধ্যান-ধারণা ও মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা নিয়ে বেড়ে উঠে। এসব কারণে শিশু-কিশোরদের মনে না পাওয়ার একটা জ্বালা সৃষ্টি হয়। দিনে দিনে অপ্রাপ্তি ও জ্বালা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে এসব চাহিদা পূরণে তারা যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জন করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। অনেক সময় তাদেরকে এমন উপায়ে উপার্জন করতে হয় যা নৈতিকতা ও আইনের দৃষ্টিতে সঙ্গত নয়। এরকম শিশু-কিশোররাই অবৈধ কাজে জড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে এসব কিশোর অপরাধী হিসেবে পরিগণিত হয়।

৬। পরিবারে মত প্রকাশের সুযোগ না থাকা

আবহমান কাল থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় সমাজপতিদের মতামত ও সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। সমাজপতিদের বাহিরে পরিবারের প্রধান বা কর্তার সিদ্ধান্ত ছিল অলঙ্গনীয়। তাছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট হতে সিদ্ধান্ত বা মতামত নেওয়া প্রয়োজনই অনুভব করা হত না। সমাজব্যবস্থায় আধুনিকতার ছোঁয়ায় পারিবারিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের হাওয়া লাগলেও শুধুমাত্র স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের নিকট হতে মতামত নেওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। আর অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতামত প্রদানের রেওয়াজই গড়ে উঠেনি। ফলে এসকল পরিবারের সন্তানরা সাধারণত পারিবারিক বিভিন্ন বিষয়ে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারে না। এমনকি অনেক শিক্ষিত পরিবারের সন্তানরাও স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায় না। ফলে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত ও মতামত দেওয়ার যোগ্যতা গড়ে উঠে না। তাছাড়া সাধারণত আমাদের সমাজের বয়স্করা মনে করে যে, শিশু-কিশোররা ভাল-মন্দের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত বা মতামত দেওয়ার যোগ্য নয়। তারা নিজের ভাল-মন্দ বুঝে না বা বুঝার বয়স হয়নি। তাই পরিবার বা সমাজের বয়স্করা তাদের মতামত বা সিদ্ধান্ত শিশু-কিশোরের উপর চাপিয়ে দেয়, যা অনেক সময়ই তাদের মনোজগতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। কিশোর সময়টা সাধারণত আবেগী ও স্বাধীনচেতা হয়। পরিবারে মতপ্রকাশ করতে না পেরে তাদের আত্মমর্যাদায় আঘাত হানে ফলে তারা অনৈতিক ও অবৈধ কাজে উদ্বুদ্ধ হয় এবং মাধ্যমে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।

৭। পিতামাতার দ্বন্দ্ব ও কলহ

বাংলাদেশসহ অনুন্নত এবং উন্নত প্রত্যেক দেশেই এ সমস্যাটি প্রকটভাবে শিশু-কিশোরদেরকে প্রভাবিত করে। পিতামাতার দ্বন্দ্ব, দূরত্ব, ঝগড়া-বিবাদ, আলাদা বসবাস প্রভৃতি নানাবিধ কলহ অপরিণত শিশু-কিশোরের মনোজগতে দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। তাদের মানসিক অবস্থা পরিণত না থাকায় পিতামাতার অনাকাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণ শিশু-কিশোরের মধ্যে মারাত্মক মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে থাকে এবং শিশু-কিশোর সহজে এ

দ্বন্দ্বের মিমাংসা করতে পারে না। পিতামাতার কলহ, পারস্পরিক বিরোধ, এবং পারিবারিক অশান্তির কারণে শিশু-কিশোর যে মানসিক আঘাত পায়, একসময় তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। এছাড়া পিতামাতার দ্বন্দ্বের ফলে শিশু অবহেলিত ও অযত্নের শিকার হয় এবং ভীতসন্ত্রস্ত জীবনযাপন করতে থাকে এবং নিরাপত্তাবোধের অভাব তার মধ্যে তীব্রতর হয়ে উঠে। এমন অবস্থায় শিশুর মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং সামাজিকীকরণে বাধার সৃষ্টি হয়। শিশু ক্রমেই অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে এবং ভবিষ্যতে অপরাধজনক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

৮। অশিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত পিতামাতা

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশ সমাজব্যবস্থায় কৃষি নির্ভরতা লক্ষ্য করা যায়। এ কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার তেমন প্রয়োজন মনে করা হতো না। তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতার জন্যও পরিবারে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার গুরুত্ব ছিল না বললেই চলে। যাও কিছুটা ছিল মেয়েদের ক্ষেত্রে তা একেবারেই নিষিদ্ধ মনে করা হত। ফলে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অশিক্ষত বা স্বল্পশিক্ষিতের হার ছিল বেশি। যার ধারাবাহিকতায় আধুনিক সমাজে এসেও অনেক পরিবারে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, পিতামাতা বা পরিবারের অভিভাবকের অশিক্ষা ও সুশিক্ষার অভাবেও সন্তানরা অপরাধে জড়াতে পারে। ড. নাহিদ ফেরদৌসি অশিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত পিতামাতাকে সন্তানের অপরাধপ্রবণ হওয়ার জন্য দায়ী মনে করেন।[৭১] তার মতে অশিক্ষিত এবং স্বল্প শিক্ষিত পিতামাতার পরিমিত জীবনযাপনের সুযোগ থাকে না, তারা সন্তানদেরকে নিম্নমানের শিক্ষা ও নৈতিক অভিভাবকত্ব ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। একইভাবে সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবে কিশোর-কিশোরীরা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। ফলস্বরূপ এসব শিশু-কিশোররা পরিবার, সমাজ ও জাতির প্রতি তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি উদাসীন থেকেই বেড়ে উঠে। ফলে পরবর্তীসময়ে এসব শিশু-কিশোর সহজেই তাদেরকে বেআইনি কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে ফেলে।

৯। পরিবারের কর্তার অনুকরণ

সাধারণত শিশু-কিশোররা পরিবার থেকেই নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জন করে থাকে। পরিবারের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে শিশু-কিশোর বেড়ে উঠে এবং মানবীয় গুণাবলী অর্জন করে। মূলত পরিবার থেকেই সে সকল নীতি-নৈতিকতা ও মানবিকতার শিক্ষা লাভ করে থাকে। পরিবোরের কর্তা যদি সৎগুণাবলী সম্পন্ন হন, তাহলে উক্ত পরিবারের শিশু-কিশোরও তার দেখা-দেখি উত্তমগুণাবলী সম্পন্ন হবে। আবার পরিবারের প্রধান বা কোন প্রাপ্তবয়স্ক সদস্য যদি সুদ, ঘুষ, চোরাকারবারিসহ অন্যান্য অপরাধমূলক অনৈতিক বা সমাজ বিরোধী কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলে পরিবারে অনুজ সদস্যদের মধ্যে এর প্রভাব পরতে পারে, যা কিশোর অপরাধ সমস্যা বিকশিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তাই দেখা যায় যে, যেভাবে পিতামাতা, ভাই-বোনসহ

৭১. Rajendra K Sharma, *Criminology and Penology* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors,1998), p.32; Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, p.112

পরিবারের সদস্যদের চারিত্রিক মাধুর্য তথা নীতি-নৈতিকতা একজন শিশু-কিশোরের উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনভাবেই তাদের অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজও শিশু-কিশোরের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

১০। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবহেলা

প্রায়শই শিশুরা পিতামাতার নিকট থেকে নিষ্ঠুর আচরণ পেয়ে থাকে। সামান্য কারণে পিতামাতা সন্তানকে শারীরিক আঘাত করে থাকে। পিতামাতার নিষ্ঠুরতা ও অবহেলার কারণে সহজেই শিশুটির ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পরে। তাছাড়া সৎ পিতা বা মাতা কর্তৃক নানা সময়ে শিশু নিষ্ঠুরতা ও অবহেলার শিকার হয়। অনেক সময় দেখা যায় শিশুর মা মারা যাওয়ার কারণে পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী বা সৎ মা তার নিজের সন্তানের তুলনায় এই শিশুর প্রতি অনাদর ও অবহেলা দেখায়; এমনকি শারিরিক নির্যাতনও করে থাকে। ফলে শিশুর প্রতি পিতামাতার নিষ্ঠুরতা, অনাদর বা অবহেলায় শিশুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কারণ পিতামাতার আচরণ শিশুর জীবনে দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। তাদের নেতিবাচক কোন আচরণ শিশুর নেতিবাচক জীবন দর্শন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। তাই দেখা যায় যে, শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবহেলা কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ। এ প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম'-এর ২০১৮ সালের প্রতিবেদনটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এপ্রিল, ২০১৯ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং শিশু অধিকার লঙ্ঘনের একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশা করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরে শিশুর অধিকারের সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়। ২০১৮ সালে শিশু আত্মহত্যা, অপহরণ, নিরুদ্দেশ হওয়া, দুর্ঘটনার শিকার,পানিতে ডুবে মারা যাওয়া, বিভিন্ন রকমের নির্যাতনের ঘটনা পরিস্কারভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী এ বছর ৪১৮ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ২৩.৩০% বেশি।[৭২]

১১। যৌন উৎপীড়ন (Sexual Abuse and Exploitations of Children)

শিশু উৎপীড়নের চিত্র বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের যৌন হয়রানির মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুদের উপর নানাভাবে যৌন উৎপীড়ন করা হয়ে থাকে। যেমন, অনুচিত যৌন আচরণ প্রদর্শন করা, অসংগত স্পর্শ, শৃঙ্গার ও বলপূর্বক অঙ্গপ্রবেশ করানো ইত্যাদি অনৈতিক আচরণের মাধ্যমে শিশুকে যৌন উৎপীড়ন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে শিশু অধিকার ফোরাম তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রতি চারজন মেয়ে শিশুর মধ্যে একজন যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। আর প্রতি ছয় জন ছেলে শিশুর মধ্যে যৌন নিপীড়নের শিকার হয় একজন। শুধু পুরুষ নয়, শিশুরা কখনও কখনও নারীর হাতেও যৌন হয়রানির শিকার হয়। ডা. হেলাল উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে যৌন হয়রানির শিকার শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন। তিনি শিশুদের যৌন হয়রানির ক্লিনিকাল গবেষণা করছেন। তাঁর এ গবেষণায় শিশুদের যৌন হয়রানির ভয়াবহ তথ্য

৭২. Bangladesh Shishu Adhikar Forum (BSAF), *State of Child Rights in Bangladesh* (Dhaka: Bangladesh Shishu Adhikar Forum, April 2019), p. 6

উঠে এসেছে। তাতে দেখা যায়, শতকরা ৭৫ ভাগ শিশুর যৌন হয়রানির ঘটনাই ঘটে পরিবারের ঘনিষ্টজন, বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে।[৭৩]

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম বলছে, যৌন নিপীড়নের শিকার শতকরা ৫ ভাগ ছেলে শিশু আর ৯৫ ভাগ মেয়ে শিশু। শিশুদের যৌন হয়রানির মধ্যে ধর্ষণ ছাড়াও তাদের উপর নানা ধরনের শারীরিক আক্রমণ, বলাৎকার, স্পর্শকাতর ও যৌনাঙ্গে অসৎ উদ্দেশ্যে স্পর্শ অন্যতম। শিশু অধিকার ফোরামের হিসাবে চলতি বছরে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৭১ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৭৮ জন শিশু। ৫০ জন শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে ৬ শিশু। ধর্ষণের শিকার শিশুদের মধ্যে ২২ জন শিশু প্রতিবন্ধী। শিশু অধিকার ফেরামের তথ্য মতে, ২০১৪ সালে ১৯৯ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়, ২০১৫ সালে ৫২১ জন শিশু, ২০১৬ সালে ৪৪৬ জন শিশু ২০১৭ সালে ৫৯৩ জন শিশু এবং ২০১৮ সালে ৫৭১ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে।[৭৪] 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম' এপ্রিল, ২০১৯ যে প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাতে বলা হয়, ২০১৮ সালে শিশুর যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের মাত্রা কিছুটা কমেছে, যা গতবছরের (২০১৭ সালের) তুলনায় প্রায় ৯.১৭% কম। এ সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদন মতে, ২০১৮ সালে মোট ৮১২ জন শিশু কমপক্ষে ১০ টি ভিন্ন উপায়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যেখানে গত ২০১৭ ও ২০১৬ সালে যথাক্রমে বছর মধ্যে ৮৯৪ জন ও ৬৮৬ জন শিশু যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।

আইন ও শালিশ কেন্দ্রের (ASK) বর্ণনা মতে এই নির্যাতনকারীদের মধ্যে কিছু শিশুকেও নির্যাতনকারী হিসেবে পাওয়া যায়। এটা খুবই শঙ্কার বিষয়। এখনই এ বিষয় আমাদেরকে আরো বিশেষ নজর দিতে হবে এবং যথাযথ আইন প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিম্নোক্ত সারণীতে বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের প্রতিবেদনের আলোকে নারী ও শিশুর যৌন হয়রানির চিত্র প্রদান করা হলো-

সারণী-৮: Incidents of Sexual Abuse and Exploitations in 2018[৭৫]

Sl	Type of Incidents	2017	2018	+/- (%)
1.	Rape (total)	593	571	-4%
2.	Gang Rape	70	94	34%
3.	Rape of disable child	44	28	-36%
4.	Murder After Rape	22	60	173%

---

৭৩. বিএল দাস, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্বীয়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭
৭৪. Bangladesh Shishu Adhikar Forum (BSAF), *ibid*
৭৫. *Ibid*, p. 23

5.	Suicide After Rape	7	6	-14%
6.	CDW Rape	7	5	-28%
7.	Attempt to Rape	72	96	33%
8.	Eve Teasing	51	43	-16%
9.	Sexual Harassment	90	87	-3%
10.	Victim of Pornography	26	15	-42%
11.	Wounded/Beaten by Perverts	35	18	-48.57%

উল্লিখিত চিত্রে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালে শিশু ধর্ষণের (যাতে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, এবং ধর্ষণের পর আত্মহত্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) হার গত বছরের তুলনায় ৪% কমেছে। ২০১৮ সালে ৫৭১ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, গড়ে প্রতি মাসে ৪৮ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যা ২০১৭ ও ২০১৬ সালে প্রতি মাসে গড়ে ৪৯ জন ছিল। যদিও গত বছরে তুলনামূলকভাবে শিশু ধর্ষণের হার কিছুটা কম ছিল; কিন্তু সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা গত দুই বছরের (২০১৭ ও ২০১৬) তুলনায় যথাক্রমে ৩৪% এবং ১৭৩% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৮ সালের ধর্ষণের শিকার ৫৭১ জনের মধ্যে ৯৪ জন শিশুকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে, ৬০ জন শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে, ২৮ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ৬ জন শিশু ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে। ২০১৮ সালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ধর্ষণের নিম্নগামী প্রবৃত্তির পরেও ২০১৭ ও ২০১৬ সালের তুলনায় পর্ণগ্রাফী এবং ধর্ষণ প্রচেষ্টার হার যথাক্রমে ৪২% ও ৩৩% বৃদ্ধি পেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে অভ্যুত্থান ঘটেছে। নিম্নোক্ত সারণীতে ধর্ষিত শিশুদের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো-

সারণী-৯: Distribution of Raped Children by Age[৭৬]

Age	Number	(%)
01-06	57	10%
07-12	131	23%
13-18	160	28%
Not Mentioned	223	39%
Total	571	100%

৭৬. *Ibid*, p. 24

নিম্নোক্ত সারণীতে শিশু নির্যাতনকারী ধর্ষকদের বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো-

সারণী-১০: Distribution of Perpetrators by Age[৭৭]

Age	Number	(%)
Under 18	40	7.00%
18-30	160	28.02%
31-45	68	1.91%
45+	35	6.13%
Unidentified	268	46.94%
Total	571	100%

উল্লিখিত প্রথম চিত্রে দেখা যায় যে, প্রায় ৩৯% ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার শিশুর বয়স উল্লেখ করা হয়নি। অবশিষ্টের মধ্যে ১০% শিশুর বয়স ১ থেকে ৬ বছরের মধ্যে, ২৩% শিশুর বয়স ৭ থেকে ১২ বছরের মধ্যে এবং ২৮% শিশুর বয়স ১৩ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরীরা বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। বিপরীতদিকে ৭% ধর্ষণকারীর বয়স ১৮ বছরের নিচে। যেখানে দ্বিতীয় চিত্রে দেখা যায় যে, ২৮.০২% ধর্ষণকারীর বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে এবং ১১.৯১% ধর্ষকের বয়স ৩১ থেকে ৪৫ এর মধ্যে। প্রায় ৬.১৩% ধর্ষকের বয়স ৪৫ এর উপরে। অর্থাৎ অধিকাংশ ধর্ষকের বয়স (মোট ৫৩% ধর্ষকের বয়স) ১৮ এর নিচ থেকে ৪৫ এর উপরে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, প্রায় ৪৬.৯৪% ধর্ষক অজ্ঞাত রয়েছে।

যদিও ৪ থেকে ১৮ বছরের সকল শিশুই অরক্ষিত, তারপরেও ৭ থেকে ১২ এবং ১৩ থেকে ১৮ বছরের শিশুরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের ঝুঁকিতে রয়েছে। সাধারণত ১ থেকে ৬ এবং ৭ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদেরকে তারা যখন একা ঘরে থাকে তখন চকোলেট, আইসক্রীম, খেলনা প্রভৃতির লোভ দেখিয়ে অথবা জোর করে নির্জন স্থানে নিয়ে ধর্ষণ করে। অন্যদিকে ১৩ থেকে ১৮ বছরের শিশুদেরকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে অথবা প্রেমের ফাঁদ পেতে বা বিয়েতে রাজি না হলে বল প্রয়োগ করে অথবা নির্জন স্থানের সুযোগ নিয়ে ধর্ষণ করে থাকে। এটা লক্ষ্যণীয় যে, অধিকাংশ ধর্ষকই হয় পরিবারের সদস্য অথবা পাড়া-প্রতিবেশি। এসকল নির্যাতনের কারণে শিশু-কিশোরীদের মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। যা অধিকাংশ সময় তাদেরকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

৭৭. *Ibid*, p. 23

১২। পিতামাতার কর্মস্থল পরিবর্তন

বাংলাদেশে কর্মজীবি পিতামাতার সন্তানদের একটা অংশ অপরাধপ্রবণ হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে বারংবার কর্মস্থল পরিবর্তন। অভিভাবকদের যদি বারংবার কর্মস্থল পরিবর্তন করতে হয় তাহলে তাদের সন্তানসহ গোটা পরিবারকেও সঙ্গে সঙ্গে স্থানান্তরিত হতে হয়। এমতাবস্থায় এ সকল পরিবারের শিশু-কিশোররা বিভিন্ন জায়গায় স্কুল এবং অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশের সম্মুখীন হয়। কোন এক বিশেষ জায়গায় খাপ খাইয়ে চলার অভ্যাস আয়ত্ত করতে না করতেই হয়ত তাদের অভিভাকদের পুনরায় কর্মস্থল পরিবর্তন করতে হয়। এতে শিশু-কিশোরদের বিচিত্রধর্মী পরিবেশে নানা ধরনের ছেলেমেয়েদের সংস্পর্শে আসতে হয় এবং বারংবার স্থানান্তরিত হতে গিয়ে তাদের মানসিক অবস্থার উপর চাপ পড়ে। ফলে তাদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশ সাধিত হয় না যা তাকে অপরাধপ্রবণ হতে সাহায্য করে।

এমন ঘটনার অভাব নেই যেখানে বারংবার কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে অনেক কিশোর-কিশোরীর লেখাপড়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় অথবা মেধাবী ছাত্র ক্রমে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সে নানা রকম অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে। একসময় সে অপরাধমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। অতএব বারংবার কর্মস্থল পরিবর্তন কিশোর অপরাধের আরেকটি অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে।[৭৮] এ সম্পর্কে ইবরাহীম আব্দুহু আশ-শুরফাবীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "পিতামাতার ঘন ঘন কর্মস্থল পরিবর্তনের কারণে শিশু-কিশোররা নতুন নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সংস্পর্শে এসে সহজেই তা অনুসরণ করতে পারে না এবং তাদের ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণভাবে বেড়ে উঠে। ফলে এটি শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার জন্ম দেয়।"[৭৯] তাই বলা যায় যে, পিতামাতার কর্মস্থল বারংবার পরিবর্তনের কারণেও সন্তানের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিতে পারে।

১৩। বাধহীন স্বাধীনতা

শিশু-কিশোরের অবাধ স্বাধীনতা তাদেরকে অধিকাংশ সময় বেপরোয়া করে তুলে। অনেক পিতামাতা তাদের একমাত্র আদরের সন্তানকে ছোট-খাট ভুল-ভ্রান্তিতে বা বিচ্যুত আচরণে শাসন না করে বরং উৎসাহিত করে। ফলে এসকল শিশু-কিশোর আস্তে আস্তে আরো বড় বড় ভুল করতে থাকে, একসময় আর পিতামাতা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে সে অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ের শিশু সচল, ভ্রাম্যমান ও অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। আবার বয়স ও লিঙ্গভেদে যে পৃথক ভূমিকা, আচার-আচরণ ও ঐতিহ্যের প্রচলন ছিল তা অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে আজ তারা নির্দিষ্ট ভূমিকা ও দায়িত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। তাদের জীবনের বহুলাংশে যেন পরিচালিত হচ্ছে পাণ্ডুলিপি ছাড়া যাতে নেই কোন নির্দিষ্ট ভূমিকা ও নেই কোন

৭৮. ড. বোরহান উদ্দিন খান ও মঞ্জুর কাদের, *অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা/চট্টগ্রাম: কামরুল বুক হাইস, ফেব্রুয়ারী, ২০১৪), পৃ. ২৩১-২৩৪
৭৯. ইবরাহীম আব্দুহু আশ-শুরফাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

নির্দিষ্ট লক্ষ্য।[৮০] এমত পরিস্থিতিতে শিশুর মধ্যে বিভিন্ন বিপদে-আপদে ও হতাশায় ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা, অন্যের সীমাবদ্ধতা ও হস্তক্ষেপ করার মত বিষয়গুলো সহজে গ্রহণ না করার প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়। তাই দেখা যায় শিশু-কিশোরের অপরাধপ্রবণ হওয়ার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতাও কম দায়ী নয়।

১৪। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় যৌথ পরিবারের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু আজ আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় সেটি একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। একসময় একজন ব্যক্তি আত্মীয়স্বজনসহ পরিবারের সদস্য ও পরিজন দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবিকা কী হবে তা নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল সমভাবে সকলের। ব্যক্তির সন্তুষ্টি অর্জিত হত এসব মানুষের সহযোগিতার উপর। এসময় শিশু-কিশোরের পারিবারিক পরিবেশে মানসিক ও নৈতিক বিকাশ ঘটত। শিশুটি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিকট আদর-স্নেহ, ভালবাসা, শাসন পেত এবং নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা লাভ করত। তাছাড়া পিতামাতার অবর্তমানেও পরিবারের সদস্যদের সাহচর্যের কারণে শিশু-কিশোরের মনে একাকীত্ব ও অবসাদগ্রস্ততা আসত না। শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে, পারিবারের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। নিকটাত্মীয়-স্বজন দূরে চলে যাচ্ছে। আর তদস্থান দখল করছে মোবাইল, ফেজবুক, ইন্টারনেট প্রভৃতি। ফলে একক পরিবারের একজন শিশু পিতামাতার চাকুরী বা ব্যবসার কারণে একাকীত্ব অনুভব করছে। তার এ একাকীত্ব অনুভূতি দিনে দিনে আরো প্রকট হয় এবং মানসিক অসুস্থতা সৃষ্টি করে। শিশু তার মানসিক এ অবস্থা থেকে বের হতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে সে অস্বাভাবিক ও বিচ্যুত আচরণ করতে থাকে এবং একসময় কিশোর অপরাধী হিসেবে পরিণত হয়।

(খ) কিশোর অপরাধের সামাজিক কারণ (Social Phenomenon)

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। আবাসিক পরিবেশ, সঙ্গী-সাথীদের প্রভাব, ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা, সামাজিক বিভিন্ন দল ও উপদল বিপরীতমুখী আদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক শোষণ-বঞ্চনা, অপরাধের অনুকূল সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক কাঠামোগত দুর্বলতা, সর্বোপরি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যমের কিছু কিছু নেতিবাচক কার্যক্রমের প্রভাব ইত্যাদি সামাজিক উপাদানগুলো শিশু-কিশোরদেরকে অপরাধপ্রবণ হতে সহায়তা করে। নিম্নে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সামাজিক কারণসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

---

৮০. Abdul Hakim Sarker, *ibid*, p.51

১। সামাজিক কাঠামোগত দুর্বলতা

আমাদের সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার সাথে কিশোর অপরাধের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। কিশোর অপরাধ বিশ্লেষকগণ মনে করেন, সমাজ পরিবেষ্টনকারী অপরিহার্য সমাজিক কাঠামো এবং সমাজ প্রক্রিয়া থেকে কিশোর অপরাধের উৎপত্তি ঘটতে পারে। সামাজিক সংগঠন, সামাজিক আচার-আচরণ, বিশৃঙ্খলা, সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা ও সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই সামাজিক প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা থেকেও কিশোর অপরাধের সৃষ্টি হয়। সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে কিশোর অপরাধ সৃষ্টির কয়েকটি কারণ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

(ক) সামাজিক কাঠামোগত প্রক্রিয়ায় ত্রুটি

আমাদের সমাজ যে সমস্ত কাঠামোগত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে, সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে সেসব কাঠামোগত পদ্ধতির মধ্যেই গলদ রয়েছে। যা শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণ হওয়ার পেছনে দায়ী। যেমন, সমাজ যদি জনগণের চাহিদা অনুসারে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারে, তাহলে মানুষ তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিকল্প পন্থা গ্রহণ করে অপরাধী হিসেবে পরিণত হতে পারে। Ruth Shonle Cavan (1896-1993Ad.) বলেন, সমাজে পরিবেষ্টনকারী এবং অপরিহার্য মৌলিক প্রক্রিয়া যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে কাঠামোবদ্ধ করে, তাকে নিম্নোক্তভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যায়- সামাজিক সংগঠন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্যুতি।[৮১] এর প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াই উল্লেখযোগ্যভাবে কিশোর অপরাধ অবস্থাকে প্রভাবিত করে। তাই রভার্ট কে মার্টন Rovert King Merton (1910-2003 Ad.) তার বিখ্যাত "Social Structure and Anomie" গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সামাজিক কাঠামোগত প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিই কিশোর অপরাধের চূড়ান্ত উৎস। যা এ সত্যকে প্রকাশ করে যে, সমাজের কাঠামোসমূহের মধ্যে ত্রুটি ও বিরোধ রয়েছে।[৮২]

(খ) মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির আচরণগত পার্থক্য

মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যকার আচরণগত ভিন্নতা বা বৈসাদৃশ্য অনেক সময় কিশোরদের মনে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিশোর অনেক সময় নিম্নবিত্ত বা শ্রমিক শ্রেণির কিশোরদেরকে ঘৃণা বা প্রত্যাখান করে, তাদের সাথে মিশতে চায় না। কারণ অনেক সময়ই নিম্নবিত্ত শ্রেণির কিশোরদের ব্যবহারে অসংলগ্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী Albert K. Cohen (1918-2014 Ad.) দাবী করেন যে, আচরণগত

---

৮১. Ruth Shonle Cavan and Fredin and N Theodore, *Juvenile Delinquency and urban areas* (Chicago: University of Chicago Press, 1975), p. 107

৮২. Rovert K Merton, Giallombards, Rosde (Ed), *Social Structure And Anomie, Juvenile Delinquebcy-A Book of Rating* (New York: Wiley a Inc, 1938), p.141

ভিন্নতার ফলে মর্যাদাগত নিরাশা নিম্নশ্রেণি বা শ্রমিক শ্রেণির কিশোরের মনে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যা শ্রমিক শ্রেণির কিশোরদেরকে অপরাধী করার পেছনে ভূমিকা রাখে।[৮৩]

(গ) বৈধ সুযোগের অপ্রতুলতা

কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রতিপালনের অন্যতম কারণ হলো বৈধ বা আইনগত সুযোগ সুবিধা থেকে অবৈধ সুযোগ সুবিধার সহজলভ্যতা। বাংলাদেশ সমাজব্যবস্থায় এখন সবাই একথা স্বীকার করেন যে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ্য লোকের চেয়ে অযোগ্য লোকজনই বেশি। তাই সব জায়গাতেই একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করছে। কোথায় শৃঙ্খলা নেই। চাকুরীরর বাজারেও যোগ্যরা সমানভাবে সুযোগ পায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। অনেকেই অনৈতিক পন্থায় চাকুরীরি পেছনে দৌঁড়ায়। তাই যোগ্যতার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মসংস্থান করতে না পেরে অনেক কিশোর বৈধপন্থায় উপার্জনের চেয়ে অবৈধ পন্থায় উপার্জনের প্রতি বেশি আগ্রহ বোধ করে। কারণ হলো অবৈধপন্থায় উপার্জন ও সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন বৈধ পন্থার সুযোগ সুবিধা থেকে অনেক আকর্ষণীয়। বৈধপন্থায় উপার্জন অনেক কঠিন, আর অবৈধপন্থায় রয়েছে নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা। ফলে শ্রমিক শ্রেণির কিশোররা তাদের জীবন-জীবিকার প্রয়োজন পূরণের জন্য অবৈধ পন্থাকে বেছে নেয়। এটা শুধু নিম্নবিত্ত শ্রেণির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তশ্রেণির কিশোর-কিশোরীরাও বৈধ সুবিধার অপ্রতুলতার জন্য অবৈধভাবে উপার্জনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আর এভাবেই বৈধ সুযোগের অপ্রতুলতার কারণে কিশোর-কিশোরী অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

(ঘ) নেতিবাচক পরিবেশ

আমাদের সামাজিক পরিবেশ অনেকটাই নেতিবাচক। হতাশা, নিরাশা দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দুশ্চিন্তা, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতিতে সমাজ ভরপুর। শিশু কিশোরের মনে এসকল বিষয় সরাসরি রেখাপাত করে এবং তারা তাদের ভবিষ্যত নিয়ে মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। আজকাল দেখা যায় যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা বেড়ে যাচ্ছে, ভবিষ্যৎ চিন্তা এখনই তাদেরকে গ্রাস করছে। এ অবস্থা থেকে অনেকে নিজেকে উত্তরণ করতে না পেরে অপরাধমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। ফলে তারা সহজেই কিশোর অপরাধীতে পরিণত হচ্ছে। তাই সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন, শিশু-কিশোরদের এ অবস্থার জন্য আমাদের সমাজকাঠামোই দায়ী।

২। গণ-সমষ্টি (Mass-Community)

সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্বার বাসনা মানুষের প্রচলিত আদর্শ, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধকে দুর্বল করে তোলে। সমাজে মানুষে মানুষে ও দলে দলে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব সামাজিক নিয়ন্ত্রণ শক্তিকে আরো দুর্বল করতে

৮৩. Albert K. Cohen, Alfred and Schussler, *ibi*, p.119

সহায়তা করে। একটি সমাজের শিশু-কিশোর তাদের চারপাশের জগত অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজে বসবাসকারী প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মূল্যবোধ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অনেক প্রাপ্তবয়স্ক নেতৃস্থানীয় ও গণ্যমান্য মানুষের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ ও সমাজ বিরোধী মনোভাব তথা মূল্যবোধের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। এর কোনটি প্রকাশ্যে বা প্রত্যক্ষভাবে আবার কোনটি পরোক্ষভাবে সমাজে অনুমোদিত হয়ে আসছে। দৈনন্দিন আচার-আচরণে দ্বৈত-মানের (double standard) উপস্থিতিও যথেষ্ঠ। অর্থাৎ একজন শিশু যাকে দেখে বড় হচ্ছে তার কথায় ও কাজের মধ্যে উল্টোমুখী প্রবণতা থাকায় শিশুরা সংশয় ও দ্বিধায় ভোগে। যেমন শিশু-কিশোরকে বিদ্যালয়ে ঘুষ থেকে বিরত থাকার কথা শিক্ষা দেওয়া হলো, আবার পবিরারে বা সমাজে সে প্রকাশ্যে ঘুষের আদা-প্রদান দেখতে পেল। তাহলে এমন একজন কিশোরের মনে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব তৈরি হবে।

এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে বেশ কিছু কার্যকলাপ রয়েছে যা সমাজবিরোধী আচরণ তুল্য। ভদ্রবেশি অপরাধ যথা-ঘুষ, দুর্নীতি, রাজনীতি ও বাণিজ্যে অসততা এসবের অবস্থা দেখে মনে হয় এসবকিছু, 'অনুমতিপ্রাপ্ত' ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য। দৈনন্দিন জীবনে প্রতারণা, চালাকি, বা ছলে-বলে-কৌশলে পরাস্ত করে স্বার্থ আদায়ের ঘটনা অনেকটা প্রকাশ্যেই দেখা যায় এবং এর প্রতি সমাজের একটা মৌন সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। আবার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা কিছু কার্যকলাপ যেমন-জুয়া খেলা, মাদকাসক্তি, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি একদিকে সমাজ কর্তৃক নিষিদ্ধ অন্যদিকে সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ফলে এসব বিষয় শিশু-কিশোরদের মধ্যে শুধু কৌতূহলই নয় 'ভাল' কি 'মন্দ', 'গ্রহণীয়' কি 'বর্জনীয়' এরূপ প্রশ্নের অবতারণা করে।[৮৪] সমাজের এ বিষয়গুলো কিছু অংশের জন্য অনুমোদিত আবার অধিকাংশের জন্য অনুমোদিত নয়, যা কিশোরদের কৌতূহলী মনকে প্রভাবিত করে। তারা সমাজের এসকল দ্বৈত-নীতির কারণে সহজেই অন্যায় কাজে সম্পৃক্ত হতে পারে।

৩। জনসংখ্যার ঘনত্ব

বাংলাদেশ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম এবং এশিয়ার ৫ম জনবহুল দেশ। আর আয়াতনে বিশ্বের ৯০তম দেশ। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ (Population Exploition) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। ছোট এ আয়াতনের দেশে এতো লোকের বসবাস হওয়ায় অপরাধীরা অপরাধ প্রসারে সহায়ক পরিবেশ পাচ্ছে। মাত্র এক বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১১৬ জন, যা পৃথিবীর সর্বোচ্চ (কিছু দ্বীপ ও নগর রাষ্ট্র বাদে)। এখানে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৩৩%।[৮৫] অনেকের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা। নিম্নোক্ত টেবিলে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো-

৮৪. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯

৮৫. *Repot on Bangladesh SampleVital Statistics, 2018* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Information Devision (SID), Ministry of Planning,May,2019), p. 31

সারণী-১১: Population of Bangladesh[৮৬] (Based on Bangladesh Sample Vital Statistics)

Population Census	2001 (million)	2011 (million)	2018 (million)	2019 (million)
Population (In Million)	130.0	151.7	163.7	165.57
Population Growth Rate	-	-	(Percentage)1.33	-
Male-Female Ratio,	-	-	-	100: 100.2
Population Density/Sq. Km				1116

সারণীতে দেখা যায় যে, প্রতি বছরই একটি নির্দিষ্ট হারে (১.৩৩%) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে হারে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাছাড়া মাথাপিছু আয় কম থাকায় অনেকের পক্ষে তাদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেকে বাধ্য হয়ে দুর্নীতি ও অপরাধের মাধ্যমে অবৈধভাবে তাদের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করছে। আর এর প্রভাবে কিশোরদের মাঝে দুর্নীতি ও অপরাধপ্রবণতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। অধিকন্তু বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার দরিদ্র ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে অধিক। দরিদ্র শ্রেণির লোকজন তাদের সন্তান-সন্ততির লেখা-পড়াসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের সামাজিকীকরণ ব্যাহত হয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব যথাযথভাবে গড়ে উঠছে না। সমাজে এদের সংখ্যাই অধিক।

অন্যদিকে শিক্ষিত ও সম্পদশালী শ্রেণির মধ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণের হার বেশি হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে জন্ম হার অনেক কম। সুতরাং দেখা যায় যে, এ দেশে দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উচ্চ শ্রেণির মধ্যে জনসংখ্যা যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দেখা যাচ্ছে। যা সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের মধ্যে অশান্তি, হতাশা, ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা তাদেরকে অপরাধপ্রবণ করার জন্য দায়ী।

৪। প্রাতিষ্ঠানিক কারণ

কিশোর অপরাধের জন্য অন্যান্য কারণের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কারণও কম-বেশি দায়ী। আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্বলতা, অব্যবস্থাপনা ও অবহেলার কারণেও কিশোর অপরাধ সংঘটিত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

৮৬. *Bangladesh Sample Vital Statistics,ibid,* pp. 29-31

(ক) ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা

প্রশাসনিক ত্রুটির কারণেও কিশোর অপরাধ ছড়াতে পারে। প্রশাসন যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। সমাজকাঠামো ভেঙ্গে পরে, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি দেখা দেয়। প্রশাসনের প্রতি জনগণের আস্থা কমে যায় এবং সমাজে হতাশা বৃদ্ধি পায়। ফলে কিশোরকুল একটা আস্থাহীন পরিবেশে বেড়ে উঠে এবং অপরাধমূলক মন-মানসিকতা লালন করতে থাকে।

(খ) ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সমন্বিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য কোন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তাছাড়া শিক্ষা পদ্ধতি, কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হচ্ছে। শিক্ষাদান ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত কোন নিয়ম বা পদ্ধতি নেই। বছরে বছরে পরিবর্তন হচ্ছে সিলেবাস, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার ধরন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি। ফলে শিশু-কিশোর কোন একটি নিয়মের ধারাবাহিকতা এবং সর্বজনীনতার অভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা মনে ধারণ করতে পারছে না। তাছাড়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণিতে একগাদা পাঠ্যপুস্তক ধরিয়ে দেয়া হয়। যা শিশুদের শরীর ও মনের উপর ব্যাপক চাপ ফেলে। ফলে শিশুর লেখা-পড়ার প্রতি অনিহা সৃষ্টি হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই আনন্দগণ সুষ্ঠু পরিবেশ, নেই খেলা-ধুলার জন্য উপযুক্ত মাঠ। গুণগত শিক্ষা নয় বরং বাণিজ্য ও সুনামের অসম প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো কিশোরদের মনে বিচ্যুত আচরণে রূপ নেয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি নিয়মিত উপস্থিতি ব্যবস্থায় শিথিলতা দেখায় অথবা শিক্ষক যদি পুরস্কার এবং প্রশংসার কথা ভুলে গিয়ে সর্বদাই শাস্তির উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন তাহলে কিশোরের চরিত্রে স্কুলপালানো স্বভাব গড়ে উঠবে এবং এ সময়টিতে সে নানা ধরনের অসৎ সঙ্গে মিলিত হয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশে জেনারেল শিক্ষা (স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়), মাদরাসা শিক্ষা (এবতেদায়ী, মক্তব, আলীয়া), ইংরেজি মাধ্যম (ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন, এ লেভেল, ও লেভেল), কিন্ডার গার্টেন, প্রাইমারি, সরকারি নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কওমী নেসাব (সম্প্রতি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত) প্রভৃতি নামে-বেনামে বিভিন্ন ধারার নানামুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এসব নানামুখী শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু-কিশোর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। যা কিশোরের বিচ্যুৎ আচরণের ক্ষেত্রে দায়ী। আবার নানামুখী শিক্ষাব্যবস্থা থাকার ফলে শিশু-কিশোরকে অনেক সময় তাদের পছন্দের স্কুল, মাদরাসা বা কওমী ধারায় পড়ার সুযোগ না দিয়ে অভিভাবকের পছন্দের শিক্ষা ধারায় ভর্তি করা হয়। ফলে শিশু-কিশোরের মনে শুরু থেকে ঐ শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা জন্মে এবং নানা রকম বিচ্যুৎ আচরণ করে সে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। একসময় সে শিশু-কিশোরটি অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। তাই বলা চলে নানামুখী শিক্ষা ব্যবস্থাও কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী হতে পারে।

৫। ধর্মীয় অনুশীলনের অভাব

সাধারণত ধর্মীয় অনুশীলন ও চর্চা আমাদের মনে নীতি-নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ জাগ্রত করে। বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ায় সমাজে ধর্মীয় অনুশীলন হ্রাস পাচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে শিশু-কিশোরদের উপর। তারা পরিবার ও সমাজের নিকট থেকে উপযুক্ত নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা পাচ্ছে না। শিশুদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত না হওয়ায় তারা অধিকাংশ সময় অনৈতিক বিনোদনে অতিবাহিত করে। এ সময়ে শিশুদের সঙ্গদলসহ বয়স্ক অপরাধীর সংস্পর্শে এসে তাদের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাদের এ সিদ্ধান্ত কোন ধরনের ধর্মীয় মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয় না। সুতরাং তারা অপরাধজগতের নিয়ন্ত্রকের প্রতিনিধি, সহযোগী, আবার অনেক সময় পার্টনার হিসেবে কাজ করে।

৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা

সামাজিক পরিবেশে পরিবারের ভূমিকার পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব শিশু-কিশোরদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য যেমন, শিক্ষকের সততা, আন্তরিকতা, ছাত্র-শিক্ষকের পাস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, ছাত্র-ছাত্রীর নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের চেতনা কার্যত অনুপস্থিত।[৮৭] এছাড়াও শিক্ষার্থীদের জন্য গঠনমূলক চিত্তবিনোদন, খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধা ও শিক্ষকদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও প্রকট। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কাঠামোগত ত্রুটিও শিশু-কিশোরের শরীর ও মনে প্রভাব ফেলে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিশু-কিশোরের মনো-দৈহিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ ও অবকাঠামো নেই। নেই পর্যাপ্ত বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ-সুবিধা। এছাড়া সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও স্বকীয়তা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত জাগ্রত করার কোন প্রয়াশও লক্ষ্য করা যায় না। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি শিশু-কিশোরদের রুচি ও সামর্থের অনুপযোগী হলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং তারা নানা অপরাধমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে নিজেদের মানসিক তৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করে। যেমন, স্কুল পালিয়ে তারা রাস্তায় ঘোরাফেরা করে এবং ইভটিজিং, মাদকদ্রব্য গ্রহণ, বিপণন ও ঝগড়া-বিবাদসহ নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৭। শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা

শিক্ষাঙ্গনে অস্তিরতা কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় নিয়মিতভাবে অস্থিরতা বিরাজ করত। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে এ অস্থিরতা অনেকটা কাটিয়ে উঠলেও দীর্ঘদিনের অস্থিরতার ফলে আমাদের তরুণ ছাত্র সমাজের একটা বৃহৎ অংশ নানা রকম

---

৮৭. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

অপরাধমূলক আচার-আচরণের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হত্যা, ইভটিজিং, বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মারামারি, এমনকি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হত। এছাড়া দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মাসের পর মাস বন্ধ রাখা হত। নিয়মিত পাঠ দান, পরীক্ষা গ্রহণ ও অন্যান্য ক্রীড়া-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পুরোপুরি ব্যাহত হত। এ অবস্থার ফলে একজন শিক্ষার্থীর যেভাবে মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধিত হওয়ার কথা, সেটা পুরোপুরি হচ্ছে না। ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। এসকল শিক্ষার্থীদের অনেকেই মানসিক হতাশা, রাজনৈতিক অপব্যবহার এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অবৈধ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। অতএব দেখা যায় যে, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা কিশোর-কিশোরীদের অপরাধপ্রবণতার অন্যতম কারণ।

৮। পর্যাপ্ত কাজের অভাব (Lack of work)

সমাজে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর তুলনায় কাজের সুযোগ সীমিত। ফলে অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ দিন মজুরের কাজে জড়িত থাকে। আবার অনেক সময়ই তারা দিন মজুরের কাজও পায় না। তাই গরীব পরিবারের শিশু-কিশোরদেরকে বাল্যবয়সেই তাদের উপার্জনের রাস্তা বের করতে হয়। কিন্তু তারা এ সময় উপযুক্ত কাজ খুঁজে পায় না। এ অবস্থায় তারা প্রায়ই তাদের অভাব পূরণের জন্য বাধ্য হয়ে অপরাধমূলক কাজে জড়ায়। নিম্নোক্ত টেবিলে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের (কিউক) নিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের পেশা দেখানো হলো:

সারণী-১২: তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (কিউক) নিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের পেশা[৮৮]

পেশা	কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নাম				শতকরা হার
	টঙ্গী	যশোর	কোনাবাড়ী	মোট	
ছাত্র	২৭	২১	৩	৫১	৫১%
শ্রমিক	১৭	৯	৫	৩১	৩১%
বেকার	১০	৭	২	১৯	১৮%
মোট উত্তরদাতা	৫৩	৩৭	১০	১০০	১০০%

উপরোল্লিখিত চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ৫১% নিবাসী ছাত্র কিন্তু তারা ক্ষুধা, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনি। এছাড়া তারা বিভিন্ন ধরনের সঙ্গী গ্রুপ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অপব্যবহারের শিকার হয়েছে। প্রায় ৩১% নিবাসী গার্মেন্টস শ্রমিক, দিন মজুর, হকার, গ্যারেজ ম্যাকানিক, দোকানের বয়, বাস-টেম্পো প্রভৃতি

৮৮. সূত্র: মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা, *প্রাগুক্ত*

পরিবহণের হেলপার, কৃষি শ্রমিক, বাসার কাজ প্রভৃতি শ্রমে নিয়োজিত ছিল। আর প্রায় ১৮% নিবাসী কোন ধরনের কাজেই সংশ্লিষ্ট হয়নি এবং তারা অধিকাংশই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। মাঠপর্যায়ে জরিপের ভিত্তিতে আরো দেখা যায় যে, অধিকাংশ নিবাসীই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল এবং তারা তাদের অবসর সময় গল্প-আড্ডা, ধুমপান, মাদক গ্রহণ এবং সিনেমা দেখে অতিবাহিত করত। এছাড়া দেখা যায় যে, পেশায় ছাত্র হলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নিবাসী বিভিন্ন ধরনের হালকা ও মাঝারি ধরনের পেশা গ্রহণ করেছে এবং এর অর্থ দ্বারা তার তাদের পরিবারকে সাহায্য করেছে।

৯। মাইগ্রেশনের প্রভাব (Impact of migration)

অভিবাসন সমস্যার কারণেও বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বিস্তার ঘটে থাকে। দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের সীমান্ত জেলাসমূহ দিয়ে মায়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে প্রবেশ করতে থাকে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসেব অনুযায়ী, ২৫ আগষ্ট ২০১৭ সালে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর দ্বারা শুরু হওয়া গণহত্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে ৬,৫৫,০০০ থেকে ৭,০০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।[৮৯] এদের মধ্যে প্রায় ৫৮% অর্থাৎ প্রায় ৩,৭৯,৯০০ জন শিশু-কিশোর। গত ২৫ আগষ্ট থেকে ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী সরকার ও জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এ গণহত্যায় নেতৃত্ব দেয়। এছাড়া বিগত তিন দশক ধরে মিয়ানমার সরকারের সহিংস নির্যাতনে ৩,০০,০০০ এর অধিক রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। উচ্চজন্ম হারের কারণে বর্তমানে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৫৫,০০০ এর বেশি হয়েছে। তাহলে বাংলাদেশে আশ্রিত সর্বমোট রোহিঙ্গার সংখ্যা ১২,০০,০০০ (বার লক্ষ) জনেরও বেশি। নিম্নোক্ত সারণীতে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা শিশু-কিশোরদের সংখ্যা তুলে ধরা হলোঃ

সারণী-১৩ঃ Rohingya Population In Bangladesh[৯০]

	Total	Male	Female
Total Population In Need	1200,000	564000	636000
Children (Under 18)	696000	327120	368880
Childern Under- 5	348000	163560	184440
Pregnant and Lacting Women	120000	-	12000
Adolescent	204000	95880	108120

উপরোক্ত চিত্রে দেখা যায় যে, ১২ লক্ষ রোহিঙ্গার মধ্যে ১৮ বছরের নিচে অর্থাৎ শিশু-কিশোরের সংখ্যা প্রায় ৬,৯৬,০০০ জন। এর মধ্যে নারী শিশু-কিশোরের সংখ্যাই বেশি (৩,৬৮,৮৮০ জন)। তন্মধ্যে পাঁচ বছরের

৮৯. UNICEF Bangladesh: *Humanitarian Situation Report No. 16* (Rohingya influx), 24 December, 2017
৯০. UNICEF Bangladesh, *ibid*

অধিক বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩,৪৮,০০০ জন। আবার এদের মধ্যে শুধুমাত্র কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা ২,০৪,০০০ জন। বর্তমানে পর্যটন জেলা কক্সবাজারসহ পার্বত্য অঞ্চলে ১২ লক্ষ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। পূর্বের সাড়ে পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ কিশোর ও যুবক পাহাড়ী জেলাসমূহের জনগণের সাথে মিশে গিয়েছে। ইতোমধ্যেই তারা পার্বত্য অঞ্চলসহ দেশের বিভিন্নস্থানে নানারকম সন্ত্রাসী ও অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। অবৈধভাবে তারা বাংলাদেশী পাসপোর্ট তৈরি করে বিদেশ গমন করছে। দেশের বাহিরে গিয়েও তারা যে সকল অপকর্ম করছে তার দায়ভার বাংলাদেশকে নিতে হচ্ছে। তাছাড়া এসকল রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরী পূর্ব হতেই ইয়াবাসহ নানা মাদক ব্যবসা ও সীমান্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। মিয়ানমার কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে উদ্বাস্তু হিসেবে বাংলাদেশে আসার পরে তাদের অপরাধের মাত্রা আরো নতুনত্ব পায়। বাংলাদেশে আশ্রয়ের সুবিধা নিয়ে তারা অস্ত্রব্যবসা, চোরাচালান, ইয়াবা, ফেনসিডিলসহ নানা রকমের মাদক ব্যবসার নেতৃত্ব দিচ্ছে। ফলে সমগ্র বাংলাদেশে মাদকে ছয়লাভ হয়ে যাচ্ছে। পুলিশসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান মাদক নিয়ন্ত্রনে হিমশিম খাচ্ছে। তার পরেও মাদক নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। আর এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে তরুণ জনগোষ্ঠি। কারণ তারাই এর মার্কেট প্লেস বা ভোক্তা শ্রেণি।

এছাড়া বাংলাদেশে অভ্যন্তরীন মাইগ্রেশনের ফলেও অপরাধ বৃদ্ধি করে। দরিদ্র্যতা, নদী ভাঙ্গনে সর্বশান্ত হওয়া, বেকারত্ব, মঙ্গা প্রভৃতি কারণে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে লক্ষ লক্ষ লোক শহরে মাইগ্রেট করছে। শিশুরা তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে জীবনযাপনের জন্য পিতামাতার সাথে স্থানান্তরিত হয়ে শহরে আসে। সাধারণত দেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসে তারা ঘিঁচি ঘিঁচি বস্তি এলাকায় এবং ফুটপাতে আশ্রয় নেয়। প্রথমদিন থেকেই পরিবারের পিতা-মাতা সন্তানদের সঙ্গিহীন এবং অযত্নে রেখে জীবনযাপনের জন্য উপার্জনে নেমে পড়ে। পরিবারে পিতামাতার নজরদারি ও যত্নের অভাব শিশুদেরকে অনেক সময়ই বিপথে নিয়ে যায়।

১০। মাদকাসক্তি

মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা এবং মাদকগ্রহণের কৌতূহল থেকে মাদকদ্রব্যের প্রতি অভ্যস্ততা বৃদ্ধি পায়। মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তিও অনেক ক্ষেত্রে কিশোর অপরাধের উৎপত্তি ঘটায়। মাদকদ্রব্য ক্রয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক কিশোর-কিশোরী বিভিন্ন গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হতে পারে।[৯১] এছাড়াও মাদকদ্রব্য পাচার ও বিপণন কাজে কিশোর-কিশোরীরা জড়িত থাকার কারণে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা চরম অবনতি ঘটতে পারে এবং দেখা দিতে পারে নানান ধরনের অপরাধ। এজন্যই মাদকদ্রব্যকে বলা হয়েছে উম্মুল খাবায়িছ (فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ) বা সকল প্রকার খারাপ কাজের সূতিকাগার। কেননা মাদকাসক্ত ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তার মানসিক ও শারীরিক বিপর্যয় ঘটে। ফলে সে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, নারী-শিশু নির্যাতন, সহিংসতা, চাঁদাবাজি,

৯১. মঞ্জুর আহমদ, *অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান* (ঢাকা: জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১৩খ্রি.), পৃ. ২১০

পকেটমারা, আত্মহত্যাসহ বড়বড় সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে মাদকাসক্তিতে বাধাঁ দেওয়ায় বা মাদক ক্রয়ের টাকা সরবরাহ না করার কারণে পিতামাতার মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। যেমন, ২৫ আগস্ট ২০১৩ সালের পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) পরিদর্শক মাহফুজুর রহমান ও স্বপ্না রহমান দম্পতির চাঞ্চল্যকর হত্যার ঘটনা তাদের মাদকাসক্ত কিশোরী কন্যা ঐশী কতৃক সংঘটিত হয়েছে। এ সম্পর্কে দৈনিক প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হয়: পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) পরিদর্শক মাহফুজুর রহমান ও স্বপ্না রহমানকে তাদের মেয়ে ঐশী রহমান একাই খুন করেছে বলে দাবি করছে পুলিশ। এদিকে গতকাল আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতেও ঐশী নিজেই তার বাবা-মাকে খুনের কথা স্বীকার করেছে বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে।[৯২]

এছাড়াও মাদকদ্রব্য পাচার ও বিপণন কাজে এদেশের শিশু-কিশোর-কিশোরীরা জড়িত আছে। তারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও ব্যবসা ছাড়াও অন্যান্য অপরাধের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা চরম বিঘ্ন ঘটে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, নারী-শিশু নির্যাতন, সহিংসতা, চাঁদাবাজি, পকেটমারা, আত্মহত্যা ইত্যাদি বড়বড় সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি মাদকাসক্তি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিমুখ করে রাখে এবং পাস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে দেয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ- অর্থাৎ-"শয়তান তো মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে দূরে রাখতে চায়। তারপরও কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত হবে না?"[৯৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- অর্থাৎ-"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর অবশ্যই শয়তানের অপবিত্র ও ঘৃণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তোমরা তা বর্জন কর, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।"[৯৪]

মদ্যপানের ভয়াবহতা ও অনিষ্টতার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত উসমান (রা.) বলেন,

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ

---

৯২. বি. দ্রঃ নিজস্ব প্রতিবেদক, "মা-বাবাকে একাই খুন করে ঐশী," *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ আগস্ট ২০১৩, কলামঃ ৪, পৃ. ১
৯৩. আল-কুরআন, ৫: ৯১
৯৪. আল-কুরআন, ৫: ৯০

أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ–

অর্থাৎ হযরত আবূ বকর বিন আব্দুর রহমান বিন হারিস তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি হয়রত উসমান (রা.) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, "তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ কর। কেননা তা সকল পাপের মা। তোমাদের পূর্ববর্তীকালে একজন ভাল লোক সর্বদা ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকত। একজন কুলটা মহিলা হিংসার বশবর্তী হয়ে তার ক্ষতি করার ইচ্ছা করল। তখন সে তার দাসী পাঠিয়ে লোকটিকে সাক্ষ্য দেওয়ার নাম করে ডেকে আনল। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করলো। যখন লোকটি মহিলার ঘরে প্রবেশ করলো ঐ দাসী ঘরের সব কটি দরজা বন্ধ করে দিল। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হলো আর তার সামনে ছিল একটি সুদর্শন বালক ও এক পেয়ালা (শরাব) মদ। সেই নারী আবেদকে বলল, আল্লাহর শপথ আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন, অথবা এই শরাব পান করবেন, অথবা এ বালককে হত্যা করবেন। এর কোন একটি গ্রহণ না করলে আপনার মুক্তি নেই। লোকটি ভেবে দেখল, তিনটি অপরাধের মধ্যে মদ্যপান অপেক্ষাকৃত লঘু অপরাধ। অতএব, লোকটি মদ্যপান করার সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর বললো, আমাকে এই শরাবের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা শরাবই পান করালো। তখন সে বললো, আমাকে আরো দাও। সে অধিক মদ্যপান করে সম্পূর্ণভাবে মাতাল হয়ে গেল। এরপর সে ঐ সুন্দরী মহিলার সাথে ব্যভিচার ব্যতীত ঐ স্থান ত্যাগ করলো না এবং একপর্যায়ে বালকটিকেও হত্যা করলো। অতএব, তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা, আল্লাহর শপথ শরাব ও ঈমান একত্রিত হতে পারে না। এমনকি একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।"[৯৫]

হাদীসের উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মদ্যপানকারী শুধু নির্দিষ্ট আপরাধের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং তার দ্বারা অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। এজন্যই ইসলাম মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় শ্রেণি মানুষের জন্য অভিসম্পাত করেছে। হযরত ইবন উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এ হাদীসটির বর্ণনা করেছেন, **لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ**–অর্থাৎ-"আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর, মদ্য পরিবেশন কারীর উপর, তার ক্রয়কারীর উপর, তার বিক্রেতার উপর, তার উৎপাদনের কাজের উপর, তার উৎপাদন যে করায় তার উপর, তার বহনকারীর

৯৫. ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ আবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (রহ.), *সুনানুন- নাসাঈ*, অধ্যায়: আল-আশরিবা, অনুচ্ছেদ: যিকরুল আছামিল-মুতাওয়াল্লিদাতি আন-শুরবিল খামরি মিন তারকিস সালাওয়াত (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবি, তা.বি.), হাদীস নং- ৫৬৬৬

উপর এবং তা যার জন্য বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর।"[৯৬] উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, মাদকাসক্তি কিশোর ও যুব সমাজকে সহজেই অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে।

১১। আবাসিক পরিবেশগত কারণ

আবাসিক পরিবেশগত কারণে এদেশে কিশোর অপরাধ সমস্যার প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। আবাসিক পরিবেশ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রধান উপাদান। বাংলাদেশের অনেক পরিবার তার সন্তানের জন্য বাসস্থানের উপযুক্ত পরিবেশ দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে তারা বাধ্য হয়ে বাসস্থানের অনুপযুক্ত পরিবেশ যেমন, বস্তি, ফুটপাত, ভাসমান বা ভবঘুরে, ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাস করে। আর এসব এলাকায় বসবাস করে কিশোর-কিশোরীরা সহজে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়। কেননা তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয় না এবং তাদের কোন সামাজিক প্রশিক্ষণও নেই। কিশোর অপরাধের বিস্তারের ক্ষেত্রে আবাসিক পরিবেশের ভূমিকা অনুধাবনের সুবিধার্থে বাংলাদেশ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে (কিউক) পরিচালিত জরিপের ফলাফল নিম্নোক্ত টেবিলে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণী-১৪ : আবাসিক ঠিকানা অনুযায়ী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (কিউক) নিবাসীদের পরিসংখ্যান[৯৭]

বসবাস স্থান	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
শহর	৬৪	৬৪%
গ্রাম	২৯	২৯%
অন্যান্য	০৭	০৭%
মোট	১০০	১০০%

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় যে, ১০০ জন নিবাসীর মধ্যে ৬৪% জন নিবাসী শহর কেন্দ্রিক বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করেছে। এর মধ্যে বস্তি, ফুটপাত ও ভাসমান শিশুদের সংখ্যা বেশি। আর মাত্র ২৯% অপরাধী নিবাসী গ্রাম এলাকায় বসবাস করত। আর মাত্র ৭% অপরাধী নিবাসী শহর বা গ্রামে নয় বরং অন্য কোথাও বসবাস করত। সুতরাং কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে আবাসিক পরিবেশের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

১২। সঙ্গদল (Peer Group)

কিশোর অপরাধের ক্ষেত্রে সঙ্গদলের প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিশোর-কিশোরীরা এই বয়সে পরিবারের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলতে চায় এবং পাড়া-প্রতিবেশী, খেলার সাথী ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কিশোররা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিজের একটি আলাদা রঙিন জগত তৈরি

৯৬. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবুল ইনাবু ই'উছারু লিলখামরে (রিয়াদঃ মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯হি.), হাদীস নং-৩৬৭৪

৯৭. সূত্রঃ মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা, *প্রাগুক্ত*

করে। এ ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু-কিশোররা অত্যন্ত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে, যা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে করতে পারে না।[৯৮] বন্ধুদের সাথের এ জগত এবং সময়টা খুবই রোমাঞ্চকর এবং আকর্ষণীয় হয়। সুতরাং সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কেউ অসৎ প্রকৃতির বা অপরাধপ্রবণ থাকলে তাদের প্রভাবে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।[৯৯] আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে শিশু-কিশোরদের অনেকেই দলবদ্ধভাবে থাকতে পছন্দ করে। আর একাকী থাকার চেয়ে দলবদ্ধভাবে থাকার সময়ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসাদাচরণে নিয়োজিত হয়। এটি আনুষ্ঠানিক দলীয় বন্ধনের আকারে বা গ্যাং এর আকারে হয়ে থাকে। আবার সম্মিলিতভাবেও অনেক অনেক দুষ্কর্ম সংঘটিত হয়। দলীয় অপরাধ প্রবণতার তৃতীয় একটি ধরন লক্ষ্য করা যায় 'স্ট্রিট কর্ণার গ্রুপের' মধ্যে; যেটি গ্যাং এর কার্যকলাপ বলে পরিচিতি পায়। উল্লেখ্য গ্যাং সাধারণত আবদ্ধ ও পদক্রম অনুসারে বন্ধুদের একটি দল (closed hierarchical companion)। এ ধরনের গ্যাং কার্যকলাপে নিয়োজিতদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাশিয়াতে পরিচিতি পেয়েছে 'Hooligan' হিসেবে আর বাংলাদেশে 'মাস্তান'।

জাতিসংঘের এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, "There are or were called in Germany, halbstrake (the half matured), in France *Bolusons Noirs,* in England *Teddy Boys* , in Italy *Vitelloni,* in Poland and Russia *Hooligans,* in Australia and Newzealand *Bodgies and Widgies* (girls), in South Africa *Tsotsio* and in Japan *Mambo Boys and Girls*."[১০০] অর্থাৎ তাদেরকে জামার্নীতে halbstrake, ফ্রান্সে Bolusons Noirs, ইংল্যান্ডে Teddy Boys, ইতালীতে Vitelloni, পোল্যান্ড ও রাশিয়ায় Hooligans, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে Bodgies and Widgies, দক্ষিণ আফ্রিকায় Tsotsio এবং জাপানে Mambo Boys and Girls নামে ডাকা হয়।

আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, শিশু বা কিশোর প্রথমে তার সঙ্গীদের সাথেই ছোট ছোট অবাধ্য ও বিচ্যুত আচরণ করে থাকে। যেমন, কৌতূহলী হয়ে ধুমপান, মদ্যপান, দল বেঁধে হৈ-হল্লা করা, ছোট ছোট চুরি, গ্রামে দল বেঁধে ডাব, হাস-মুরগি প্রভৃতি চুরি করে পিকনিক, বিভিন্ন ফল-মুল ও ফসল চুরি ইত্যাদি। পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে তারা এসব অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে ধুমপান থেকে গাঁজা, হিরোইন, কোকেইন, ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে। মাদকাসক্ত যুবক ছিনতাই, পকেটমারা, চোরাচালানী কর্মে যুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সে একজন কিশোর অপরাধী হিসেবে বেড়ে উঠে। তাছাড়া পরিবারে যদি প্রীতিকর অবস্থা

---

৯৮. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫২

৯৯. আদনান আদ-দূরী, *আসবাবুল জারীমা ওয়া তবীআতুস সুলূকিল ইজরামী* (কুয়েত: মানশুরাতু ডাতিস সালাসিল, ১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৩০৬; আনোয়ার মুহাম্মদ, *ইনহিরাফুল আহদাছ* (আল-কাহেরা: দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ১১৫-১১৬

১০০. United Nations, *New Forms of Juvenile Delinquency: Their Origin, Prevention and Treatment* (New York: Dept. of Economic and Social Affairs, 1960), pp.35-36

বিরাজ না করে তাহলে দেখা যায়, শিশুরা বখাটে ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করে, দল বেঁধে আড্ডা দেয়, রাস্তায় গ্যাঙিং এ যুক্ত হয় ও হল্লা করে বেড়ায়। তাই বলা যায় যে, কিশোর অপরাধ ব্যাপকভাবে দলীয় কার্যকলাপ।[১০১]

সঙ্গী-সাথীদের দ্বারা মানুষের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র বাণীতেও ফুটে উঠেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বন্ধু নির্বাচনে ভাল সঙ্গী খুঁজে নেওয়ার আহ্বান করেছেন, পাশাপাশি মন্দ সঙ্গীদের থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিম্নোক্ত হাদীসে ভাল ও খারাপ প্রকৃতির সঙ্গীর সাথে উঠা-বসার বাস্তব পরিণতি উপমার মাধ্যমে তুলে ধরে বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ-

অর্থঃ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "কুরআন পাঠকারী মু'মিনের তুলনা ঐ খেজুরের মত- যার সুঘ্রাণ আছে এবং খেতে মিস্টি। আর যে কুরআন পাঠ করে না সে মু'মিনের উদাহরণ ঐ খেজুরের মত, যা খেতে সুস্বাদু, তবে তাতে কোন সুঘ্রাণ নেই। আর গুনাহগার ব্যক্তির কুরআন পাঠের তুলনা ঐ সুগন্ধি ঘাসের ন্যায় যার স্বাদ তিক্ত এবং যে গুনাহগার কুরআন পাঠ করে না, সে ঐ তিক্ত গাছের ন্যায়- যা বিস্বাদ এবং তাতে কোন ঘ্রাণও নেই। ভাল সাথী বা বন্ধু মিস্‌ক (আতর, খোশবু, সুগন্ধিদ্রব্য) বিক্রেতার ন্যায়। সে যদি তোমাকে মিস্‌ক নাও দেয়, তবে এর একটু সুঘ্রাণ তোমার নিকট পৌঁছবেই। পক্ষান্তরে, মন্দ সাথী বা বন্ধু কর্মকারের ন্যায়। কর্মকারের হাপরের ময়লা (কাল রং) তোমার গায়ে না লাগলেও একটু ধুয়া হলেও তোমার গায়ে লাগবে (তোমাকে কষ্ট দিবে)।"[১০২]

উপরোল্লিখিত হাদীসে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, ভাল বন্ধুর সাহচর্যে কল্যাণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা রয়েছে, তা যত কমই হোক না কেন। পক্ষান্তরে মন্দ বন্ধুর সাহচর্যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা যত তুচ্ছ হোক না কেন। অপর এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূললুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

১০১. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, ১৬৮

১০২. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, অধ্যায়ঃ আল-আদব, অনুচ্ছেদঃ মান ইয়ুমারু আন ইয়ুজালিসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮২৯

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ–অর্থাৎ-"ব্যক্তি তার বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়। কাজেই, তোমাদের দেখা উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।"[১০৩] রাসূলুল্লাহ (সা.) বর্ণিত এই হাদীসেও সঙ্গী-সাথীদের মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক দিক প্রভাবিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সাহচার্য লাভকারী যদি শিশু-কিশোর হয় তাহলে সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি; কারণ তারা সবচেয়ে বেশি অনুকরণপ্রিয়। এ কারণেই অপরাধবিজ্ঞানে সঙ্গদলকে (Peer Group) কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১৩। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস (Social classification)

আবহমান কাল থেকে আমাদের সমাজে সাধারণত তিনটি শ্রেণি লক্ষ্য করা যায়, নিম্নবিত্ত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত, শ্রেণি ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি। শিশুদের আচার-আচরণে সামাজিক এ সকল জাত-পাত, শ্রেণি, বংশ প্রভৃতি ব্যাপক প্রভাব ফেলে। নিম্ন শ্রেণি থেকে আসা শিশু-কিশোর উচ্চশ্রেণির শিশু-কিশোরদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা পায় না। নিম্ন শ্রেণির শিশুর নিজেদেরকে অবহেলিত মনে করে এবং নিজেদেরকে সমাজের উপযুক্ত মনে করে না। এ অবহেলার কারণে তাদের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে এবং অপরিণত মনে প্রায়শই এ অবস্থার কারণে তাদের মনে নিরাশা জন্ম নেয়। ফলে তারা দুঃখ, কষ্ট ও গরীব অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বিকল্প পন্থা হিসেবে বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

১৪। সামাজিক শোষণ বঞ্চনা

বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পেশা গ্রহণে ব্যর্থ কিশোর-কিশোরীরা নিজেদেরকে সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে না পারার কারণে সামাজিক শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়। তাছাড়া সমাজের বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় তারা শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়, যা তাদেরকে বিপথগামী করতে সহায়তা করে। এ প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম'-এর ২০১৮ সালের প্রতিবেদনটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এপ্রিল, ২০১৯ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং শিশু অধিকার লঙ্ঘনের একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশা করা হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনের আলোকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে শিশু অধিকার লঙ্ঘনের একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হল-

---

১০৩. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৮৩৩

সারণী-১৫: Child Rights Violations in 2018[১০৪]

SL	Categories of Child Rights Violation	2018	2017	+ /- (%)
	Total	4566	3845	18.75%
1.	Fatalities	2354	1710	37.66%
2.	Sexual Abuse & Exploitation	812	894	-9.17%
3.	Kidnapping, Missing	570	433	31.64%
4.	Physical Torture & Violence	262	271	-3.32%
5.	Injuries	396	231	71.43%
6.	Child Marriage	172	306	-43.79%

চিত্রে দেখা যায় যে, ২০১৮ সালে সর্বমোট ৪৫৬৬ জন শিশু ৬টি ভিন্ন ধরনের নির্যাতন ও নিরাপত্তা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশে, ৬টি ভিন্ন নির্দেশকে শিশু নির্যাতন এবং নিরাপত্তাহীনতা ১৮.৭৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২৩৫৪ টি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে যা গত বছরের তুলনায় ৩৭.৬৬ বেশি। সার্বিকভাবে অপহরণ, নিরুদ্দেশ হওয়া বা খুঁজে না পওয়া এবং শিশু উদ্ধারের হার ৩১.৬৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুর যৌন নির্যাতন ঘটনা ৯.১৭ % কমেছে এর মধ্যে অধিকাংশই মেয়ে শিশু। এ সময়ে শারীরিক পীড়ন ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা কিছুটা নিম্নগতি (৩.৩২%)। বাল্য বিবাহ নিরোধের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নয়ন ঘটেছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৬ ও ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে যথক্রমে ৪৩.৭৯% ও ৫৮.৪৫% বাল্য বিবাহের কমেছে। মোটা দাগে যৌন নির্যাতনের বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।[১০৫] উপরোক্ত কারণে শিশু-কিশোরদের মনে তীব্র হতাশা ও নৈরাশ্য দানা বাঁধে, যা একপর্যায়ে সমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও আক্রোশে রূপ নেয়। এমন পরিস্থিতিতে এই ব্যর্থ কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এবং অপরাধমূলক আচার-আচরণে লিপ্ত হয়।[১০৬]

১৫। সমাজে বিভিন্নদল ও উপদলের প্রভাব

প্রত্যেক সমাজেই কিছু ছোট ছোট গোষ্ঠী বা দল রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজে এর সাথে যুক্ত হয়েছে বংশগত বা পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যবোধ, বৈশিষ্ট্য ও দ্বন্দ্ব। এ পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবারে পরিবারে বা বংশগত দ্বন্দ্বের শিকার হয় উঠতি কিশোর-কিশোরী। বংশগত দ্বন্দ্বের কারণে অনেক কিশোর-কিশোরী তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভুলে পরস্পরিক আক্রোশে নিজের জীবনকে নষ্ট করে ফেলে। তাছাড়া বংশগত ঝগড়া-

১০৪. *State of Child Rights in Bangladesh 2018, ibid,* p.9
১০৫. *Ibid,* p. 9
১০৬. মঞ্জুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩; ইবরাহীম আব্দুহু আশ-শুরফাবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৪

বিবাদের ফলে কিশোর-কিশোরীদের অনেকেই জেল-হাজতে জীবন অতিবাহিত করে। বর্তমানে দৈনিক পত্রিক খুললে কিংবা অনলাইন পত্রিকায় চোখ রাখলেই পারিবারিক জমিজমা, লেন- দেন সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদে কিশোর-কিশোরী ও শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমণ হত্যা, জখমসহ নানাবিধ অপরাধের খবর পাওয়া যায়। তাছাড়া সমাজের প্রত্যেক দল বা গোষ্ঠীরই কিছু নীতি-আদর্শ ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা অনেক সময় চলমান আইন ও নীতির সাথে বৈপরিত্যমূলক। প্রত্যেক দল ও গোষ্ঠী নিজেদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ অর্জনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অনেক সময় এ প্রচেষ্টা দেশের প্রচলিত আইন ও রীতি-নীতি অনুযায়ী না হয়ে আইন বিরোধী হয়।

১৬। গণমাধ্যমের প্রভাব

তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন-প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক্স ও অনলাইন মিডিয়া, মোবাইল, ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ, মেসেঞ্জার, ইউটিউব এবং হালে যুক্ত হওয়া টিকটক ও লাইকি প্রভৃতি গণমাধ্যমগুলো শিশু-কিশোরদের নিকট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এগুলো তাদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে এবং তাদের মানসিক চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে।[১০৭] এছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় অসংখ্য অনলাইন পোর্টাল, যাদের সরকারি কোন নিবন্ধন পর্যন্ত নেই। এসব পোর্টালে সাংবাদিকতার নীতিবোধ ন্যূনতম পালন করা হয় না। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অন্যকে হেয় করার জন্য বা ফাঁসানোর জন্য সংবাদ পরিবেশন করে। আবার অনেক সময় মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে নানা মন্তব্য ও বক্তব্য পেশ করে। যা সমাজে ধর্মীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায়। অনেক সময় এসব হলুদ সাংবাদিকতার কারণে উত্তেজনা এতটাই প্রবল হয় যে, পারস্পরিক সংঘাতে প্রাণনাশের ঘটনাও ঘটছে।

সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায় যে, গণমাধ্যম্যের নামী-দামী চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের রঙিন নিষিদ্ধ ভিডিও বা ছবি ইন্টারনেট তথা অনলাইনে ছড়িয়ে পড়লেও বর্তমানে সামাজিকভাবে এসকল অন্যায় কাজকে প্রতিহত করার কোন পদক্ষেপ নেই। বরং সমাজে এর একটা মৌন স্বীকৃতি রয়েছে বলে মনে হয়। ফলে ঐসব কুরুচিপূর্ণ ভিডিওর অভিনেতা-অভিনেত্রী মিডিয়াতে আরো শক্ত অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়। সমাজের উঠতি কিশোর-কিশোরীও সহজে আলোচনায় আসার জন্য এবং রাতারাতি খ্যাতি অর্জনের জন্য এসব অপরাধের অনুসরণে নিজেরাও অনুরূপ অপরাধে সম্পৃক্ত হয়। এছাড়াও এসব ভিডিও এবং ছবি দেখে কিশোর-কিশোরীদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে। যৌনরসে সিক্ত সিনেমা, বিজ্ঞাপন চিত্র, ফ্যাশন শো এর নামে প্রদর্শিত যৌন আবেদনময়ী অনুষ্ঠানমালা আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও মানসিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে বিপদগামী করে। ফলে সমাজে ব্যভিচার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়াও টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন দুঃসাহসিক ও নৃশংস হত্যাকাণ্ড, সিরিয়াল কিলিং এবং অপরাধের নানা কলা-কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিশোর-

১০৭. আলী মুহাম্মদ জা'ফর, *আল-আহদাছ আল-মুনাহারিফুন* (বৈরুত: আল-মু'য়াসসাতুল জামি'ইয়্যাহ, ১৪০৫হি.), পৃ. ৮৭; মো. আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭

কিশোরীরা নিজেরাও সেরূপ অপরাধে উৎসাহিত হচ্ছে। ফলে কিশোরদের মধ্যে অপরাধের ভয়ঙ্কর মনোভাব দ্রুত সহজভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। আব্দুল হাকিম সরকার গণমাধ্যমের প্রভাবকে উদ্ধৃত করেছেন নিম্নক্তোভাবে-

(ক) দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় গণমাধ্যম কিশোরদের ক্ষুধা মেটায়।

(খ) দুঃসাহসিক যৌনকর্মে প্রবৃত্ত হতে এটি প্রভাবিত করে।

(গ) অপরাধীদের গৌরবান্বিত করে।

(ঘ) অপরাধের যাবতীয় জ্ঞান ও কলা-কৌশল প্রদান করে।

(ঙ) সমাজে অপরাধমূলক জীবনের উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়।[১০৮]

১৭। স্বাক্ষরজ্ঞানহীনতা

বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার সন্তোষজনক নয়। যদিও সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। তবুও অনেক শিশু-কিশোর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। বর্তমান বাংলাদেশে ৭+ বয়সীদের শিক্ষার হার ৬৩.৬% (২০১৫) আর ১৫+ বয়স্ক শিক্ষারহার ৫৪.৪% (২০১৫)।[১০৯] বাংলাদেশের স্বাক্ষরতার ক্রমন্বোতির একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো-

সারণী-১৬: Literacy Rate of Population 7+ Years

Literacy Rate of Population 7+ Years	% (Percent)			
Age Group	2015	2016	2017	2018
Both sex	63.6%	71%	72.3%	73.2%
Male	65.6%	73%	78.3%	75.2%
Female	61.6%	69%	70.2%	71.2%

সারণী-১৭: Literacy Rate of Population 7+ Years (Rural Area)

Age Group	2015	2016	2017	2018
Both sex	57.2%	65.6%	66.5%	67.6%
Male	59.2%	67.7%	68.6%	69.7%
Female	55.1%	63.3%	64.8%	65.5%

১০৮. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

১০৯. *Statistical Pocket Book Bangladesh 2016* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS),Statistics and Information Devision (SID), Ministry of Planning,March-2017), p. 301

সারণী-১৮: Literacy Rate of Population 7+ Years (Urban Area)

Age Group	2015	2016	2017	2018
Both sex	73.3%	77.7%	79.5%	80.1%
Male	75.3%	79.6%	81.5%	82.0%
Female	71.2%	75.8%	77.5%	78.2%

সারণী-১৯: Literacy Rate of Population 15+ Years

Age Group	2015	2016	2017	2018
Both sex	64.4%	72.3%	72.9%	73.9%
Male	67.6%	75.2%	75.7%	76.7%
Female	61.6%	69.5%	70.1%	70.2%

সারণী-২০: Literacy Rate of Population 15+ Years (Rural Area)

Age Group	2015	2016	2017	2018
Both sex	57.6%	65.5%	66.5%	67.6%
Male	60.6%	67.7%	68.6%	69.7%
Female	54.6%	63.3%	64.4%	65.5%

সারণী-২১: Literacy Rate of Population 15+ Years (Urban Area)[১১০]

Age Group	2015	2016	2017	2018
Both sex	74.7%	77.7%	79.5%	80.61%
Male	77.7%	79.6%	81.5%	82.0%
Female	71.6%	75.8%	77.5%	78.2%

---

১১০. (সারণী-১৬ থেকে ২১) *Repot on Bangladesh SampleVital Statistics, 2018,* ibid, p. xxix

উপরোক্ত সারণীতে (সারণী-১৬ থেকে ২১) দেখা যায় যে, ২০১৫, ২০১৬ ও, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে ক্রমান্বয়ে স্বাক্ষরতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নতি সাধন করেছে। এছাড়া চিত্রসমূহে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের ক্রমোন্নয়নের হারে দেখা যায় যে, শহরের তুলনায় গ্রামের স্বাক্ষরতার উন্নতির হার একটু কম। অন্যদিকে নারী-পুরুষের তুলনামূলক পরিসংখ্যানে দেখো যাচ্ছে যে, শহর এবং গ্রাম উভয়স্থানেই নারীরা শিক্ষার ক্রমোন্নয়নে পুরুষের তুলনায় একটু পিছিয়ে রয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে বিরাট সংখ্যক শিশু ও তরুণ স্কুলের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এসব কিশোর-কিশোরীরা অধিকাংশই বেকার ও তাদের নেই কোন প্রশিক্ষণ। ফলে তাদের অনেকেরই জীবনে ভবিষ্যতের কোন দিক নির্দেশনা নেই। দেশে স্থায়ী ও সর্বব্যাপী দরিদ্র অবস্থার পেক্ষাপটে এ সব শিশু-কিশোরদের অনেকেই জীবনে কোন সম্মানজনক জীবিকা বেছে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর উপর বর্তমানে অধুনিক সমাজে এসব সংকটক্লিস্ট শিশু-তরুণ আরও বহুমুখী সমস্যা ও দুর্ভোগের মুখোমুখী। এর ফলে তারা কখনও কখনও এমন আচরণ বা কার্যকলাপ প্রদর্শন করে যা প্রায়শঃই বিসদৃশ মনে হয়, মনে হয় সমাজ বিরোধী কাজ।

১৮। অপরাধের অনুকূল সুযোগ-সুবিধা

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের জন্য পরিস্থিতিগত অনুকূল সুযোগ-সুবিধাও অনেকটা দায়ী। দেখা যায় হাট-বাজার বা সিনেমা থিয়েটার ও বস্তি এলাকায় বসবাসকারী কিশোররা সহসা ধূর্ত ও অপরাধী হয়ে পড়ে। এছাড়া সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী কিশোর-কিশোরীরা মাদক, সোনাসহ বিভিন্ন পণ্যের চোরাচালান, নারী-শিশু পাচার, মানব পাচার ও হুন্ডিসহ নানাবিধ অপরাধকর্মে সহজে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া বাস স্টান্ড, রেলস্টেশন এবং এসবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা ঘনবসতি ও বস্তি এলাকায় কিশোর অপরাধ তুলনামূলকভাবে বেশি। সাম্প্রতিককালে গবেষণায় উঠে এসেছে যে, অপরাধের অনুকূল সুযোগ-সুবিধাজনক স্থানে অপরাধ অপেক্ষাকৃত বেশি হয় এবং এসব পরিস্থিতিতে কিশোরদেরই বেশি সংশ্লিষ্টতা পওয়া যায়। এছাড়া আমাদের দেশে বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট, রেলস্টেশনের ভাসমান শিশু-কিশোর চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, চুরি, ছিনতাই, পকেটমারা প্রভৃতি অপরাধের মাত্রা একটু বেশি পরিলক্ষিত হয়। অতএব দেখা যায় যে, অপরাধের অনুকূল পরিবেশ কিশোর অপরাধের মাত্রাকে তরান্বিত করে।

১৯। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন (Unplanned industrialization and urbanization)

দ্রুত শিল্পায়ন ও শহরায়নের সাথে বিচিত্র সামাজিক পরিবর্তনের কারণে কিশোর-কিশোরীদের আচরণে প্রভাব ফেলে। নগরায়ন প্রক্রিয়া পারিবারিক জীবনকে প্রভাবিত করে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়।[১১১] বর্তমানে শিল্পায়ন ও শহরায়ন প্রক্রিয়ায় অব্যাহতভাবে গ্রামাঞ্চল হতে শহরাঞ্চলে জনগণ স্থানান্তরিত হচ্ছে। অব্যাহত

---

১১১. Shekh Hafizur Rahman Karzon, *Theoritical and Applied Criminology* (Dhaka: Palal Prokashoni and Empowerment Through Law of the Common People (ELCOP), 2008), p.370

শহরগামী মানুষের এই যাত্রার ফলে পরিবারের চিরন্তন বন্ধনে ধরেছে ভাঙ্গন। উন্নয়নশীল দেশসমূহে মানুষের জীবন-যাত্রার এই ক্রান্তিকালে পরিবারে সৃষ্ট ভাঙ্গন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে শাশ্বত মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণ হতে শুরু করে।[১১২] অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়নের কারণে এসকল শহর ও শিল্প-কারখানায় কাজের খোঁজে লোকজন বিভিন্ন গ্রাম থেকে এসে সাধারণত বস্তি, ফুটপাত, রাস্তা প্রভৃতি জায়গায় আশ্রয় নেয়। এখানে তারা জীবন ধারণের জন্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়। তাদের রঙিন স্বপ্ন ধুসর হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা সংঘবদ্ধ অপরাধী গ্যাং এর সংস্পর্শে আসে এবং এসকল সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।

২০। নগর জীবনে আবাসিক সমস্যা

শিল্পায়নের ফলে নগরায়ন ত্বরান্বিত হয় এবং শিল্পনির্ভর নগর জীবনে কতিপয় সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এগুলোর মধ্যে আবাসিক সমস্যা অন্যতম। নগর জীবনের আবাসিক সমস্যার কারণে শহরে বস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং গোটা শহর জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। চরম আবাসিক সংকটের কারণে জনাকীর্ণ এলাকায় কিশোরদের গল্পগুজব এবং নানা ধরনের মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। একদিকে দারিদ্র্য অন্যদিকে অবাধ এবং সারাক্ষণ দলবদ্ধ জীবনযাপন করতে গিয়ে অনেক কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা জাগে। তাদের এই অপরাধপ্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে দুঃসাহিসিক অভিযান এবং নানারকম অস্বাভাবিক কাজকর্মকে কেন্দ্র করে। এ অবস্থায় তারা কখনও কখনও ছোট ছোট দল বেঁধে নানা ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়ে থাকে। এছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে ফুটপাত, পার্ক ও উন্মুক্ত জায়গায় বসবাসের কারণে ভাসমান লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাসমান জনগোষ্ঠী হওয়ার কারণে এ সকল মানুষের দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহীতার প্রয়োজন হয় না। তাই তারা সহজেই নানা ধরনের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে। এদের সন্তানদের অনেকেই পথশিশুতে পরিণত হয়ে বাল্যবয়স হতে টোকাই, ভ্রাম্যমান হকার ও পথশিশুতে পরিণত হয়। এসকল পথশিশু ও হকারদের অনেকেই আবার মাদক গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয়, চুরি, ছিনতাইসহ অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে যায়। ঢাকার শাহবাগ মোড় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর পর্যন্ত ফুটপাতে বসবাসকৃত ২০ জন ভাসমান শিশু-কিশোরদের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে দেখা যায় যে, এসব শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রায় সবাই গাঁজা, ইয়াবা, ফেনসিডিলসহ অন্যান্য মাদক বহন, মাদক গ্রহণ ও ব্যবসায় জড়িত রয়েছে।[১১৩]

---

১১২. Edwin Hardin Sutherland and Donald Ray Cressey, *ibid*, p.82; আবদুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪

১১৩. সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী,২০২০, স্থান: শাহবাগ থেকে দোয়েল চত্বর মোড়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকা (- গবেষক)।

২১। সাইবার আসক্তি

সম্প্রতি বাংলাদেশে সাইবার অপরাধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সাইবার জগতে বাংলাদেশের প্রবেশ একটু দেরীতে হলেও সাইবার অপরাধে বাংলাদেশের তরুণদের অংশগ্রহণ আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাধারণত কিশোর-কিশোরীরা সাইবার বা তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ হওয়ায় বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধে তারাই অগ্রগামী। এটি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত এবং ভয়ংকর এক অপরাধের নাম। সমাজের তরুণ প্রজন্ম সাইবারের রঙিন জগতে নিমগ্ন থাকে। এখানে তারা নানা ধরনের ব্লু-ফিল্মসহ অন্যান্য মূল্যবোধ অবক্ষয়ের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং নারী-শিশু নির্যাতন ও বলৎকার প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে তা অবদমিত করে। এছাড়া কিশোর সাইবার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাংক ডাকাতি, তথ্য চুরি, হ্যাকিং করা, মিথ্যা প্রচারণা চালানো, গুজব ছড়ানোর মত ভয়ানক অপরাধ সংঘটিত করছে। আধুনা সাইবার ওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীরা আশঙ্কাজনকহারে সাইবার অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।[১১৪]

২২। বয়স্ক অপরাধীদের স্বার্থে শিশু-কিশোরদের ব্যবহার (Exploiation by adult criminals)

সমাজের অসহায়, প্রতিকূলতার শিকার শিশু-কিশোরদের নিকট হতে বয়স্ক অপরাধীরা অসমুচিত ও অযৌক্তিক সুবিধা গ্রহণ করে। সরাসরি আইনের সাথে মুখোমুখী অবস্থানে না গিয়ে শিশু-কিশোরদেরকে নানা রকম অনৈতিক ও বেআইনি কাজে সংশ্লিষ্ট করা বয়স্ক অপরাধীদের জন্য খুবই লাভজনক। মাদকদ্রব্য বিক্রেতা ও অস্ত্র চোরাচালানীরা এসকল শিশু-কিশোরদেরকে বিভিন্ন অবৈধ দ্রব্য পরিবহনের কাজে ব্যবহার করে। কারণ শিশুরা এসকল অবৈধ দ্রব্য বহন এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেকটা নিরাপদ বলে প্রমাণিত। এবং অনেক সময়ই দেখা যায় যে, এসকল শিশু-কিশোরর জানে না যে, তারা যা বহন করছে বা পৌঁছে দিচ্ছে সেটি অবৈধ বা বেআইনী কাজ।[১১৫] অতএব বলা যায় যে, সামাজিক অনিয়ম, প্রতিকূলতা, ঘাত-সংঘাত ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব প্রভৃতি কিশোর-কিশোরীদের মনে নানারকম সংশয় ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং অপরাধপ্রবণতা দানা বাঁধে। বিশেষ করে সমাজ কাঠামোগত দুর্বলতা, প্রতিষ্ঠানিক অক্ষমতা ও দুর্বলতা, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, সমাজের বিভিন্ন দল ও উপদলের আদর্শগত দ্বন্দ্ব, নগর জীবনের নানা সমস্যা, মাদকের ছোবল, রাজনৈতিক প্রতিহিংষা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, গণসমষ্টি এবং সর্বোপরি কিশোরদের সঙ্গদল তথা দলবদ্ধ আড্ডা কিশোর অপরাধের জন্য অনেকাংশেই দায়ী।

---

১১৪. মো. আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭
১১৫. Shekh Hafizur Rahman Karzon, *ibid,* P.370

(গ) কিশোর অপরাধের অর্থনৈতিক কারণ

একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কিশোর অপরাধকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। দারিদ্রতা, সম্পদের প্রাচুর্য, সমাজে সম্পদের অসম বণ্টন, শ্রমিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা, বেকারত্ব, কর্মহীনতা, অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কিশোর অপরাধ সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.) ও ফ্রেড্রিচ এঞ্জেলস (১৮২০-১৮৯৫ খ্রি.)-এর মতে কিশোর অপরাধসহ সবধরনের অপরাধের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ।[১১৬] তাদের মতে চুরি, ডাকাতি শুধু অভাবী-অনটন পীড়িত সাধারণ মানুষই করে না। বরং বৃহৎ শিল্পপতিরা রাহাজানি ও লুটপাট করে থাকেন। তারা বলেন, উৎপাদন ও বণ্টন বৈষম্যের ফলে সমাজের এক শ্রেণির লোক ক্রমশঃ সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতারণা করে পুঁজিপতিরা ক্রমশঃ বুর্জোয়া বা ধণিক শ্রেণিতে পরিণত হচ্ছে। তাই শ্রমিকরা ন্যায্য পারিশ্রমিক না পেয়ে পথে বসে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে।[১১৭] তাই বলা হয় যে, অর্থনৈতিক কারণে মানুষ নানারকম অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। দরিদ্র পরিবারের কিশোর-কিশোরী তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে বিকল্প রাস্তায় তাদের অভাব পূরণের চেষ্টা করে, যা অধিকাংশ সময়ই অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে হয়ে থাকে। এই অবৈধ পন্থায় মৌলিক চাহিদা পূরণের চেষ্টা থেকেই তারা বিভিন্ন প্রকার অপরাধের লিপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায় অর্থনৈতিক কারণেও এ দেশের কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পরে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কারণ হলো-

১। দরিদ্রতা (Poverty)

এ দেশের মানুষেরা দারিদ্র্যের কাষাঘাতে নিষ্পেষিত হচ্ছে। এদেশের জনগণের মোট ৪০% শতাংশেরও বেশি মানুষ দরিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। দরিদ্র্যতার পরিমাপক Household Income and Expenditure Survey (HIES) সর্বশেষ অনুষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে। এই জরিপের ফলাফলা অনুসারে বাংলাদেশের দারিদ্র্য প্রবণতা নিম্নরূপ:

---

১১৬. Karl Henrich Marx and Friedrich Engels, *Communist Manifesato* (London:1948), p.61; অধ্যক্ষ মোঃ আলতাফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬

১১৭. হামজা হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

সারণী-২২ : Trend of Income Poverty[১১৮]

	2016	2010	Annual Change (%) (2010 to 2016)	2005	Annual Change (%) (2005 to 2010)
Head Count Index					
National	24.3	31.5	-4.23	40.0	-4.67
Urban	18.9	21.3	-4.68	28.4	-5.59
Rural	26.4	35.2	-1.97	43.8	-4.28
Poverty Gap					
National	5.0	6.5	-4.28	12.8	-6.3
Urban	3.9	4.3	-1.61	9.1	-7.93
Rural	5.4	7.4	-5.12	13.7	-5.46
Squared Poverty Gap					
National	1.5	2.0	-4.68	4.6	-8.81
Urban	1.2	1.3	-1.33	3.3	-8.64
Rural	1.7	2.2	-4.21	4.9	-8.75

উল্লিখিত টেবিলে দেখা যায় যে, অর্ধযুগের মধ্যে বাংলাদেশের দরিদ্রতার হার দরিদ্রতার চরমসীমার বিবেচনায় ৭ পয়েন্ট নিচে নেমেছে, যা ২০১০ সালে ছিল ৩১.৫%। এ থেকে ২০১৬ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২৪.৩% ভাগে। এসময়ে মিশ্রভাবে প্রত্যেক বছরে প্রায় ৪.২৩% হারে দরিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ৪০.০% থেকে কমে ৩১.৫% ভাগে এসেছে। এসময়ে প্রত্যেক বছরে মিশ্রভাবে ৪.৬৭% হারে দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে। গ্রাম এলাকার দারিদ্র্য নিরসনের হার (১.৯৭) অপেক্ষা শহর এলাকায় দারিদ্র্য নিরসনের হার অনেক বেশি (৪.৬৮%)।

সর্বশেষ Bangladesh Economic Review 2019-এর রিপোর্টে বাংলাদেশের দরিদ্র্য অবস্থা উল্লেখ করা হয়। তাতে উল্লেখিত বর্তমান বাংলাদেশে দারিদ্র্যের অবস্থা নিম্নরূপঃ

সারণী-২৩ : Poverty Situation[১১৯]

Poverty	(%)
Incidence of Poverty (%)	21.8
Incidence of Extreme Poverty (%)	11.3

---

১১৮. *Bangladesh Economic Review 2019*, Finance Division, Ministry of Finance Government of the People's Republic of Bangladesh (Dhaka: Bangladesh Government Press, June 2019), p. 220

১১৯. *Bangladesh Economic Review 2019,* ibid, p.219

Bangladesh Economic Review 2019-এর রিপোর্টে বলা হয়, সরকার ক্রমাগত ধারাবাহিক প্রচেষ্টার বাংলাদেশ গত এক দশকে দারিদ্র্য নিরসনে অসামান্য উন্নতি সাধন করেছে। দারিদ্র্যের হার এবং চরম দরিদ্র্যতা ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী হয়েছে। গত এক যুগে দারিদ্র্যের হার ১৮.২% হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০% এবং সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন কার্যকারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের ফলে ২০১৮ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২১.৮% কমেছে। আর চরম দারিদ্র্যসীমা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৩% ভাগে। ৭ম পাঁচশালা পরিকল্পনার আলোকে ২০২০ সালের মধ্যে দরিদ্র্যের হার ১৮.৬% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্র নিধারণ করা হয়েছে।[১২০]

উল্লিখিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের দরিদ্র ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অনেক। আর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপরাধ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা এ সময় যে কোন উপায়ে তাদের দরিদ্র্যতা ভুলতে চায়। এজন্য তারা মরিয়া হয়ে উঠে এবং নানান অনৈতিক ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেমন, মাদকদ্রব্য চোরাচালান, ব্যবসা, পরিবহন, যোগান এবং মাদক গ্রহণ; চুরি, ছিনতাই, পকেটমারা, চাঁদাবাজি, মাস্তানি, রাহাজানি এমনকি চুক্তিভিত্তিক কিলার হিসেবে মানুষ হত্যায় জড়িয়ে পরে। তারা যে মৌলিক চাহিদাগুলো ঠিকভাবে পূরণ করতে পারেনি, সেগুলো অবৈধ পন্থায় পূরণের চেষ্টা থেকেই এই অপরাধে জড়িয়ে পরে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) কুফরীর পাশাপাশি দরিদ্রতা থেকেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলেন, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ অর্থাৎ-"হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"[১২১] উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব জাতিকে দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার কথা বলেছেন। যেন আল্লাহ আমাদেরকে দরিদ্রতা থেকে মুক্তি দান করেন। কেননা দারিদ্র্য কুফরীর তথা আল্লাহর নাফরমানীর পথে নিয়ে যায়, ফলে সে যে কোন ধরনের অপরাধ করতে দ্বিধা করে না। তাছাড়া কুফরী হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ। অতএব দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্রতা অপরাধের জন্য দায়ী।

২। কর্মসংস্থানের স্বল্পতা ও বেকারত্ব

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। অতিসম্প্রতি এটি নিম্ন-মধ্যবিত্ত আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এদেশে কর্মসংস্থান বলতে সরকারি কিছু চাকুরি ছাড়া বাকী সবাই প্রায় কৃষিজীবি ছিল। কর্মসংস্থানের তেমন কোন বিশেষ বা উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। এছাড়া কর্মসংস্থানের জন্য সরকারি ও বেসরকারি

১২০. *Ibid*

১২১. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবু: মা ইয়াকুলু ইযা আছবাহা, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৫০৯০; ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ আবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (রহ.), *সুনানুন- নাসাঈ*, কিতবুল ইসতি'আযা, বাবঃ আল-ইসতে'আযাতু মিনাল ফাকরে, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৪৬৫

বহুমুখী উদ্যোগ খুব কম দেখা যায়। ফলে দেশজুরেই কর্মসংস্থানের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হত। এতে করে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বেকারত্বের অভিশাপে নিমজ্জিত থাকে। বেকারদের মধ্যে অধিকাংশ কিশোর ও যুবক। ফলে কিশোর-কিশোরীরা তাদের অভাব পূরণের জন্য কাজের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চাহিদামত কাজ না পেয়ে, বা কোন কাজ না পেয়ে তারা নানাবিধ অপরাধকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় এসকল কিশোর-কিশোরীরা হতাশা থেকে মাদকাসক্ত হয়ে নিজের ও পরিবারের জীবন বিপন্ন করে তুলে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

বেকারত্ব বিষ সদৃশ যা সমাজকে দূষিত করে ও দেশের মৌলিক সামাজিক চরিত্র ধ্বংস করে দেয়। পেটে ক্ষুধা নিয়ে নীতিবোধ কারোই ভালো লাগে না। গায়ে ছিন্ন বসন ও আধাপেটা মানুষ -একজন রোগগ্রস্ত মানুষ, আর রোগগ্রস্ত মানুষ একটি জাতিকে সংক্রমিত করে। রাম প্রতাপ বাহাদুর এ সম্পর্কে বলেন, "A Half clad and half-fed man is a disease man and a diseased man infects a nation."[১২২] এ সম্পর্কে আব্দুল হাকিম সরকার বলেন, বেকারত্ব ও দারিদ্র্যকে সরাসরি কিশোর অপরাধের কারণ বলা যায় না, তবে এটি একটি বড় ধরনের ঝুকিপূর্ণ বিষয়।[১২৩] বেকারত্বের কারণে দরিদ্র পরিবারগুলো স্বাধীনভাবে বাসাস্থান পছন্দ করতে পারে না; বাধ্যহয় মানহীন অগোছালো আবাসন বেছে নিতে, যেখানে সাধারণ দুর্নীতিপরায়ন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত মানুষের বাস। তাই এ পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশে মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৭,০০,০৯,৩৫৩ জন।[১২৪] কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সবাই তাদের প্রয়োজন অনুসারে কর্মসংস্থান করতে পারেনি। তাই তাদের মধ্যে বেকারত্বের হার একেবারে কম নয়। নিম্নোক্ত টেবিলসমূহ থেকে বাংলাদেশের কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণী-২৪ : Economically Active Population/ Labour force (Million) 15+[১২৫]

	2010	2013	2016
Bangladesh	56.7	60.7	63.5
Male	39.5	42.5	43.5
Female	17.2	18.2	20.0

১২২. Ram Pratap Bahadur, *Problems of Unemployment, Social Problem and Social Disorganization in India* (Allahabad, 2nd Ed, 1962), p. 361

১২৩. আব্দুল হাকিম সরকার, *প্রাগুক্ত*, ১৬৯

১২৪. World Bank, Tradingeconomis.Com

১২৫. *Bangladesh Economic Review 2019,* ibid, p.xxxii

সারণী-২৫: Employed Population/ Labour force (Million) 15+[১২৬]

	2005-06	2010	2013	2016
Bangladesh	47.4	54.1	58.1	61.2
Male	36.1	37.9	41.3	43.3
Female	11.3	16.2	16.8	17.9

উল্লিখিত দু'টি টেবিলের প্রথম টেবিলে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে কর্মক্ষম জনসংখ্যার তালিকা প্রদান করা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, ৬৩.৫ মিলিয়ন জনসংখ্যা কর্মক্ষম রয়েছে। আর দ্বিতীয় টেবিলে দেখানো হয়েছে উক্ত কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থেকে ২০১৬ সালে ৬১.২ মিলিয়ন জনসংখ্যা কাজ পেয়েছে। কর্মক্ষম জনসংখ্যার অবশিষ্টাংশ কোন কাজই পায়নি।

তবে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিচালিত সর্বশেষ জরিপ মতে, ১৫+ কর্মক্ষম জনশক্তির সংখ্যা প্রায় ৬.৩৫ কেটি। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪.৩৫ কেটি এবং নারীর সংখ্যা হল ২.০ কোটি। সর্বোচ্চ ৬.০৮ কোটি লোক বিভিন্ন পেশায় জড়িত আছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র কৃষি কাজে জড়িত ৪০.৬% জন লোক। ৩৯.০০% চাকুরিতে এবং অবশিষ্ট ২০.৪% লোক শিল্প-কারখানায় কর্মরত। Labour Force Survey (LFS) এর সর্বশেষ পরিচালিত জরিপ অনুসারে কর্মজীবি জনসংখ্যার মধ্যে একটা বড় অংশ নিজের ব্যবস্থাপনায় কাজ করে থাকে। পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায় যে, ৩৯.১% চাকুরিজীবি এবং ১১.৫% পরিবারের কাজ দেখাশুনা করেন।[১২৭] নিম্নোক্ত সারণীতে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার দেখানো হলো:

সারণী-২৬: Bangladesh Unemployment Rate 2015-2019[১২৮]

Year	Unemployment Rate (%)	Annual Change
2019	4.19	-0.09%
2018	4.28	-0.09%
2017	4.37	0.02%
2016	4.35	-0.03%
2015	4.38	0.02%

১২৬. *Statistical Pocket Book Bangladesh 2016,* ibid, p. 109
১২৭. *Bangladesh Economic Review 2019,* ibid, p.26; www.mof.gov.bd
১২৮. *Bangladesh Unemployment Rate 1991-2020,* www.macrotrends.net

সারণী-২৭: Bangladesh Unemployed Population (Million)[১২৯]

	2015	2016	2017	2018	2019
Bangladesh	2.6	2.7	2.1	2.6	2.6
Male	2.0	1.5	1.2	1.6	1.3
Female	0.6	1.2	0.9	1.0	1.3

উপরোল্লিখিত সারণী ২৬ ও ২৭ এ দেখা যায় যে, প্রায় প্রতি বছরই গড়পরতা বেকারত্বের হার কমেছে। তবে শুধুমাত্র ২০১৬ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে ০.০২% বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সর্বশেষ ২০১৯ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৪. ১৯% শতাংশে, যা গত বছরের তুলনায় ০.০৯% কম। অন্যদিকে সারণী ২৬ এ দেখা যায় যে, সংখ্যাগত দিক থেকে প্রায় প্রতিবছরই বেকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে বেকারত্বের সংখ্যা দাড়ায় ২.৬ মিলিয়নে। ২০১৯ সালের এক রিপোর্টে বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হারের দিক থেকে ২৭তম অবস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। সম্পদের অসম বণ্টন

অসম বণ্টন বিশ্বব্যাপী সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। অসম বণ্টনের জন্যই ধনী-গরীবের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়, দেশে অভাব-অনটন দেখা দেয় এবং সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এর ফলে পৃথিবীর গুটি কতেক সম্পদশালীর হাতে সমস্ত সম্পদ জমা হচ্ছে। বাংলাদেশ পুঁজিবাদী অর্থনীতির দেশ হওয়ার কারণে এখানে সম্পদ অর্জনের একটি অসম প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে শ্রমিকসহ অন্যান্যদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় না। শুধু নিজেদের মুনাফা বা সম্পদ অর্জনই মূখ্য বিষয়। ফলে শ্রমিক শ্রেণি তাদের অধিকার বঞ্চিত হয়ে আরো দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত হয়। এর প্রভাবে ধনী পরিবারের শিশু-কিশোর অঢেল প্রাচুর্য এবং দরিদ্র পরিবারে শিশু-কিশোর চরম অভাবের মধ্যে প্রতিপালিত হয়। ফলে উভয় শ্রেণির সন্তানদের মাঝেই অপরাধ প্রবণতা তৈরি হয়। বিশেষ করে অভাবী গোষ্ঠীর শিশু-কিশোররা ধনীর দুলালদের কর্মকাণ্ডের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে আবার ধনীর দুলালরা গরীবের সন্তানের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবহেলা প্রদর্শন করে। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যেই বিদ্বেষভাব তৈরি হয় যার ফলে সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

৪। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি

মূল্যস্ফীতি বা দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম সমস্যা। বাংলাদেশ একটি নিম্নমধ্যবিত্ত আয়ের দেশ হওয়ার পরেও দ্রব্যমূল্য একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে জনজীবনে প্রভাব ফেলছে। দ্রব্যমূল্যকে

১২৯. *Repot on Bangladesh SampleVital Statistics,2018* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Information Devision (SID), Ministry of Planning, 2019), p. 109

নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সরকারের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রণালয় রীতিমত হিমসিম খাচ্ছে। বিভিন্ন সিন্ডিকেট গ্রুপ অসৎ উপায়ে অধিক মুনাফা লাভের জন্য এবং সরকারকে চাপে রাখার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে দেয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য গুদামাত করে আটকিয়ে রাখে এবং প্রয়োজনের সময় বাজারে সে সকল দ্রব্য সরবরাহ না করে বরং কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। সরবরাহ কম বলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে দেশে পর্যাপ্ত দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও বাজারে ঘাটতি দেখা দেয়। দ্রব্যমূল্যের এই উর্ধ্বগতির ফলে দরিদ্র পরিবার সন্তানদের জন্য চাহিদামত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে পারে না। তাই তারা তাদের চাহিদা মিটাতে গিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। তাই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যের সুষম বণ্টনে ইসলামের নির্দেশনা এখানে প্রাসাঙ্গিক।

ইসলাম দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যের সুষম বণ্টনের লক্ষ্যে গুদামজাত করা নিষিদ্ধ করেছে। গুদামজাত সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيهِ–অর্থাৎ-হারামের মধ্যে খাদ্যশস্য (অধিক মূল্যে বিক্রির আশায়) গুদামজাত করে রাখা যুলুম ও সীমালঙ্ঘনের পর্যায়ভুক্ত।[১৩০] রাসূলুল্লাহ অপর এক হাদীসে গুদামজাতকারী সম্পর্কে বলেন, لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ– অর্থাৎ-পাপাচারী ব্যতিরেকে কেউ মওজূদদারী করে না।[১৩১] উপরোক্ত হাদীস দু'টিতে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কৃত্রিম সংকট তৈরি করে অধিক মুনাফা লাভের আশায় খাদ্যশস্য গুদামজাত করতে নিষেধ করেছেন। যাতে খাদ্যশস্যের দাম সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে থাকে।

নিম্নোক্ত টেবিলে Bangladesh Economic Review 2019, এর পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশের বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

সারণী-২৮: Consumer Price Index and Inflation[১৩২] (Base Year 2005-2006)

	2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
General index Inflation	132.17 (7.60)	141.18 (6.82)	156.59 (10.91)	170.19 (8.69)	181.73 (6.78)	195.08 (7.35)	207.58 (6.41)	219.86 (5.92)	231.82 (5.44)	245.22 (5.78)
Food index Inflation	140.61 (7.91)	149.40 (6.25)	170.48 (14.11)	183.65 (7.72)	193.24 (5.22)	209.79 (8.56)	223.80 (6.68)	234.77 (4.90)	248.90 (6.02)	266.64 (7.13)
Non-food index Inflation	127.36 (7.14)	130.66 (7.66)	138.77 (6.21)	152.94 (10.21)	166.97 (9.17)	176.23 (5.55)	186.79 (5.99)	200.66 (7.43)	209.92 (4.61)	217.76 (3.74)

১৩০. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল মানাসিক, বাব: তাহরীমু হারামি মাক্কাতা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০২০

১৩১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামে' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল বুয়ূ' আন রাসূলিল্লাহি (সা.), বাব: মা যায়া ফিল ইহতিকারি (রিয়াদ: মাকতাবাতল মা'আরিফ, ১৪১৭ হি.), হাদীস নং-১২৬৭

১৩২. *Bangladesh Economic Review 2019,* ibid, p.24

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় যে, গত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ১০.৯১% মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে ২০১০-১১ অর্থ বছরে। এবং সর্বনিম্ন ৫.৪৪% মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে। আর ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মুদ্রাস্ফীতি এসে দাঁড়িয়েছে ৫.৭৮ %। এ সময়ে খাদ্যদ্রব্যের মুল্যস্ফীতির চেয়ে অন্যান্য দ্রব্যের মুল্যস্ফীতি কম ছিল। জুলাই ২০১৮-তে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্ফীতি ছিল ৬. ১৮% এবং মার্চ ২০১৯ এ ছিল ৫.৭২%। আর একই সময়ে খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যস্ফীতি ছিল ৩.৭৪% এবং মার্চ ২০১৯ এ তা এসে দাঁড়ায় ৫.২৯%।[১৩৩]

৫। নিম্ন মাথাপিছু আয়

২০০৭ সালের পূর্বে বাংলাদেশের জনগণের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৫২০ মার্কিন ডলারের কম ছিল। যা বাংলাদেশের জনগণের নিম্ন জীবন মানের ইঙ্গিত বহন করে। এ স্বল্প আয় দ্বারা বাংলাদেশের মত বৃহৎ পরিবারের কর্তার পক্ষে পরিবারের সকল সদস্যের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা সম্ভব না। বিশেষ করে শিশু-কিশোরের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা-দীক্ষা, শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দরকার তা সরবরাহ করা সম্ভব না। ফলে নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশু বা কিশোরের শারীরিক প্রবৃদ্ধি, মানসিক দক্ষতার বিকাশ, সৃজনশীল মনের পরিচর্যা মোটেও সম্ভব হয় না। তাই এসকল শিশু কিংবা কিশোরের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বোধ সঠিকভাবে তৈরি হয় না। নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক শিক্ষার অভাবে সে শিশু অপরাধে জড়াতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা তাদের চাহিদা মিটাতে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। জড়িয়ে পড়ে নানাবিধ নিত্য নতুন অপরাধের সাথে। আর এভাবেই সে হয়ে উঠে একজন কিশোর অপরাধী। তাই নিম্ন মাথাপিছু আয় কিশোর অপরাধের জন্য অনেক ক্ষেত্রে দায়ী। আরো পরিস্কার ধারণালাভের সুবিধার্থে ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত GDP, GNI এবং মাথাপিছু GDP নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো:

সারণী-২৯: GDP, GNI, Per Capita GDP and GNI at Current Market Prices[১৩৪]

Item	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
GDP (In Crore Tk.)	915829	1055204	1198923	1343674	1515802	1732864	1975815	2250479	2536177
GNI (In Crore Tk.)	988342	1144506	1295352	143324	1614204	1832675	2060716	2353108	2649787
Population (In Crore)	14.97	15.16	15.37	15.58	15.79	15.99	16.18	16.37	16.56
Per Capita GDP (In Tk.)	61198	69614	78009	86266	96004	108378	122152	137518	153197
Per Capita GNI (In Tk.)	66044	75505	84283	92015	102236	114621	127401	143789	160060
Per Capita GDP (In US$)	860	880	976	1110	1236	1385	1544	1675	1827
Per Capita GNI (In US$)	928	955	1054	1184	1316	1465	1610	1751	1909

১৩৩. *Ibid*, p.24
১৩৪. *Ibid*, p.14;

Bangladesh Economic Review ও Bangladesh Bureau of Statistics -এর আপতকালীন তথ্যের ভিত্তিতে, বর্তমান বাজার মূল্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে Gross Domestic Product (GDP) দাঁড়িয়েছে ২৫,৩৬, ১৭৭ কোটি টাকায় যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১২.৭% বেশি। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে Gross Domestic Product (GDP) দাঁড়িয়েছে ১,৫৩,১৯৭ টাকায়, যা গত অর্থ বছরে ছিল ১,৩৭,৫১৮ টাকা। অন্যদিকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬০,০৬০ টাকায় যা গত অর্থ বছরে ছিল ১,৪৩,৭৮৯ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমেরিকান ডলারে GNI এবং GDP পরিমাণ হলো যথাক্রমে US$ ১,৯০৯ এবং US$ ১,৮২৭, যা গত অর্থ বছরে ছিল যথাক্রমে US$ ১,৭৫১ এবং US$ ১,৬৭৫। জনগণের ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে মাথাপিছু GNI বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে US$ ৩,৫২৪ -এ।[১৩৫] উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৮৬০ ডলার। যা দিয়ে একটি পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা মোটেও সহজসাধ্য ছিল না। তাই নিম্ন মাথাপিছু আয় বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ বলে সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন।

৬। শিশুশ্রম

বাংলাদেশে শিল্প-কারখানা ভিত্তিক নগর জীবনে নানা সমস্যার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুশ্রম নির্ভর। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিশুশ্রমও বিক্রি হয় এবং অনেকে অস্থায়ী ব্যবসা, ব্যবসার কাজ, কুলিগিরি, বাস বা বিভিন্ন পাবলিক পরিবহনের হেলপার, কন্ট্রাকটার ও ড্রাইভার, ফুটপাতসহ বাস, প্রাইভেটকার ও পথচারীদের মধ্যে ভ্রাম্যমান হকারের কাজ করে। এতে করে কিশোরদের হাতে কিছু অর্থের সমাগম হয়। এদের বাবা-মা তাদের সন্তানদের উপার্জন করতে দেখে একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং সন্তানদের প্রতি তাদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল করে দেয়। এমতাবস্থায় শিশু-কিশোর তাদের অর্থের সৎ ব্যবহার করতে অনেক সময়ই ব্যর্থ হয়। টাকা-পয়সা হাতে আসায় সহজ-সরল কোমলমতি শিশুরা যে কোন পন্থায় অর্থ ব্যয় করতে শুরু করে। এভাবে অর্থ ব্যয় করতে করতে তারা জুয়া, মদ্যপান, অশ্লীল ছবি দেখা, অশ্লীল পত্রিকা পড়া ইত্যাদি অভ্যাস আয়ত্ত করে। ফলে ক্রমে ক্রমে তারা অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই সমাজবিজ্ঞানীগণ শিশু শ্রমকে কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাংলাদেশসহ অনুন্নত দেশসমূহে এই শিশুশ্রমের মাত্রা অনেক বেশি; ফলে এখানে কিশোর অপরাধীর সংখ্যাও আশংকাজনকহারে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান সররকারের নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে শিশুশ্রম বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তারপরেও বর্তমানে বাংলাদেশে শিশুশ্রমিকের অবস্থা জানার জন্য Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) এর ২০১৩ সালে রিপোর্টটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

---

১৩৫. *Ibid*, p.13

বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস (Bangladesh Bureau of Statistics) এর শিশুশ্রম পরিসংখ্যান ২০১৩ মতে, বাংলাদেশে শিশুশমিকের সংখ্যা ১৭ লক্ষ, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ শিশুশ্রমিক বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কিন্তু ২০০৩ সালে পরিচালিত জরিপের ফলাফলে উল্লিখিত শিশুশ্রমর সংখ্যাছিল ৩৪ লক্ষ। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে শিশুশ্রম দূর করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে সকল ধরনের শিশুশ্রম অপসারিত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।[১৩৬]

৭। সুদ নির্ভর অর্থনীতি

বৈশ্বিক অর্থনীতির ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনীতিও সুদের লেন-দেনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর সুদ হচ্ছে সামাজিক অভিশাপ। সুদ অর্থকে গতিশীল করে না বরং অর্থকে অলস করে দেয়। এর কোন উৎপাদন নেই, নেই কোন কল্যাণ। দরিদ্র শ্রেণি সুদের যাতাকলে আরো দরিদ্র হতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক দরিদ্র পরিবার সুদের ভার বইতে না পেরে নিজের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে পথে বসছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় আবহমানকাল থেকে সুদের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া এদেশে ব্যাংকিং খাতের একটি প্রধান অংশ সুদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। মোদ্দাকথা অর্থনীতির চালিকা শক্তি হলো সুদ এবং সুদনির্ভর ব্যবসায়-বাণিজ্য। আর ব্যবসায়ীদের হাতে দেশীয় পুঁজির মোটা অংশ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় তারা সরকারকে চাপে ফেলে সুদের উচ্চ হার নির্ধারণ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরো নিস্পেষিত করে। এর ফলে দরিদ্র পরিবারের কিশোর-কিশোরী তাদের মেধা বিকাশের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের মনে সমাজব্যবস্থার প্রতি ঘৃণা জন্মে। এ অবস্থায় শিশু-কিশোরদের মনে অপরাধপ্রবণতা দানা বাঁধা অস্বাভাবিক নয়। আর এ জন্যই ইসলাম সুদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুদকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ–

অর্থাৎ-"যারা সুদ গ্রহণ করে (আখিরাতে) তারা তো সে ব্যক্তির মত দাঁড়াবে শয়তান যাকে স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাদের এ অবস্থা হবে এ জন্য যে, তারা বলত, নিশ্চয় ক্রয়-বিক্রয়তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে (সুদ গ্রহণ ও প্রদান থেকে) বিরত হয়েছে, তবে আগে যা হয়ে গেছে তা তারই জন্য এবং তার ব্যাপারটি আল্লাহর ইখতিয়ার। আর যারা আবারো সুদের লেনদেন শুরু করবে তারাই তো জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা

---

১৩৬. *Ibid*, p.31

চিরদিন থাকবে।"[১৩৭] পবিত্র কুরআনের উক্ত বাণীতে সুদের কুফল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, সুদ আদান-প্রদান করা অপরাধ এবং এটি সমাজে অপরাধ বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

৮। অর্থের সহজলভ্যতা ও প্রাচুর্যতা

এদেশের জনগণের মধ্যে যারা সম্পদশালী, তারা দিন দিন আরো সম্পদশালী হচ্ছেন। আর যারা অভাবী ও গরীব তারা ধীরে ধীরে আরো গরীব হচ্ছেন। সম্পদশালী তথা বিত্তবানরা তাদের ছেলে-মেয়েদের হাতে শিশু-কিশোর বয়স থেকেই প্রচুর অর্থ তুলে দেয়, অথবা এসকল ছেলে-মেয়েদের হাতে এমনিতেই পর্যাপ্ত অর্থ থাকে। এ সকল পরিবারের শিশু-কিশোর প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে অর্থ খরচ তথা অপচয় ও অপব্যয় করে থাকে। তাদের এ মানসিকতা ও অর্থের সহজলভ্যতা একসময় তাদেরকে অপরাধের দিকে ধাবিত করে। তাছাড়া পিতামাতা বা অভিভাবকে বে-হিসেবি খরচ করতে দেখে বা ধন-সম্পদের দাম্ভিকতা দেখে কিশোর-কিশোরীর মধ্যে অনুরূপ স্বভাব তৈরি হয় এবং সে যে কোন অপরাধমূলক কাজ করতে দ্বিধা করে না। মহান আল্লাহ এ বাস্তবতাকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ– অর্থ: "আল্লাহ সকল বান্দাকে জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা যমীনে অবশ্যই বিশৃঙ্খলা তৈরি করত।"[১৩৮] তাই বলা যায় যে, প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব যেমন ব্যক্তি অপরাধপ্রবণ করে তোলে তেমনি সম্পদের প্রাচুর্যতাও কিশোর-কিশোরীকে অপরাধপ্রবণ হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৯। মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাব

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিনিময় ব্যবস্থায় পরস্পর বিপরীতমুখী স্বার্থসংশ্লিষ্ট দু'টি ভিন্ন শ্রেণি বা গোষ্ঠীকে দেখতে পাওয়া যায়। (১) প্রথমটি হলো বিক্রেতা তথা উৎপাদক ও মালিক শ্রেণি (২) দ্বিতীয়টি হলো শ্রমিক, ভোক্তা বা ক্রেতা শ্রেণি। এই দুই শ্রেণির প্রত্যেকেই প্রায় সর্বদা একে অপরকে নিজের কাজে লাগাতে চায়, ঠকাতে চায় অর্থাৎ শঠতা ও প্রতারণার মাধ্যমে শুধু নিজের স্বার্থ অর্জন করতে চায়। আরো বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে বাজার অর্থনীতিতে আধুনিক শিল্প সমাজ আরো সংঘবদ্ধ হয়েছে ফলে বিপরীতধর্মী দল বা শ্রমিক ও ভোক্তা শ্রেণির সাথে আরো শত্রুভাবাপন্ন হয়েছে। পরিস্থিতি এমন হচ্ছে যে, মালিক শ্রমিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যরূপ লাভ করছে।[১৩৯] মার্ক্সবাদীদের মতবাদ অনুসারে বাজার অর্থনীতি বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিই শ্রেণি দ্বন্দ্বের মূল উৎস। একদল সুবিধাবাদী শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণগুলো নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম্যে সকল অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে শ্রমিক

---

১৩৭. আল-কুরআন, ২: ২৭৫
১৩৮. আল-কুরআন, ৪২: ২৭
১৩৯. Ruth Shonle Cavan and Fredin and N. Theodore, *ibid*, p. 107

ও ভোক্তা শ্রেণিকে শোষণ করে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণি তাদের দুর্দশা বা অমানবিক অবস্থার সম্পর্কে বড় রকমের প্রতিবাদ।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ নানারকম অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়। আর অর্থনৈতিক দুরাবস্থা কিশোর অপরাধের মাত্রাকে আরো বেশি প্রভাবিত করে। বিশেষ করে দরিদ্রতা, কর্মসংস্থানের স্বল্পতা, নিম্ন মাথাপিছু আয়, সম্পদের ত্রুটিপূর্ণ বন্টন ব্যবস্থা, ত্রুটিপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, মুক্তবাজার অর্থনীতি, কর্মক্ষম মানুষের তুলনায় কাজের ক্ষেত্র পর্যাপ্ত না থাকা, শিল্প-কারখানা ভিত্তিক নগর জীবনে নানা সমস্যা, শিশুশ্রম, অর্থনীতিতে সুদের কালো ছায়া, সমাজের কিছু লোকের কাছে অর্থের প্রচুর্যতা, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি প্রভৃতি অর্থনৈতিক কারণে সমাজের কিশোর-কিশোরী নানা রকম অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়ে।

(ঘ) কিশোর অপরাধের সাংস্কৃতিক কারণ

সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা মানব মনকে প্রফুল্ল করে এবং অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখে। সমাজে উপযুক্ত ক্রীড়া-সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা না থাকেলে শিশু-কিশোরের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায় না। সমাজের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তাদের মনোজগতে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তাই সাংস্কৃতিক চর্চা কিশোরদের মনোজগতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সমাজে যদি সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা না হয়, নীতি-নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ যদি শক্ত ভীতের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিম্নে কিশোরের অপরাধপ্রবণতার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক প্রভাব তুলে ধরা হলো-

১। পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রা

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সমাজ দ্রুত গতিতে পরিবর্তন হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ পরিবর্তন আরো দ্রুততর হচ্ছে। এতো দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার সঙ্গে কোমলমতি শিশু-কিশোর খাপ খাইয়ে নিতে প্রায়ই ব্যর্থ হয়। একদিকে তাদের ঐতিহ্যগত পারিবারিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ তাদেরকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রাখে অন্যদিকে হাল আমলের নিত্যনতুন ফ্যাশন, সঙ্গীত, পোশাক-পরিচ্ছদ তথা আধুনিক সংস্কৃতি দ্বারা এমনভাবে দ্রুত প্রভাবিত হয় যে, তারা অনেক সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। পরিবর্তনশীল এ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে না পেরে তারা সহজেই সমাজবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যা তাদেরকে প্রথমে বিচ্যুত কিশোর এবং সময়ের বিবর্তনে একজন কিশোর অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে।

২। চিত্তবিনোদনের অভাব

শিশু-কিশোরদের জন্য চাই উপযুক্ত চিত্তবিনোদনমূলক ব্যবস্থা। এদেশে রুচিশীল বিনোদনের বড়ই অভাব। কুরুচিপূর্ণ বিনোদন অপরাধে সহায়ক। কুরুচিপূর্ণ বিনোদন সহজলভ্য হওয়ায় আমাদের দেশের কিশোররা সহজেই নোংরা বিনোদনে জড়িয়ে পড়ে। ফলে অসামাজিক কার্যকলাপ তাদের সঙ্গী হয়ে যায়। এজন্য খেলা-ধুলা, শরীরচর্চা, সঙ্গীত এবং নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র খেলা-ধুলার মাঠ দখল হয়ে যাচ্ছে। এসব মাঠ দখল করে গড়ে উঠেছে নানামুখী ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড। আবার কোথাও এসব মাঠ সরকারি পর্যায়ে লিজ প্রদান করেছে, যেখানে গড়ে তুলেছে ইট-পাথরের পার্ক। সেখানে প্রবেশ বাণিজ্যিকভাবে চড়ামূল্যের হওয়ার কারণে এটা সাধারণ জনগণের তেমন উপকারে আসে না। বরং এসব পার্কে ইদানিং উঠতি যুবক-যুবতিদের অসামাজিক কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ফলে খেলা-ধুলায় ব্যস্ত থাকার পরিবর্তে এসময় শিশু-কিশোরদের যত্রতত্র রাস্তাঘাটে ঘুরতে-ফিরতে দেখা যায়। এ ধরনের বিশৃঙ্খল ঘোরাফেরা শিশু-কিশোরদের মনে সাময়িক আনন্দ দিলেও বস্তুতপক্ষে তা একটি আদর্শ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। আর এ কারণেও শিশু-কিশোররা অসৎসঙ্গে মেশে এবং একটি অনিয়মতান্ত্রিক পন্থার মধ্যে সময় কাটানোর কারণে তাদের চরিত্রে অনিয়ম এবং অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয় এবং তারা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।

৩। সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব

পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার অন্যতম একটি প্রভাব হচ্ছে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। আধুনিক সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একদিকে শিশু-কিশোর তাদের ঐতিহ্যগত আঞ্চলিক ও দেশীয় সংস্কৃতির সাথে অভ্যস্ত হওয়ায় আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আকাশ সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি নির্ভর বিনোদন উপাদানসমূহ দেশীয় সংস্কৃতির তুলনায় অধিক আকর্ষণীয়, বেশি বিনোদনমূলক এবং চিত্তাকর্ষক হওয়ায় শিশু-কিশোর এটাকে বেশি গ্রহণ করতে চায়। ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব সংস্কৃতির সাথে অত্যাধুনিক বিদেশী সংস্কৃতির দ্বন্দ্বভূমিতে দাঁড়িয়ে কিশোরকুল সঠিক পথ বেছে নিতে ব্যর্থ হয় এবং সহজেই তারা বিচ্যুত আচরণে অভ্যস্ত হয়।

৪। অপসাংস্কৃতির প্রভাব

বর্তমান সময়ে সুস্থ সংস্কৃতিক চর্চার চেয়ে অপসংস্কৃতিই যেন বেশি চর্চা হচ্ছে। আমাদের আবহমান কৃষ্টি-কালচার লোপ পেয়েছে। তদস্থলে দখল নিয়েছে আকাশ সংস্কৃতি তথা পশ্চিমা জগতের রঙিন সংস্কৃতি। যা আমাদের সমাজব্যবস্থার সাথে একেবারেই বেমানান। আমাদের মূল্যবোধ এসব সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে না। কিন্তু এই সংস্কৃতি এতটাই চটকদার এবং রঙিন যে, একজন কিশোর তা প্রত্যাখান করতে পারছে না। আবার সে এ সংস্কৃতি সামাজিকভাবেও গ্রহণ করতে পারছে না। ফলে তার মনোজগতে একটি দ্বৈত অবস্থা সৃষ্টি হয়। একটা সময় সামাজিক মূল্যবোধ তার কাছে পরাজিত হয় এবং অপসংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে বিকল্প পথ বেছে নেয়। যা অধিকাংশ

সময়ই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত আদর্শের লঙ্ঘন হয়। ফলে কিশোরটি একজন বিচ্যুত বা অপরাধী কিশোর হিসেবে সাব্যস্ত হয়। অতএব উক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, একজন কিশোরের সুস্থ বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতি যদি সুস্থ না হয় তাহলে ঐ সমাজের কিশোর অপ-সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে অপরাধপ্রবণ হতে পারে।

(ঙ) রাজনৈতিক কারণ (Political Causes)

রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের একটি সমস্যা। এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তরুণ সমাজ তথা শিশু-কিশোর। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশসমূহে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কিশোরদেরকে। রাজনৈতিক নির্বাচনী প্রচারণা, ভোট কেন্দ্র দখলসহ দলীয় শক্তি বৃদ্ধিতে আজকাল তরুণদেরকে ব্যবহার একেবারেই ওপেন সিক্রেট বিষয়। এছাড়া চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মাদক ব্যবসা, লুটপাট প্রভৃতি সব কাজেই তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি বোমাবাজি, খুন-খারাবিতেও তারা জড়িয়ে পড়ছে। তাছাড়া বর্তমান সময়ে এসে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর আদর্শিক ছাত্র সংগঠন বা ছাত্রদের দলীয় রাজনীতি। বর্তমান সময়ে কমবেশি প্রত্যেক দলের ছাত্র সংগঠনেরই নানারকম অপরাধে জড়িত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। যাদের অনেকেই কিশোর বয়স অতিক্রম করেনি।

কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে উপরোক্ত আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধ একটি সামাজিক সমস্যা। সমাজের যেমন বিভিন্ন কাঠামো, রছম-রেওয়াজ, নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন ও কৃষ্টি-কালচার রয়েছে; তেমনি আবার সমাজভেদে এসবের মধ্যে রয়েছে স্বাতন্ত্র্যবোধ, ভিন্নতা, বৈচিত্রতা এবং বহুমুখীতা। চিরায়ত এ সমাজ ব্যবস্থার ন্যায়ই কিশোর অপরাধ সমস্যার রয়েছে চিরায়ত, আধুনিক ও নব্য কিছু কারণ যা আবার সমাজভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে সংঘটিত হয়। তাই এককভাবে কোন কারণ বা অবস্থাকেই বিশেষভাবে কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না। বরং সমাজ কাঠামো, রছম-রেওয়াজ, নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন ও কৃষ্টি-কালচারের ভিন্নতার মতই কিশোর অপরাধ সংঘটনে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কারণ। তাই একজন অপরাধী কিশোরের অপরাধের কারণের সাথে অপর একজন কিশোরের অপরাধের কারণের ভিন্নতা দৃশ্যমান। তবে প্রায় সকল সমাজেই এমন কিছু সর্বজনীন কারণ বা অবস্থা রয়েছে যে জন্য সমাজের কিশোর-কিশোরী অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি ও প্রভাব

শিল্পায়ন, শহরায়ন ও তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশে যে বিচ্ছিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট বহুমাত্রাবিশিষ্ট কিশোর অপরাধ সমস্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এর প্রতিকার, কারণ ও প্রতিকারের পথ অনুসন্ধান আমাদের জন্য অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। কিশোর অপরাধ সম্পর্কে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে, সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, সুশীল সমাজ, এনজিও কর্মকর্তা, সমাজ ও পরিবারের সদস্য প্রত্যেকেরই ধারণা ও উপলব্দি ভিন্ন ভিন্ন। সমাজ বিজ্ঞানী এর যেভাবে ব্যাখ্যা দেন, অপরাধবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী বিশ্লেষণ করেন অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ফলে এ বিষয়ে সর্বজনীন ধারণা পাওয়া কঠিন হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে কিশোর ও তরুণ সমাজের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা স্বেচ্ছায় অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে না; বরং দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ, আর্থ-সামাজিক প্রতিকূল অবস্থা, পারিবারিক অশান্তিসহ কতগুলো সামাজিক কারণ এর সাথে জড়িত রয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির উন্নতির সাথে পাল্লা দিয়ে শিশু-কিশোরদের অপরাধের ধরন ও মাত্রা পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি (Nature of Juvenile Delinquency)

বাংলাদেশ বিশ্বের দরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এ দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। তবে নিকট অতীতকাল পর্যন্ত ৪০% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করত। ২০০৭ সালের বাংলাদেশের জনসংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ১৩% এর বয়স ৫ বছরের নিচে, ৩৮% এর বয়স ১৫ বছরের নিচে এবং ৪৭% এর বয়স ১৮ বছরের নিচে।[১৪০] নিম্নে এসভিআরএস রিপোর্ট, ২০১৮ (Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018, Published on May 2019) -এর আলোকে বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা (শতাংশ) চিত্রে তুলেধরা হলো:

১৪০. *Third and Fourth Periodic Report of the Government of Bangladesh under the Convention on the Rights of the Child* (Dhaka: Ministry of Women and Children Affairs 2007), p.11

সারণী-৩০: বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা (শতাংশ)[১৪১]

বয়স	২০১৮	২০১৭	২০১৬	২০১৫	২০১৪
০০-১৪	২৮.৮	২৯.৩	৩০.৮	৩০.৮	৩১.৭
১৫-৪৯	৫৪.৬	৫৪.৪	৫৩.৬	৫৩.৭	৫২.৬
৫০-৫৯	৮.৭	৮.৩	৮.১	৭.৮	৭.৯
৬০+	৭.৯	৮.০	৭.৫	৭.৭	৭.৮

সাম্প্রতিক সময়ের বাংলাদেশের উপরোল্লিখিত জনসংখ্যাতত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ২৮.৮% এর বয়স ১৪ বছরের নিচে, ৫৪.৬% এর বয়স ১৫-৪৯ বছরের মধ্যে, ৮.৭% এর বয়স ৫০-৫৯ এর মধ্যে এবং অবশিষ্ট ৭.৯% এর বয়স ৬০ বছর বা এর উর্ধ্বে।

দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জনসংখ্যার আধিক্য, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে অধিকাংশ জনগণ তাদের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না।[১৪২] এসব সমস্যার সাথে বর্তমানে বাংলাদেশ আরো যে সকল গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তার মধ্যে কিশোর অপরাধ অন্যতম। এ কারণে বর্তমান সময়ে এ সমস্যা সচেতন মহলের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়ে পরিগণিত হয়েছে। অপরাধের সংস্পর্শে আসা বা আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত অথবা অপরাধে জড়িত কিশোর-কিশোরীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের রুগ্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার শিকার। তাদের অধিকাংশই শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, বাসস্থান ও নিরাপত্তার মত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ দেশে বাড়ি পালানো এবং সৎ মা-বাবার সংসারের হাজারো সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। কিছু শিশু পরিবারের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে পথ শিশুতে রূপান্তরিত হয়। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ও কিশোর অপরাধ বিশেষজ্ঞ শাহনাজ হুদা বলেন, "Thousands of disadvantage children in Bangladesh, mostly runaway and single parent children, have turned into outlaws. Most of these children have had little or no access to fundamental rights. Some children have left their homes and taken to the street to escape violence and abuse at the hands of their respective families."[১৪৩]

আবার কিছুসংখ্যক শিশু-কিশোরকে তাদের পরিবার কর্তৃক পরিত্যাজ্য হয়ে নিজের ও নিজের ছোট ভাই-বোনের দেখাশুনার ভার নিতে হয়। বিশৃঙ্খল সামাজিক ও পারিপার্শিক অবস্থার প্রভাবে সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের

১৪১. *Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division (Sid), Ministry of Planning, May 2019), p.xxii
১৪২. Amzad Hossain *"Correctinal Service for the juvenile Delinquents in Bangladesh: A Study of NICS Tongi"*, Unpublished Ph.D Dissertation (University of Rajshahi: Institute of Bangladesh studies,2002), p. 93
১৪৩. Shanaz Huda, *A child of One`s Own* (Dhaka: Bangladesh Shishu Adhikar Forum, 2008), p.31

অনেকেই ছিনতাই, চোরাচালান, মাদকসহ অন্যান্য বেআইনী কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর এভাবেই তারা নিজেদেরকে অনৈতিক জীবন-যাপনের দিকে ঠেলে দেয়। বেঁচে থাকার তাগিদে পরিণত অপরাধীদের প্ররোচনায় এসকল শিশুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অন্যায় আচরণ, অসামাজিক কাজ এবং মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে যায়। ফলে তারা কিশোর অপরাধীতে পরিগণিত হয়।[১৪৪]

নানাবিধ কারণে শিশু-কিশোর বহুমুখী বেআইনী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে বিংশ শতাব্দীর ৮০ দশকের শেষের দিকে এবং ৯০ দশকের শুরুর দিকে শিশু-কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধের ধরন ও মাত্রা পরিবর্তিত হয়। কৃষি নির্ভর অর্থনীতি থেকে শিল্প নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের ধারাবাহিকতায় শিশু-কিশোরের অপরাধের ধরন ও মাত্রা পরিবর্তিত হয়েছে বহুমাত্রিকভাবে। ফলে বর্তমান সময়ে এসে কিশোর অপরাধের পরিমাণ ও অপরাধের ধরন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা যেন দিন দিন আরো প্রবল ও ভয়ানক হচ্ছে। কিশোর কিশোরীরা এখন পরিণত অপরাধীদের ন্যায় মারাত্মক সব অপরাধের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোরদের আচরণ ও অপরাধের এ পরিবর্তনের জন্য অনেকগুলো উপাদানকে কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন, নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজ অবকাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন, গ্রাম নির্ভরশীলতা হ্রাস, শহরায়ন, শিল্পোন্নয়ন, পিতামাতার সম্পর্কচ্ছেদ, সন্তানের উপর পিতামাতার নিয়ন্ত্রণের শৈথিল্য, বয়সের আগে শারিরীক পূর্ণতা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, শিশু শ্রম এবং বস্তিজীবন প্রভৃতি।[১৪৫]

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের (বিএসএএফ) ২০০৮ সালের রিপোর্ট মতে, বয়স্ক কোন অপরাধীর অধীনে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী অধিকাংশ অপরাধী শিশু-কিশোরের অপরাধ জগতের সূচনা ঘটে বা বেআইনী কর্মকাণ্ড শুরু হয়। দেখা যায় যে, ৯০% শিশু-কিশোর অপরাধী তাদের অপরাধ জীবনের পরিচয় গোপন করার জন্য ছোট-ছোট দোকান-পাট, রেস্টুরেন্ট প্রভৃতির বয়, দাড়োয়ান, কুলি হিসেবে কাজ করে থাকে।[১৪৬] অন্যদিকে সচ্ছল পরিবারের সন্তানেরাও কম বখাটে হচ্ছে না। শহরের ধনীর দুলালেরা পিতা-মাতার সাহচর্য ও নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে থাকার ফলে সহজেই তারা বিপথে পা বাড়াচ্ছে। বিশেষ করে মাদক, রহস্য ও ডিটেকটিভ উপন্যাস, ভিসিডি, ইন্টারনেটের রঙিন জগত, অশ্লীল ও উত্তেজক বিভিন্ন সিনেমা তাদের বিপথগামী করে দিচ্ছে। তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে এ দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাও কিশোরদের কম বিপদগামী করছে না। কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশের শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করছে। এছাড়া শিল্পায়ন ও শহরায়ন ছেলে-মেয়েদের অপরাধের দিকে ধাবিত করতে সহায়তা করছে।

---

১৪৪. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid,* p.106
১৪৫. *Ibid,* p.106
১৪৬. *BASF Yearly Report of 2008* (Dhaka: Bangladesh Shishu Adhikar Forum, 2009), p.17

আমাদের দেশে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি বড়ই বিচিত্র ও বহুমুখী। কিশোর অপরাধের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে ড. নাহিদ ফেরদৌসি বলেন, "It is very difficult to assess them all here. These may be personal offences, such as murder, rape etc. offence against the dignity and security of the state and offences relating to social welfare."[১৪৭] দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে কিশোর অপরাধ পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কিশোর সংশোধনী বা উন্নয়ন কেন্দ্র ও কিশোরী সংশোধনী বা উন্নয়ন কেন্দ্র এ দু'ধরনের উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে, যা থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, এদেশের কিশোর-কিশেরী উভয়ই আইনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত বা অপরাধে জড়িত। নিম্নে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের প্রকৃতি আলোচনা করা হলো-

(ক) কিশোরদের অপরাধের প্রকৃতি

প্রথাগতভাবে কিশোর অপরাধের ধরন শুধুমাত্র মিথ্যা বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং স্কুল পলানো, অভিভাবক থেকে টাকা এনেও স্কুলের বর্ডিং কিংবা হোস্টেলের ফি পরিশোধ না করা, বন্ধুদের মোবাবইল, টাকা, হাত ঘরি ইত্যাদি চুরি করা, প্রথাগত অন্যান্য চুরি ও ছিনতাই করা এবং ইভটিজিংসহ অনুরূপ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়া। অধিকন্তু সময়ের ব্যবধানে তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ডের পরিধি আরো বৃদ্ধি পায়। শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন তাঁর এক গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর উভয় স্থানেই কিশোরদের কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন এসেছে। তারা চুরি, ডাকাতি, মাদক বহন, হাইজ্যাকিং, পকেট কাটা, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, ট্রাফিকিং, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ভীতি প্রদর্শন করা প্রভৃতিতে জড়িত হয়ে পড়েছে। তারা বন্দুক, পিস্তলসহ বিভিন্ন রকমের আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য মরাণাস্ত্র বহন করে এমনকি তারা হত্যার সাথেও জড়িয়ে পড়েছে।[১৪৮]

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে কিশোর অপরাধের প্রকৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে কিশোর-কিশোরীরা আরো বেশি অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে। তারা সাধারণত ফেইজবুক, ইমো, ভাইভার, মেসেঞ্জার, টুইটার, হোয়াটস এ্যাপ প্রভৃতি প্রোগ্রামে ফেক আইডি খুলে নানা রকম নিত্য নতুন অপরাধ সংঘটিত করে; যেমন- কারো ছবি কাট পেস্ট করে বিদ্রুপ বা মানহানিকরভাবে উপস্থাপন করা, মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো। এসব গ্রুপে বা ওয়ালে ভূয়া সংবাদ ভাইরাল করে উত্তেজনা ছড়ানো, ধর্মীয় সংবেদনশীল বিষয় বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা; পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জাল বা আউট করে তা ছড়িয়ে দেওয়া, পর্ণ সাইটে সাইন ইন করা, অশ্লীল বিষয়ে পোস্ট দেওয়া প্রভৃতি। আব্দুল হালিম সরকার তার এক গবেষণায় উল্লেখ করেন, "At present,

---

১৪৭. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, P.106; T.E.Jems,*Crime and Punishment*,cited in the book of law: An outline for the intending student (London and Henley : Routledge and Kgan Paul,1967, Reprint1977), p.166

১৪৮. Shekh Hafizur Rahman Karzon, *ibid*, p.369

with the advant of cyber crimes, many juveniles are also trapped in such crimes.”[১৪৯] আইন ও শালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদন মতে, যৌন হয়রানি ও শিশু নির্যাতনের ঘটনার দিক থেকে উদ্বেগজনক ছিল ২০১৯সাল। এ বছর ২৫৮ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয় যা আগের বছরের তুলনায় বেশি। এসব ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে চার নারীসহ ১৭ জন নিহত হয়েছেন। আত্মহত্যা করেছে আরো ১৮ জন নির্যাতিতা।[১৫০] ইভটিজিংয়ের শিকার কমপক্ষে ১৪ জন নারী ও তার অভিভাবক ২০১০ সালের চারমাসে আত্মহত্যা করেছে, তিন জনকে হত্যা করা হয়েছে এবং স্থানীয় যুবকদের ইভটিজিং বাধা দেওয়ায় আরো চারজন লোককে নানা রকম অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। তাই দেখা যায় যে, কিশোর-কিশোরী প্রায় সব রকমের অপরাধের সাথেই কম-বেশি জড়িত রয়েছে। এদেশে কিশোররা সাধারণত যে সব অপরাধ করে থাকে তা হলো-

১. ছিনতাই করা;

২. চুরি করা;

৩. পকেট মারা;

৪. পরীক্ষায় নকল করা;

৫. বোমাবাজি করা;

৬. বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া;

৭. স্কুল থেকে পালানো;

৮. বিনা টিকেটে ভ্রমন করা;

৯. ইভটিজিং করা

(ক) মেয়েদের দেখে শীষ দেওয়া;

(খ) রাস্তা অবরোধ করে প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া;

(গ) নানারকম অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মেয়েদের বিরক্ত করা;

(ঘ) বিভিন্ন অশ্লীল চিঠি ও মেসেজ প্রদান করা এবং

(ঙ) বিভিন্ন হুমকি প্রদান করে প্রেম করতে বাধ্য করা: যেমন আত্মহত্যা, হাত কাটা, ঘুমের ঔষধ খাওয়া, এসিড নিক্ষেপ করে সৌন্দর্য নষ্ট করে দেওয়াসহ নানা প্রকার হুমকি প্রদান করে থাকে।

১০. অপহরণ করা;

---

১৪৯. M.Abdul Halim, *Children: Role of Voluntary Organizations in the Protection of Human Rights at the Grassroots* (Dhaka: Bangladesh Society for the Enforcement of Human Rights,1996), p.88

১৫০. “বিদায়ী বছরে ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে দ্বিগুণ: আসক”, স্টার অনলাইন রিপোর্ট, *‘দ্য ডেইলি স্টার’*, ৩১ ডিসেম্বও, ২০১৯

১১. মাদক সংক্রান্ত অপরাধ;

(ক) মাদকের ব্যবসা করা;

(খ) নিজে মাদক গ্রহণ করা;

(গ) মাদক চোরাচালানে সাহায্য করা;

(ঘ) নিত্য নতুন মাদক আমদানি করা;

(ঙ) মাদক ট্রান্সপোর্টার হিসেবে কাজ করা।

১২. প্রতারণা করা;

১৩. পর্ণ ছবি দেখা;

১৪. কারো গায়ে থুতু দেওয়া;

১৫. যৌন হয়রানি করা;

১৬. তাস ও জুয়া খেলা;

১৭. খুন করা;

১৮. বড়দের সাথে বেয়াদবি করা;

১৯. মা-বাবার অবাধ্য হওয়া;

২০. শিক্ষদের অবাধ্য হওয়া;

২১. চোরাকারবারের বাহক হওয়া;

২২. উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করা ;

২৩. নাশকতামূলক কাজ করা;

২৪. এসিড নিক্ষেপ করা;

২৫. সংঘবদ্ধভাবে অসংযত আচরণ করা (গ্যাগিং);

২৬. মাস্তানি করা;

২৭. যানবাহনে গোলযোগ সৃষ্টি করা;

কিশোররা যখন পাবলিক পরিবহনে বা যানবাহনে আরোহন করে, তখন অধিকাংশ সময়ই তারা দল বেঁধে হৈ-হুল্লা ও চেঁচামেচি করে থাকে। তাছাড়া তারা গণপরিবহণের ড্রাইভার ও হেলপারদের সাথে ভাড়া ও সিটে বসাসহ বিভিন্ন অজুহাতে গোলযোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া অন্যান্য যাত্রীসাধারণের সাথে নানা অজুহাতে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে।

২৮. জমির ফসল নষ্ট করা;

২৯. পঙ্গু ও বৃদ্ধ লোকদের বিদ্রুপ করা;

৩০. খেলার মাঠে মারামারি করা;

৩১. ঘরের জিনিস চুরি করা;

৩২. জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা;

৩৩. অন্যের গাছের ফল-মূল খাওয়া;

৩৪. অধিক রাতে বাড়ি ফেরা;

৩৫. সাইবার অপরাধ প্রভৃতি।

(খ) কিশোরীদের অপরাধের প্রকৃতি

বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবেই কিশোরীর অপরাধের মাত্রা ও ধরন কিশোর অপরাধ থেকে কম এবং লঘুতর। কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালে নানারকম শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তারা এ সময় ভাল মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারে না। তারা সহজেই তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। গরীব ও ভগ্ন পরিবারের অধিকাংশ কন্যা সন্তান নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা পায় না। এছাড়া পরিবারের বাবা মায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বনিবনা না হওয়া; পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ভালো না থাকা কিশোরীদের উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে সেচ্ছাধীন মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ কিশোরী সহজে পথভ্রষ্ট হয় এবং সমাজবিরোধী কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

১৯৮০'র দশকের পর থেকে গার্মেন্টস শিল্পের উন্নয়ন ও নগরায়নের ফলে দরিদ্র পরিবারের কন্যা শিশু ও কিশোরীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া কন্যাশিশুদের শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়া আর্থ-সামাজিক ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কন্যাশিশু ও কিশোরীদের ঐতিহ্যগত সামাজিক জীবনপ্রণালীর ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। যার ফলে অপরাধ জগতের সাথে তাদের পরিচয় প্রসারিত হয়। ফলে গ্রাম ও শহর উভয় স্থানের কন্যা শিশুরা নানা ধরনের অপরাধমূলক কাজ-কর্মে জড়িত হয়। কখনও কখনও কিশোরীরা বয়স্ক অপরাধীদের দ্বারা অপরাধজগতের কাজের সাথে জড়িয়ে পরে। ধীরে ধীরে হিরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা, পেথেডিন, কোকেনসহ নানা রকম ড্রাগের ব্যবসা ও মাদক পরিবহনের নানান অপরাধমূলক কাজে কিশোরীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি স্মাগলিং, ট্রাফিকিং, হাইজেকিং, জাল টাকা, অবৈধ অস্ত্র বহন, প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজেও কিশোরীদের জড়িয়ে পড়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।[১৫১]

কিশোরীদের অপরাধের ধরন উল্লেখ করে শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন,

"It has come out from a field survey that the present trends in femal delinquency and the offence commited by them appear mostly to be abetment in child

---

১৫১. Rekha Saxena, *Women and Crime in India* (New Delhi: Inter-India Publications,1994), p.163

trafficking, offence out of frustrated love, use of drugs, smuggling, theft, picpocketing, child sex, drug and arms carrying and murder etc.”[১৫২] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শিশু বা কিশোরীরা পারিপার্শ্বিকতা, দরিদ্রতা প্রভৃতি কারণে তাদের পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ ও তাদের ব্যক্তিগত মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা তথাকথিত শুভাকাঙ্খীর দ্বারা প্রতারণার শিকার হয় এবং নিরাপরাধ কিশোরী অপরাধচক্রের কাছে বিক্রি ও হস্তান্তরিত হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তারা দেহ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে, তারা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না এবং অনেক সময় এটা তাদের উপার্জনের মাধ্যম হয়ে যায়। ফলে একজন শিশু বা কিশোরী যার অফুরন্ত সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ ছিল, ধীরে ধীরে সে একজন সমাজ ঘৃণিত অপরাধী হিসেবে পরিণত হয়। তার পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশিরাও তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। বাংলাদেশের কিশোরীরা সাধারণত যে সব অপরাধ সংঘটিত করে থাকে তা হলো-

১. পরীক্ষায় নকল করা;
২. বড়দের সাথে বেয়াদবি করা;
৩. মা-বাবার অবাধ্য হওয়া;
৪. শিক্ষদের অবাধ্য হওয়া;
৫. উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করা ;
৬. ঘরের জিনিস চুরি করা;
৭. অধিক রাতে বাড়ি ফেরা;
৮. ছিনতাই করা;
৯. চুরি করা;
১০. পকেট মারা;
১১. স্কুল থেকে পালিয়ে প্রেম বা প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া;
১২. পেমে ব্যর্থ হয়ে হতাশাগ্রস্ত হওয়া, হাত কাটা, ঘুমের ঔষধ খাওয়া, নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া না করা এমনকি কখনও কখনও আত্মহত্যাও করে থাকে।
১৩. অপহরণ করা;
১৪. প্রতারণা করা;
১৫. ভালবাসার ফাঁদ পেতে পরিকল্পিতভাবে প্রতারণা করে অর্থ-সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়া;

১৫২. Shekh Hafizur Rahman Karzon, *ibid*, p.97

১৬. মাদক সংক্রান্ত অপরাধ, যেমন-

(ক) মাদকের ব্যবসা করা;

(খ) নিজে মাদক গ্রহণ করা;

(গ) মাদক চোরাচালানে সাহায্য করা;

(ঘ) নিত্য নতুন মাদক আমদানি করা;

(ঙ) মাদক ট্রান্সপোর্টার হিসেবে কাজ করা;

১৭. পর্ণ ছবি তৈরি করে বাজারজাত করা;

১৮. যৌন কেলেঙ্কারী করা;

১৯. তাস ও জুয়া খেলা;

২০. চোরাকারবারের বাহক হওয়া;

২১. নাশকতামুলক কাজ করা;

২২. খুন করা: সাম্প্রতিক সময়ে কিশোরীদের দ্বারা হত্যার ঘটনাও ঘটেছে। এমনকি পিতা-মাতাকেও নির্মমভাবে হত্যা করার মত ঘটনা সংঘটিত করেছে।

২৩. সাইবার অপরাধেও কিশোরীরা জড়িয়ে পড়েছে। যেমন, কিশোরদের ন্যায় ফেইক ফেইজবুক, ইমো, ভাইভার, মেসেঞ্জার, টুইটার, হোয়াটস এ্যাপ প্রভৃতি আইডি খুলে নানা রকম প্রলোভনমূলক অফার করা; নিত্য নতুন অপরাধ সংঘটিত করা; যেমন- কারো ছবি কাট পেস্ট করে নিজের আইডি খোলা, মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো, এসব গ্রুপে বা ওয়ালে ভূয়া সংবাদ ভাইরাল করে উত্তেজনা ছড়ানো, ধর্মীয় সংবেদনশীল বিষয়ে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা; পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জাল বা আউট করে তা ছড়িয়ে দেওয়া, পর্ণ সাইটে সাইন ইন করা, অশ্লীল বিষয়ে পোস্ট দেওয়া প্রভৃতি।

কিশোর অপরাধের প্রকৃতি: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ

গবেষণার এরিয়া হিসেবে কিশোর অপরাধের প্রকৃতি নির্ণয়ে বাংলাদেশের তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে যথা: টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে, যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে এবং কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে (বর্তমানে সংশোধিত নাম শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র) মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের নির্বাচিত অপরাধী নিবাসীদের মধ্যে মাঠ জরিপ কার্য পরিচালনা করে তাদের নিকট থেকে যে তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যায় তা বিশ্লেষণ করে এবং তাদের বর্ণনার ভিত্তিতে বর্তমান সময়ে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধের প্রকৃতি সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তা একটি সারণীতে উপস্থাপন করা হলো, যা থেকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসী শিশু-কিশোর অপরাধের বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে।

সারণী-৩১: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের অপরাধ (সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত নিবাসীদের ভিত্তিতে)[১৫৩]

অপরাধের ধরন	উন্নয়ন কেন্দ্রের নাম			মোট সংখ্যা	শতকরা হার (%)
	টঙ্গী সেপ্টেম্বর, ২০১৯	যশোর অক্টোবর, ২০১৯	কোনাবাড়ী নভেম্বর, ২০১৯		
হত্যা	৫ জন	৩ জন	৩ জন	১১ জন	১১%
অস্ত্র মামলা	১০ জন	৭ জন	১ জন	১৮ জন	১৮%
মাদক সংক্রান্ত	১৫ জন	১০ জন	৫ জন	৩০ জন	৩০%
যৌন নির্যাতন	৯ জন	৭ জন	- জন	১৬ জন	১৬%
অপহরণ	৪ জন	২ জন	-	৬ জন	৬%
চুরি	৪ জন	২ জন	১ জন	৭ জন	৭%
নারী ও শিশু পাচার	৪ জন	৪ জন	-	৮ জন	৮%
সন্দেহজনক	২ জন	২ জন	-	৪ জন	৪%
	৫৩ জন	৩৭ জন	১০ জন	১০০ জন	১০০%

উপরের সারণীতে শুধুমাত্র গবেষণার সাক্ষাৎকারে ব্যবহৃত নিবাসীদের অপরাধ চিত্র দেখানো হয়েছে। সারণীতে দেখা যায় যে, কিশোর উন্নয়নকেন্দ্রের শতকরা ৩০ জন নিবাসী মাদক গ্রহণ, পরিবহন ও ব্যবসায় জড়িত। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সীমান্তবর্তী এলাকার কিশোর-কিশোরীরা মাদকসংক্রান্ত অপরাধের সাথে বেশি

১৫৩.সূত্র: মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা, *কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ* (টঙ্গী, কোনাবাড়ী ও যশোর), প্রাগুক্ত

জড়িত। এক্ষেত্রে যশোর সীমান্ত এলাকা মাদক ব্যাবসায় কুখ্যাত হয়ে আছে। এছাড়া প্রায় ১১% কিউকের নিবাসী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত। সারণীতে আরো দেখা যায় যে, ১৮% শিশু-কিশোর অস্ত্র মামলায় জড়িত। অবশিষ্টদের মধ্যে ১৬% নিবাসী যৌননির্যাতন, ৮% নারী-শিশু পাচার, ৬% অপহরণ, ৪% সন্দেহজনক মামলা এবং ৭% চুরি ঘটনায় সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এছাড়া টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নথি থেকে এটা প্রমাণিত যে, দিনে দিনে কিশোর অপরাধের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তারা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নানা অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছে।

সারণী-৩২: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের বিভিন্ন ধরনের অপরাধ (মামলার ধরন অনুযায়ী কেন্দ্রের সকল নিবাসী) Different Offences of Inmates of the three KUKs[১৫৪]

মামলার ধরন	কেন্দ্রে অনুযায়ী নিবাসীর সংখ্যা				শতকরা N=৯২৭
	টঙ্গী জুন, ২০২০	যশোর জুন, ২০২০	কোনাবাড়ী জুন, ২০২০	মোট	
হত্যা মামলা	৫৭ জন	৯০ জন	০৭ জন	১৫৪ জন	১৬.৬১%
নারী ও শিশু নির্যাতন	৬৫ জন	৭৪ জন	-	১৩৯ জন	১৫.০০%
মাদক দ্রব্য	৬০ জন	৫০ জন	০২ জন	১১২ জন	১২.০৮%
দ্রুত বিচার আইন	-	০১ জন	-	০১ জন	০.১১%
বিশেষ ক্ষমতা আইন	৭১ জন	০৫ জন	-	৭৬ জন	৮.২০%
অস্ত্র মামলা	২৯ জন	০৯ জন	-	৩৮ জন	৪.১০%
চুরি/ডাকাতি মামলা	১৫১ জন	১৮ জন	০৩ জন	১৭২ জন	১৮.৫৫%
শিশু আইন	-	০৬ জন	-	০৬ জন	০.৬৫%
তথ্যপ্রযুক্তি আইন		০২ জন	-	০২ জন	০.২২%
পর্ণগ্রাফি		০১ জন	-	০১ জন	০.১১%
মারামারি	৮৫ জন			৮৫ জন	৯.১৭%

১৫৪. সূত্র: মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা, *প্রাগুক্ত*

অভিভাবক কেইস	-	-	-	০০ জন	০.০০%
নিরাপদ হেফাজতী	১৮ জন	০৭ জন	১২ জন	৩৭ জন	৩.৯৯%
সন্দেজনক	২১ জন			২১ জন	২.২৭%
সাধারণ ডায়রি	১৯ জন			১৯ জন	২.০৫%
অন্যান্য		১৪ জন	০২ জন	৩৭ জন	৩.৯৯%
ভিকটিম			৫৬ জন	৫৬ জন	৬.০৪%
সর্বমোট	৫৭৬ জন	২৬৯ জন	৮২ জন	৯২৭ জন	১০০%

বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিচালিত মাঠ জরিপে (২০১৯-২০২০) দেখা যায় যে, প্রতি বছরই অপরাধী নিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া প্রতিবছরই অপরাধের ধরন ও প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা যোগ হচ্ছে। বিশেষ করে দ্রুত অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে দ্রুত তথ্যের বিকাশ এবং জীবন ধারার ব্যাপক পরিবর্তন অপরাধ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে। দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়ন এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে প্রকৃতির উপর বিশেষ প্রভাব পড়ছে, পাশাপাশি এটি অপরাধ বৃদ্ধিতেও বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে। উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ১৮.৭২% নিবাসী চুরি ও ডাকাতির মামলা বা ঘটনায় জড়িত হয়ে উন্নয়ন কেন্দ্রে এসেছে। এরপরেই রয়েছে হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট শিশু-কিশোরের সংখ্যা। আশ্চর্যজনক হলেও, উন্নয়ন কেন্দ্রে মাস শেষে প্রতিবেদনের আলোকে দেখা যায় যে, কেন্দ্র সমূহে হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ১৫৪ জন অপরাধী। যা মোট নিবাসীর প্রায় শতকরা ১৬.৬১ ভাগ। এটি অবশ্যই দেশের জন্য একটি বড় ধরনের চিন্তার বিষয়। এর পরেই রয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধ। প্রায় ১৩৯ জন অপরাধী এ অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, যা মোট অপরাধের শতকরা ১৫.০০ ভাগ। এছাড়া কিশোরদের মাদকসংক্রান্ত অপরাধে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতাও আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিবাসীদের মধ্যে প্রায় ১২.০৮ ভাগ নিবাসীর মাদক সংক্রান্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া গেছে। এরপরে রয়েছে মারামারি ও অস্ত্র মামলা সংক্রান্ত অপরাধের পরিমাণ।

তবে এখানে লক্ষণীয় যে, কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত মোট ৮২ জন নিবাসীর মধ্যে ৫৬ জনই ভিকটিম। যার পরিমাণ মোট কিশোরী নিবাসীদের শতকরা ৬৮.২৯ ভাগ। তাহলে দেখা যায় যে, কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে অপরাধী নিবাসীদের তুলনায় ভিকটিম নিবাসীর সংখ্যা অনেক বেশি। এছাড়া কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র দু'টিতে নারী ও শিশু নিযাতনের দায়ে অপরাধী সংখ্যা প্রায় ১৩৯ জন যা মোট অপরাধের শতকরা ১৫.০০ ভাগ। এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, সমাজে নারী ও শিশুরা আজও অনেক বেশি অসহায় এবং তারাই বেশি

ভিকটিম। তাদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিশোর অপরাধের ব্যাপ্তি এবং গতিবিধি দেশে বিরাজমান সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। অতএব কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পরিচালিত জরিপ কার্যক্রমের প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, কিশোর অপরাধীরা অসংখ্য নিন্দনীয় ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়। তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অপরাধী নিবাসীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও তাদের বর্ণনার ভিত্তিতে কয়েকটি অপরাধের প্রকৃতি নিম্নে তুলে ধরা হল:

চুরি

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের মধ্যে পরিচালিত জরিপের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রায় সর্বজনীন এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের একটি অপরাধ হচ্ছে চুরি। প্রত্যেক কিশোরই অভ্যাসগতভাবে নিজ গৃহ হতে অল্প পরিমাণ অর্থ বা মূল্যবান পণ্য চুরির সাথে জড়িত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিবাসীদের কেউ কেউ আপন গৃহ থেকে মোবাইল, ঘরি, স্বর্নালংকার এবং বড় ধরনের অর্থ (৫০০০ থেকে ২০০০০) চুরি করেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ৫০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা চুরির ঘটনায় জড়িত হয়েছে। এ ধরনের চুরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিশোর সুযোগের অপেক্ষায় থাকে কিভাবে পিতা-মাতা বা অত্মীয়স্বজনের বিশ্রাম বা অমনোযোগিতার সুযোগে তাদের প্রয়োজনীয় টাকা বা সামগ্রী সরিয়ে ফেলা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে, গৃহে চুরির ক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরী সুযোগ-সন্ধানী হয়ে থাকে। দেখা যায় যে, প্রায় ২৫% কিশোর গৃহে চুরি করার পাশাপাশি অন্যের গৃহ থেকেও চুরি করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা সাধারণত নিকটাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশির বাড়িকে চুরির ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেয়। এছাড়া দেখা যায় যে, তারা প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব, নিকটআত্মীয় এবং পাড়া-প্রতিবেশির নিকট বিভিন্ন অযুহাতে টাকা ধার চায় এবং ধার নিয়ে আর পরিশোধ করে না।

অপরাধী নিবাসীরা ঘরের বাইরে থেকে চুরির বিষয়টি স্বীকার করেছে। তবে দেখা যায় যে, অনেক কিশোর-কিশোরীর এসব চুরির ঘটনা অভিভাবকরা জানে না। চুরির সাথে সংশ্লিষ্ট এমন অধিকাংশ অপরাধী নিবাসীই নিজের গৃহ ছাড়াও অন্যের গৃহ থেকে চুরির কথা স্বীকার করেছে। তারা আত্মীয়-স্বজনের গৃহ ছাড়াও দোকানপাট, মালবহন কারী পরিবহণ প্রভৃতি থেকে চুরি করে থাকে। নিকটাত্মীয়দের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাদের অলক্ষ্যে মূল্যবান দ্রব্য নিয়ে আসা, আত্মীয়-স্বজনের বা পরিচিত দোকানপাট থেকেও একইভাবে মালিকের অলক্ষ্যে টাকা পয়সা সরিয়ে ফেলে বা মালামাল চুরি করে অন্যত্র বিক্রি করা। এছাড়া কিছু নিবাসীর দেওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, তারা দ্রব্যসামগ্রীতে ভর্তি পরিবহণ বা ট্রাক থেকে দল বেঁধে মূল্যবান দ্রব্য চুরি করে থাকে। নিবাসী অপরাধী কিশোররা চুরির একাধিক কারণ উল্লেখ করেছে। বালকদের দ্বারা উল্লিখিত কারণসমূহের মধ্যে তাদের হাত খালি থাকা অন্যতম। তারা অনেকেই অভিযোগ করে যে, তাদের হাত খরচের প্রয়োজন হলে অভিভাবক সে খরচার টাকা দেয় না, ফলে তারা চুরি করতে বাধ্য হয়। তাহলে প্রকৃত অবস্থা এমন যে, অধিকাংশ অভিভাবক তাদের সন্তানরা যে সমস্ত খরচ করতে চায়, তা সরবরাহ না করার কারণে তারা চুরি করে থাকে। আবার আরো

অন্যান্য কারণ যেমনঃ ক্যারাম, তাস বা ছোট-খাট বাজির অর্থ যোগানের জন্য, তাদের বন্ধুদের সাথে আড্ডার খরচের জন্য, সিনেমা-নাটক দেখার জন্য বা তাদের গ্রুপ নেতার চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানের জন্য চুরি করার ঘটনাও পাওয়া গিয়েছে। অধিকন্তু বর্তমানে কিশোর নিবাসীদের মধ্যে কিছু পেশাগত চুরির ঘটনাও পাওয়া যায়।

পকেটমারা

কিশোর নিবাসীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিবাসী অপরাধী পকেট কাটার সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা স্বীকার করেছে। নিবাসীদের কথা থেকে বুঝা যায় যে, তারা অভ্যাসগতভাবে পকেট মারে না। বরং তারা পেশাদার কোন পকেটমারের নেতৃত্বে পকেট মেরে থাকে। তারা কোন সিনেমা হল, মার্কেটের বা মানুষের ভীর রয়েছে এমন স্থানের কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে লক্ষ্য করে পকেট মারে। তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, পকেট মার সাধারণত সুসংগঠিত দলীয় কার্যক্রম, তারা দল বেঁধে বিভিন্ন স্থানে গমন করে এবং মানুষের ভীর রয়েছে এমন স্থানে পকেট মারার জন্য অপেক্ষা করে। তারা এমনভাবে অবস্থান নেয় যে, সাধারণ মানুষ তাদের উপস্থিতি বুঝতে পারে না। তারা আরো বর্ণনা করে যে, পকেট মারার কাজ সম্পন্ন করার জন্য এবং যে কোন ধরনের বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্য যেমনঃ পুলিশ ও মানুষের হাতে ধৃত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য আলাদা কোড বা ভাষা ব্যবহার করে যাতে মানুষ তা বুঝতে না পারে।

তাদের বর্ণনা থেকে আরো জানা যায় যে, পকেট মারার প্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন করার পরে গ্রুপ লিডার কর্তৃক একজন সিনিয়র সহযোগীর নেতৃত্বে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে নির্ধারিত মার্কেট বা স্থানে অবস্থান করে। তারা আরো বর্ণনা করে যে, অপারেশন সফল হওয়ার পরে তাদের দলীয় নেতার নিকট পকেট মারার সমস্ত টাকা-পয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী জমা করতে হয় এবং দলীয় নেতা ভাগ করে তাদেরকে একটি অংশ প্রদান করেন। নেতা যাই প্রদান করুক না কেন তারা তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন করার পর দলের নেতা বা সহযোগী বড় ভাই তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং তাদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করে তাদের প্রশংসা করে। তাহলে এটা পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, দলীয় নেতা বা বড় ভাই তাদের সাথে চমৎকার আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে এবং অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে।

ছিনতাই

উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে অনেকে ছিনতাইয়ে সম্পৃক্ত ছিল। তাদের ছিনতাই সম্পর্কে তাদের অভিভাবক বেশিরভাগ সময়ই কিছুই জানতেন না। তাদের বর্ণনায় দেখা যায় যে, ছিনতাইকারীরা পথচারীদের বা ছোট-খাট পরিবহণের পথ অবরোধ করে আগ্নেয়াস্ত্র, ছুরি বা বোমা প্রভৃতির ভয় দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সবকিছু ছিনতাই করে নিয়ে যায়। তাদের বর্ণনা থেকে আরো বুঝা

যায় যে, অনেকেই ছিনতাইকে তাদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি বরং দুঃসাহসিক অভিযান ও আনন্দের অংশ হিসেবে ছিনতাই করে থাকে। তাদের বর্ণনায় দেখা যায় যে, আকস্মিক ঝোঁক থেকে কয়েকজন মিলে পরিকল্পনা করে দুঃসাহসিক অভিযানের ন্যায় ছিনতাই করে থাকে। নেশার টাকা সংগ্রহ এবং পরিবারের প্রদত্ত খরচের বাইরে অতিরিক্ত খরচের টাকা সংগ্রহের জন্যও অনেকে ছিনতাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। আবার অনেকে টাকার প্রয়োজনে নয় বরং শুধুমাত্র দুঃসাহসিক অভিযানের মজা নেওয়ার জন্য; আবার কেহ তাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন দুশ্চিন্তা ও অশান্তি দূর করার জন্য বিভিন্ন রকমের ছিনতাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়।

মাঠপর্যায়ে পরিচালিত জরিপের প্রশ্নমালার উত্তরে বুঝা যায় যে, কিছু কিছু ছিনতাইকারী ভাল পরিবার থেকে অর্থাৎ অর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছে। তারা হয়ত পারিবারিক দিক থেকে ইমোশনাল অস্থিরতা অথবা পরিবার থেকে নিদিষ্ট কোন চাহিদা পরিপূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়ে এসব অপরাধে সম্পৃক্ত হয়েছে। তারা তাদের পরিবারের বর্তমান অবস্থার সাথে সঠিকভাবে মানিয়ে নিতে না পেরে আবেগপ্রবণ হয়ে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিনতাইয়ের মত অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে। নিজের মায়ের স্থানে সৎ মা, নিজ বাবার স্থানে সৎ বাবার উপস্থিতি তাদের মানসিক অবস্থার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের সাথে, সৎ ভাই-বোন ও সৎ বাবা-মার সাথে বনি-বনার অভাব প্রভৃতি কারণেও কিশোরদের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করত। তাদের মধ্যে একজন তার মনের অবস্থা বর্ণনা করে যে, সে দীর্ঘদিন ধরে তার তালাকপ্রাপ্তা মায়ের স্মৃতি কথা মন থেকে মুছতে পারছে না। সে প্রায়শই তার মায়ের বয়স, শারীরিক অবস্থা এবং মুখমণ্ডলের ন্যায় বিভিন্ন মহিলাদের মধ্যে তার মাকে খুঁজছিল; কিন্তু সে কখনই তার মায়ের মত কাউকে খুঁজে পায়নি। তার মনের এ অবস্থার কারণে একসময় সে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছিল না। ফলে একসময় সে ছিনতাইয়ের মত অপরাধ করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক নিবাসী তাদের আচরণগত সমস্যার কারণে উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরিত হয়েছে। নিম্নে এসমস্ত কিছু বিচ্যুত আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

স্কুল পালানো

নিবাসীদের মধ্যে একটি সাধারণ বিচ্যুত আচরণ বা ঘটনা হলো স্কুল ফাঁকি দিয়ে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ানো। নিবাসী বালকদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্কুলের প্রতি কোন আগ্রহ না থাকার কারণে বা দুষ্টুমির জন্য স্কুল পালিয়েছে। সারণী-৭ এ দেখা যায় যে, নিবাসী কিশোরদের মধ্যে ৬১% নিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। অন্যদিকে মাত্র ১৩% নিবাসী মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে। এ তথ্য থেকে সহজেই বুঝা রযায় যে, এসকল কিশোরদের মধ্যে স্থুল পালানো স্বভাব কতটা তীব্রতর। তাদের কথায় বুঝা যায় যে, কোন বালকেরই স্কুলের প্রতি কোন আগ্রহ ছিল না যার ফলে তারা প্রতিদিন স্কুলে যেতে চাইত না। তাদের অনেকের মতে স্কুলের চলমান সাধারণ লেখাপড়া তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারত না। স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা, স্কুলের কঠোর নিয়ম-

কানুন, পরিবারের সমস্যা এবং স্কুলে যায় না এমন বন্ধুদের স্বাধীনতা ও তার জন্য স্কুলের বাহিরে অপেক্ষা করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে তাদেরকে স্কুল পালাতে বা স্কুলে না যেতে উৎসাহ যোগাত। এছাড়া পরিবারে কাজের চাপ, মাঝে-মধ্যে উপার্জনের কাজে সহযোগিতা প্রভৃতি কারণে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা, গুণ্ডামি ও ভাংচুর করা

নিবাসীদের তথ্য মতে দেখা যায় যে, তারা কোন কারণ ছাড়াই রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে দলবেঁধে ঘোরাফেরা করত। এসব দলের সবাই স্থানীয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের এই দল গঠিত হয়। কিশোরদের এই দল সাধরণত স্থানীয় কোন চক্রের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে। এ সমস্ত কিশোর তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় চক্র তাদের এই দলের সাথে বন্ধুত্ব করেই তাদের চাহিদা বা ইচ্ছা পূরণ করেই ক্ষান্ত হয় না; তারা আরো অনেক নতুন বালকদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক তৈরির প্রশস্ত সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়। এসমস্ত কিশোর বিশ্বাস করে যে, তাদের যে কোন সমস্যা পাড়ার বড় ভাইদের এই চক্র সমাধান করে দিবে। তাই তারা আরো উত্তেজনাকর নানান অভিযান ও কাজ-কর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সাধারণত তারা যেসমস্ত কার্যকলাপে যুক্ত তা হলো: (ক) তাস, ক্যারাম, ফুটবল, ক্রিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা (খ) খারাপ আচরণ করে ক্রীড়া-কৌতুক করা (গ) কারণ ছাড়াই অশ্লীলভাবে চিৎকার বা চেঁচামেচি করা; (ঘ) ছাদে ঘুরে বেড়ানো (ঙ) রাস্তার মোড়ে মোড়ে জমা হয়ে সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করা; (চ) তাস ও জুয়া খেলা (ছ) ইট-পাথর মেরে জানালার কাঁচ ভাঙ্গা (জ) মেয়েদের টিজ করা এবং হয়রানিমূলক বিভিন্ন আচরণ করা (ঝ) মারামারি করা (ঞ) ফল-মূল চুরি করা (চ) হৈ-হল্লা করা প্রভৃতি।

উপরোল্লিখিত আচরণ তারা সাধারণত ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টার ছলে করে থাকে কিন্তু তাদের এ কাজকর্ম অনেকের জন্যেই ধ্বংসাত্মক হিসেবে পরিগণিত হয় এবং অনেকের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। তাদের এসকল আচরণকে সমাজ অনেক সময়ই বোকামি বা বিচ্যুত আচরণ হিসেবে নিয়ে তাদের সংশোধন উন্নয়নের জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশোধনী কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়।

দেরি করে বাড়িতে ফেরা, বাইরে রাত্রিযাপন করা

কিশোরউন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ উল্লেখ করে যে, তারা সাধারণত কারণ ছাড়াই দেরি করে বাড়িতে ফিরত। বর্ণনা মতে, তাদের মধ্যে অনেকে ঘরের বাহিরে আড্ডা দিয়ে রাত্রি যাপনও করে থাকে। এসকল কিশোরের পেশাপূর্ববতী চিন্তাভাবনা এবং বন্ধু ও খেলার সাথীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কারণ দেখিয়ে বাহিরে অবস্থান করে। এছাড়া কিছু বালক তাদের পূর্ববতী কোন খারাপ আচরণের কারণে পিতা বা অভিভাবককে ভয় করে ঘরে না ফিরে বাহিরে রাত্রিযাপন করে। তারা মনে করে যে, এরূপ ভয়ের কারণে তদেরকে অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করে। তাদের বর্ণনা মতে, অনেক সময় পিতামাতার রাগের

কারণে তারা বাসায় না ফিরে বন্ধু-বান্ধবের বাসায় রাত কাটায়। বাহিরে অবস্থানের এ সময়টাতে তাদের হাতে প্রচুর সময় থাকে এবং এ সময় তারা নিজেদের মত করে বিচ্যুত আচণের মাধ্যমে অতিবাহিত করে।

ধুমপান করা

উন্নয়ন কেন্দ্রে আসা বালকদের মধ্যে অনেক নিবাসী ঘনঘন ধুমপানে অভ্যস্ত ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, বালকদের একটা বড় অংশ ধুমপান পছন্দ করে, কারণ তাদের বিশ্বাস একটা সিগারেটের স্টিক অনেক সময় তাদেরকে সঙ্গ দেয়, মানসিক কোন দুশ্চিন্তা থাকলে দূর করে এবং অনেক সময় তাদের কোন কিছু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ধুমপানের মধ্য দিয়ে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়। তাদের মতে ধুমপান হচ্ছে তাদের যোগ্যতা, চতুরতা ও স্মার্টনেসের প্রমাণ। তাদের মধ্যে অনেকে উল্লেখ করে যে, তারা বন্ধুদের ধুমপান দেখে দেখে ধুমপানে অভ্যস্ত হয়েছে। এছাড়া দলের অগ্রজ সদস্যদের প্ররোচনা ও প্রতিনিয়ত তদারকির মাধ্যমে ধুমপানের অভ্যাস গড়ে তুলেছে। তাদের কেউ কেউ বলে যে, সিগারেটে আগুন ধরানোর পর থেকেই দলের নেতা ধারাবাহিকভাবে মুখে সিগারেট পুতে দিতে থাকে যাতে সে ফুঁ দিয়ে সিগারেট ভিতরে চালান করতে পারে। সর্বোপরি দলের নতুন ও তরুণ সদস্যের ধুমপানের যাবতীয় খরচ সিনিয়র সদস্য বা আগে থেকে অভ্যস্থ ধুমপায়ীরা বহন করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে, পরিবারে পিতা বা বড় কোন সদস্যকে দেখে ধুমপান করা শিখে এবং ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ধুমপান একটি বড় কোন অপরাধ নয় কিন্তু অভিভাবক যুবকরা ধুমপানে যাতে অভ্যস্ত হতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ধুম পান থেকে তরুণপ্রজন্ম ধীরে ধীরে অন্যান্য নেশায় জড়িয়ে পড়ে। তাই এটাকে নেশার প্রবেশ দ্বার বলা হয়।

অত্যধিক পরিমাণে সিনেমা টিভি দেখা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের বর্ণনা মতে, তাদের অত্যধিক পরিমানে সিনেমা দেখা বাবা-মা পছন্দ করে না। কিন্তু সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার আনন্দ বেশি হওয়ায় হলে গিয়ে প্রত্যেকটি নতুন সিনেমা দেখার অভ্যাস গড়ে তোলে। তারা বাবা-মায়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে লেখা-পড়া বাদ দিয়ে বা স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখে।

মানুষের গাছের ফল-মুল চুরি করা

বিচ্যুত কিশোরদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা দল বেঁধে অপরের গাছের ফুল ছিরে নেয় ও ফল-মুল পেরে খায়। প্রায় অর্ধেক নিবাসী অপরের গাছের ফল-মূল চুরি করে খাওয়ার কথা স্বীকার করেছে। তাদের বর্ণনা মতে, তারা দল বেঁধে পরিকল্পনা করে রাতে বা নির্জন সময়ে চুরি করে নিয়ে আসে এবং সবাই আনন্দ করে খায়। তারা পাহারা বসিয়ে পর্যবেক্ষণ করে সুবিধামত সময়ে চুরি কার্য সম্পাদন করে।

ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়া

কিশোরদের বিচ্যুত আচরণের মধ্যে ঘর থেকে পালিয়ে চলে যাওয়া অন্যতম সাধারণ ব্যাপার। তাদের বর্ণনায় দেখা যায়, যে সমস্ত পরিবারে সন্তানরা বেশি যত্ন ও শাসনে থাকে তারা কখনও মুক্ত হয়ে অবসর সময় পেলে স্বাধীন জীবনের সাদ পেয়ে যায় এবং পরিবার থেকে পালিয়ে উন্মুক্ত জীবনের স্বাদ নিতে চায়। যদি কোন পরিবারে এরকম ঘটনা ঘটে আর সে বাড়িতে ফিরে না আসে তাহলে সে পরিবারে বড় ধরনের যন্ত্রণা নেমে আসে। দেখা যায় যে, পরিবারে সৎ পিতা-মাতা থাকলে বা পরিবারের সদস্যের সাথে বনি-বনা না থাকলে শিশু-কিশোররা বাড়ি ছেড়ে পালায়।

ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো এবং মেয়েদেরকে টিজ করা

গবেষণা ব্যবহৃত নিবাসীদের প্রায় ৩০% -এর বর্ণনা মতে, তারা ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো এবং রাস্তায় নানাভাবে মেয়েদেরকে উত্যক্ত করার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। ইতস্তত রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো এবং মেয়েদেরকে ইভ-টিজিং করা কিশোরদের একটা বড় ধরনের বিচ্যুত আচরণ। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কিশোর তার বন্ধুদের সাথে স্কুল বা কলেজের সন্নিকটে রাস্তার নির্দিষ্ট কোন স্থানে বা মোড়ে পূর্ব থেকে অবস্থান নেয় এবং স্কুল বা কলেজ ছুটির পরে ছাত্রীরা বের হয়ে যাওয়ার পথে দল বেঁধে নানা রকম অশোভন আচরণ করে। অনেক সময় কোন একটি মেয়েকে লক্ষ্য করে অশোভন আচরণ বা অঙ্গভঙ্গি, উড়ন্ত চুমো ও অন্যান্য শব্দ করে মেয়েকে বিরক্ত করে। একটা নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত মেয়েকে ফলো করে নানা অশালীন শব্দ প্রয়োগে তাকে বিরক্ত করতে থাকে। তাদের অনেকে এটাকে তাদের প্রেমের প্রস্তাব বা প্রেমের পূর্ব পাঠ হিসেবে বিবেচনা করে।

যৌন নির্যাতন/ নারী ও শিশু নির্যাতন

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে উল্লেযোগ্যসংখ্যক নিবাসী বিভিন্ন রকমের যৌন হয়রানি ও যৌন নির্যাতনমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। তাদের কারো কারো বর্ণনায় দেখা যায় যে, স্কুল-কলেজের বিরতির সময়ে তাদের সমমনা দলের মধ্যে যৌন বিষয়ক বিভিন্ন গল্প আলাপ-আলোচনা করতে আনন্দ পেত। তাদের মতে অশ্লীল সিনেমা, নাটক, আপত্তিকর দৃশ্য-ছবি, কামোত্তেজক গল্প-কাহিনী প্রভৃতির বিস্তৃত সুযোগ তাদেরকে যৌন জীবনের প্রতি উৎসুক করত। তাছাড়া এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনকারী আগ্রহী শ্রোতাদের সামনে তার অভিজ্ঞতা বর্ণায় তীব্র সুখানুভূতি লাভ করত।

এছাড়াও বালকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঘনবসতিপূর্ণ পরিবার, পরিবারের সদস্যদের নানা অঙ্গ-ভঙ্গি, আলাপ-আলোচনা সর্বোপরি গৃহের সার্বিক পরিবেশ কিশোরের রহস্যময় যৌন অভিজ্ঞতা উদঘাটনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের কাজ করে। এছাড়া কিছু বালককে এ কথা বলতে দেখা যায় যে, ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা, ছেলে-মেয়ে জোড়া বেঁধে ঘোরাফেরা এবং সর্বোপরি চারিদিকে মেয়েদের অবাধ ঘোরাফেরা কোন না কোনভাবে

তাদেরকে যৌন নির্যাতনমূলক কাজে উৎসাহিত করেছে। একজন নিবাসী কিশোরের বর্ণনা মতে, সে একজন বয়স্ক আত্মীয় মহিলার মাধ্যমে যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। অধিকন্তু একজন ১৪ বছরের বালকের বর্ণনা মতে, পারিবারিক দ্বন্দ্ব থেকে সে দীর্ঘ দিন পরিকল্পনা করে প্রথমে প্রেমের অভিনয় এবং পরে ধর্ষণের চেষ্টা করে পুলিশের হাতে ধৃত হয়ে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সে আরো বর্ণনা করে যে, সে ধর্ষণে সফল হয়নি, এর আগেই ডাকাডাকির কারণে লোকজন এসে তাকে পিটিয়ে পুলিশে দিয়ে দেয়। এছাড়া কোন কোন বালক নিষিদ্ধ পতিতালয়ে অবাধ যাতায়াতের কথাও স্বীকার করে।

জুয়া খেলা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের বালকদের একটি সাধারণ অভ্যাস হচ্ছে জুয়া খেলা। তাদের মতে, তারা তাস খেলে সহজে অন্যকে প্রতারিত ও ঠকাতে পারে এবং আনন্দ করে সময় অতিবাহিত করতে পারে। বালকদের অনেকে বাজি ধরে তাস বা জুয়া খেলে থাকে বলে বর্ণনায় উল্লেখ করে। অতএব বুঝা যায় যে, তারা দুই বা ততোধিক কাছের বন্ধু-বান্ধব মিলে জুয়া বা এধরনের বাজি ধরে কার্ড খেলে। এছাড়া বালকদের মধ্যে কেহ কেহ উল্লেখ করে যে, স্থানীয়ভাবে উদযাপিত বিভিন্ন মেলা বা প্রর্শনীতে গিয়েও জুয়া খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে।

মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও পাচার

উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে অনেকেই মাদক ব্যবসার পাশাপাশি মদ্যপান বা মাদক গ্রহণেও অভ্যস্ত ছিল। তাদের মধ্যে কাউকে একেবারেই মাদকাসক্ত হিসেবে পাওয়া গিয়েছে। তাদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শুরুতে তারা হালকা নেশা জাতীয় মাদক গ্রহণ করে ধীরে ধীরে মাদক গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। গবেষণার অনুসন্ধান থেকে বুঝা যায় যে, তাদের অধিকাংশই সাধারণত বন্ধুদের দ্বারা মাদক গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়েছে। হতাশা বা মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতেও কেউ কেউ মাদক গ্রহণ করেছে বলে উল্লেখ করে। বালকদের মধ্যে অন্যান্য মাদকের চেয়ে গাঁজা, ইয়াবা এবং ফেনসিডিল গ্রহণের মাত্রা বেশি। তবে তাদের কেউ কেউ দেশি মদ, তারীসহ অন্য আরো কিছু মাদকের নাম উল্লেখ করেছে।

চোরাচালান

নিবাসী বালকদের মধ্যে কারো কারো চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ততা পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের তিন দিক স্থলভাগ দ্বারা অন্যান্য দেশের সাথে সংযুক্ত। ফলে অপরাধীরা সীমান্তের বিশাল এলাকা দিয়ে চোরাচালান করে থাকে। উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসী কিশোরদের বিশেষ করে সীমান্ত এলাক শিশু-কিশোরদেরকে এই চোরাচালানের সাথে বেশি পরিমাণে জড়িত। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থ পাচার, স্বর্ণের ভার পাচার, ডলার পাচার, মাদক পাচারসহ আরো কিছু চোরাচালানের চোরাচালানের সাথে জড়িত ছিল। তাদের বর্ণনা মতে, স্থানীয় প্রভাবশালী বয়স্ক কোন অপরাধীর হয়ে তারা এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং তার হয়েই

কাজ করে। একটি চালান আনা বা নেওয়ার জন্য নির্ধারিত হারে অর্থের বিনিময়ে তারা এ কাজ করে থাকে। তারা উল্লেখ করে যে, দিনে তিন থেকে পাঁচবার বাংলাদেশ ভারত বা বাংলাদেশ মায়ানমার থেকে পণ্য আনা নেওয়া করতে পারে। একেক বার আনা নেওয়ায় তার ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের একজন নিবাসীর বর্ণনা মতে, পরিবারের বড় ছেলে হওয়ায় বাবার মৃত্যুর পরে তাকে পরিবারের হাল ধরতে হয়। এসময় সুবিধা মত কোন কাজ না পাওয়ায় স্থানীয় একজন চোরাকারবারীর কথামত সে প্রথম চোরাচালানে যুক্ত হয় এবং দৈনিক ২০০ থেকে ৩০০ টাকা আয় করে। ফলে ধীরে ধীরে সে চোরাচালানের সাথে জড়িয়ে যায়। বর্তমানে তার পরিবারের মা এবং ভাইসহ তিন সদস্যই চোরাচালানের সাথে সম্পৃক্ত। তার মা, ছোট ভাই এবং সে নিজে স্বর্ণ, মাদক, টাকা, মানব পাচারসহ আরো অনেক কিছু চোরাচালান করে থাকে। বর্তমানে সে একটা স্বর্ণ চোরাচালান মামলায় উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করছে। যে মামলায় সে ধৃত হয়েছে, সে স্বর্ণ চোরাকারবারী তাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনবে আশ্বাস দিয়ে ধরিয়ে দেয়। এরপর মামলা গুরুতর হওয়ায় চোরকারবারী মূল হোতা আর তার সাথে যোগাযোগ রাখেনি। তাই এখন সে মামলার মূল আসামি হিসেবে সংশোধনরত আছে।

হত্যাকাণ্ড

বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরের হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততার মাত্রা অনেক বেশি। তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রের মোট ১৫৪ জন নিবাসী হত্যাকাণ্ডের আসামি হিসেবে কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তাদের বর্ণনা মধ্যে প্রায় সবাই সরাসরি হত্যার সাথে জড়িত ছিল। তবে কেউ কেউ বন্ধুদের সাথে দল বেঁধে মারামারি করতে গিয়ে ফেঁসে যায়। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত নিবাসীদের হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলোই আবার চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উন্নয়ন কেন্দ্রের মাঠ জরিপে দেখা যায় যে, নিবাসী শিশু-কিশোরদের শতকরা প্রায় ১৬.৬১ ভাগ অপরাধই হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত। প্রেমে প্রত্যাখাত হওয়া, একাধিক প্রেমিকার সাথে প্রেম করা প্রভৃতির জের ধরে, মাদকে বাঁধা প্রদান বা মাদকের টাকা সরবরাহ না করা, চুরি-ডাকাতির টাকা ভাগাভাগি, স্কুলের সামান্য ঝগড়া এবং আরো নানাবিধ কারণে এসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

নিবাসীদের একজনের বর্ণনা মতে, সে তার বাবামায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা মারা যাওয়ায় মা এবং ছেলে নিয়েই সুখের সংসার। মা একজন সরকারি নার্স ইনসট্রাকটর (সহকারী অধ্যাপক)। মায়ের আয়ে সংসার ভালই চলছে। বর্তমান তার বয়স ১৬। ২ বছর পূর্বে থেকে সে একটি মেয়ের সাথে ভালবাসার সম্পর্কে জড়ায়। তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তারা শারীরিকভাবেও সম্পর্কিত হয়। কিন্তু ২ বছর পরে তার প্রেমিকা তাকে কিছুটা উপেক্ষা করতে থাকে। একদিন তার বন্ধু মারফত জানতে পারে যে, সে একজন ছেলের সাথে নতুনভাবে প্রেমে

জড়িত হয়েছে। একথা শুনে তার প্রেমিকার কাছে একাধিকবার বিষয়টি জিজ্ঞেস করলেও মেয়েটি অস্বীকার করে। ইতোমধ্যে তার অপর এক বন্ধু মোবাইল ফোনে ঐ মেয়ের প্রেমের দৃশ্য ধারণ করে এনে তাকে দেখায়। ফলে তার বিশ্বাস হয় যে, মেয়েটি তার সাথে প্রতারণা করেছে এবং সে একটি চরিত্রহীন মেয়ে। এরপর সে এ সম্পর্ক থেকে ফিরে আসে কিন্তু কিছুতেই ঐ মেয়ের কথা ভুলতে পারছিল না। তাই আবার সে মেয়েটির সাথে যোগাযোগ করে। মেয়েটি এবার তাকে ফিরিয়ে দেয়। এর ফলে সে রাগান্বিত হয়ে পড়ে এবং তার বন্ধুদের নিয়ে পরিকল্পনা করে যে, এর একটা বিহিত করতে হবে। পরিকল্পনা মোতাবেক একদিন মেয়েটির বর্তমান প্রেমিকাকে বাসায় ডেকে আনে এবং চার বন্ধু মিলে রড দিয়ে ব্যাপক মারধর করে একপর্যায়ে বুঝতে পারে যে, সে মারা গেছে। তখন তারা সবাই মিলে ছাদে পানির টেঙ্কিতে ফেলে রেখে আসে। মা সরকারি চাকুরির কারণে বাহিরে থাকায় এসবের কিছুই জানতেন না। পরবর্তী সময়ে ঘটনা জানাজানি হলে মাসহ গ্রেফতার হয় এবং শিশু হওয়ায় কিশোর আদালত তাকে সংশোধনের জন্য উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ করে।

সর্বোপরি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শিশু-কিশোর কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত নিবাসীদের প্রায় ১৬.৬১% নিবাসী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত রয়েছে। এটি সমাজের জন্য একটি অশনি সংকেত বটে। সর্বোচ্চ ১৮.৫৫% নিবাসী চুরি-ডাকাতির সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। অধিকন্তু প্রায় ১৫.০০% নিবাসী কিশোর নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় সম্পৃক্ত হয়েছে। এছাড়া বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোর বিভিন্ন অস্ত্র মামলায় গ্রেফতার হচ্ছে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের মোট ৩৮ জন নিবাসী আস্ত্র সংক্রান্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। তাছাড়া তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রের মোট নিবাসীদের মধ্যে ৮৫ জন মারামারি ঘটনায় জড়িত হয়েছে। তাই বলা যায় যে, শিশু-কিশোর লঘু অপরাধের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডসহ বড় বড় অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। দিন দিন এর মাত্রা ও পরিধি আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শিশু-কিশোরের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছে।

বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের প্রভাব (Impect of Juvenile Delinquency in Bangladesh)

বাংলাদেশের সর্বত্রই কিশোর অপরাধের প্রভাব বিরাজমান। এমনিতেই বিভিন্ন সমস্যায় ভরপুর আমাদের সমাজ। এর মধ্যে কিশোর অপরাধ সার্বিক অপরাধের মাত্রা ও তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। পরিবার ও সমাজে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ছে। তাই এর ভয়াবহতায় আতঙ্কিত সমাজের সাধারণ মানুষ। নিম্নে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বিভিন্ন প্রভাব আলোচনা করা হলো-

১। নৈতিক অধঃপতন

কিশোর-কিশোরী অদূর ভবিষ্যতে জাতির চালিকা শক্তি। একটি দেশে কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শিশু-কিশোরের নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ সুদৃঢ় হওয়া জরুরি। কিন্তু আমাদের সমাজে নানা রকম অপরাধের সাথে কিশোরদের সম্পৃক্ততার প্রভাবে তাদের মধ্যে নৈতিক অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষা-দীক্ষা ও মানসিক উন্নয়ন ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পরিবর্তে কিশোররা নানারকম অপরাধ ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। এছাড়া লেখা-পড়ার পরিবর্তে আদর্শবিহীন রাজনীতি, টেন্ডারবাজি, অর্থ-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার লোভ তাদের নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ নষ্ট করে দিচ্ছে। এসকল কিশোরই আবার প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দেশের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে। কর্মজীবনে এসেও কিশোরজীবনের অনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। ফলে এসকল প্রতিষ্ঠানও তাদের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে।

২। অর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

সাম্প্রতিক সময়ে কিশোররা অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজেও জড়িয়ে পড়ছে। তারা প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর ন্যায় ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, ভাঙচুর, অগ্নি সংযোগ, হামলা, যানবাহন ধ্বংস প্রভৃতি নাশকতামূলক কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে; অন্যদিকে পরিবার ও সমাজের প্রত্যাশা বিনষ্ট করে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। এছাড়া এসকল কিশোর মেধার চর্চার মাধ্যমে দেশের প্রগতি ও উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও নিজেকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করে দেশের উৎপাদন ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না। ফলে সামগ্রিকভাবে দেশ আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৩। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট

একটি জাতির কর্ণধার হচ্ছে শিশু-কিশোররা। আজকের শিশু-কিশোরই আগামী দিনের দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দিবে। কেউ সরকার পরিচালনা করবে, আবার কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। আবার অন্য শ্রেণি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ও আবিষ্কারের মাধ্যমে দেশের জন্য সুনাম ও খ্যাতি নিয়ে আসবে। কিন্তু তারা যদি নিজের উজ্জ্বল

সম্ভাবনা নষ্ট করে অপরাধের দিকে ধাবিত হয় তাহলে অচিরেই তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে। আর এরকম কিশোর অপরাধীর দ্বারা সমাজের ক্ষতি ছাড়া কোন উপকার সাধন হবে না। অঙ্কুরেই তারা বিনষ্ট হবে এবং দেশের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলবে।

৪। শিক্ষার পরিবেশের অবনতি

বিভিন্ন অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বখে যাওয়া কিশোর-কিশোরীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশকে কলুষিত করছে। তারা দলাদলি, অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি, ধর্মঘট, মিছিল, ভাংচুর প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ নষ্ট করছে। ছাত্র নামধারী এসকল অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরী পরীক্ষায় নকলের মহোৎসব ঘটানোর চেষ্টা করে থোকে। এছাড়াও তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইভটিজিং ও যৌন হয়রানিমূলক কাজেও সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি অনেক সময় অপরাধপ্রবণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সাথে অসদাচরণ করে। সম্প্রতিক সময়ে এরকম বখাটে শিক্ষার্থী কিশোর অপরাধীদের দ্বারা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে নির্যাতন, বিশেষ করে শিক্ষকদেরকে প্রহারের ঘটনাও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে কিশোর অপরাধের কারণে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে এবং শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা হ্রাস পাচ্ছে, শিক্ষকের সম্মান নষ্ট হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে এর প্রভাব পড়ছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর।

৫। নিরাপত্তাহীনতা

সমাজে কিশোর অপরাধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা চাপা আতঙ্ক বিরাজ করে। তারা বয়স্ক অপরাধীদের ন্যায় কিশোর অপরাধীদের ভয়েও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে ভয় পায়, না জানি কোন সময় তারা কোন বিপদ ঘটায়। মেয়েদেরকে অশোভন উক্তি, নানাভাবে টিজ করা এমনকি অপহরণ করে থাকে। প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হয়ে যৌন হয়রানি, এসিড নিক্ষেপের হুমকি দিয়ে থাকে। কোন কোন সময় তারা এসিড নিক্ষেপ ও অপহরণ করেও থাকে। ফলে ঘোটা সমাজে একটা আতঙ্ক বিরাজ করে এবং সাধারণ মানুষ এ ব্যাপরে প্রতিকারের কোন সুরাহা পায় না। তাই কিশোর অপরাধের কারণে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে যায়।

৬। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়

কিশোর অপরাধ দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্র ব্যাহত করে। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা যানবাহন ভাংচুর করে, রাস্তা-ঘাটে আবদ্ধ করে, এমনকি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত করে থাকে। এক কথায় রাস্তাঘাটে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জনজীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। অনেক সময় এমনও হয় যে তাদের ঠুনকো কোন আবদার পূরণের জন্য রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনও হয় যে, মুমূর্ষু রোগীর পরিবহনের এম্বুলেন্স পর্যন্ত আবদ্ধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সার্বিকভাবে কিশোর অপরাধের কারণে জনজীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে।

৭। পারিবারিক মর্যাদা ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে

কিশোর-কিশোরীদের বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধ পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়। মা-বাবা বখে যাওয়া সন্তানকে নিয়ে সবসময় দুশ্চিন্তায় থাকে। সে পরিবারের কোন নিয়মনীতি মানে না। নেশার অর্থ সংগ্রহের জন্য পরিবারের টাকা-পয়সা ও মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে বিক্রি করে দেয়। অনেক সময় নিজের পরিবারের বাইরেও চুরি-ছিনতাই সংঘটিত করে থাকে। তাছাড়া নেশাগ্রস্ত হয়ে পরিবারের সদস্য ও সমাজের অন্য লোকজনের সাথে খারাপ ব্যবহার করে। ফলে এমন পরিবারের পিতামাতাকে সমাজের কাছে ছোট হতে হয় এবং পরিবারের স্বাভাবিক গতিশীলতা ও মান-মর্যাদা নষ্ট হয়।

৮। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি

কিশোর অপরাধের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। ইভটিজিং থেকে শুরু করে ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, রাহাজানি, বোমাবাজি, গোলাগুলি, হুমকি প্রদান, হত্যা, অপহরণসহ এমন কোন কাজ নেই যা অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরী করতে পারে না। এ সকল অপরাধ নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসন হিমসিম খাচ্ছে। ফলে দেশের আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটছে।

৯। নেতৃত্বের ঘাটতি

কিশোর অপরাধের প্রভাবে দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব হুমকীর সম্মুখীন হচ্ছে। কিশোররা বিভিন্ন অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী গড়ে উঠছে না। তাছাড়া নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধর অনুশীলন ও চর্চার অভাবে ভবিষ্যতে উত্তম চরিত্রের মানুষের ঘাটতি দেখা দিবে। শিশু-কিশোরদের সঠিকভাবে মানসিক বিকাশ না হওয়ায় এবং সৃজনশীল প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যত নেতৃত্বে আসবে শূন্যতা। এছাড়া তাদেরকে দেখে ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ ছাত্র-রাজনীতির চর্চার মানসিকতা আস্তে আস্তে লোপ পাচ্ছে। তাই ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এ সুযোগে অসৎ ও অযোগ্যরা চলে আসবে নেতৃত্বের ভূমিকায়। তাই কিশোর অপরাধ সমস্যার সুষ্ঠুভাবে প্রতিরোধ করতে না পারলে দেশে ভবিষ্যতে দক্ষ নেতৃত্বের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।

১০। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

রাজনৈতিক অঙ্গনেও কিশোর অপরাধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক অঙ্গনে অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, বোমাবাজি, গোলাগুলি, হত্যা প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মত বাংলাদেশের রাজনীতিতেও পেশিশক্তির ব্যবহার থাকায় তাদের দৌরাত্ম্য দিনে দিনে আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এখনই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করা না গেলে রাজনৈতিক অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা আরো বৃদ্ধি পাবে।

১১। ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলবস্থা

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেও কিশোর অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, বোমাবাজি, গোলাগুলি, হত্যা প্রভৃতি কর্ম-কাণ্ডের মাধ্যমে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে অচলবস্থা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। বয়স্ক অপরাধীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় টেন্ডার দখল, অবৈধ চাঁদা আদায়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর প্রভৃতি কাজ কিশোর অপরাধীদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে। ফলে দেশি-বিদেশী বিনিয়োগ ব্যহত হচ্ছে, নতুন বিনিয়োগে আগ্রহ হারাচ্ছে আর্ন্তজাতিক নামী-দামী প্রতিষ্ঠানগুলো। এর ফলে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। যা জাতীয় অর্থনীতি অগ্রগতির অন্যতম প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়।

১২। মানব সম্পদ ধ্বংস

প্রতিটি মানুষ সমাজের এক একটা সম্পদ যদি তারা দক্ষ ও কর্মক্ষম জনশক্তিতে রূপান্ততি হয়। কিশোর বয়সে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ার ফলে তারা আর নিজেদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করতে পারছে না। একবার অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়লে সে কিশোর আর অপরাধমূলক কাজ থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। প্রত্যেকটি পরিবারেরই সন্তানদের নিয়ে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন থাকে। বিপথগামী এসকল কিশোর পরিবার ও সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। এর ফলে তারা পরিবার সমাজ ও মানুষের ক্ষতি ছাড়া কোন কল্যাণে আসে না। তারা একদিকে নিজের জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, অপরদিকে পরিবার ও সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে বিনষ্ট করছে। অন্যের জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতিতে বাঁধা সৃষ্টি করছে। জাতীয় সম্পদ নষ্ট করছে এবং নিজের উন্নয়ন করতে না পেরে মানব সম্পদ ধ্বংস করে চলছে।

কিশোর অপরাধের প্রভাব সকল দিকেই ঋনাত্মক। স্বাভাবিক জীবনের পথে এটি হুমকিস্বরূপ। এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সমাজের বিপদগামী কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়ন করতে না পারলে বা সমাজের কিশোর অপরাধ দমন করতে না পারলে জাতি অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হবে। এজন্য কিশোরদের অপরাধমূলক কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার পূর্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আর যারা ইতোমধ্যে অপরাধের সাধে জড়িয়ে পরেছে তাদেরকে বিভিন্ন সংশোধন, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে সমাজের মূল স্রোতের সাথে একীভূত করা প্রয়োজন। তা নাহলে সমাজ বিনষ্টের দায়ভার সকলকেই নিতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কিশোর : অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য

চতুর্থ অধ্যায়

কিশোর : অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্য

পৃথিবীতে সকল মানুষই শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করে। একজন মানব শিশু যখন কথা বলতে পারে না, হাটা চলা করতে পারে না, নিজে খেতে পারে না, ভাল-মন্দ বুঝে না -সে সময় থেকে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট তাদের কিছু অধিকার রয়েছে। যা শিশু অধিকার নামে পরিচিত। সাধারণত, শিশুরা যাতে কষ্ট না পায়, তাদের বুদ্ধির বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত না হয়, মেধা ও মনন বিকাশে বিঘ্ন না ঘটে, এককথায় তাদের প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণের পর্যাপ্ততা এবং এ সকল প্রয়োজন পূরণে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রাপ্তির অধিকারই 'শিশু অধিকার'। তাই আজকে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করেছে তার প্রয়োজনীয় আদর, স্নেহ-ভালবাসা ও প্রতিপালনের অধিকার থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। কেননা আজকেই এই শিশু তার অধিকার বঞ্চিত হয়ে বেড়ে উঠলে ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিবে; সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত হবে; জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ব। বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই শিশুদের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় শিশু নীতি, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ প্রচলিত আরো অনেক নীতিমালা রয়েছে। তারপরেও সমাজে শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; সমাজের উপযুক্ত প্রতিপালন ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে তাদের পর্যাপ্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হচ্ছে না। তাই এ প্রসঙ্গে প্রচলিত নীতিমালার পাশাপাশি শাশ্বত বিধান ইসলামের নির্দেশনা ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদঃ ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪১ -এ শিশু-কিশোরসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। শিশু-কিশোরদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'শিশু আইন ১৯৭৪' প্রণয়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ এবং সম্প্রতি 'শিশু আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করে শিশু-কিশোরের অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সংবিধানের ১১, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২৮(৪) নং অনুচ্ছেদে শিশু-কিশোরের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ সকল মৌলিক প্রয়োজন ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে তাদের অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরেও শিশুদের অধিকার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা

রয়েছে। শিশুদের অধিকার রক্ষায় ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'শিশু অধিকার সনদ গ্রহণ করে এবং ০২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সাল থেকে তা কার্যকর করা হয়।[১]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কিশোর-কিশোরীর মধ্যে যারা অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে তাদের সংশোধন, শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন সাধনের জন্য একাধিক কিশোর সংশোধনী বা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। এর মাধ্যমে সরকার সকল শিশু-কিশোরের সাথে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়া কিশোরদেরকেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার এবং স্বাভাবিক বিকাশ সাধন ও পুণর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ লক্ষ্যে সরকার তিনটি (১. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর ২. কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর; ৩. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর) কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। শিশু আইন, ২০১৩ ও প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিনেন্স ১৯৬০ এর অধীনে এ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হয়। এসকল কেন্দ্রে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের কেইস ওয়ার্ক, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন ইত্যাদি স্বীকৃত পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন করে শিশুদের অধিকার বাস্তবায়ন করে আসছে।

শিশু-কিশোরের অধিকার

"ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।"[২] আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশু কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা দেশের নয় বরং সমগ্র বিশ্বের। শিশুদেরকে আগামী দিনের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য তাদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক পরিচর্যা ও নিরপত্তা একান্ত জরুরী। অথচ বিশ্বে কোটি কোটি শিশু তাদের মৌলিক অধিকার থেকে আজও বঞ্চিত হচ্ছে। মানুষ জন্মগতভাবেই কিছু অধিকার নিয়ে জন্মলাভ করে। মানুষের এই অধিকারগুলাই মৌলিক মানবিক অধিকার। একজন পরিণত মানুষের মত একজন শিশু-কিশোরও কিছু অধিকার ভোগ করে থাকে। এ অধিকারগুলো সঠিকভাবে প্রাপ্ত না হলে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাঁধাগ্রস্ত হয়। মানব শিশুর জন্য ইসলাম পিতা-মাতাকে দায়িত্ব দিয়েছে সন্তানের মৌলিক অধিকারসমূহ পূরণ করে তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য, যাতে সন্তান সমাজে ও সংসারে সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। নিম্নে শিশু অধিকারসমূহ আলোচনা করা হলো-

১। পবিত্র জন্ম লাভের অধিকার

---

১. *Convention on the Rights of the Child,CRC,1989* (New York: United Nations, 20 November, 1989)

২. গোলাম মোস্তফা (সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত), *কাব্য সংকলন* (ঢাকা: খোশরোজ কিবতাব মহল, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৫৫

ইসলাম সন্তানের অপরাধমুক্ত জীবনযাপনের জন্য পিতা-মাতা ও অভিভাবককে সন্তান জন্মপূর্ব প্রয়োজনীয় নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে ইসলাম পিতা-মাতার সৎ উপার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। যাতে পিতামাতা সুদ, ঘুষ, কালোবাজারিসহ সকল অনৈতিক পন্থায় থেকে মুক্ত থেকে সৎ জীবিকা উপার্জনের মাধ্যমে জীবন নির্বাহ করে। যাতে উক্ত পিতামাতার সন্তানের উপর সৎ উপার্জনের প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং সন্তান অপরাধমুক্ত হয়েই মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত করতে পারে। কারণ পিতা-মাতার অসৎ উপার্জন সন্তানের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে যা তাদেরকে অপরাধের পথে ঠেলে দেয়। বৈধভাবে জন্মলাভ করা একটি সন্তানের প্রথম ও প্রধান মানবিক অধিকার। ইসলাম বৈধভাবে বিবাহ সম্পাদন করা ছাড়া নারী-পুরুষের মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম নারী-পুরুষের বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক স্বীকার করে না। এজন্য সন্তান জন্মদানের প্রধান ও একমাত্র শর্ত হচ্ছে বৈধপন্থায় বিবাহ সম্পাদন করতে হবে। বিবাহ সম্পাদন ব্যতীত কোন সন্তান জন্ম লাভ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সন্তান পবিত্র নয়। তাই ইসলাম প্রত্যেক মানব সন্তানকে পবিত্রভাবে জন্মলাভের অধিকার প্রদান করেছে। বিয়ের উপকারিতা সর্বজনীন এবং তা একটি সামাজিক স্বার্থ ও কল্যাণকর কাজ। এর মাধ্যমেই মানব বংশের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি ঘটে। বিয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ-অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জোড়া থেকে সৃষ্টি করেছেন ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি এবং তোমাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছেন।"[৩] এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء-অর্থ: "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন সে ব্যক্তি থেকে তার জোড়া, আর তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী।"[৪]

বিয়ের মাধ্যমে বংশের ধারা অক্ষুণ্ন থাকে এবং সন্তান নিজ পিতার বংশে গৌরব বোধ করে। বিয়ে ছাড়া অবৈধপন্থায় যে সকল সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাদের না আছে আত্ম ও বংশ পরিচয়, আর না আছে উন্নত চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য। বরং তারাই সমাজে বিপর্যয় ও বেহায়াপনার প্রতীক। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসেও বিবাহের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ- অর্থ: "কোন মুমিন তাকওয়া অর্জনের পর নেকী স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন জিনিস দ্বারা

---

৩. আল-কুরআন, ১৬: ৭২
৪. আল-কুরআন, ৪: ১

উপকৃত হতে পারে না। স্বামী স্ত্রীকে কোন আদেশ করলে নেক স্ত্রী তা পালন করে, স্বামী তার প্রতি নজর করলে আনন্দ পায়, তার উপর কোন বিষয়ের কসম করলে সে তা পূরণ করে, স্বামীর অনুপস্থিতে স্ত্রী তার জান ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করে।"[৫] আর এই পবিত্র দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে নি'আমত দান করেন তা হলো মানব শিশু। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মানব সন্তানের সর্বপ্রথম অধিকার হলো পবিত্র জন্মলাভের অধিকার।

২। মাতৃদুগ্ধ পানের অধিকার

শিশুর জন্য মায়ের দুধ অপরিহার্য, এর কোন বিকল্প নেই। মায়ের বুকের দুধ হচ্ছে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির সকল উপাদানসমৃদ্ধ আল্লাহ প্রদত্ত এমন তৈরি খাবার যা শিশু সহজেই হজম করতে পারে। শিশুর শরীরের জন্য উপযোগী মাতৃদুগ্ধ শিশুর শরীর তা সহজেই কাজে লাগিয়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটিয়ে থাকে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর দেহের খাদ্যের চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে, মায়ের বুকের দুধের উপাদানে অনুরূপ পরিবর্তন প্রতিদিনই ঘটতে থাকে। তাই শিশুর জন্য মায়ের দুধের বিকল্প নেই। মায়ের দুধ শিশু-সন্তানের জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে পুষ্টিকর খাবার। সন্তানের যে কোন রোগ-বালাই থেকে মুক্ত রাখার জন্য এ দুধ খুবই উপকারী। ইসলাম তাই মাতৃদুগ্ধ পানের উপর সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানব সন্তান জন্মলাভের পর কমপক্ষে দুই বছর মাতৃদুগ্ধ পান করবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ-অর্থাৎ-"মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়।"[৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ- অর্থ: "তার মা তাকে অসীম কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই তোমরা আমার প্রতি এবং তোমার মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তোমাদের ফিরে আসা তো আমার নিকটেই।"[৭] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ- অর্থ: "মূসার মায়ের নিকট আমি ওহী পাঠালাম, তুমি শিশুটিকে দুধ পান করাও।"[৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا- অর্থ: "তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধপান ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস।"[৯] মহান আল্লাহর এসকল বাণীতে

---

৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুন-নিকাহ, বাবঃ আফযালুন-নিসা (রিয়াদ, জেদ্দাহঃ দারুসসালাম, ২০০৭খ্রি.), হাদীস নং- ১৮৫৭

৬. আল-কুরআন, ২: ২৩৩

৭. আল-কুরআন, ৩১: ১৪

৮. আল-কুরআন, ২৮: ৭

৯. আল-কুরআন, ৪৬: ১৫

মাতৃদুগ্ধপানের ফজিলত ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিশুর দুগ্ধপানের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শিশুদেরকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করার ইসলাম স্তন্যদানকারী মায়ের উপর শরী'আতের হুকম শিথিল করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ عَنْ الْمُسَافِرِ وَعَنْ الْمُرْضِعِ أَوْ الْحُبْلَى–

অর্থ: "আল্লাহ মুসাফিরের উপর থেকে চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযের অর্ধেক রহিত করে দিয়েছেন। আর মুসাফির স্তন্যদানকারী ও গর্ভবতী মহিলা থেকে রমযানের রোযা রাখার বাধ্যবাধকতাও উঠিয়ে নিয়েছেন।"[১০] হযরত উমর ফারুক (রা.) -এর সময় প্রথমদিকে যেহেতু মাতৃদুগ্ধ পানরত শিশুরা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে আর্থিক অনুদান পেত না, সেহেতু মায়েরা অনুদান পাওয়ার আশায় দ্রুত বুকের দুধ খাওয়ানো ছাড়িয়ে দিতেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত উমর (রা.) শিশুদের বুকের দুধ দানে মায়েদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে জন্মের পর থেকেই এ আর্থিক অনুদান চালু করেন।[১১] আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিশুকে মাতৃদুগ্ধ দানের ব্যাপারে যে গুরুত্বপ্রদান করেছে, ইসলাম তা অনেক আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছে। আজকে বিশ্বব্যাপী মাতৃদুগ্ধ দানের ব্যাপারে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, এমনকি বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর পহেলা আগষ্ট 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস' পালিত হচ্ছে, তা মূলত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন।

৩। শিশুর সুন্দর নামকরণের অধিকার

নবজাতক শিশুর জন্য পিতামাতার আরো একটি কর্তব্য হলো, জন্মের সাত দিবসের মধ্যে একটি শ্রুতি মধুর ও অর্থবোধক নাম রাখা। মানুষের জীবনে নামের বিরাট প্রভাব পড়ে। সন্তানের জন্য সুন্দর একটি অর্থবোধক নাম রাখা প্রত্যেক পিতামাতার কর্তব্য এবং নবজাতকের অধিকার। মানুষের পরবর্তী জীবনে এ নামের প্রভাব স্বভাব-চরিত্রে ফুটে উঠে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে,

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِي أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمِي حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِينَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ–

অর্থ: হযরত সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তার দাদা হাযন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমাতে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন তোমার নাম কি? তিনি উত্তরে বললেন, আমার নাম হাযন (শক্ত)। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, না বরং তোমার নাম হওয়া উচিত সাহল (সহজ সরল)। তিনি উত্তরে বললেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন তা আমি পরিবর্তন করব না। সাঈদ ইবন মুসাইয়্যাব বলেন,

---

১০. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুস-সাওম, বাব: এখতিয়ারুল ফিতর (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯হি.), হাদীস নং-২৪০৮

১১. সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবন ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৪৩৪ হি.), পৃ. ১৪৮

এরপর আমাদের পরিবারে পরবর্তীকালে কঠিন অবস্থা ও পেরেশানী লেগে থাকত।[১২] সুতরাং সুন্দর একটি নাম শিশুর জন্মগত অধিকার। তাই পিতামাতার উচিত নামের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে নবজাতকের নাম রাখা। আধুনিকতার নামে মুসলিম ভাবধারা বহির্ভূত ও অর্থহীন নাম রাখা অনুচিত।

৪। শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার

ইসলামে শিশুর বেঁচে থাকা বা নিরাপত্তার অধিকার সুরক্ষিত। শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। শান্তি বা যুদ্ধ উভয় অবস্থায়ই শিশুর জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। জাহেলি যুগে কন্যা সন্তানকে অপয়া মনে করে ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে হত্যা করা হতো। কখনও কখনও তাদেরকে জীবন্ত পুতে রাখা হতো। ইসলাম এ নিষ্ঠুর কাজকে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করেছে এবং এর জন্য চরম শাস্তি ঘোষণা করেছে। কাজেই পিতা-মাতা কোন অবস্থাতেই সন্তান হত্যা করতে পারবে না। এমনকি চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হলেও নয়। ইসলাম ঘোষণা করেছে, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا–অর্থ: "অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। তাদের আমি জীবিকা দেই এবং তোমাদেরকেও আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা ভয়ানক অপরাধ।"[১৩] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ–"অর্থ: "তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা বোকামি ও মূর্খতার কারণে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে।"[১৪] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,–وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ– بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ অর্থ: "যখন জীবিত কবর দেয়া মেয়ে শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"[১৫] এরপর আল্লাহ তা'আলা সন্তানের উদ্বিগ্নতার কথা উল্লেখ করে বলেন, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ–অর্থ: "তারা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করলে তারাও সন্তানদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হত।"[১৬] ইসলামই সর্বপ্রথম শিশুর বেচেঁ থাকার অধিকার ঘোষণা করেছে। প্রাচীন সমাজে যেখানে কন্যা শিশু সন্তানকে অপাংতেয় মনে করা হতো সেখানে ইসলাম ঘোষণা করেছে, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ–অর্থ: "তোমরা

---

১২. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাব: তাহবীলিল-ইসমি ইলা ইসমি আহসানা মিনহু (আল-কাহেরা: মাকতাবাতুস সাফা, ১৪২৩হি.), হাদীস নং-৬১৯৩

১৩. আল-কুরআন, ১৭: ৩১

১৪. আল-কুরআন, ৬: ১৪০

১৫. আল-কুরআন, ৮১: ৮-৯

১৬. আল-কুরআন, ৪: ১৯

অভাবের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তোমাদেরকে এবং তাদেরকে তো আমিই জীবিকা দেই”[১৭] উপরোল্লিখত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানব সন্তানের জীবনের অধিকার তথা বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। মানব সন্তানের জীবনের জন্য সমস্ত হুমকি প্রতিরোধ করে জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নারীদের বায়'আত গ্রহণকালে তাদের থেকে যেসব বিষয়ের শপথ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তন্মধ্যে একটি ছিল সন্তান হত্যা না করা। ইসলামি শরী'আতে শিশুর জীবন রক্ষায় পিতা-মাতার দায়িত্ব অপরিসীম। শিশু পিতা-মাতার নিকট এক পবিত্র আমানত। এ আমানত সম্পর্কে তারা অচিরেই জিজ্ঞাসিত হবে। যদি পিতা-মাতা শিশুদের প্রতিপালনে মনোযোগী না হয়, তবে অবশ্যই তাদের জবাবদিহী করতে হবে। মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ–অর্থ: “তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্ববান এবং প্রত্যেকেই আপন দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি মানুষ তার পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে দায়িত্ববান। তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সম্পদ ও সন্তানের ব্যাপরে দায়িত্ববান। সে এসবের রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”[১৮] কুরআনের উক্ত আয়াতসমূহে শিশুর জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। শিশুর নিরাপত্তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহও (সা.) বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন। এছাড়া ইসলাম কার্যত যুদ্ধকালীন সময়েও শিশু ও নারীদের নিরাপত্তার বিধান কার্যকর করেছে। মোট কথা ইসলাম সর্বাবস্থায় মানব সন্তান হত্যা হারাম করে দিয়ে শিশু-সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এভাবে মানব শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম শিশুকে বেঁচে থাকার আইনগত অধিকার প্রদান করেছে।

৫। বৈষম্যহীন আচরণের অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল সন্তানই বৈষম্যহীন আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখে। ইসলাম সন্তানদের মাঝে কোন রকম বৈষম্য অনুমোদন করে না। মেয়ে হোক বা ছেলে হোক সবাই পিতামাতার নিকট সমান মর্যাদার অধিকারী। তাই সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক, তাদের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তানদের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ প্রসঙ্গে বলেন, اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ–অর্থাৎ-“তোমরা সন্তানদের

---

১৭. আল-কুরআন, ৬: ১৫১

১৮. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জুমআ, বাবুল জুমুআতি ফিল কুরা ওল মুদুন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৯৩; ইমাম হাফেজ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ইমারাত, বাব: ফাযিলাতুল ইমামিল আদিল (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪১৯হি.), হাদীস নং-১৮২৯

কিছু দেয়ার ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কায়েম কর।”[১৯] অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, বশীর আনসারীর স্ত্রী ‘উমরাহ তার পুত্র নু‘মান ইবন বাশীরকে একটি বাগান অথবা ক্রীতদাস দান করার জন্য স্বামীকে পিড়াপিড়ি করেন। এতে বাশীর (রা.) ঐ ছেলেকে তা দান করেন। কিন্তু, নু‘মানের মা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) কে স্বাক্ষী রাখার দাবি করেন। সেমতে তিনি নু‘মানকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) - এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ -অর্থ: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার স্ত্রী ‘উমরার গর্ভজাত এ পুত্রকে একটি ক্রীতদাস দান করেছি। আর ‘উমরাহ এ ব্যাপারে আপনাকে স্বাক্ষী রাখার অনুরোধ করেছে। তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অন্যান্য সন্তানদেরও এরূপ দান করেছ? সে বলল, জ্বি না। তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর। আমি এ যুলুমের সাক্ষী হব না। অতঃপর বশীর এসে তার দান ফেরত নিয়ে নেন।”[২০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং মেয়েদের উপর ছেলেদের অহেতুক প্রধান্য দেওয়াকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ –অর্থ: “যার তত্ত্বাবধানে কোন বালিকা শিশু থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং বালকদের উপর কোনরূপ প্রাধান্য না দেয়, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।”[২১] এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) কন্যা সন্তানের গুরুত্ব ও প্রতিপালনের ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

সন্তানদের মাঝে বৈষম্যের ব্যাপারে গণপ্রতাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮/ ১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না। আর ২৮/৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।[২২] এছাড়া জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ তে মানব সন্তানদের মাঝে কোনরূপ বৈষম্য না করার নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে,

---

১৯. ইমাম আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল হিবা, বাবুল হিবাতি লিল ওলিদ

২০. ইমাম আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২৫৮৭; ইমাম হাফেজ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল হিবা, বাবঃ কারাহাতু তাফযিলি বা‘দিল আওলাদি ফিল হিবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬২৩

২১. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবঃ ফিফাযলি মান ‘আলা ইয়াতিমান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫১৪৬

২২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইনবিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এপ্রিল ২০০১, অনুচ্ছেদঃ ২৮/১, ২৮/৩

"গোত্র, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক ভিন্নমত,জাতীয়তা অথবা সামাজিক পরিচয়, বিত্ত, সামর্থ্য, জন্মসূত্রে কিংবা অন্য কোন বংশগত অবস্থানের কারণে শিশুর প্রতি কোন রকম বৈষম্য করা যাবে না।"[২৩] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপরোক্ত বক্তব্য, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ও বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত অধিকার বিশ্লেষণ পূর্বক আমরা বলতে পারি যে, সন্তান ছেলে, মেয়ে, সুন্দর বা অসুন্দর, ছোট বা বড়, স্বাভাবিক বা প্রাতিবন্ধী যাই হোক উভয়ের প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। সংবিধান

৬। সঠিকভাবে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার

প্রত্যেকটি শিশু-কিশোরের উপযুক্তভাবে প্রতিপালিত হওয়ার অধিকার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। এ অধিকার শিশু-কিশোর পিতামাতা, অভিভাবক ও রাষ্ট্রের নিকট হতে প্রাপ্য হয়। সন্তান প্রতিপালনের ব্যাপারে পিতামাতা উভয়েরই বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। এজন্য তাদের উচিৎ সন্তানদের প্রত্যেকটি বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, তাদের যথাযথ পরিচর্যা করা, তাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা। এ অধিকারের কথা উল্লেখ করে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে বলা হয়, "শিশুর লালনপালন ও বিকাশের জন্য পিতামাতা উভয়ের দায়িত্বকে সক্রিয় করে তুলতে রাষ্ট্র উদ্যোগী হবে। শিশুর লালনপালন এবং গড়ে তোলার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে পিতামাতার এবং আইনসম্মত অভিভাবকের। তাদের মূল চিন্তাই হবে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ। পিতামাতা ও আইনসম্মত অভিভাবককে শিশুর লালনপালনে রাষ্ট্র সাহায্য করবে এবং শিশুর বিকাশের জন্য শিশু পরিচর্যা প্রতিষ্ঠানসহ সেবার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবে।"[২৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান প্রতিপালন করা সওয়াবের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ– অর্থাৎ-"পিতার কর্তব্য হল ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের ভরণপোষণ ও খরচ দেয়া।"[২৫] ইসলাম উত্তমরূপে সন্তান প্রতিপালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। সন্তান প্রতিপালনের জন্য পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারেই সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার ভিত রচিত হয়। তাই শিশুদের আদর-স্নেহ-মমতা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, "তোমরা শিশুদের ভালবাসো এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করো।"[২৬] এছাড়া যারা শিশুদের ভালোবাসে না, স্নেহ করে না তাদেরকে সতর্ক করে রাসূলুল্লাহ

---

২৩. *Convention on the Rights of the Child, CRC,1989,* ibid, Article: 2
২৪. *Ibid,* Article:18
২৫. আল-কুরআন, ২: ২৩৩
২৬. সিরাজুল করিম, *মহানবীর শিশু প্রীতি* (ঢাকা : রুমা প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ২০

(সা.) বলেন, –مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا অর্থ: "যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের কেউ নয়।"[২৭] শিশু-কিশোরের প্রতি পিতামাতার আচরণ কেমন হবে তার একটি নমুনা পাওয়া যায় হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ–

অর্থ: "হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন কতিপয় বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। তারা দেখলেন সাহাবীগণ শিশু সন্তানদেরকে চুমু দিয়ে আদর করছেন। তা দেখে তারা বললেন, আপনারা কি আপনাদের শিশুদেরকে চুম্বন করেন? তাঁরা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! তারা বললেন কিন্তু, আল্লাহর কসম, আমরাতো শিশুদেরকে চুম্বন করি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন, তাহলে আমার কিছুই করার নেই।"[২৮] কাজেই শিশু-কিশোরের প্রতিপালনের ব্যাপারে পিতামাতা, অভিভাবক ও রাষ্ট্র সকলেরই যত্নবান হওয়া উচিত।

৭। শিক্ষালাভের অধিকার

সকল শিশু সমান সুযোগের ভিত্তিতে শিক্ষাগ্রহণের অধিকার পাবে। বাংলাদেশের সংবিধান,[২৯] শিশু আইন, ২০১৩ এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদসহ সকল সনদে শিশুর সর্বজনীন শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ইসলাম সকল শিশু-কিশোরের জন্য সর্বজনীন লক্ষ্যে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বলা হয়, "এ অধিকার বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, বিশেষ করে, সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং সহজলভ্য করবে। সাধারণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষাকে উৎসাহ দিবে এবং এরূপ শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করবে। সকল শিশু যেন এ সুযোগ লাভ করতে পারে সেজন্য বিনা খরচে শিক্ষা লাভ ও প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে।"[৩০] ইসলাম সর্বজনীন শিক্ষা উৎসাহিত করতে শিক্ষাগ্রহণকে 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে, যাতে প্রত্যেক মুসলমান শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হন। ইসলামের সুমহান ঐশী

২৭. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.) *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাব: ফি রাহমাতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯৪৩; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল বিররি ওসসিলাতি আন রাসূলল্লাহ (সা.), বাব: মা যায়া ফি রাহমাতিস-সিবইয়ান (রিয়াদ: মাকতাবাতল মা'আরিফ, ১৪১৭ হি.), হাদীস নং-১৯১৯

২৮. ইমাম হাফেজ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, অধ্যায়: কিতাবুল ফাযায়েল, অনুচ্ছেদ: শিশুদের প্রতি ও সন্তানের প্রতি রাসূলুল্লাহ সা. এর স্নেহ ও বিনয়ী ভাব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৮৫৫

২৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়: রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দানের জন্য, (খ) সময়ের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। *(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইনবিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এপ্রিল ২০০১)

৩০. *Convention on the Rights of the Child, CRC,1989,* ibid, Article: 28

বাণীর প্রথম বাণীটিই ছিল শিক্ষা বা জ্ঞানার্জন সম্পর্কিত। মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম বাণীতে বলেন,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ– অর্থ: "(হে রাসূল!) পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[৩১]

একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শের প্রথম বাণীই যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত হয়, তখন সে জীবন ব্যবস্থার সর্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। ইসলামের নবী মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেন, اطلبوا العلم ولو بالصِّين فإن طلب العلم فريضةٌ على كل مسلمٍ– অর্থাৎ-"জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য প্রয়োজনে তোমরা চীন দেশে যাও। কেননা, জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।"[৩২] অপর এক হাদীসে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ– অর্থাৎ-"আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীনের জ্ঞান দান করেন।"[৩৩] এছাড়াও অসংখ্য হাদীসে জ্ঞানার্জনের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) উৎসাহিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ– অর্থাৎ-"একজন ইসলামি জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি (ফকীহ) শয়তানের উপর একহাজার আবিদের (ইবাদত গুযারের) চাইতেও অধিক শক্তিশালী।"[৩৪] এভাবে ইসলাম শিশু-কিশোরের জন্য শিক্ষার অধিকার ঘোষণা করে শিক্ষার আলো সকলের দোরগোরায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

৮। ঈমানের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার

ঈমান[৩৫]মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী-রাসূলই মানব জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন। জাগতিক জীবনের প্রকৃত শান্তি, বিশুদ্ধ জীবনযাত্রা, সামগ্রিক কল্যাণ ও

৩১. আল-কুরআন, ৯৬: ১

৩২. বি.দ্রঃ বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বায়হাকী তাঁর *শু'আবুল ঈমান*, কিতাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধতার ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বায়হাকী উল্লেখ করেন, হাদীসটির প্রসিদ্ধি মাশহুর পর্যায়ে কিন্তু যতগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি সনদই দুর্বল। (ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ: ফী ত্বলবিল 'ইলম, বৈরুত: দারুল কতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২১ হি., খ.২, হাদীসনং-১৬৬৩)

৩৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, অধ্যায়: আলমুকাদ্দামাহ, বাব: ফাদলুল 'উলামায়ে ওয়াল হাচ্ছু আলা ত্বলাবিল 'ইলম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২১

৩৪. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২২২

৩৫. ঈমানের শাব্দিক অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামে ঈমানের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। ঈমানের পরিচয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, ঈমানের শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা (ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৩৭৯হি.খ. ১, পৃ.৬০)। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহ) বলেন, ঈমানের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে। ঈমানের পারিভাষিক অর্থ- আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, ঈমান হলো হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়ন নাম। 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল' এই সাক্ষ্য প্রদান করা ইলামের প্রধান ও মূল ভিত্তি। ইসলামের অবশিষ্ট সকল ভিত্তি এবং ইসলামি জীবন দর্শনের সকল নীতি, আদর্শ, বিধি-বিধান, জীবন-দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি সকলকিছু সুনির্দিষ্টভাবে এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈমানে আল্লাহ তা'আলা একমাত্র উপাস্য এবং মুহামম্দ (সা.) তাঁর রাসূল' এই সাক্ষ্যের সাথে সাথে আরো কয়েকটি বিশেষ সাক্ষ্য দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا

পারলৌকিক মুক্তি ইত্যাদি সবকিছুর সফলতা প্রকৃত অর্থে ঈমানের বিশুদ্ধতার উপরই নির্ভরশীল। ঈমান না থাকলে একজন মানুষের সবকিছুই বিনষ্ট হয়ে যায়। আখেরাতের জীবন তার অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে। জাহান্নামের স্থায়ী আগুনে নিপতিত হবে। তাই একজন শিশু-কিশোর জীবনের শুরুতেই পিতামাতা, অভিভাবক ও সমাজ থেকে ঈমানের শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রাখে। কারণ প্রত্যেক মানব সন্তান সত্য গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও পিতামাতা ও সমাজই তাকে ভিন্ন ধর্মের অনুসারী বানায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ সম্পর্কে বলেছেন, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ–অর্থাৎ- "প্রত্যেক মানব সন্তানই ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে। যেমন চতুষ্পদজন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে (জন্মগত) কানকাটা দেখেছ?"[৩৬]

উল্লিখিত হাদীস থেকে সহজেই বুঝা যায় যে, শিশু-কিশোরের ঈমান সংক্রান্ত শিক্ষা পাবার অধিকার মহান আল্লাহ প্রদত্ত মৌলিক অধিকার। এ অধিকারের আলোকে তাদেরকে ঈমানের মৌলিক জ্ঞান প্রদান না করলে পিতামাতা, অভিভাবক ও সমাজ এর জন্য দায়ী থাকবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) অপর এক হাদীসে বলেন, افتحوا على صبيانكم أوّل كلمة بلا إله إلاّ الله–ولقّنوهم عند الموت لا إله إلاّ الله– অর্থাৎ- "তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রথম কথা শুরু করবে এই বলে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' এবং মৃত্যুর সময়ও পাঠ করাবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'।"[৩৭] তাই ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমান সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার প্রত্যেক শিশু-কিশোরের জন্মগত অধিকার।

৯। 'ইবাদত অনুশীলনের অধিকার

একজন আদর্শ মানুষ গঠন ও অপরাধ প্রতিরোধে 'ইবাদতের সক্রিয় প্রভাব রয়েছে। 'ইবাদত বলা হয় বিনয় ও নম্রতাসহকারে আল্লাহর আনুগত্য করা। তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করার নামই 'ইবাদত।[৩৮] ইসলামের মৌলিক 'ইবাদত যথাক্রমে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত

وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ– অর্থাৎ-"মুমিনরা প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরেশতার প্রতি, তাঁর আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে) 'রাসূলগণের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না" (আল-কুরআন, ২: ২৮৫)।

৩৬. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাযিয, বাব: মা কিইলা ফি আওলাদিল মুশরিকিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৮৫; ইমাম হাফেজ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল কাদর, বাব: মা'আনা কুল্লি মাওলুদি ইউলাদু আলাল ফিতরাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৫৮

৩৭. ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *আল-জামি' লি-শু'আবিল ঈমান*, অনুচ্ছেদ: হুকমুল আওলাদ ওয়াল আহলিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮২৮২

৩৮. ড. ইউসূফ হামিদ আল-'আলিম, *আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ: আদ-দারুল 'আলামিয়াহ লিল কিতাবিল ইসলামি, ১৪১৫হি,), পৃ. ২৩৪

প্রত্যেকটিই মানুষের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, সালাত মহান আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাহদের গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা সৃষ্টি করে। যা তাদেরকে অপরাধমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধা দেয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ-অর্থ: "নিশ্চয়ই সালাত অশালীন ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৩৯] তাই সন্তানকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখার জন্য 'ইবাদতের অনুশীলনের অভ্যাস করানো উচিৎ।

মাতা-পিতা, অভিভাবক ও সমাজে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে শৈশবকাল থেকেই একজন শিশু-কিশোর সালাত, সিয়ামসহ ইসলামের মৌলিক 'ইবাদতসমূহ অনুশীলনে অভ্যস্ত হতে পারে। এরকম একটি শিক্ষা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী থেকেও পাওয়া যায়। ইবাদতে অভ্যস্ত করানোর জন্য অভিভাবকদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনে প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন। হযরত আমর ইবনে শুআইব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম (সা.) বলেন, مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ-অর্থাৎ-"তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছরে পদার্পন করলে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিবে। দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তাদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যবস্থা করবে।"[৪০] রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদীস থেকে শিশু-কিশোরদের ইবাদত অনুশীলনের অধিকার প্রমাণিত হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশু-কিশোররা 'ইবাদতের মুখাতেব না হওয়া সত্ত্বেও তাদের ইবাদতে অভ্যস্ত করানোর নির্দেশ প্রদান করেছেন। যাতে সে আল্লাহর এবাদতের মাধ্যমে অপরাধ থেকে দূরে থাকতে পারে।

১০। নৈতিক শিক্ষার অধিকার

শিশু-কিশোরের নৈতিকতা উন্নয়নে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনস্বীকার্য; তবে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। পিতামাতাসহ সমাজের সকলের কর্তব্য হলো নিজেরা অনৈতিকতা পরিহার করে শিশু-কিশোরদেরকে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা। কারণ মা-বাবা এবং পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ সদস্যরা নীতি-নৈতিকতা মেনে চললে এবং শিশু-কিশোরদেরকে তা অনুকরণ করে মেনে চলতে শিখালে তারাও একসময় নৈতিক ও মানবিক হয়ে উঠবে। শিশুদের নৈতিক শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ- অর্থাৎ-"পিতা তার নিজের সন্তানকে যা কিছু দান করেন তার মধ্যে সর্বোত্তম

৩৯. আল-কুরআন, ২৯: ৪৫

৪০. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাব: আসসালাত, বাব: মাতা ইউমারুল গুলামু বিসসালাত প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৯৫

হলো ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।"[৪১] এ হাদীসে পিতামাতার পক্ষ হতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম দান হিসেবে নৈতিক মূল্যবোধকে বুঝানো হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, নৈতিকতার শিক্ষা পাওয়া শিশু-কিশোরের অন্যতম অধিকার। কারণ, নৈতিকতা ও উত্তম শিক্ষা তাকে আজীবন সঠিক পথ দেখাবে। এজন্য শিশুদের সব সময় উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, أَكْرِمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ– অর্থ: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাথে কোমল আচরণ কর এবং তাদেরকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।"[৪২] অতএব শিশু-কিশোরদেরকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের অবশ্যকর্তব্য।

১১। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অধিকার

শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের অধিকার একটি সাংবিধানিক অধিকার। প্রত্যেক শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ এবং পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। এটি বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বলা হয় যে, শিশুর শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র গণমাধ্যমের কর্মকাণ্ড গুরুত্বের সাথে স্বীকৃতি দিয়ে শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও বিষয়বস্তু শিশুর সামনে তুলে ধরবে। বিশেষ করে সেসব তথ্য ও বিষয় যা শিশুর সামাজিক-আত্মিক কল্যাণ করবে এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেও বিকাশ সাধন করবে।[৪৩] শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খাদ্যের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ইসলাম শিশুকে মায়ের দুধপান করানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এছাড়া ইসলাম শিশুর মানসিক বিকাশে তার সাথে খেলা-ধুলা করা, উত্তম আচরণ করা এবং উত্তম আখলাক শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

১২। শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অধিকার

শিশুর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টিগত অধিকার তার অন্যতম মৌলিক অধিকার। এ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে জতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বলা হয়েছে, শিশুর সর্বোচ্চ মানের স্বাস্থ্য, রোগের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের সুবিধা লাভের অধিকার পাবে। এধরনের সেবার অধিকার থেকে কোন শিশু যেন বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র

৪১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল বিররি ওসসিলাতি আন রাসূলিল্লাহে (সা.), বাব: মা যাআ ফি আদাবিল ওলিদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৫২; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, মুসনাদুল মাক্কিয়ীন, বাব: ১৩ (বৈরুত: মাওসুসাতুর রিসালাহ, ১৪১৬হি.), হাদীস নং- ১৪৮৫৬;

৪২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুল আদাব, বাবু বিররিল ওয়ালিদি ওয়াল ইহসানি ইলাল বানাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৬৭১

৪৩. *Convention on the Rights of the Child, CRC,1989,* Ibid, Article: 17,

সর্বাত্মক চেষ্টা করবে।[৪৪] ইসলাম শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খাদ্যের গুণগত মানের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا- فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا- وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا- وَحَدَائِقَ غُلْبًا- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا- مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-

অর্থ: "মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই তার জন্য চমৎকারভাবে বিপুল পানি বর্ষণ করি, এরপর আমি সুন্দরভাবে জমিকে (ফসল ফলানোর জন্য) ছিদ্র ছিদ্র বা, বিদীর্ণ করে দেই, তারপর সে জমিতে আমি ফসল উৎপন্ন করি, উৎপন্ন করি আঙুর, সবজি, যায়তুন, খেজুর। অনেক গাছগাছালিতে ভরা বাগান, আরো উৎপন্ন করি নানা রকম ফল এবং গবাদির খাদ্য। এগুলো তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর ভোগের জন্য উৎপন্ন করি।"[৪৫] আল-কুরআনে আরো ঘোষণা হয়েছে, فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ- অর্থাৎ-"এরপর সে পানি দিয়ে আমি তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি। বাগানগুলোতে তোমাদের জন্য রয়েছে বিপুল ফল–ফলাদি। সেখান থেকে তোমরা আহার করে থাক।"[৪৬] উল্লিখিত আয়াতের আলোকে বলা যায়, ইসলাম শিশুর পুষ্টিকর খাবারের নিশ্চয়তার জন্য বিশেষভাবে তাকিদ দিয়েছে। কারণ মানব জীবনের ভিত্তি হচ্ছে শৈশব-কৈশোর। এ সময়ে যদি দেহ ও মনকে রোগমুক্ত রাখা যায়, তাহলে পরিণত বয়সে সে একজন সুস্থ মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করতে পারবে। এজন্য ইসলাম শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের প্রথম সোপান হিসেবে মাতৃদুগ্ধকে চিহ্নিত করেছে।

১৩। চিকিৎসা ও পরিচর্যার অধিকার

চিকিৎসা ও পরিচর্যার অধিকার প্রত্যেক মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। একজন শিশুও এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। ইসলাম যেমন এ অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে; তেমনি দেশীয় আইন ও আর্ন্তজাতিক সনদেও এ অধিকারের কথা দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু সনদে বলা হয়েছে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচর্যা, শারীরিক, মানসিক চিকিৎসায় নিয়োজিত শিশুকে দেয়া চিকিৎসা ও তারসাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পারিপার্শ্বিক বিষয়কে নিয়মিত পর্যালোচনার অধিকার পাবে।"[৪৭] চিকিৎসা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারের কথা উল্লেখ করে সংবিধানের ১৮/১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট

৪৪. *Ibid,* Article: 24
৪৫. আল-কুরআন, ৮০: ২৪-৩২
৪৬. আল-কুরআন, ২৩: ১৯
৪৭. *Convention on the Rights of the Child, CRC,1989,* ibid, Article: 24

অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।[৪৮]

রোগব্যাধি থেকে সতর্কতা অবলম্বনে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। রোগ প্রতিরোধ রোগ নিরাময় থেকে শ্রেয়। তাই ইসলাম জন্মগতভাবে মানুষের যেসব মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা তন্মধ্যে অন্যতম। মানবতার ধর্ম হিসেবে ইসলাম রোগের চিকিৎসা এবং সেবা পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) রোগীর সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, قَالَ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ-অর্থ: "তোমরা ক্ষুধার্তকে খাবার দাও, রোগীকে সেবা কর এবং কয়েদীকে মুক্ত কর।"[৪৯] রোগীর সেবা সম্পর্কে অপর এক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُودَ الْمَرِيضَ وَنُفْشِيَ السَّلَامَ-

অর্থাৎ-বারায়া ইবন 'আযেব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সাতটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন: সোনার আংটি, মোটা-পাতলা ও কারুকার্য খচিত রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে এবং কাসী ও মীসারাগ কাপর ব্যবহার করতে। আর তিনি আমাদের আদেশ করেছেন: আমরা যেন জানাযার পশ্চাতে যাই, পীড়িতের সেবা করি এবং বেশি বেশি সালাম করি।"[৫০] তাই সাধারণ রোগীর সেবা করা যেমন সকলের কর্তব্য তেমনি শিশুর সেবা ও চিকিৎসা করানোও সামর্থ্যবানদের নৈতিক দায়িত্ব।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিভিন্ন রোগ-বালাই মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আসে এবং এসব রোগ-বালাইয়ের প্রতিষেধক এবং ঔষধও তিনি দিয়েছেন। চিকিৎসা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ-অর্থ: "হে আল্লাহর বান্দাগণ! ঔষধ (চিকিৎসা) গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা বার্ধক্য ছাড়া এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার সাথে শিফা পাঠাননি।"[৫১] রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন ধরনের রোগ-বালাই থেকে নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা ও ঔষধ গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করে বলেন, مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ

৪৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ: ১৮(১)

৪৯. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: মারদা, অনুচ্ছেদ: উজুবি ইয়াদাতিল মারিদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৬৪৯

৫০. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ৫৬৫০

৫১. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুত-তিব, বাব: মা আনযালাল্লাহু দায়া ইল্লা আনযালা লাহু শিফা', প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৪৩৬

لَهٗ شِفَاءً-অর্থ: "আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার নিরাময় তিনি সৃষ্টি করেননি।"[৫২] তাই ইসলাম চিকিৎসা লাভের অধিকারকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসাবে নিশ্চিত করেছে। শিশু-কিশোরের সুস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এটা ইসলামি সমাজের মৌলিক দায়িত্ব।

১৪। বাসস্থানের অধিকার

বাসস্থানের অধিকার প্রত্যেক মানব সন্তানের মৌলক অধিকার। বাসস্থান বা গৃহ এমন জায়গা যেখানে মানুষ শান্তি ও ভালবাসা খুঁজে পায়। বাহিরের প্ররিশ্রম ও ক্লান্তি দূর করতে বাসস্থানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এখানেই সে রাতের বিশ্রামসহ জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে। তাই ব্যক্তিজীবনে বাসস্থানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আল্লাহ তা'আলা ঘরকে নি'আমত হিসেবে মানুষের নিরাপদ আশ্রয় ও বিশ্রামস্থলরূপে দান করেছেন। পবিত্র কুরআনে গৃহের গুরুত্ব বর্ণনা করে এরশাদ করা হয়েছে; وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ অর্থাৎ-"তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে।"[৫৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يايُّها الَّذِيْن امنُوْا لاتدْخُلُوْا بُيُوْتًا غيْر بُيُوْتِكُمْ حتّٰى تسْتانِسُوْا وتُسلِّمُوْا على اهْلِها অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া আর কারো ঘরে ঘরের অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না।"[৫৪] তাই বাসস্থানের অধিকার মহান আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম সর্বজনীন অধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫/ক অনুচ্ছেদে বাসস্থানের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রকে এ মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।[৫৫] জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বলা হয়েছে, পিতামাতা কিংবা শিশুর দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সামর্থ্য ও সংগতি অনুযায়ী শিশুর উন্নয়নের জন্য উপযোগী জীবনযাপনের মান নিশ্চিত করা।

১৫। মাদক ও যৌন হয়রানি থেকে মুক্ত থাকার অধিকার

শিশু-কিশোররা যেকোন ধরনের মাদকাসক্তি, মাদক গ্রহণ, বহন, পাচার, কেনা-বেচা থেকে মুক্ত থাকার অধিকার রাখে। শিশু-কিশোরদেরকে মাদক সংশ্লিষ্ট কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি মাদক তৈরির কোন প্রক্রিয়ায়ও তাদেরকে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। শিশু আইন, ২০১৩ -এর তিনটি ভিন্ন ধারায় শিশু-কিশোরদের সাথে মাদক সংশ্লিষ্টতার অপরাধের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়। ৭২ নং ধারায় বলা হয়, শিশুদের দায়িত্বে থাকাকালে নেশাগ্রস্ত হবার অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০

---

৫২. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুত-তিব, বাব: মা আনযালাল্লাহু দায়া ইল্লা আনযালা লাহু শিফা', প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৬৭৮

৫৩. আল-কুরআন, ৩৩: ৩৩

৫৪. আল-কুরআন, ২৪: ২৭

৫৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ: ১৫/ক

(পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। আর ৭৩ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়, শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী মাদকদ্রব্য কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। ৭৪ নং ধারায় মাদকদ্রব্য কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানসমূহে প্রবেশের অনুমতিদানের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।[৫৬]

এছাড়া শিশু-কিশোর যৌন হয়রানিমূলক যে কোন আচরণ থেকে মুক্ত থাকবে। তাদের সাথে হয়রানিমূলক কোন আচরণ করা যাবে না, কোন যৌন পল্লীতে তাদেরকে যাবার অনুমতি, থাকার অনুমতি দেওয়া যাবে না। এসম্পর্কে শিশু আইনের ৭০ থেকে ৮৩ পর্যন্ত বিভিন্ন ধারায়, ৪ বৎসরের অধিক বয়সের কোন শিশুকে যৌনপল্লীতে থাকার বা গমনাগমনের সুযোগ বা অনুমতি প্রদান করা যাবে না। এ অপরাধের জন্য অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

১৬। বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের জন্য ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অধিকার

সমাজের প্রত্যেকটি শিশু-কিশোর ক্রীড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অধিকার পাবে। কারণ শিশু-কিশোরের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং মনোজাগতিক উন্নয়নের জন্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চার বিকল্প নেই। শিশু-কিশোরের শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য অভিভাবক, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চার ব্যবস্থা করা, দেশীয় খেলা-ধুলা যেমন, হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, কানামাছি, বৌচি, ফুটবল ও ক্রিকেটসহ প্রতিটি খেলা-ধুলার ব্যবস্থা করা। খেলা-ধুলা একদিকে যেমন শরীর ও মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশে যথার্থ ভূমিকা পালন করে, তেমনি অন্যদিকে শিশু-কিশোরকে অপরাধ ও বিচ্যুত আচরণ হতেও দূরে রাখে। খেলা-ধুলা শারীরিক শক্তি এবং শরীরে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। খেলা-ধুলার গুরুত্ব বর্ণনা করে আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেন, كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ لَهْوٌ أَوْ سَهْوٌ إلا أَرْبَعَ خِصَالٍ : مَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ ، ومُلاعَبَةُ أَهْلِهِ ، وَتَعَلُّمُ السِّبَاحَةِ–অর্থ: "আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত সকল কিছু খেলা-তামাশা ও উদাসীনতা। তবে চারটি জিনিস এর ব্যতিক্রম। (১) দু'টো লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে টার্গেট করে ব্যক্তির চলা অর্থাৎ তীর নিক্ষেপ করা (২) ঘোড়া চালনা

৫৬. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৭৪

শিক্ষা দেওয়া, (৩) স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টা করা এবং (৪) সাতার শেখা।"[৫৭] এ হাদীস থেকে প্রয়োজনীয় খেলা-ধুলার গুরুত্ব অনুমেয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ-অর্থ: "(হে মুমিনগণ!) কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্য তোমরা সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত রাখবে।"[৫৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত আছে যে,

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ -أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ-

অর্থ: উকবা ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "(হে মুমিনগণ) কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্য তোমরা সাধ্যমত শক্তি প্রস্তুত রাখবে। তোমরা জেনে রাখ, তীরন্দাজীই (তীর নিক্ষেপ করা) শক্তি, তীরন্দাজীই (তীর নিক্ষেপ করা) শক্তি, তীরন্দাজীই (তীর নিক্ষেপ করা) শক্তি, এটা তোমাদের উত্তম খেলা।"[৫৯] উকবা ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ-অর্থ: "অচিরেই বিভিন্ন এলাকা তোমাদের দখলে এসে যাবে এবং আল্লাহ তোমাদের তুষ্ট করবেন। কিন্তু তোমাদের কেউ যেন তীর-ধনুক নিয়ে খেলা করা পরিত্যাগ না করে।"[৬০]

হাদীস দু'টিতে দেখা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তীর-ধনুক নিয়ে খেলা করা পছন্দ করতেন এবং এটা পরিত্যাগ না করার পরামর্শ দেন। বর্তমানে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা খেলা-ধুলার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও খেলা-ধুলা করতে পারে না। তাছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত শরীর চর্চা শিক্ষক নেই। শরীর চর্চা শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশ স্কুল-কলেজেই শারীরিক কসরত শিখানো হয় না বরং শিক্ষক অন্যান্য কাজে ব্যস্ত সময় কাটায়। তাই খেলা-ধুলার অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যেক শিশু যেন খেলা-ধুলায় অংশ গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

১৭। সুস্থ পারিবারিক পরিবেশের অধিকার

সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ বলতে এমন পারিবারিক পরিবেশকে বুঝায়, যে পরিবারে একজন শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও বেড়ে ওঠার উপযুক্ত সুবিধাদি বিদ্যমান থাকে। একজন শিশুর মানসিক বিকাশ,

---

৫৭. হাফেজ আবূল কাসেম সুলাইমান ইবন আহমদ তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, জাবির ইবন উমর আনসারী (রা.) (বৈরুত: মাকতাবাতু ইবন তায়মিয়া, ১৪০৪ হি.), খ.২, হাদীস নং-১৭৮৫

৫৮. আল-কুরআন, ৮: ৬০

৫৯. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ইমারাত, বাব: ফাযলুর-রামী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯১৭

৬০. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-১৯১৮

শারীরিক সুস্থতা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী গড়ে উঠে পরিবার থেকে। পরিবার যদি শিশুর বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ দিতে না পারে সে ক্ষেত্রে শিশুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধিত নাও হতে পারে। তার মেধা, মনন ও সুকুমার বৃত্তি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়, যদি না পারিবারিক পরিবেশ শিশু উপযোগী হয়। মাতা-পিতা হলেন সন্তানের আদর্শ। পরিবারের প্রধান মা-বাবা থেকেই সন্তানেরা সামাজিকীকরণের শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের মনোজাগতিক বিকাশ সাধিত হয়। পারিবারিক কলহ বিশেষ করে পিতা-মাতার মনোমালিন্য, ঝগড়া-ঝাটি কিংবা দ্বন্দ্ব সন্তানদের উপর সরাসরি প্রভাব সৃষ্টি করে। এ জন্য পিতা-মাতার কর্তব্য হলো তাদের সাংসারিক ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন অমিল শিশু সন্তানদের সামনে প্রকাশ না করা। কেননা এতে সন্তানের মনোজগতে প্রভাব ফেলে এবং সে বাবা-মা ও পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারিয়ে ফেলে।

১৮। সুস্থ বিনোদনের অধিকার

সুস্থ বিনোদন শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পাশাপাশি অসুস্থ ও অশ্লীল বিনোদন তার সুস্থ বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং মানসিক বিকৃতি সৃষ্টি করে। তাই জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৩১নং অনুচ্ছেদে শিশু-কিশোরের বিনোদনের অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।[৬১] অতএব সুস্থ বিনোদন শিশুর মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। শিশুর বিনোদনের জন্য পরিবারের অভিভাবক গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে পারেন। পিতামাতা নিজের শিশু-সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া এবং তাদের সাথে বিভিন্ন খেলা-ধুলায় মেতে উঠা। যেমন- উপকারী খেলা-ধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আনন্দ ভ্রমণ, পারিবারিক আড্ডা প্রভৃতি হতে পারে সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম।

১৯। শিশুর অবহেলা ও অপব্যবহার থেকে নিরাপদ থাকার অধিকার

পিতামাতার কর্তব্য হলো শিশুদেরকে অযত্ন বা অবহেলা না করা। আদর-স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে সবকিছু শিক্ষা দেওয়া। সামান্য কারণে সন্তানকে বকাঝকা বা গালমন্দ অথবা শারীরিক প্রহার না করে তাকে সে আচরণ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। কারণ পিতামাতার নিষ্ঠুরতা ও অবহেলা শিশুর ভবিষ্যত অন্ধকার করে দিতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর মা মারা যাওয়ার কারণে পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী বা সৎ মা তার নিজের সন্তানের তুলনায় এই শিশুর প্রতি অনাদর ও অবহেলা দেখায়; এমনকি শারীরিক নির্যাতনও করে থাকে। শিশুর প্রতি পিতামাতার যে কোন ধরনের নিষ্ঠুরতা, অনাদর বা অবহেলায় শিশুর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাই অযত্ন অবহেলা নয় বরং আদর-স্নেহ-ভালবাসায় পরিপূর্ণ হবে একটি পরিবার এমনিই ইসলামের শিক্ষা।

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে রাষ্ট্রকে শিশুর উপর আঘাত বা অত্যাচার, অবহেলা বা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার বা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সব রকমের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য

---

৬১. *Convention on the Rights of the Child*, ibid Article:31

যথাযথ আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব আরোপ করে। উক্ত সনদের ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় "রাষ্ট্র, পিতামাতা, আইনানুগ অভিভাবক বা শিশু পরিচর্যায় নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকা অবস্থায় শিশুকে আঘাত বা অত্যাচার, অবহেলা বা অমনোযোগী আচরণ, দুর্ব্যবহার বা শোষণ এবং যৌন অত্যাচারসহ সব রকমের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য যথাযথ আইনানুগ, প্রশাসনিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত ব্যবস্থা নেবে।"[৬২] অতএব জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে বলা যায় যে, শিশু-কিশোররা যে কোন ধরনের অবহেলা ও অপব্যবহার থেকে নিরাপদ থাকার অধিকার রাখে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সর্বোপরি বলা যায় যে, শিশু-কিশোর মানব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু তারাই আবার সবচেয়ে অসহায় ও দুর্বল। তাই মানব সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার প্রয়োজন রয়েছে। এসকল দিক বিবেচনায় ইসলামি শরী'আতে ও বিশ্বের বিভিন্ন আইনে শিশুদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। ইসলামি শরী'আহ, বিভিন্ন আইনে উল্লিখিত অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করেই শশু-কিশোরকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

কিশোরের দায়িত্ব-কর্তব্য

কিশোর পরিবার ও সমাজের অন্যতম প্রভাববিস্তার কারী সদস্য। তাই পিতামাতা, পরিবার, অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্রের কিশোরদের প্রতি যেমনি দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তেমনি কিশোরদেরও রয়েছে পিতামাতা, পরিবার, অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অনেক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। নিম্নে কিশোরদের দায়িত্ব-কর্তব্য উল্লেখ করা হলো-

১। পিতামাতার প্রতি কর্তব্য

কিশোরের সবচেয়ে গভীর ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় সম্পর্ক হলো তার পিতামাতার সাথে। তাই তার কর্তব্যের সর্বপ্রথম হকদার ব্যক্তিত্ব হলেন পিতামাতা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর পরেই পিতামাতার হকের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য উল্লেখ করে বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا– وَاخْفِضْ لَهُمَا

৬২. *Ibid*, Article:19

وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ–অর্থাৎ-"(হে রাসূল!) আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কারো ইবাদাত না করতে এবং মাতাপিতার সাথে সদাচারণ করতে। মাতাপিতার মধ্যে একজন অথবা তারা দু'জনই বৃদ্ধ হয়ে গেলে (অবহেলা, উপেক্ষা, ক্রোধ ও বিরক্তিতে) তাদেরকে 'উহ' বলো না, তাদেরকে ধমক দিবে না। তাদের সঙ্গে সম্মানের সাথে কথা বল। ভালবাসা ও শ্রদ্ধায় তাদের জন্য বিনয়ে দু'বাহু বিছিয়ে (বাড়িয়ে) দাও। তাদের জন্য প্রার্থনা করে বল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমার মা-বাবার উপর দয়া করুন, যেভাবে শৈশবে তারা আমার উপর দয়া করেছিলেন।"[৬৩]

পিতামাতার সেবা যত্ন করা, তাদের আনুগত্য করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসেও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ– অর্থ: "আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ পিতামাতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে হয়ে থাকে।"[৬৪] পৃথিবীতে মানব সন্তানের উত্তম আচরণ বা সদাচরণের প্রথম ও প্রধান হকদার পিতামাতা। তাঁদের সাথে সুন্দর ও মার্জিত আচরণ করাকে ইসলাম সন্তানদের উপর ফরজ করে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا "আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সুন্দর আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি।"[৬৫] আয়াতে ব্যবহৃত 'حُسْن' শব্দটি ধাতু। এর অর্থ সৌন্দর্য। এখানে সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্যবহারকে অতিশায়র্থে 'حُسْن' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।[৬৬] অন্য মতে, 'حُسْن' মানে نهاية البر 'চরম পর্যায়ের ও পরম মানের সর্বোত্তম ভাল কাজ করা, ভাল ব্যবহার করা।[৬৭] সুতরাং আচরণের সর্বোত্তম ব্যবহারই সদ্ব্যবহার বা সদাচরণ। ইমাম কুরতুবী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের 'ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরজ করেছেন।[৬৮]

অপর এক হাদীসে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ –
অর্থ: আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন, সময় হলে নামাজ পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এরপর

৬৩. আল-কুরআন, ১৭: ২৩-২৪
৬৪. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল বিররি ওয়াস সিলাহ আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব: মা যায়া মিনাল ফাযলে ফি রিযাল ওয়ালিদাইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৮৯৯
৬৫. আল-কুরআন, ২৯ : ৮
৬৬. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, মওলানা মুহিউদ্দিন খান অনূদিত (মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রন প্রকল্প, হিজরী-১৪১৩হি,), পৃ. ১০২৫
৬৭. মওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৯৬খ্রি.),পৃ. ৩৬০
৬৮. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৭১

কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার।[৬৯] পিতামাতার প্রতি সন্তানের সদাচরণের গুরুত্ব বর্ণনা করে জনৈক সাহাবীর- সন্তানের উপর তাদের পিতামাতার অধিকার কী? -এ প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ–অর্থাৎ-"পিতামাতাই হলো তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।"[৭০] অর্থাৎ পিতামাতার সেবাযত্ন ও মনোতুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই জান্নাত লাভ করা যাবে। আর বিপরীত দিকে তাঁদের অসন্তুষ্টি ও তাদের প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা সন্তানের জন্য জাহান্নামের কারণ হবে। তাই সর্বদা পিতামাতার সাথে উত্তম আচরণ করা সন্তানের জন্য সর্বোত্তম কর্তব্য। এমনকি দুর্ভাগ্যক্রমে পিতামাতা যদি অমুসলিম হয়, তাহলেও সে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে। সর্বোপরি পার্থিব বিষয়ে তাঁদের আনুগত্য প্রদর্শন করবে এবং শিরক ও কুফরী ব্যতীত অন্যান্য ব্যাপারে যেন মনোকষ্টের কারণ না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

সৃষ্টির অমোঘ বিধান অনুযায়ী একসময় মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হয়ে সন্তানের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। তাঁদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এসময় তাঁরা সাধারণত সবার সঙ্গ চায়, সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে চায়, সন্তানের নিকট হতে বিশেষ সেবা ও যত্ন প্রত্যাশা করে। ইসলাম পিতামাতা অসুস্থ হলে, তাঁদেরকে সেবা ও যত্ন দিয়ে সুস্থ করে তোলা এবং সাধ্যমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, অবনত মস্তকে রোগগ্রস্ত পিতামাতার পরিচর্চা করা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাঁদেরকে সাহচর্য দেওয়ার জন্য সন্তানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তাফসীর ও হাদীসবিদ তাবেয়ী মুজাহিদ বলেন, "পিতামাতা তোমার সামনে বার্ধক্যে পৌঁছলে তাঁদেরকে ময়লার মধ্যে ফেলে রাখবে না এবং যখন তাঁদের পায়খানা-পেশাব সাফ করবে তখনও তাঁদের প্রতি কোনরূপ ক্ষোভ দেখাবে না, অপমানকর কথা বলবে না, যেমন করে তাঁরা শিশু অবস্থায় তোমার পেশাব-পায়খানা সাফ করত, ঠিক তেমনি দরদ দিয়ে তা পরিষ্কার করবে।"[৭১] কেননা পিতামাতার সেবাযত্ন করার মধ্যে সন্তানের জন্য কল্যাণ রয়েছে, রয়েছে জান্নাতে প্রবেশের উপলক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) পিতামাতার সেবা-যত্নের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, رَغِمَ اَنف ثُمَّ رَغِمَ اَنف ثُمَّ رَغِمَ اَنف مَن اَدرَكَ اَبوَاهُ عِندَ الكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَو كِلَاهُمَ فَلَم يَدخُلِ الجَنَّةَ– অর্থ: "যে লোক তার পিতামাতা দু'জনকেই কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ তাঁদের

৬৯. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ ওসসাইনাল ইনসানা বি ওয়ালিদিহি হুসনা , প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৯৭০

৭০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুত আদাব, অনুচ্ছেদ: বিররুল ওয়ালিদাইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৬৬২

৭১. ইমাম আবু হাজ্জাজ মুজাহিদ বিন জাবির, *তাফসীরু আল-ইমাম মুজাহিদ*, তাহকীক: ড. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম (ইসলামাবাদ: মুজমাউল বাহুছিল ইসলামিয়াহ, ১৯২১খ্রি.), খ. ১,পৃ. ৩৬০; আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন কাছির, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম* (বৈরুত: দারুত তয়্যিবাহ লিলনশর ওয়াত তাওযী, ১৪২০ হি.), খ. ২,পৃ.২৮৪

খেদমত করে জান্নাতবাসী হওয়ার অধিকারী হলো না, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, তার নাক ধুলায় মলিন হোক, অর্থাৎ তার মত হতভাগ্য আর কেউ নাই।”[৭২]

বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। এছাড়া এ সময় তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতামাতার বাসনা এবং দাবী দাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে এমতাবস্থায় পিতামাতার মনোতুষ্টি ও সুখশান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করে দিয়েছেন যে, আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, একসময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন তাঁদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য ত্যাগ করেছেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহমমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এ দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের সাথেও সেরকম আচরণ কর, যেরকম তাঁরা তোমাদের শৈশবে করেছে।

পিতামাতার সাথে বার্ধক্য বয়সে কিংবা জীবনের কোন অবস্থায়ই অসৌজন্যমূলক কোন আচরণ করা যাবে না। সন্তানের কথাবার্তায় ও ব্যবহারে এমন কোন অনমনীয়ভাব প্রকাশ করা যাবে না যাতে তাঁদের মনে কষ্ট বা আঘাত লাগতে পারে। তাঁদের সামনে কোনরকম বিরক্তিভাব প্রকাশ বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না। এমনকি তাঁদের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলাও আদবের খেলাফ। তাঁদের সামনে সন্তান তার কষ্টের কারণে ‘উহ’ শব্দটিও উচ্চারণ করবে না। আয়াতে উল্লিখিত উহ ‘أُفٍّ’ শব্দটি বলে এমন শব্দ বোঝানো হয়েছে যার দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধ দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত।[৭৩] অর্থাৎ যে কথায় পিতামাতার সামান্য কষ্ট হয়, এমনকি সন্তানের কষ্টের কথা শুনে তাদের কষ্ট হবে এমন কথাও নিষিদ্ধ। আর তাঁদের সাথে ধমক দেওয়া ও ধমকের সূরে কথা বলা, বেআদবী সূচক আচরণ করা ইসলাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। অনেক সময় সন্তান উত্তেজিত হয়ে পিতামাতার সাথে উচ্চ-বাচ্য ও রূঢ় আচরণ করে থাকে, এমনকি তাঁদেরকে গালমন্দও দিয়ে থাকে। ইসলাম এটাকে গর্হিত কাজ ও কবীরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং তা হতে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ – অর্থাৎ-“কারো নিজের পিতামাতার উপর অভিসম্পাত করাও সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ। সাহাবীগণ একথা শুনে বললেন, পিতামাতাকেও কেউ গালাগাল করে নাকি হে রাসূলুল্লাহ (সা.)? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এক ব্যক্তি

৭২. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাত ওয়াল আদাব, বাবঃ রাগেমা আনফু মান আদরাকা আবওয়াইহি ফালাম ইয়াদখুলিল-জান্নাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৫১

৭৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৭২

অপর ব্যক্তির পিতাকে গাল দেয়, প্রত্যুত্তরে সেও প্রথম ব্যক্তির পিতাকে গাল দেয়, এমনিভাবে কেউ অপর ব্যক্তির মাতাকে গাল দেয়, সেও প্রথম ব্যক্তির মাতাকেই গাল দেয়।”[৭৪]

পৃথিবীতে পিতামাতাস ন্তানের পরম গুরুজন। বয়জ্যেষ্ঠতা, অভিজ্ঞতায় এবং জ্ঞান-গড়িমায় তাঁরা সন্তানের চেয়ে অগ্রজ। মহান আল্লাহর পড়েই এই পৃথিবীতে তাঁদের সম্মানের অবস্থান। এজন্য সন্তানের কর্তব্য হলো পিতামাতার সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখানো এবং আনুগত্য প্রকাশ করা। তাঁদের আদেশ নিষেধ মান্য করা, তাঁদের অবাধ্য না হওয়া, তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া। হাদীস শরীফে এসেছে, একদা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) দু’ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তাঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি তোমার কি হন? সে বলল, ইনি আমার পিতা। তখন আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, “সাবধান, তাঁকে কখনও নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর আগে চলবে না এবং তাঁর বসার পূর্বে তুমি বসবে না।”[৭৫]

পিতামাতার আনুত্যের ফযিলত বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতামাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দু’টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাঁদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দু’টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতামাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতামাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? উত্তরে তিনি তিন বার বলেন, وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ–অর্থ: “পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবুও, পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবুও, পিতামাতা যদি সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবুও।”[৭৬] কোন কোন বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব এবং কোন বিষয়ে আনুগত্য না করার অবকাশ আছে, এর ব্যাপারে আলিম ও ফোকাহবিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গুনাহের কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েজ ও নয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا–অর্থ: “তোমার পিতামাতা যদি তোমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে চাপ দেয়, যাকে শরীক করা সম্পর্কে তোমার নিকট নিশ্চিত কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাঁদের আনুগত্য কর না।”[৭৭]

পিতামাতার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও সন্তানের অন্যতম কর্তব্য। ইসলাম মানব সন্তানকে তাদের পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বর্ণনা করা

---

৭৪. ইমাম আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৫৯৭৩

৭৫. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদঃ ছিল্ মান কানা আবুকা ইয়াছিলু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৬৬৩

৭৬. ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *শু‘আবুল ঈমান*, অধ্যয়ঃ ফি বিররুল ওলিদাইন, অনুচ্ছেদঃ সিলাতুর রেহমি (বৈরুতঃ দারুল ফিকর লিতত্ববাআতে ওয়ান নুশুর ওয়াত তাওযী‘, ১৪২৪হি./২০০৪খ্রি.), খ. ৬, হাদীস নং- ৭৯১২

৭৭. আল-কুরআন, ৩১ : ১৫

হয়েছে, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ-"কাজেই তোমরা আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৭৮] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের 'ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরজ করেছেন এবং পিতামাতাকে মান্য করা ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিশেষ তাকিদ দিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার এবাদতের পর পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও সন্তানের জন্য ওয়াজিব। অধিকন্তু ইসলাম মৃত্যুর পরেও পিতামাতার প্রতি সন্তানদের কর্তব্য আরোপ করেছে। পিতামাতার মধ্যে দু'জনে কিংবা কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সন্তানের কর্তব্য হলো, তাঁদের জন্য দু'আ করা, তাঁদের পরকালীন জীবনের জন্য কল্যাণ কামনা করা। মহান আল্লাহ মানব সন্তানকে এ দু'আ শিখিয়ে দিয়ে বলেন, رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا অর্থ: "হে আমাদের প্রভূ! তাঁদের প্রতি কল্যাণ ও রহমত বর্ষণ করুন যেমনি তাঁরা শৈশবে আমাদেরকে করেছেন।"[৭৯] রাসূলুল্লাহ (সা.) পিতামাতার মৃত্যুর পরে তাঁদের প্রতি সন্তাদের কর্তব্য উল্লেখ করে বলেন,

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا-

অর্থ: আবূ উসাইদ মালিক ইবন রাবী'আ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা.)-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় বনী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর এমন কোন আচরণ অবশিষ্ট আছে যা আমি তাঁদের সাথে করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের জন্য দু'আ ইস্তেগফার কর, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন কর এবং তাঁদের বন্ধুবান্ধবকে সম্মান কর এবং সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, যে সম্পর্ক শুধু তাঁদের বন্ধনের কারণেই রক্ষা করা হয়ে থাকে।[৮০]

সর্বোপরি ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে সন্তান যেন সর্বদা পিতামাতার জন্য বিনয়ের দু'বাহু প্রশস্ত করে দেয়। সবসময় বিনয়ের সাথে তাঁদের সেবায় নিয়োজিত থাকে, কোন সময়ই তা থেকে বিরত না থাকে। কোন সেবা করেই অহংকার বোধ না করে এবং পিতামাতার উপর অনাগ্রহ দেখাবার চেষ্টা না করে এমন ভাব করবে যে, যেটুকু খেদমত করেছে তা মোটেও যথেষ্ট নয়, আরও বেশী খেদমতের প্রয়োজন এবং এটা তার কর্তব্য। আর সন্তান

৭৮. আল-কুরআন, ৩১ : ১৪
৭৯. আল-কুরআন, ১৭ : ২৪
৮০. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৬৬৪

খেদমত করে পিতামাতার প্রতি কোন অনুগ্রহ করছে না, করছে কর্তব্য পালন। সর্বদা সন্তানের মনে পিতামাতার অপরিসীম স্নেহ-মমতার পাশাপাশি বার্ধক্য বয়সে তাঁদের অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষীতার কথা সদা-জাগ্রত থাকতে হবে। পিতামাতার জন্য শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মমতা সেবা ও আনুগত্যের নিজনিজ পাখা নম্রতাসহকারে নত করে দিতে হবে। তাঁদের সামনে নিজেকে সর্বদা অক্ষম ও হেয় করে পেশ করা; যেভাবে গোলাম প্রভূর সামনে করে থাকে। পিতামাতার সাথে এই আচরণ নিছক লোক দেখানো কিংবা সমাজিকতার জন্য হবে না; বরং আন্তরিক মমতা, ভালবাসা ও সম্মানের ভিত্তিতে হতে হবে।

২। ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য

ভাই-বোন অপার্থিব এক রক্ত সম্পর্ক। ইসলাম তাই সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপ্রিত্রেয় বা দুগ্ধ সম্পর্কীয় ভাই-বোনের প্রতি বিভিন্ন কর্তব্য পালনের বিধান জারি করেছে। বড় ভাই-বোনকে শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা, তাদের প্রাপ্য হক আদায় করে দেওয়া। বড়দেরকে শ্রদ্ধা এবং ছোটদেরকে স্নেহ ও আদর করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا – অর্থাৎ "যে ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান করে না সে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৮১] ভাই-বোন ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও কর্তব্য আরোপ করেছেন। এ অধিকারের কথা স্মরণ করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ অর্থাৎ- "আত্মীয়–স্বজনকে তাদের অধিকার আদায় করে দাও।"[৮২] এছাড়া তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করাও কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে এরশাদ করা হয়েছে, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ অর্থাৎ-"হে রাসূল! লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, তারা কী ব্যয় করবে। আপনি বলুন, কল্যাণকর যে ব্যয় তোমরা করবে, তা করবে মাতাপিতা ও নিকটাত্মীয়ের জন্য।"[৮৩] তাই ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা, তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের প্রাপ্য হক বুঝিয়ে দেওয়া প্রত্যেকে মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

৩। পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

ইসলাম সন্তানের উপর পিতামাতার হক এবং নিকট আত্মীয়দের হকের পাশাপাশি প্রতিবেশীর অধিকারের কথা উল্লেখ করেছে। ইসলামে প্রতিবেশীর চার ধরনের অধিকার আছে। সেগুলো হলো-(১) প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া, (২) প্রতিবেশীকে হেফাজত করা, (৩) প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করা, (৪) প্রতিবেশীর কঠোরতা ও

---

৮১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামে' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল বিররি ওসসিলাতি আন রাসূলিল্লাহে (সা.), বাবঃ মা যাআ ফি রাহমাতিছ-ছিবইয়ান, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-১৯২১

৮২. আল-কুরআন, ১৭: ২৬

৮৩. আল-কুরআন, ২: ২১৫

ক্ষতির বিপরীতে ধৈর্য্যধারণ করা।[৮৪] আল্লাহ তা'আলা পাড়া-প্রতিবেশীর অধিকারে কথা উল্লেখ করে বলেন, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا- অর্থাৎ-"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী–সাথী ও পথচারীদের সাথে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস–দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।"[৮৫]

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ নানা ধরনের প্রতিবেশীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামে তাদের সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা নিকট প্রতিবেশীর অর্থ এমন প্রতিবেশী যার সাথে প্রতিবেশী হওয়ার পাশাপাশি আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। দূর প্রতিবেশী অর্থ যার সাথে আত্মীয়তার কোন সম্পর্ক নেই, শুধু পাশাপাশি বসবাস করে এটুকুই তার সাথে সম্পর্ক। উল্লিখিত সকল প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য এ আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পাড়া-প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ–অর্থাৎ-"আর নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।"[৮৬] এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতিবেশীদের প্রতি অনুগ্রহ বৃদ্ধির জন্য উৎসাহিত করে বলেন, ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه– অর্থাৎ-"সে প্রকৃত মুমিন নয়, যে পেটপুরে আহার করে অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।"[৮৭] সুতরাং সর্বদা প্রতিবেশীর উপকার করা, তার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং কখনো কোন ক্ষতি না করা। প্রতিবেশীর স্ত্রী ও সন্তানাদি এবং তাদের মানসম্মানের সংরক্ষণ করা। সম্ভব হলে প্রতিবেশীর বাড়ীতে হাদিয়া প্রেরণ করা। এমনকি প্রতিবেশী দ্বারা কোন ক্ষতি হলেও সে সময় ধৈর্যধারণ করা কর্তব্য। পরিবারের বয়েজ্যেষ্ঠ, পিতামাতা পাড়া-প্রতিবেশীর প্রতি এ আচরণ করলে শিশু-কিশোরও তাদেরকে দেখে এ আচরণে অভ্যস্ত হবে।

৪। শিক্ষকগণের প্রতি কর্তব্য

ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া যেমন জরুরী, অনুরূপভাবে দীনি ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেমন শিক্ষক, সহপাঠী প্রমুখ ব্যক্তিদের হক আদায় করাও জরুরী। বস্তুত ইলমে দীনের বরকত হাসিল এ সকল হক আদায়ের উপরই নির্ভরশীল। ছাত্রদের জন্য শিক্ষক এক বিরাট নি'আমত। ছাত্রদের কাছে শিক্ষকের মর্যাদা ও

---

৮৪. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে সন্তান গঠন পদ্ধতি* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১০খ্রি.), পৃ. ২৩৬
৮৫. আল-কুরআন, ৪: ৩৬
৮৬. আল-কুরআন, ৪: ৩৬
৮৭. ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অধ্যায়: ২২, অনুচ্ছেদ: মা যায়া ফি কারাহিয়াতি এমসাকিল ফাযলি ওয়া গাইরিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৩৮৬

সম্মান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই উস্তাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ ও রাসূল (সা.) -এর পর মানুষের প্রতি সবচেয়ে বড় দানশীল ব্যক্তি হলেন উস্তাদ। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীগণকে প্রশ্ন করে বললেন,

هل تدرون من أجود جودا ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال الله أجود جودا ، ثم أنا أجود بني آدم ، وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشره يأتي يوم القيامة أميرا وحده أو قال أمة وحده –

অর্থাৎ-"তোমরা কি জান, সবচেয়ে বড় দানশীল কে? জবাবে সাহাবীগণ বললেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, সবচেয়ে বড় দানশীল হলেন, আল্লাহ তা'আলা। তার পর আদম সন্তানের মধ্যে আমি হলাম সবচেয়ে বড় দানশীল। এরপর বেশি দানশীল ঐ ব্যক্তি যে ইলম শিখার পর এর প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। এরূপ ব্যক্তি কিয়ামতের দিন একাই একজন আমীরের মত অথবা এক উম্মত হিসাবে অর্থাৎ এই মর্যাদা সহকারে উপস্থিত হবে।"[৮৮]

ছাত্রের জন্য অপরিহার্য হলো শিক্ষক ভক্তি করা, তাঁর খিদমাত করা এবং নরম ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলা। নামায পড়ে তাঁর জন্য দু'আ করা। সম্ভব হলে কিছু হাদিয়া প্রদান করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন,

مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ– অর্থাৎ- "কেউ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলে তোমরা তাকে এর বিনিময় প্রদান করবে। যদি বিনিময় দেয়ার মত কিছু না পাও তবে তার জন্য তোমাদের মনে এ ধারণা হওয়া পর্যন্ত দু'আ করতে থাকবে যে, তোমরা তার সমপরিমাণ বিনিময় প্রদান করতে সক্ষম হয়েছ।"[৮৯]

মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) বলেন, ছাত্র যতই বড় হোক, শিক্ষকের সাথে তার মর্যাদার তুলনা হয় না। শিক্ষকের প্রতি আদব রক্ষা করা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। বে-আদব কখনো মুত্তাকী হতে পারে না। কথা-বার্তা, চাল-চলন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে উস্তাদের প্রতি আদব রক্ষা করে চলা তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। উস্তাদকে উস্তাদ হওয়ার কারণেই সম্মান করা উচিত। শিক্ষকগণের সামনে আদব ও বিনয়ের সাথে আসা উচিত।[৯০] এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, তোমরা দীনি ইলম শিক্ষা কর এবং ইলমের জন্য স্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন কর। আর যার নিকট হতে ইলম শিখছ তাঁর নিকট বিনয় সহকারে গমন কর।

---

৮৮. ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: ১৮, বাব: ফি নাশরিল ইলম ওয়াল আইমানি'আহি আহলিহি ইয়া হাযারাল-'আলিম, হাদীস নং- ১৭৬৭

৮৯. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুয-যাকাত, বাব: 'আতীতু মান সায়ালা বিল্লাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৭২

৯০. *দৈনন্দিন জীবন ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

শিক্ষক কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের কর্তব্যের উল্লেখ করে বলেন, "ছাত্রদের উচিত, উস্তাদের খেদমতে হাজির হওয়ার পূর্বে উত্তমরূপে গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে হাযির হওয়া। উস্তাদের সামনে আদবের সাথে বসা। তাঁর দিকে পা ছড়িয়ে না বসা। উস্তাদের প্রতি আযমত প্রকাশ করা। উস্তাদের আলোচনা করার সময় এদিক ওদিক না তাকানো; বরং মনোযোগ সহকারে তাঁর আলোচনা শ্রবন করা। উস্তাদের সাথে কখনো মিথ্যা না বলা এবং প্রতারণা না করা। কোন কথা বুঝে না আসলে এর জন্য উস্তাদকে দোষী বা অযোগ্য মনে করবে না; বরং এ কথা মনে করবে যে, আমার বুঝার শক্তির ত্রুটির কারণে তা বুঝতে পারছি না। উস্তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকবে। সাক্ষাতে প্রথমে তাঁকে সালাম করবে এবং তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে। উস্তাদের সামনে বেশি কথা বলবে না এবং হাশি-তামাশাও করবে না। কোন ব্যাপারে উস্তাদ কঠোরতা করলে তা অম্লান বদনে বরণ করে নিবে। কোন ব্যাপারে উস্তাদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করবে না। সময় সময় উস্তাদকে হাদিয়া প্রদান করবে। উস্তাদের জীবদ্দশায় এবং ইনতিকালের পর তাঁর জন্য দু'আ করবে।[৯১] শিক্ষকগণের প্রতি উপরোক্ত কর্তব্য সম্পাদন করার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তথা কিশোর-কিশোরী নিজের উত্তম চারিত্রিক মাধুর্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হবে।

৫। বয়জ্যেষ্ঠদের প্রতি কর্তব্য

কিশোররা যেমন তাদের পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন করবে ঠিক তদ্রুপ সমাজের বয়জ্যেষ্ঠদের প্রতিও তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করবে। পিতামাতার ন্যায় বয়জ্যেষ্ঠদেরকে শ্রদ্ধা করা। কোন কারণেই মুরব্বিদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা যাবে না। কিশোরের কথাবার্তা ও ব্যবহারে এমন কোন অনমনীয় ভাব প্রকাশ করা যাবে না যাতে বড়দের মনে কষ্ট হয়। তাদের সামনে কোন রকম বিরক্তিভাব প্রকাশ বা অবমাননাকর আচরণ করা যাবে না। তাদের সাথে দেখা হলে নম্রতার সাথে সৌজন্য রক্ষা করা, প্রথমে তাদেরকে সালাম করা। ইসলাম প্রত্যেক শিশু-কিশোরকে তাদের পিতামাতার পাশাপাশি তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথেও সদাচরণ করা ও তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছে। হাদীস শরীফে এ সর্ম্পকে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِيفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا–

---

৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

অর্থ: আবূ উসাইদ মালিক ইবন রাবী'আ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সা.) -এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় বণী সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললেন, হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পর এমন কোন আচরণ অবশিষ্ট আছে যা আমি তাঁদের সাথে করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের জন্য দু'আ ইস্তেগফার কর, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কৃত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন কর এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবকে সম্মান কর এবং সেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, যে সম্পর্ক শুধু তাঁদের বন্ধনের কারণেই রক্ষা করা হয়ে থাকে।[৯২]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বয়জ্যেষ্ঠদের প্রতি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করে বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ --- وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি বর্ণনা করেন ইবন সারহ নবী করিম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ---বড়দের হক সম্পর্কে জানে না অর্থাৎ সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৯৩] উল্লিখিত প্রথম হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা.) পিতামতার বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং দ্বিতীয় হাদীসে যারা বড়দের হক সম্পর্কে জেনে তা আদায় কারে না বা সম্মান-শ্রদ্ধা করে না, তাদেরকে সরাসরি নবীর দলভুক্ত নয় অর্থাৎ উম্মত নয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই বুঝা যায় যে, বয়জ্যেষ্ঠদের সাথে সদাচরণ করা ইসলামি নির্দেশনার অন্তর্ভুক্ত। তাই কিশোরদের কর্তব্য হলো সমাজের প্রত্যেক বয়জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানো।

৬। সঙ্গী ও সহপাঠীদের প্রতি কর্তব্য

বন্ধু বা সঙ্গী-সাথী মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্ব। বর্তমান সময়ের কিশোর-কিশোরী বন্ধু ছাড়া তাদের জীবনকে কল্পনা করতে পারে না। কারণ তারা এ সময়ে পরিবারের বাঁধনমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলতে চায়, খেলার সাথী, সমবয়সী এবং পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে একাকার হতে চায়। এসময় কিশোররা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিজের একটি আলাদা জগত তৈরি করে। এ ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে কিশোররা অত্যন্ত সহজ ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে, যা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে তা করতে পারে না।[৯৪] অনেক সময় কিশোর প্রথমে তার সঙ্গীদের সাথেই ছোট ছোট অবাধ্য ও বিচ্যুত আচরণ করে থাকে। সঙ্গী সাথীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেমন অন্যায় কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে, আবার ভালো কাজের প্রতিও আকৃষ্ট হতে পারে। এটি নির্ভর করে সে কেমন বন্ধুদের সাথে মিশছে তার উপর। প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীর প্রধান কর্তব্য হলো প্রথমে সে কেমন বন্ধুদের সাথে মিশবে সেটা নির্ধারণ করে

---

৯২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৬৬৪

৯৩. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাব: ফি রাহমাতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯৪৩; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামে' আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯১৯

৯৪. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫২

নেওয়া। এরপরেও বন্ধুদের কোন আচরণ অপরাধমূলক বা খারাপ দেখলে সেটা প্রতিবাদ করা, তার সাথে না মিশা। এছাড়া নিজেও সঙ্গী-সাথীদের সাথে সদাচার করা, কোন খারাপ অভ্যাস বন্ধুদের মাঝে না ছড়ানোর চেষ্টা করা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথী-সহপাঠী, সফরের সাথী, এককথায় সকল প্রকার সঙ্গী-সাথীর সাথেই সদ্ব্যবহার করা উচিত। সঙ্গী-সাথীদের সাথে ভদ্রভাবে মেলামেশা করা, নম্রভাষায় কথা বলা এবং তাদের সাথে কখনও রূঢ় আচরণ করা যাবে না। তাদের সাথে এমন আচরণ করা যাবে না যা পরবর্তীতে বিচ্যুত আচরণ হিসেবে সমাজে স্বীকৃত হয়। নিজের কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে সেটি প্রকাশ না করা বা বন্ধুদের সামনে অন্যায় বা অপরাধের গল্প না করা। বন্ধুদেরকে নিয়ে অন্যায় কাজে শামিল না হওয়া। তাহলে উক্ত অন্যায় বা ত্রুটি বন্ধুদের মাঝেও ছড়িয়ে যেতে পারে।

ইসলাম সঙ্গী-সাথী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ প্রদান করেছে। সত্যবাদী, নামাযী ও দীনদার ব্যক্তিকে সঙ্গী হিসেবে নির্বাচন করতে হবে। কেননা বন্ধু-বান্ধব ভাল না হলে জীবন-জগৎ ও পরকাল সবই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এজন্য ইসলাম বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ভাল লোকদের সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।[৯৫] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ অর্থাৎ-"হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হিসেবে গ্রহণ কর না। কেননা অন্যরা তোমাদের ক্ষতি করতে দ্বিধা করে না এবং যা তোমাদেরকে কষ্ট দেয় তারা তাই কামনা করে।"[৯৬] সঙ্গী সাথী নির্বাচনে নির্দেশনা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا- অর্থাৎ-"মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে সাথী নির্বাচন করবে না।"[৯৭]

এছাড়া সহপাঠীদের সাথে বয়স ও মর্যাদানুসারে সদ্ব্যবহার ও ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখা শিক্ষার্থী কিশোর-কিশোরীদের কর্তব্য। ক্লাসের সকলের সাথে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখাই ইসলামের আদর্শ। ক্লাসের সবার খোঁজ-খবর নেওয়া এবং ক্লাসে পরে আগমনকারী সাথীকে বসার জায়গা করে দেওয়াও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। একত্রে বসার সময় কারো দিকে পা ছড়িয়ে না বসা। কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে বসবে না। কোন কারণবশত ক্লাস থেকে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হলে নিজের সিটে কোন রুমাল বা অন্য কিছু রেখে যাওয়া।

---

৯৫. আল-কুরআন, ৯: ১১৯
৯৬. আল-কুরআন, ৩: ১১৮
৯৭. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাব: মান ইউমারু আন ইউজালিসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৬২; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুয-যুহদে আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব: মা যাআ ফি সুহবাতিল মুমিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৯৫

যাতে অন্য ছাত্ররা বুঝতে পারে যে, সে আবার ফিরে আসবে। ক্লাসে গিয়ে যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই বসবে। ক্লাসের সাথীদের সাথে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলবে। এগুলো সবই একজন কিশোর শিক্ষার্থীর কর্তব্য।

উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের বাণী থেকে সঙ্গী-সাথীদের মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক দিক প্রভাবিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সাহচার্য লাভকারী যদি শিশু-কিশোর হয় তাহলে সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি থাকে। তাই শিশু-কিশোরের কর্তব্য হলো সৎ ও আদর্শ বন্ধু নির্বাচন করা এবং মন্দ কিশোরের সাহচর্য ত্যাগ করা। নিজে কোন অন্যায় কাজ না করা এবং বন্ধুদেরকেও অন্যায় কাজে নিরুৎসাহিত করা। এছাড়া বন্ধুদের সাথে দেখা হলে সালাম দেওয়া, অসুস্থ হলে সেবা করা, হাঁচির জবাব দেওয়া, বিপদে-আপদে সাহায্য করা, বন্ধুদের দাওয়াত গ্রহণ করা, উপহার-হাদিয়া প্রদান করা প্রভৃতি সবই বন্ধুদের প্রতি কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

৭। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য

একজন কিশোরের প্রতি পিতামাতা, পরিবার, অভিভাবক, সমাজ ও রাষ্ট্র সার্বিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাকে প্রতিপালন করে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, তার মনোদৈহিক, আর্থ-সামাজিক ও মানবিক বিকাশ ঘটায়। আর সে নিজেও সমাজের একজন সদস্য, রাষ্ট্রের একজন নাগরিক। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তারও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য বর্তায়। এসব দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক নিয়ম-নীতি, শিষ্টাচার, আদব-কায়দা শিক্ষা গ্রহণ করা ও তা পালন করা। সামাজিক শিষ্টাচারের আওতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিশু-কিশোরের মনে বদ্ধমূল করতে হবে: (ক) পানাহারের আদব-কায়দা, (খ) গৃহে প্রবেশের অনুমতির আদব (গ) সালামের আদব (ঘ) কথা-বার্তার আদব (ঙ) পোশাক-পরিচ্ছদের আদব (চ) মজলিসে বসার আদব (ছ) হাই ও হাঁচির আদব (জ) রোগী দেখার আদব প্রভৃতি।[৯৮] নিম্নে শিশু-কিশোরের পালনীয় কতিপয় আদব আলোচনা করা হলো-

(ক) খাওয়া-দাওয়ার আদব মেনে চলা

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় একজন নাগরিকের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি বিষয়ের সুষ্ঠু নির্দেশনা রয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার আদবও এর বর্হিভূত নয়। ইসলাম কিশোর-কিশোরীর খাওয়া-দাওয়ার জন্য শিষ্টাচার নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলামের শিষ্টাচারে খাওয়ার শুরুতে "বিছমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" বলে ডান হাতে খাওয়া সুন্নাত। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ-অর্থাৎ-"তোমাদের কেউ বাম হাতে আহার করবে না এবং বাম হাতে পান করবে না। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় এবং পান করে।"[৯৯] এছাড়া খাওয়ার পূর্বে ও পরে ভাল করে হাত ধোয়া ও কুলি করা; একপাত্রে

৯৮. এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫

৯৯. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামে' আত-তিরমিযী*, কিতাবুল আত্বয়িমাহ, বাব: মা যায়া ফিন-নাহয়ি আনিল আকলি ওশ-শুরবি বিশ-শিমালি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭৯৯

কয়েকজন খেতে বসলে নিজের সামনে থেকে খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ। রাসূলুল্লাহ (সা.) পাত্রের মাঝখান থেকে এলোমেলোভাবে খেতে নিষেধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, - الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ অর্থাৎ-"বরকত নাযিল হয় খানার মাঝখানে। সুতরাং এর এক পাশ থেকে তোমরা খাবে, এর মাঝখান থেকে খাবে না।"[১০০]

এক মজলিসে কয়েকজন খেতে বসলে সকলের সামনে খাদ্যসামগ্রী পৌঁছার পর সকলে "বিছমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" বলে খাওয়া শুরু করা। নিজে আগে খাওয়া আরম্ভ না করা এবং অন্যের খাবারের প্রতি না তাকানো। খাবার খুব দ্রুত না খাওয়া এবং একবারে ধীরেও না খাওয়া ভাল। খুব ভালভাবে চিবিয়ে খাবার গ্রহণ করা, খাওয়ার সময় শব্দ না করা, খেজুর, আঙ্গুর, তরমুজ একত্রে খেতে বসলে এক টুকরা বা একটি করে খাওয়া, একত্রে দু'-তিনটি না খাওয়া উত্তম। তরকারি বা খাবার যেন পোশাকে বা বিছানায় না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখা। একশ্বাসে পানি পান না করা, তিনবারে পানি পান করা এবং পানির পাত্রে নিশ্বাস না ফেলা বরং বাইরে নিশ্বাস ফেলা। পানি পানের শুরুতে বিছমিল্লাহ এবং পান শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা। কয়েকজন মিলে একত্রে খানা খাওয়ার সময় অন্যদের অনুমতি নিয়ে উঠা এবং খাবারের কোন জিনিস পছন্দ না হলে সেটি প্রকাশ না করা উচিত। খাওয়া শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলে আল্লাহর শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করা। খাওয়ার সময় আঙ্গুল এবং পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া উত্তম। দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাত এবং দাঁড়িয়ে খানা খাওয়া উচিৎ নয়।[১০১] অতএব শিশু-কিশোরকে একজন আদর্শ মানুষে পরিণত হতে হলে খাওয়া-দাওয়ার এসকল আদবও রপ্ত করতে হবে।

(খ) গৃহে প্রবেশের আদব

ইসলাম বড়দের ন্যায় শিশু-কিশোরদেরও গৃহে প্রবেশের শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে কারো গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে তার অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে মুহাররাম, গায়রে মুহাররাম নারী-পুরুষ সকলেই সমান। আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরে গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে ফজর নামাযে আগে, দুপুরে বিশ্রামের সময় এবং ইশার নামাযের পর এ তিন সময় অনুমতি গ্রহণ আবশ্যিক করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يايُّها الَّذِيْن امنُوْا لِيستاْذِنْكُمُ الَّذِيْن ملكتْ ايْمانُكُمْ والَّذِيْن لمْ يبْلُغُوْا الْحُلُم مِنْكُمْ ثلاث مرّاتٍ ط مِنْ قبْلِ صلوةِ الْفجْرِ وحِيْن تضْعُوْن ثِيابكُمْ مِن الظّهِيْرةِ ومِنْ بعْدِ صلوةِ الْعِشاءِ ط ثلاثُ عوْرتٍ لّكُمْ ط ليْس عليْكُمْ ولا عليْهِمْ جُناح بعْد هُنّ ط طوّفُوْن عليْكُمْ بعْضُكُمْ على بعْضٍ ط كذالِك يُبيِّنُ اللهُ لكُمُ الايات ط واللهُ عليْم حكِيْم-

---

১০০. *প্রাগুক্ত*, বাব : কারাহিয়াতুল আকলি মিন ওসাতিত-ত্বাআমি, হাদীস নং-১৮০৫
১০১. আশরাফ আলী থানভী, *বেহেশতী জেওর* (ঢাকা: দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯২খ্রি.) খ. ৪, পৃ. ৭৮

অর্থাৎ-"হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা ও তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজর সালাতের আগে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং ইশার সালাতের পর। এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তোমাদের একজনকে তো অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[১০২]

উক্ত তিন সময়ে এজন্য অনুমতির বিধান রাখা হয়েছে, যেন ছোট শিশুরা নারী পুরুষের গোপন অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে না পারে। আর যদি শিশুরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে এই তিন অবস্থাসহ অন্য সময়েও অনুমতি নিতে হবে। যেমন,আল্লাহ তা'আলা বলেন, واذا بلغ الاطْفالُ مِنْكُمُ الحُلُم فلْيَستأذِنُوْا كما اسْتأذن الَّذِيْن مِنْ قبْلِهِمْ ط كذلِك يُبيِّنُ الله لَكُمْ اياتِهِ ط واللهُ عِلِيْم حكِيْم- অর্থাৎ-"আর তোমাদের সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বড়রা। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এমনকি কেউ যদি তার মা বোন অথবা কোন মুহাররাম মহিলার কক্ষে যায় তবুও অনুমতি চাওয়া আবশ্যক।"[১০৩] এমনকি সে উক্ত রুমে একসাথে অবস্থান করলে কিংবা সর্বদা তার সঙ্গে থাকলেও পরে বাহিরে এসে পুনরায় প্রবেশের জন্যও অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, -يايّها الَّذِيْن امنُوْا لاتدْخُلُوْا بُيُوْتًا غيْر بُيُوْتِكُمْ حتّٰى تسْتانِسُوْا وتُسلِّمُوْا على اهْلِها ط ذالِكُمْ خيْر لَكُمْ لعلَّكُمْ تذكَّرُوْن অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া আর কারো ঘরে ঘরের অধিবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য ভালো, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[১০৪]

উক্ত আয়াতে কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধান আলোকপাত করা হয়েছে। অন্য কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নেয়ার বিধানে প্রতিটি ঈমানদার নারী, পুরুষ, মুহাররাম, গায়রে মুহাররাম সবাই শামিল রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (রহ) 'আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে এবং ইমাম মালেক 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসংখ্য বাণী উল্লেখ করেছেন। বিষয় অনুধাবনের সুবিথার্থে প্রাসাঙ্গিক কয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১০২. আল-কুরআন, ২৪: ৫৮
১০৩. আল-কুরআন, ২৪: ৫৯
১০৪. আল-কুরআন, ২৪: ২৭

عن عطاء قال : سألت ابن عباس فقلت : أستأذن على أختي ؟ فقال : نعم ، فأعدت فقلت : أختان في حجري ، وأنا أمونهما وأنفق عليهما ، أستأذن عليهما ؟ قال : نعم ، أتحب أن تراهما عريانتين ؟ ثم قرأ : يايّها الّذِيْن امنُوْا لِيسْتأْذِنْكُمُ الّذِيْن ملكتْ ايْمانُكُمْ والّذِيْن لمْ يبْلُغُوْا الْحُلُم مِنْكُمْ ثلاث مرّاتٍ ط مِنْ قبْلِ صلوةِ الْفجْرِ وحِيْن تضعُوْن ثِيابكُمْ مِن الظّهِيْرةِ ومِنْ بعْدِ صلوةِ الْعِشاءِ ط ثلاثُ عوْرتٍ لّكُمْ – قال ابن عباس : فالإذن واجب –

অর্থ: আতা ইবন আবি রাবাহ বর্ণনা করেন যে, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি আমার বোনের নিকট প্রবেশের সময় অনুমতি চাইব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম আমার কিছু ইয়াতীম বোন রয়েছে, তারা আমার কাছে আমার ঘরেই প্রতিপালিত হয়, আমি কি তাদের কাছে যাবার সময় অনুমতি নেব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি তাদেরকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে চাও? অত:পর তিনি সূরা নূরের ৫৮নং আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, "হে মুমিনগণ! তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসীরা ও তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজর সালাতের আগে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখো তখন এবং ইশার সালাতের পর। এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তার সময়। ইবন আব্বাবস (রা) বললেন, সুতরাং অনুমতি গ্রহণ অপরিহার্য।"[১০৫]
ইমাম মালেক ইবন আনাস (র) আল-মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا–

অর্থ: "ইমাম মালেক (রহ) আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল, আমি আমার মায়ের কাছে যাওয়ার সময়ও অনুমতি চাইব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনুমতি চাও। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আমার মায়ের ঘরেই বসবাস করি। তিনি বললেন, তবুও তুমি অনুমতি না নিয়ে ঘরে যাবে না। তুমি কি তোমার মাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাই অনুমতি চাওয়া আবশ্যক। কেননা কক্ষে কোন প্রয়োজনে তার অপ্রকাশযোগ্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সুন্নাত তরীকা হলো, প্রথমে সালাম দিবে এবং পরে অনুমতি প্রার্থনা করবে। অনুমতি চাওয়ার সময় নিজের নামও উল্লেখ করবে।"[১০৬] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ বলেন, الْاِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ

---

১০৫. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *আল-আদাবুল মুফরাদ*, অনুচ্ছেদ: ইয়াসতা'জিনু আলা উখতিহি, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯ হি.), হাদীস নং-১০৭৬

১০৬. ইমাম মালেক ইবন আনাস (রহ.), *আল-মুয়াত্ত্বা*, কিতাবুল জামি', বাব: ফিল-ইসতি'জান (বৈরুত: দারুল ইহইয়াউল তুরাসিল আরাব, ১৪০৬হি.), হাদীস নং- ১৭৫০

أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ–অর্থাৎ-"কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করবে। অতপর অনুপতি পাওয়া গেলে গৃহে প্রবেশ করবে আর যদি পাওয়া না যায়, তাহলে ফিরে আসবে।"[১০৭] এভাবে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করে, একজন কিশোর তার নিজ গৃহসহ যে কোন গৃহে প্রবেশের আদব-কায়দা আয়ত্ত্ব করবে। যা ভবিষ্যতে তাকে একজন শালীন ও ভদ্র মানুষে রূপান্তরিত করবে।

(গ) সালাম-কালামের আদব পালন করা

সালাম ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক এবং 'ইবাদতের মধ্যে অন্যতম। একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের প্রথমে সালাম প্রদান করা কবর্তব্য। সালাম প্রদানের বিনিময়ে তিনি ছওয়াবের অধিকারী হন। আর যাকে সালাম দেওয়া হয় তার জন্য সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। যাকে সালাম দেওয়া হলো, তিনি সালামের উত্তর দেওয়ার জন্যও ছওয়াবের অধিকারী হন। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত শিশু-কিশোরকে সালামের আদব শিক্ষা দেওয়া। ইসলামি শরী'আতে সালাম দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ অর্থ: "যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান রাখে তারা যখন আপনার কাছে আসে তখন আপনি তাদেরকে বলবেন, 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"[১০৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً অর্থ: "তবে যখন তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম দেবে অভিবাদনস্বরূপ যা আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় এবং পবিত্র।"[১০৯]

ইসলামি সংস্কৃতির অন্যতম বাহন হলো একে অপরকে সাক্ষাতে সালাম দেওয়া। এটি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল। ইসলাম শিশু-কিশোরদেরকে ছোটবেলা থেকেই সালাম-কালামে অভ্যস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলামে সালাম দেওয়ার উত্তম নিয়ম হলো ছোটরা বড়দের সালাম করবে, কম সংখ্যক লোক বেশি লোকদের সালাম করবে, উপবিষ্ট লোক পথচারীকে সালাম করবে। তবে এর ব্যতিক্রম হলেও কোন সমস্যা নেই। হাদীস শরীফে সালামের প্রচলন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব প্রদান করে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ–

অর্থ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন না হও, ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর মুমিন

---

১০৭. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৭৫১
১০৮. আল-কুরআন, ৬: ৫৪
১০৯. আল-কুরআন, ২৪: ৬১

হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। তোমাদের এমন একটি বিষয়ের কথা বলব কি, যা করলে তোমাদের পরস্পরের ভালবাসা সৃষ্টি হবে। তা হলো, তোমাদের মাঝে সালামের প্রসার করো।[১১০] কারো সাথে দেখা হলে কথাবার্তা শুরুর প্রারম্ভে সালাম প্রদানের কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ অর্থাৎ-"কথাবার্তার শুরুর পূর্বে সালাম আদান প্রদান করবে।"[১১১] সুতরাং দেখা যায়, ইসলামি সমাজের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, ভাবের আদান-প্রদানের শুরুতে সালাম দেওয়ার বিধান রয়েছে, এমন কি কারো গৃহে প্রবেশের পূর্বে সালামের মাধ্যমে অনুমতি নেওয়ার কথা শরী'আতে বিধৃত হয়েছে। তাই প্রত্যেক শিশু-কিশোরকে ইসলামি সমাজের এই সংস্কৃতি ও আদব শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার।

(ঘ) কথা-বার্তার আদব

প্রত্যেক শিশু-কিশোর কথা বলার নিয়ম, আলোচনার ধরন এবং নীতিমালা শিক্ষা গ্রহণ করবে। যাতে বড় হয়ে লোকদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে ও শুনতে হবে, তা বুঝতে পারবে। কথা বলার আদব সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "তোমরা যে রকম বিরতিহীন ও নিরবচ্ছিন্ন কথা বল, রাসূলুল্লাহ (সা.) সেরকম কথা বলতেন না। তিনি ধীরে-সুস্থে থেমে থেমে কথা বলতেন। তাঁর কথাগুলো এতো স্পষ্ট হতো যে, যে কোন ব্যক্তিই তা একবার শোনার পর মুখস্থ করে ফেলতো।"[১১২] এ মর্মে ইমাম তিরমিযী ইবন ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْبَلِيغَ مِنْ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ-

অর্থাৎ "আল্লাহ সে বক্তার উপর অসন্তুষ্ট, যে গরুর জাবর কাটার মতো জিহবার আড়-মোড়সহকারে গাল ভরা বুলি আওড়ায়।"[১১৩] কথা বলার ব্যাপারে কতিপয় আদবের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। যেমন, ধীরে সুস্থে কথ বলা, বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা, যোগ্যতা অনুযায়ী লোকদের সাথে কথা বলা, আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা, শ্রোতার বক্তব্যও মনযোগসহকারে শোনা, উপস্থিত সকল শ্রোতার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে কথা বলা, হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথা বলা।

(ঙ) মার্জিত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা

শিশু-কিশোরের পোশাক-পরিচ্ছদ সামাজিক-সংস্কৃতি তথা আদব ও শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। পোশাক-পরিচ্ছদে শিশু-কিশোরের আদব ও শিষ্টাচারের বহিপ্রকাশ ঘটে। শিশু-কিশোর সবসময় উত্তম পোশাক পরিধান করবে, পরিবার ও সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু মনে হয়-এমন পোশাক পরিধান করবে না। ফ্যাশনের নামে দৃষ্টিকটু ও

---

১১০. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল ইসতিজানি ওয়াল আদাবি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাব: মা যায়া ফি ইফসাইস-সালাম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৮৮

১১১. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ২৬৯৯

১১২. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি'-আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল মানাকিব আন রাসূলিল্লাহি (সা.), বাব: কালামুন-নাবিয়্যি, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৩৬৩৯

১১৩. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, আবওয়াবুল আদাব আন রাসূলিল্লাহি (সা.), বাব: মা যায়া ফিল-ফাসাহাতি ওয়াল বায়ান, হাদীস নং- ২৮৫৩

অশালীন পোশাক পরিধান যাবে না। মোদ্দাকথা পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও শিশু-কিশোরকে ইসলামি বিধিবিধান মেনে চলা আবশ্যক। ইসলামে পোশাক-পরিচ্ছদের মূল উদ্দেশ্য দু'টি, একটি হচ্ছে সতর ঢাকা এবং অপরটি সৌন্দর্য বর্ধন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ–

অর্থাৎ-"হে আদম সন্তান (মানুষ)! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকা ও তোমাদেরকে শোভন করার জন্য পোশাক দিয়েছি, আর তাকওয়ার পোশাক হল উত্তম পোশাক। আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এটা অন্যতম, যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[১১৪] এ আয়াতে মহান আল্লাহ লজ্জার স্থান তথা সতর ঢাকার জন্য পরিমিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলমান বালক-বালিকা বা কিশোর-কিশোরীসহ প্রত্যেক নর-নারীর এ পোশাক পরিধান করাই বাঞ্ছনীয়।

লেবাস বা পোশাক-পরিচ্ছদের অন্যতম উদ্দেশ্য সৌন্দর্য বর্ধন বা সৌন্দর্য লাভ। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে বলা ঘোষণা করা হয়েছে, يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ– অর্থ: "হে আদম সন্তান! প্রতিটি সালাতের সময় তোমরা সুন্দর ও পবিত্র পোশাক পরিধান করবে, খাবে এবং পান করবে, তবে অপচয় করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না।"[১১৫] মুসলমান শিশু-কিশোরসহ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য উত্তম পোশাক হলো ইসলামি ড্রেসকোড অনুসরণ করে নিজের জন্য পোশাক নির্বাচন করা যা শালীন, মার্জিত, রুচিশীল শোভনীয়। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে কিশোররা কিশোরীদের এবং কিশোরীরা কিশোরদের পোশাক অনুসরণ বা অনুকরণ নিষিদ্ধ। পুরুষদের জন্য যেসব রঙ এবং উপাদানের কাপড় নিষেধ (যেমন, জাফরানী রঙের কাপড়, রেশমী কাপড়) সেসব কাপড় কিশোররা না পড়া এবং যেসব পোশাকে অহংকার প্রকাশ পায় তাও পরিধান না করা। এছাড়া এমন পোশাক পরিধান করা যাবে না যে পোশাক পরিধানের পরেও শরীর দেখা যায়। স্বর্ণের আংটি, স্বর্ণের চেইন বা স্বর্ণের যে কোন গহনা ব্যবহার করা পুরুষদের ন্যায় কিশোরদের জন্যও নিষিদ্ধ। পায়ের টাখনু গিরার নিচে প্যান্ট বা পায়জামা পরিধান করা যাবে না। বেশি শান-শওকতের পোশাক পরিধান করা এবং একেবারে ময়লা কাপড় পরিধান করা উচিত নয়। বরং সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। চুলের যত্ন নেওয়া, সুরমা ব্যবহার করা উত্তম। এক পায়ে জুতা পরিধান করে হাঁটা উচিত নয়।[১১৬] মোদ্দাকথা পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানের ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরকে মার্জিত ও রুচিশীল হতে হবে। ফ্যাশনের নামে উচ্ছৃঙ্খল ও রুচিহীন পোশাকে পরিধান করা যাবে না।

(ঘ) মজলিসে বসার আদব-কায়দা

---

১১৪. আল-কুরআন, ৭: ২৬
১১৫. আল-কুরআন, ৭: ৩১
১১৬. আশরাফ আলী থানভী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৩৩২

ইসলাম শিশু-কিশোরদের পরিপূর্ণ মানব হওয়ার যাবতীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ জন্য ইসলাম শিশু-কিশোরদের জন্য মজলিসে বসার আদাব-কায়দা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সমাজের প্রত্যেকটি শিশু ইসলামের এ নিয়ম-নীতি মেনে চললে তার জন্য উজ্জল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শিশু-কিশোরদের মজলিসে বসার আদব হলো, শিশু-কিশোররা মজলিসে গিয়ে নম্রভাবে "আস্‌সালমুআলাইকুম' বলে সকলকে সালাম করবে। তথায় বিশেষ কোন মুরুব্বী থাকলে তাকে খাসভাবে সালাম করবে। মানুষের সাথে নরম ভাষায় কথা বলবে এবং আদবের সাথে বসবে। মজলিসের মধ্যে থুথু ফেলবে না এবং নাক পরিষ্কার করবে না। যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে মজলিস থেকে উঠে গিয়ে নাক পরিষ্কার করে আসবে। মজলিসে বসা অবস্থায় যদি হাই বা হাঁচি আসে তবে মুখের উপর হাত বা রুমাল রাখবে এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করবে যাতে আওয়াজ কম হয়। কাউকে পারত পক্ষে পিছনে রেখে বসবে না এবং কারো প্রতি পা ছড়িয়ে বসবে না। মজলিসের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাবে না। বারবার কারো দিকে তাকাবে না, বেশি কথা বলবে না। প্রথমে নিজে কথা বলবে না, চুপ করে শুনবে, প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে কথা বলবে।[১১৭] এছাড়া মজলিসের মধ্যে বসা অবস্থায় যদি অন্য কেউ আসে তবে একটু সরে গিয়ে তার জন্য জায়গা করে দিবে। মজলিস থেকে বিদায়ের সময় 'আসসালামু আলাইকুম বলে' বিদায় নিবে। এভাবে শিশু-কিশোর মজলিসের আদব-কায়দা রক্ষা করা শিক্ষবে এবং একজন পরিশীলিত মানুষরূপে নিজেকে গড়ে তুলবে।

(ছ) হাই ও হাঁচির আদব

পরিশীলিত ও পরিমার্জিত মানব সন্তান গঠনের জন্য মানবিক আচরণ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এসব মানবিক আচরণের অন্যতম হলো তাদেরকে হাঁচি ও হাই তোলার নিয়ম শিক্ষা দেওয়া। এর ফলে তারা সমাজের ভদ্র মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে এবং সমাজে তাদের চরিত্র মাধুর্য ফুটে উঠবে। হাঁচির আদব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, কারো হাঁচি আসলে সে আল্লাহর প্রশংসা, রহমত ও হেদায়েতের শব্দ উচ্চারণ করবে। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ–অর্থাৎ- "তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। তার সাথী যেন জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে। এরপর হাঁচিদাতা যেন বলে ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলেহ বালাকুম।"[১১৮] আবূ দাউদ ও তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় এসেছে, হাঁচিদাতা যেন ইয়াগফিরুল্লাহ লানা ওয়া লাকুম বলে।[১১৯] সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় বলা

---

১১৭. *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৭৮

১১৮. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাব: ইজা আতাসা কাইফা ইউশাম্মাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬২২৪

১১৯. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাব: মা যায়া ফি তাশমিতিল 'আতিস, হাদীস নং- ৫০৩১

হয়, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدْ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ –"অর্থাৎ-"তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বল। আর যদি আলহামদুলিল্লাহ না বলে, তাহলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে না।"[১২০]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ হতে হাঁচির ব্যাপারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো শিশু-কিশোর শিক্ষাগ্রহণ করবে। হাঁচিদাতা বলবে, আলহামদুলিল্লাহ অথবা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, অথবা আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। যারা এই কথা শুনতে পাবে তারা জবাবে বলবে, ইয়ারহামুকাল্লাহ। হাঁচিদাতা পুনরায় বলবে, ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলেহ বালাকুম, অথবা, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ও লাকুম। তবে হাঁচিদাতা কিছু না বললে জবাব প্রদান করতে হবে না। হাঁচি বা কাশি দেওয়ার সময় মুখে হাত বা রুমাল দিয়ে যথাসম্ভব শব্দ কমানো এবং নাকের-মুখের ময়লা না ছড়ানোর জন্য চেষ্টা করা। সূনানে আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ–অর্থ: "রাসূলুল্লাহ (সা.) হাঁচি দেওয়ার সময় মুখে হাত বা কাপড় দিয়ে আওয়াজ কমাতেন কিংবা বন্ধ করতেন।"[১২১]

বর্তমান সময়ে উপরোক্ত হাদীসটির উপযোগিতা অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে করোনাসহ অধিকাংশ ভাইরাস হাঁচি-কাশির মাধ্যমে একজন মানুষের শরীর হতে অপর মানুষের শরীরে ছড়ায়। আর তাই হাঁচি বা কাশির দেওয়ার সময় মুখে রুমাল, টিস্যু বা হাতের কনুইর মধ্যে মুখ লুকিয়ে হাঁচি বা কাশি দিতে হবে। শিশু-কিশোর ইসলামের এই আদবটি শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং এর মধ্যদিয়ে নিজেকে ও অপরকে রোগ-বালাই থেকে রক্ষা করবে।

হাই আসা এটি শরীরের দুর্বলতার প্রতীক, এটি শয়তানের পক্ষ হতে আসে, তাই হাই আসলে তা প্রতিরোধ করা দরকার। বড় করে মুখ খুলে হাই দেওয়া নিয়েষধ। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে বিস্তরিত বর্ণনা এসেছে। ইমাম বুখারী উল্লেখ করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ–অর্থাৎ-"আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে। তাহলে প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার কর্তব্য হলো জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। আর হাই তোলা শয়তানের কাজ। যখন তোমাদের কারো

১২০. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুয-যুহদু ওয়ার-রাকায়িক, বাব: তাশমিতুল আতিস, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৯৯২

১২১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল আদাবি আন রাসূলিল্লাহ (সা.) বাব: খাফদুস-সাওতি ও তাখমিরুল-ওজহি ইনদাল আতাস, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৭৪৫

হাই আসে সে যেন সাধ্যমত তা প্রতিরোধ করে। কেননা কেউ যখন হাই তুলে শয়তান তখন হাসে।"[১২২] তাছাড়া মুখ খুলে হাই তোলার সময় শয়তান মুখের ভিতরে প্রবেশ করে, তাই কারো হাই আসলে সে মুখে হাত দিবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ–অর্থাৎ-"তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন মুখ হাত দিয়ে ঢেকে রাখে। তা নাহলে শয়তান ভেতরে প্রবেশ করে।"[১২৩] তাই শিশু-কিশোর স্বাস্থ্যগত সচেতনার পাশাপাশি আদব ও শালীনতার জন্যেও হাঁচি বা হাই তোলার আদব মেনে চলবে।

(জ) রোগীর সেবা করা

ইসলাম একটি মানব কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা। এখানে মানুষের প্রত্যেকটি আচার-আচরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এখানে বাদ যায়নি একজন রোগীর প্রতি অন্যান্য ব্যক্তিদের কর্তব্যের কথা। ইসলাম একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের যে ৬টি হক নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং রোগীর সেবা করা। এ প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ–

অর্থ: আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ৬টি অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করা হলো সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল? তখন তিনি বললেন, (১) যখন কারো সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তখন তাকে সালাম করা; (২) যখন কেউ তোমাকে দাওয়াত দেয় বা আহবান করে, তখন তার আহবানে বা দাওয়াতে সাড়া দেওয়া; (৩) যখন কেউ তোমার কাছে পরামর্শ চায়, তাকে সৎ পরামর্শ দেওয়া; (৪) যখন কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে তখন তার হাঁচির জবাব দেওয়া; (৫) আর যখন কেউ অসুস্থ হয় তখন তাকে দেখতে যাওয়া এবং (৬) আর যখন কেউ মারা যায়, তখন তার জানাযায় ও দাফনে অংশ গ্রহণ করা।"[১২৪] রোগীর সেবার ক্ষেত্রে এই হাদীসের দাবী হলো যদি কেউ রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তাকে দেখতে যাওয়া, তার সেবা করা। নবী করিম, (সা.) রোগী দেখতে যেয়ে তার মাথায় হাত বুলাতেন, তার জন্য দু'আ করতেন এবং খোঁজ-খবর নিতেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا–

১২২. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, বাব: ইজা তাসাউবা ফালইয়াদা' ইয়াদাহু আলা ফিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬২২৬ ; ইমাম হাফেজ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুয-যুহদু ওয়ার-রাকায়িক, বাব: তাশমিতুল আতিস, হাদীস নং- ২৯৯২

১২৩. *আস-সহীহু লিমুসলিম*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৯৫

১২৪. *প্রাগুক্ত*, কিতাবুস সালাম, বাব: মিন হাক্কিল-মুসলিমি রাদ্দুস-সালাম, হাদীস নং- ২১৬২

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী (সা.) নিজ অসুস্থ স্ত্রীকে দেখে ডান হাত দিয়ে মুছতেন এবং বলতেন হে আল্লাহ! মানুষের রব, রোগ দূর করুন, আরোগ্য দিন। আপনি আরোগ্যদাতা, আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোন চিকিৎসা নেই। এমন চিকিৎসা যা কোন রোগ রেখে যাবে না।"[১২৫] মোদ্দাকথা রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করা, তার সেবা করা ইসলামি মুওয়াখাতের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে আদব হলো রোগীর মাথার কাছে বসে ব্যাথার স্থানে বা হাতে হাত রেখে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করা, রোগীকে শান্ত্বনা দেওয়া, রোগী সর্ম্পকে তার পরিবারকে জিজ্ঞাসা করা এবং প্রয়োজনে আর্থিক বা অন্যভাবে সহযোগিতা করা।

(ঝ) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা

ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এর যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। দৈহিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকতে হলে দেহকে পবিত্র রাখতে হবে, কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়া খাবার পাত্র এবং খাবারও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। কারণ মনোদৈহিক রোগ থেকে বেঁচে থাকার প্রধান চাবিকাঠি পবিত্র মন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ-অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।"[১২৬] আধুনিক বিজ্ঞানও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রমাণ করেছে। বর্তমানে চিকিৎসাবিজ্ঞানে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশেষত রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভূমিকা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে একটি কথা স্মরণীয় যে, প্রতিরোধ নিরাময়ের চাইতে শ্রেয়। সুস্থ শরীর ও সুস্থ মনের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করার গুরুত্ব পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-অর্থাৎ- "(হে নবী!) আপনার পোশাক পবিত্র রাখুন।"[১২৭]

আলোচনান্তে বলা যায় যে, মানব সন্তান হিসেবে একজন শিশু-কিশোর তার পিতামাতা, পরিবার, অভিভাবক, সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে তার প্রতিপালন, শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন, মেধা, মনন ও সুকুমারবৃত্তি বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের অধিকার বা সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন, যা উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্ব হিসেবে শিশু-কিশোরদের প্রতি পালন করে থাকেন। আবার এসকল শিশু-কিশোরের রয়েছে নিজেদের প্রতি, পিতামাতা, পরিবার, অভিভাবক, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব-কর্তব্য, যা পালনের মাধ্যম্যে সে নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ এবং সমাজ ও দেশের সেবায় একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।

---

১২৫. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুত-তিব্ব, বাবঃ রুকইয়াতিন-নাবী (সা.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৭৪২

১২৬. আল-কুরআন, ২: ২২২

১২৭. আল-কুরআন, ৭৪: ৪

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ : কার্যক্রম, সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য সমাজেই কিশোরের অপরাধ আচরণের পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর জন্য এবং কিশোরের ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর ও স্বাভাবিক করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এ জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আইনের সংস্পর্শে আসা অথবা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু-কিশোরের জন্য সরকারী সংশোধনাগার স্থাপন করা হয়। এই সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলো কিশোর অপরাধ দমন, প্রতিরোধ এবং শিশু-কিশোরদের সমাজে স্বাভাবিক পুনর্বাসনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। সংশোধনী ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো আইনের আওতায় আসা শিশু-কিশোরদের পরামর্শ, পুনর্বাসন, শিক্ষা, বিনোদন, দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ এবং পুনরায় সমাজের মূল স্রোতের সাথে একীভূত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। বাংলাদেশের সংশোধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ (কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ) কিশোরদের চারিত্রিক বিভন্ন দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে তাদেরকে সংশোধন ও পুর্নবাসনের জন্য প্রস্তুত করে। কেন্দ্রে আসা প্রত্যেক শিশু-কিশোরের জন্য ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।[১] বাংলাদেশের গাজীপুরের টঙ্গী উপজেলা এবং যশোর জেলার সদর উপজেলার পুলেরহাটে একটি করে শিশু-কিশোর সংশোধনাগার এবং গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে একটি কিশোরী সংশোধনাগার বা উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

কিশোর সংশোধনী বা উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোর অপরাধীদেরকে সামাজিক কর্মে অন্তর্ভুক্তিকরণ, প্রেরণা, উপদেশ, ধর্মীয় শিক্ষা, হাতের কাজ, শারীরিক কসরত ও পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন, উপার্জনক্ষম জনগোষ্ঠিতে রূপান্তর ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে আদর-যত্নে প্রতিপালন, সুরক্ষা, চিকিৎসা এবং সমাজে পুনর্বাসন করা।[২] 'বাংলাদেশ শিশু নীতি, ২০১১' ও 'শিশু আইন, ২০১৩' -এর মতে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ১৮বছরের নিচে শিশু-কিশোরদের বিচার, নিরাপদ হেফাজত, সুরক্ষা, চিকিৎসা এবং সংশোধনের জন্য কাজ করবে। শিশু নীতি ও শিশু আইনের আলোকে এ সকল উন্নয়ন কেন্দ্র নিবাসী কিশোরদের নিয়মিত মেডিকেল চেক-আপ, পুষ্টিসম্মত খাবার এবং প্রয়োজনীয় পরিধেয় জামা-কাপড় সরবরাহ করবে। এছাড়া নিবাসী কিশোরদের প্রত্যেকের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি শিক্ষা নিশ্চিত করবে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র। এভাবে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, আইনের সাথে

---

১. বিএল. দাস, *অপরাধ বিজ্ঞান তত্ত্বীয়* (ঢাকা: কামরুল বুক হাউজ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২১০

২. Dr. Nahid Ferdousi, *Juvenile Justice System in Bangladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2012), p. 150

সংঘাতে জড়িত শিশু-কিশোরের সর্বপ্রকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিয়ে পরিবার ও সমাজে শিশু-কিশোরদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। 'শিশু আইন,২০১৩'-এর ৮ম অধ্যায়ে ৫৯ থেকে ৬৯ অনুচ্ছেদের আলোকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে,

১. অপরাধপ্রবণ বা অপরাধের জাথে জড়িত কিশোরদেরকে শাস্তির জন্য নয় বরং সংশোধনের জন্য উন্নয়ন কেন্দ্রে গ্রহণ করা।
২. সমাজের অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা অব্যাহত রাখা।
৩. কিশোর অপরাধীকে দেশের আইনমান্যকারী এবং উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে তৈরি করে সমাজের মূলস্রোতের সাথে পুনঃএকত্রীকরণ ও পুনর্বাসন করা।
৪. সংশোধন প্রক্রিয়ায় পরিবার ও সমাজের উপর গুরুত্ব প্রদান করা।
৫. কিশোরদের গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত সংশোধনের ব্যবস্থা করা।
৬. কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিকের উৎকর্ষ সাধন করা।
৭. শিশু-কিশোরদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বোচ্চ মানবতার দৃষ্টিভঙ্গিতে আদালতের নির্দেশনা পালন করা।
৮. দাগী আসামীদের থেকে তাদের দূরে রেখে আলাদা বিচারের ব্যবস্থা করা।
৯. শিশু-কিশোরের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনের জন্য চেষ্টা করা এবং তাদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা।
১০. কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য সংশোধনাগারে থাকার ব্যবস্থা করা।
১১. সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস করা।
১২. সর্বোপরি কিশোরদের জন্য সংশোধনাগারে সাধারণ শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, শরীর চর্চা, খেলা-ধুলা, চিত্তবিনোদন প্রভৃতির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে একজন কিশোরের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন ও একজন আর্দশ নাগরিক তৈরির মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তর করা।

এছাড়াও সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় আরো নানাবিধ সংশোধন, উন্নয়ন ও পুর্নবাসনমূলক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ কাজ করছে।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রেসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান হলো অপরাধের সাথে জড়িত শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন ও সংশোধনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মূলত কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য স্থাপন করা হয় কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। 'শিশু আইন,২০১৩', অনুচ্ছেদ: ৪৪ (১) এবং The Penal Code 2004, Section: 82 and 83 অনুযায়ী সাধারণত ৯-১৮ বছর বয়সসীমার বালক-বালিকারাই কিশোর হিসেবে বিবেচিত হয়। এ বয়সের অনেক কিশোর-কিশোরী বিপথগামী হয়। তাই শিশু-কিশোরদের বিপথগামীতা থেকে রক্ষা করে তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সময় ও চাহিদার বিবর্তনে প্রতিষ্ঠানটির কয়েক দফা নাম পরিবর্তিত হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের নাম 'শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র'। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এ প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় কিশোর অপরাধ সংশোধনী ইনস্টিটিউট' নামে নামকরণ করা হয়। এর পর ১৯৯৫ সালে 'জাতীয় কিশোর অপরাধী সংশোধনী প্রতিষ্ঠান', ২০০২ সালে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এবং সর্বশেষ ১ মার্চ ২০১৭ সালে এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়, 'শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র'।[৩] এটি কিশোর-কিশোরী অপরাধীদের সংশোধনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এ প্রতিষ্ঠান অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের চরিত্র সংশোধন, উপদেশ প্রদান, পুনর্বাসন, শিক্ষা-দীক্ষা, বিনোদন দৈনন্দিন কার্যবালী এবং সমাজে মূলস্রোতের সাথে পুনঃএকত্রীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। যাতে করে কিশোর-কিশোরীরা সংশোধিত হয়ে সমাজে সম্মানের সাথে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।

বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত ৩টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে। তখন এর ধারণ ক্ষমতা বা আসন সংখ্যা ছিল ২০০টি। পরবর্তীতে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে যশোর জেলার সদর উপজেলার পুলেরহাটে ১৫০ আসন বিশিষ্ট দ্বিতীয় সংশোধনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং অক্টোবর, ১৯৯৫ সালে এখানে উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ৩য় সংশোধনী প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ২০০২ সালে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে। এটি স্বতন্ত্রভাবে শুধুমাত্র কিশোরীদের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর আসন সংখ্যা ১৫০টি। এছাড়া ৬ষ্ট পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরো ৩টি সংশোধনী কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। যাদের মধ্যে ৩০০ আসন বিশিষ্ট বগুরার জয়পুরহাটে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রটির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলে জানা যায়। টঙ্গী ও যশোরে অবস্থিত কেন্দ্র দু'টিতে বর্তমান সুযোগ-সুবিধার সাথে আরো

৩. সূত্র: মাঠপর্যায়ে জরিপকর্ম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ (টঙ্গী, কোনাবাড়ী ও যশোর), সমীক্ষা কাল: জুলাই-জুন, ২০১৯-২০২০, প্রতিষ্ঠানের সুপারিনটেনডেন্টগণের সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত। কেন্দ্রের নিবাসী ও সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ: টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র- ১৫ থেকে ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯; যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র-৫ থেকে ০৯ অক্টোবর, ২০১৯ এবং কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র-১০ ও ১১ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.। (উল্লেখ্য যে, শিশু-উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে সর্বমোট তিনটি ধাপে মাঠ জরিপকর্ম পরিচালনা করা হয়। প্রথম ধাপে: টঙ্গী, কোনাবাড়ী ও যশোরের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন, মাঠ সমীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত, প্রকাশনা প্রভৃতি সংগ্রহ করা; দ্বিতীয় ধাপে: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ভিত্তিক সময়সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত নিবাসী ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্টগণের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়- গবেষক।)

প্রয়োজনীয় সুবিধা বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত ৩৫০ জন নিবাসীর থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নিম্নোক্ত টেবিলে একনজরে তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রের বিবরণ প্রদান করা হলো-

সারণী-৩৩: The Present Position and Description of three KUKs[৪]

Subject	Tongi KUK	Jessore KUK	Konabari KUK
Establishment	1978	1995	2002
Jurisdiction (according to notification of Gazette of 1999)	Dhaka, Chittagong and Sylhet division are under the jurisdiction of Tongi KUK	Khulna, Rajshahi, Barisal and Rangpur division are under the jurisdiction of Jessore KUK	Jurisdiction of whole Bangladesh which mentioned seven division.
Numbers of seats	Present number of seats is 300; additional 200 has been proposed	Present number of seats is 150 additional 200 has been proposed	Present number of seats is 150
Present Inmates June, 2020	Guardian Case-00 Police Case-576 Total-576	Guardian Case-00 Police Case-269 Total-269	Guardian Case-43 Police Case-39 Total-82
Total number of inmated from the time of establishment	From 1978 to 2018 Guardian Case-7488 Police Case-10871 Total-18359	From 1995 to 2020 Guardian Case-1508 Police Case-10542 Total-12050	From 2002 to 2020 Guardian Case-395 Police Case-514 Total-909
Released and Reintegration to the family or society	Guardian Case-7276 Police Case-10361 Probation-317 Total-17954	Guardian Case-1508 Police Case-10162 Probation-111 Total-11781	Guardian Case-357 Police Case-440 Transfer to other Centres-30 Total-827

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট এই তিনটি বিভাগ রয়েছে। যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ রয়েছে।

৪. সূত্র: (প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক) *মাসিক প্রতিবেদন*, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ (টঙ্গী, যশোর ও কোনাবাড়ী), জুলাই, ২০২০ খ্রি.

অপরদিকে কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ৭টি বিভাগ থেকে নিবাসী এখানে ভর্তি হয়। টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সাথে সিলেট বা চট্টগ্রামের দূরত্বের কারণে সেখানকার শিশু-কিশোর সংক্রান্ত ঘটনা টঙ্গী উন্নয়ন কেন্দ্রে আনা খুবই দুরুহ। একই অবস্থা যশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে কিশোর আদালত পরিচালনার কাজে স্ব-স্ব জেলায় আনা-নেওয়া খুবই কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এছাড়াও দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই প্রায় ৬৪ জেলা থেকে নিবাসীরা আগমন করে। সুতরাং এই তিনটি শিশু বা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট নয়।

তাছাড়া এ তিনটি কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে জনবল সংকট ছাড়াও ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল। যা দিয়ে শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন দূরের কথা তাদের মৌলিক মানবিক প্রয়োজনগুলোই পূরণ করা সম্ভব হয় না। বস্তুতপক্ষে উন্নয়ন কেন্দ্র তিনটি অপর্যাপ্ত জনবল, কিশোর আদালতে স্থায়ী বিচারকের অভাব এবং প্রশাসনিক নানা ধরনের অসুবিধা রয়েছে যা থেকে উন্নয়ন কেন্দ্রের সন্তোষজনক কোন প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না।

কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের জনবল

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠান শাখা শিশু (শিশু-কিশোর-কিশোরী) উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ পরিচালনা করে। পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) এর নেতৃত্বে অতিরিক্ত পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক সদর দপ্তর পর্যায়ে এবং মাঠপর্যায়ে তিন জন তত্ত্বাবধায়ক শিশু (শিশু-কিশোর-কিশোরী) উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট। জেলা পর্যায়ে ৩ জন উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালক মাঠ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান তদারকি করেন এবং মাঠ পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করেন। প্রত্যেকটি শিশু/ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক বা প্রধানকে সুপারিনটেনডেন্ট বলা হয়। সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে এছাড়া যারা কর্মরত রয়েছেন তারা হচ্ছেন- প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, একজন সহকারী সুপারভাইজার, প্রবেশন অফিসার, ব্যক্তি সমাজকর্মী, জি. আর. এ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। প্রতিষ্ঠাকালীন জনবল কাঠামো দ্বারাই এখনও পরিচালিত হচ্ছে উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ। নিম্নে কিশোর উন্নয়নকেন্দ্র ও কিশোর আদালতের জনবল কাঠামো উপস্থাপন করা হলো:

সারণী-৩৪: Administrative structure of the Kishor Unnayan Kendra[৫]

Remand Home and Training Institute	
Administrative and Professional Personnel	6
Education (General)	5
Education (Technical)	4
Recreation	1
Religions	1
Medical	3
Residential	4
Office	5
Security	13
Dining	10
Gardening	1
Sweeping	2
Driver and MLSS	3
Total	58

Juvenile Court	
Magistrate	1
Probation Officer	1
Office Stuff	1
G.R.O	3
Literate	1
Constable	1
MLSS	2
Total	10

উপরোক্ত টেবিলে বর্ণিত প্রত্যেকটি উন্নয়ন কেন্দ্রের জনবল কাঠামো অনুসারে ৫৮ জন করে জনবল থাকার কথা থাকলেও বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। প্রত্যেক কেন্দ্রেই প্রায় একতৃতীয়াংশ পদ শূন্য রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র তিনটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলো ধরা হলো-

৫. সূত্র: মাঠ জরিপকর্ম, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ, *প্রাগুক্ত;* Abdul Hakim Sarker, *Juvenile Delinquency: Dhaka City Experience* (Dhaka: Human Nursery for Development, 2001), p. 293

১। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর

শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা, প্রতিপালন, নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য বাংলাদেশে বিভিন্ন আইন চালু রয়েছে। এর অধিকাংশ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু হয়। ব্রিটিশ পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার সে আইনই গ্রহণ করে এবং সর্বশেষ বাংলাদেশেও তারই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশ শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন স্বার্থকে রক্ষা করে সর্বপ্রথম "শিশু আইন ১৯৭৪" নামে একটি আইন প্রণয়ন করে। এছাড়াও শিশু স্বার্থ রক্ষা করে আরো কিছু আইন এ সময়ে প্রণয়ন করা হয়। যেমনঃ Bangladesh Scout Act 1972, Girls Guide Act 1973, Shishu Academy Act 1976 প্রভৃতি। এসকল আইন ও বিধির আলোকে বাংলাদেশে প্রথম কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় জুন, ১৯৭৮ সালে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে। বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ এবং শিশু বিধি ১৯৭৬ এর বিধান অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে একটি কিশোর আদালত, একটি রিমান্ড হোম এবং একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এই তিন স্তরের কার্যক্রম নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়। শুরু থেকেই ১৬ বছরের নিচে শিশু-কিশোরের বিচার, নিরাপদ হেফাজত, সুরক্ষা, চিকিৎসা এবং কিশোর ও তরুণ অপরাধীদের সংশোধনমূলক কার্যক্রম ছিল এর পরিধিভুক্ত। এটি ঢাকা মেট্রোপলিটন এলকার নিকটর্তী গাজীপুর জেলার টঙ্গী শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। বর্তমানে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানটির ভৌত কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

(১) ইনস্টিটিউটি সর্বমোট তিন একর ৭১ ডেসিমাল জায়গার উপর অবস্থিত।

(২) মোট ৮টি ভবন। প্রশাসনিক ভবন ১টি; কিশোর নিবাসীদের আবাসিক ভবন-৪টি; ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আবাসিক ভবন ২টি, ব্যারাক টিনশেড ১টি এবং অন্যান্য ১টি।

(৩) দ্বিতল বিশিষ্ট আদালত ভবন ১টি।

(৪) অন্যান্য ছোট ভবন ৫টি। প্রহরী কক্ষ ১টি, পাম্প হাউজ ২টি, গ্যারেজ ১টি এবং অন্যান্য ২টি।

(৫) যানবাহন ৩টিঃ মাইক্রোবাস-১টি; মিনবাস-১টি এবং মোটর সাইকেল-১টি

(৬) এছাড়া সেইফহোম শিশুদের জন্য ফুটবল খেলার মাঠ -১টি, শিশুদের জন্য চিলড্রেন কর্ণার-২টি, গভীর নলকূপ -২টি, টিউবওয়েল-১টি।

১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ধারা ২১ অনুযায়ী নিবাসী শিশু-কিশোরদের বাসস্থানের জন্য মানসম্মত প্রয়োজনীয় সংখ্যক আবাসিক ভবন পাঠদানের জন্য শ্রেণিকক্ষ, প্রশিক্ষণের জন্য কারখানা, শারীরিক অনুশীলন ও খেলা-ধুলার জন্য খেলার মাঠ থাকার কথা বলা হয়েছে। যে সকল আবাসিক ভবনে নিবাসী কিশোর রাত্রিযাপন করে তার সংখ্যা চারটি। এ চারটি ভবনের নাম হলোঃ (১) বঙ্গবন্ধু হাউজ (২) শের-ঈ

বাংলা হাউজ (৩) নজরুল হাউজ এবং (৪) ভাওয়াল হাউজ। নিবাসীদের থাকার জন্য এসকল ভবন পর্যাপ্ত নয়। কারণ প্রত্যেক রুমে কমপক্ষে ৪টি করে খাট রয়েছে। প্রত্যেক খাটে কমপক্ষে ২জন নিবাসী অবস্থান করার কথা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। খাটগুলো সরিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ একরুমে নিবাসীর সংখ্যা এত বেশি যে, প্রায়শই খাট নিয়ে মারামারি হয়। তাই খাট সরিয়ে সবাই ফ্লোরিং করছে।

এখানে কোন রুমেই বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে বৈদ্যুতিক লাইনের অবস্থাও তেমন ভাল না। এখানে স্বতন্ত্র কোন সুইচের ব্যবস্থা নেই। গরমকালে ভেপসা গুমোট আবহাওয়ায় নিবাসীদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। এখানকার নিবাসীরা খেলা-ধুলার ক্ষেত্রেও তাদের প্রতিভা দেখানোর পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পায় না। তারা যে সুযোগ-সুবিধা পায় সেটি কোনক্রমেই যথাযথ নয়। এখানে প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে উল্লেখ করার মত ক্রিকেট মাঠ, ব্যাডমিন্টন কোট সহ একটি ফুটবল মাঠ রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে প্রতিষ্ঠানের নিবাসীরা সঠিকভাবে তাদের বিনোদনমূলক কার্যক্রম উপভোগ করতে পারে না।

টঙ্গীতে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ২০১৮ সালের আগষ্ট পর্যন্ত প্রায় ১০৩৬১ টি শিশুর বিচার কিশোর আদালতে হয়েছে, ৭২৭৬ জন সংশোধনের সুযোগ পেয়েছে এবং সংশোধন শেষে মোট ১৭৯৫৪ জন মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে।[৬] নিম্নোক্ত সারণীসমূহে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) টঙ্গী, গাজীপুর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

সারণী-৩৫: নিবাসী শিশু-কিশোরদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ[৭]

	খাত	টাকার পরিমাণ
১	খাদ্য, দুধ, জ্বালানী	২৫০০ টাকা
২	শিক্ষা ও খেলা-ধুলা সামগ্রী	২০০ টাকা
৩	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	২০০ টাকা
৪	সাধারণ পোশাক সামগ্রী	৩০০ টাকা
৫	চিকিৎসা	১০০ টাকা
৬	তেল, সাবান ও প্রসাধনী	২০০ টাকা
	মোট	৩৫০০ টাকা

শিশুদের সামগ্রিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারের পক্ষ হতে প্রতিমাসে নিবাসীদের মাথাপিছু বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০১৯ সালে মাথাপিছু বরাদ্দ ২৬০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। উপরোক্ত

৬. সূত্র: *মাসিক প্রতিবেদন*, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর, প্রতিবেদন কাল: জুলাই, ২০২০খ্রি.
৭. *এক নজরে দৈনিক সূচী বোর্ড*, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর, জুলাই, ২০২০খ্রি.

সারণীতে দেখা যায় যে, নিবাসীদের মাথাপিছু খাদ্য, দুধ ও জ্বালানী বাবদ ২৫০০ টাকা এবং অন্যান্য ১০০০ টাকাসহ মোট বরাদ্দ ৩৫০০ টাকা। এ বরাদ্দ দিয়েই শিশু-কিশোরদের যাবতীয় সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্লোক্ত ৩৬ ও ৩৭ নং সারণীতে নিবাসীদের প্রাত্যহিক কর্মসূচী ও প্রাত্যহিক খাদ্য তালিকা দেখানো হলো-

সারণী-৩৬: নিবাসীদের প্রাত্যহিক কর্মসূচী[৮]

	গ্রীষ্মকালীন সময়	শীতকালীন সময়	কাজের ধরন
১	সকাল ৫.০০ থেকে ৮.০০	সকাল ৬.০০ থেকে ৮.০০পর্যন্ত	ফজর নামাজ আদায় ও রুম গোছানো
২	সকাল ৮.০০ থেকে ৯.০০ পর্যন্ত	সকাল ৮.০০ থেকে ৯.০০পর্যন্ত	গোসল, সকালের নাস্তা, এসেম্বলীর জন্য প্রস্তুতি, শারীরিক
৩	সকাল ৯.০০ থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত	সকাল ৯.০০ থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত	এসেম্বলী, স্কুল ও ট্রেড গমন
৪	সকাল ৯.৩০ থেকে ১.০০ পর্যন্ত	সকাল ৯.৩০ থেকে ১.০০ পর্যন্ত	সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ, ডরমেটরীতে অবসন্থানরত অন্যান্য নিবাসীদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম, কেইসওয়ার্ক, কায়িক শ্রম ও বাগান পরিচর্যা
৫	দুপুর ১.০০ থেকে ২.০০ পর্যন্ত	দুপুর ১.০০ থেকে ২.০০ পর্যন্ত	যুহর নামাজ ও দুপুরের খাবার
৬	দুপুর ২.০০ থেকে ৩.০০ পর্যন্ত	দুপুর ২.০০ থেকে ২.৩০ পর্যন্ত	টিভি দেখা ও ইনডোর গেমস
৭	দুপুর ৩.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত	দুপুর ২.৩০ থেকে ৪.৪৫ পর্যন্ত	আউটডোর গেমস, কেইস ওয়ার্ক, কায়িক শ্রম, বাগান পরিচর্যা (হাউজে অবস্থানরত শিশু-কিশোরদের ইনডোর গেমস ও আসরের নামাজ)
৮	বিকাল ৬.০০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত	বিকাল ৪.৪৫ থেকে ৫.০০ পর্যন্ত	আছর নামাজ ও ইনডোর গেমস
৯	সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.১৫ পর্যন্ত	বিকাল ৫.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত	মাগরিব নামাজ ও প্রার্থনা
১০	রাত ৭.১৫ থেকে ১০.০০ পর্যন্ত	বিকাল ৬.০০ থেকে ১০.০০ পর্যন্ত	রাতের খাবার, স্কুলের পাঠ প্রস্তুতি, হোম ওয়ার্ক, এশার নামাজ, টিভি দেখা, ঘুমানো।

৮. সূত্র: *মাসিক প্রতিবেদন*, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর, প্রাগুক্ত

সারণী-৩৭: নিবাসীদের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা[৯]

নিবাসীদের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা				
বার	সকালের নাস্তা	দুপুরের খাবার	বিকালের নাস্তা	রাতের খাবার
শনিবার	ভাত ও আলু ভর্তা	ভাত, সবজি, মাছ ও ডাল	মুড়ি ও চানাচুর	ভাত, সবজি, মুরগীর মাংস ও ডাল
রবি	ভাত ও ডাল	ভাত, সবজি, মুরগীর মাংস ও ডাল	কলা	ভাত, সবজি ও ডাল
সোম	ভাত ও আলু ভর্তা	ভাত, সবজি, ডিম ও ডাল	বনরুটি	ভাত, সবজি, মুরগীর মাংস ও ডাল
মঙ্গল	ভাত ও ডাল	ভাত, সবজি, মাছ ও ডাল	সিঙ্গারা	ভাত, সবজি ও ডাল
বুধ	ভাত ও আলু ভর্তা	ভাত, সবজি, গরুর মাংস ও ডাল	মুড়ি ও চানাচুর	ভাত, সবজি, ডিম ও ডাল
বৃহস্পতি	খিচুরী	ভাত, সবজি, ডিম ও ডাল	কলা	ভাত, সবজি ও দুধ চিনি
শুক্র	ভাত ও ডাল	ভাত, সবজি, মুরগীর মাংস ও ডাল	সিঙ্গারা	ভাত, সবজি, ডিম ও ডাল

প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে এ কেন্দ্রের নিবাসীদের জন্য আসন সংখ্যা ছিল ২০০ টি। পরবর্তীতে আরো ১০০টি আসন বৃদ্ধি করে ৩০০ আসন অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে এ আসন সংখ্যার বিপরীতে প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশু-কিশোর নিবাসীর পরিসংখ্যান নিম্নোক্ত সারণীতে দেখানো হলো-

সারণী-৩৮: টঙ্গী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের কেইস ভিত্তিক পরিসংখ্যান[১০]

নিবাসীদের কেইস ভিত্তিক পরিসংখ্যান		
অনুমোদিত আসন সংখ্যা Approved Seat Arrangement		৩০০ অনুমোদিত
সংশোধনী Correction	অভিভাবক কেইস (Petition)	০০
	জি.আর কেইস (G.R)	১১
কিশোর হাজত Remand	অভিভাবক কেইস (Petition)	০০
	জি.আর কেইস (G.R)	৫৬৫
উপস্থিত নিবাসী সংখ্যা Present Total		৫৭৬
ছুটিতে অবস্থানরত		–
মোট শিশুর সংখ্যা =		৫৭৬ জন

৯. *প্রাগুক্ত*
১০. *প্রাগুক্ত*

উপরোক্ত টেবিলে দেখা যায় যে, বর্তমান সময়ে অভিভাবক কেইসের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য এবং গবেষণা কর্ম পরিচালনাকালীন সময়ে অভিভাবক কেইস একটিও ছিল না। অথচ একসময় অভিভাবকগণই তাদের বিচ্যুত বা অপরাধপ্রণ কিশোরদেরকে সংশোধনের জন্য এখানে ভর্তি করাতেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা লাভ করা যায় (সারণী-৩৩: The Present Position and Description of three KUKs) ৩৩নং সারণীতে। বিপরীত দিকে পুলিশ কেইসের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক সময় যা অভিভাবক কেইসের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে পুলিশ কেইসের সংখ্যাই বেশি এবং গবেষণাকালে কেন্দ্রে শুধুমাত্র পুলিশ কেইসের নিবাসীদেরকেই পাওয়া যায়। উপরোক্ত ৩৮ নং সারণীতে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। নিম্নোক্ত টেবিল থেকে টঙ্গী কেন্দ্রের নিবাসীদের গত তিন বছরের বিভিন্ন অপরাধের চিত্র পাওয়া যায়:

সারণী-৩৯: টঙ্গী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের অপরাধের ধরন[১১]

অপরাধের ধরণ	২০১৭	২০১৮	২০১৯
হত্যা	৩০	২৫	৫৭
অস্ত্র মামলা	১৮	১৪	২৯
নারী ও শিশু নির্যাতন	৩২	২৫	৬৫
মাদক সংক্রান্ত	৩৫	৫১	৬০
চুরি/ছিনতাই	১৩০	১৯০	১২০
ডাকাতি	১১	১১	৩১
বিশেষ ক্ষমতা আইন	১১	১০	৭১
মারামারি	৪৭	৫৬	৮৫
অভিভাবক কেস	৪০	৩৬	০০
সাধারণ ডায়রি	৩০	৩১	১৯
সেফ কাস্টডি	৪	৫	১৮
সন্দেহজনক	১৯	১৬	২১
মোট	৪০৭	৪৭০	৫৭৬

উপরের টেবিলে ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের অপরাধের ধরনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। ২০১৯ সালে দেখা যায় যে, সর্বোচ্চ ১২০টি চুরির ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে ১৯০টি চুরির ঘটনা ২০১৮ সালের সর্বোচ্চ অপরাধ। ২০১৭ সালেও চুরির ঘটনাই ছিল সর্বোচ্চ কিন্তু এর সংখ্যা ছিল ২০১৮ সালের চেয়ে ৬০টি কম। মাদক সংক্রান্ত অপরাধ ও মারামারির ঘটনা প্রতিবছরই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি

১১. *এক নজরে দৈনিক সূচী বোর্ড*, প্রাগুক্ত

পাচ্ছে। বিপরীতদিকে অভিভাবক কেসের সংখ্যা ধারাবাহিতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। আরো লক্ষণীয় যে, আশংকাজনক হারে মোট অপরাধের সংখ্যা প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রটি ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত এ কেন্দ্রে মোট ১৮৫৩৯ জন শিশু-কিশোর সংশোধন ও উন্নয়নের নিমিত্তে ভর্তি হয়। ভর্তির পরে এ উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে উক্ত শিশু-কিশোরদের মধ্যে সংশোধন ও উন্নয়ন শেষে পুনর্বাসিত হয়ে আবার নিজ পরিবার ও সমাজের সাথে একীভূত হয় ১৭৯৫৪ জন শিশু-কিশোর। নিমোক্ত সারণীতে এ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থান করা হলোঃ

সারণী-৪০: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশু-কিশোরের সংখ্যা[১২]

প্রতিষ্ঠানের নাম	শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশু-কিশোরের সংখ্যা	
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) টঙ্গী, গাজীপুর	অভিভাবক কেইস	৭৪৮৮ জন
	পুলিশ কেইস	১০৮৭১ জন
	মোট	১৮৩৫৯ জন

সারণী-৪১: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত শিশু-কিশোরের সংখ্যা[১৩]

প্রতিষ্ঠানের নাম	শুরু থেকে এ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত শিশু- কিশোরের সংখ্যা	
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) টঙ্গী, গাজীপুর	অভিভাবক কেইস	৭২৭৬ জন
	পুলিশ কেইস	১০৩৬১জন
	প্রবেশন	৩১৭ জন
	মোট	১৭৯৫৪ জন

উপরোক্ত সারণী দু'টিতে দেখা যায় যে, ১৯৭৮ সালে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন ও সংশোধন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত অভিভাবক কেইস ৭৪৮৮ জন এবং পুলিশ কেইস ১০৮১৭ জন, সর্বমোট ১৮৩৫৯ জন নিবাসীকে ভর্তি করে সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ১০৩৬১ জন শিশু-কিশোরের বিচার কিশোর আদালতে শেষ হয়েছে, ৭২৭৬ জন শিশু-কিশোর সংশোধনের সুযোগ পেয়েছে এবং ৩১৭ জন শিশু-কিশোর প্রবেশন ব্যবস্থায় সংশোধিত হয়েছে। সবমোট ১৭৯৫৪ জন সংশোধিত হয়ে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে।

১২. *মাসিক প্রতিবেদন*, প্রাগুক্ত
১৩. *প্রাগুক্ত*

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) টঙ্গী, গাজীপুরে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল নিবাসীর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বিশেষ ব্যবস্থায় ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ দানেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ থাকলেও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে সবার। জেডিসি, এসএসসি, এইচএসসি পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থী থাকলে সংশ্লিষ্ট আদালত, বোর্ড এবং কেন্দ্রর সাথে সমন্বয় সাধন করে মামলা ও অপরাধের ধরন অনুসারে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে অথবা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এখানে রয়েছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। নিম্নোক্ত টেবিল দু'টিতে অত্র কেন্দ্রের নিবাসীদের প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের বিবরণ প্রদান করা হলো:

সারণী-৪২: সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে মোট শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা[১৪]

১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত		
প্রতিষ্ঠানের নাম	শ্রেণি	ছাত্র সংখ্যা
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) টঙ্গী, গাজীপুর	১ম শ্রেণি	৩০ জন
	২য় শ্রেণি	৩১ জন
	৩য় শ্রেণি	৩৭ জন
	৪র্থ শ্রেণি	৪৪ জন
	৫ম শ্রেণি	৩৮ জন
	মোট	১৮০ জন

সারণী-৪৩: বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা[১৫]

কেন্দ্রের নাম: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর।		
ক্রমিক	ট্রেডের ধরন	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	অটো মোবাইল ট্রেড	২০ জন
২	কাঠ শিল্প ট্রেড	২০ জন
৩	ইলেকট্রিড ট্রেড	২০ জন
৪	দর্জিবিজ্ঞান ট্রেড	২০ জন
৫	মোট প্রশিক্ষণরত	৮০ জন

১৪. *মাসিক প্রতিবেদন*, *প্রাগুক্ত*
১৫. *প্রাগুক্ত*

উপরোক্ত আলোচনা এবং সারণীতে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা থেকে বলা যায় যে, টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশের প্রথম উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংশোধন ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা, কিশোর আদালত, রিমান্ড হোম বা কিশোর হাজত ও সেইফ হোম পরিচালনা, বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পশিক্ষণ প্রদান, উদ্বুদ্ধকরণ (Motivation), পরামর্শ প্রদান (Counseling), সামাজিকীকরণ (Socialization), আচার-ব্যবহারের উন্নয়ন, পরিবার পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান, গৃহ পরিদর্শন (Home Visit), দলীয় কার্যক্রম (Group Work) পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে অপরাধী নিবাসী কিশোরের সংশোধন ও উন্নয়ন সাধন করে পরিবার ও সমাজে পুনএকত্রীকরণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত (জুন-২০২০) ১৮৩৫৯ জন বিভিন্ন ধরনের অপরাধী নিবাসীকে ভর্তি ও সেবা প্রদান করেছে এবং ১৭৯৫৪ জন নিবাসী কিশোর অপরাধীকে সংশোধিত করে পরিবার ও সমাজে পুনর্বাসিত করেছে।

২। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোর

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), পুলেরহাট, যশোর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর যশোর সদর উপজেলার পুলের হাটে এই কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে এখানে অনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের চারটি বিভাগের ৩২টি জেলার আইনের সাথে সংঘর্ষে অথবা সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিচার কাজে সহায়তা, রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, লালন-পালন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিম্নে সংক্ষেপে কেন্দ্রের সার্বিক বিবরণ তুলে ধরা হলো:[১৬]

১। কেন্দ্রের নাম	:	কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), পুলেরহাট, যশোর।		
২। প্রশাসনিক দফতর	:	সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।		
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
৪। প্রতিষ্ঠার তারিখ	:	২৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ খ্রি.		
৫। কার্যক্রম শুরুর তারিখ	:	অক্টোবর, ১৯৯৫ খ্রি.		
৬। জমির পরিমাণ	:	৫.২২ একর		
৭। অনুমোদিত আসন সংখ্যা	:	১৫০ জন		
৮। অধিক্ষেত্র	:	প্রশাসনিক বিভাগ	৪টি	খুলনা বরিশাল রাজশাহী রংপুর
		প্রশাসনিক জেলা	৩২টি	
		উপজেলা	২২০টি	
৯। কেন্দ্রে আগত কিশোরের ধরন	:	(ক) আইনের সংস্পর্শে আসা/ আইনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত শিশু-কিশোর (খ) সংশোধনীতে		
০১০। শিশুর অবস্থান কাল	:	৯ থেকে ১৮ বছরের শিশু বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে অত্র কেন্দ্রে আগমন করে। আটককৃত বা সংশোধনরত শিশু অনুর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কেন্দ্রে অবস্থান করে।		
১১। কেন্দ্রের অবকাঠামোগত	:	(ক) প্রশাসনিক ও কিশোর আদালত ভবন (খ) বিচারাধীন ভবন: ডরমেটরি -১ ও ডরমেটরি-২		

১৬. সূত্র: *মাসিক প্রতিবেদন*, জুলাই ,২০২০খ্রি, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলেরহাট , যশোর।

বিন্যাস		(গ) স্কুল ও প্রশিক্ষণ ভবন (ঘ) রান্নাঘর ও গুদাম (ঙ) গ্যারেজ ও ড্রাইভার কক্ষ (চ) প্লে গ্রাউন্ড।
১২। নিরাপত্তা ব্যারাক	:	৩ তলা ভবন (০১) একটি
১৩। আবাসিক কোয়ার্টার	:	১। ৪ তলা ভবন ১টি, ইউনিট-১৬টি। ২। ৩ তলা ভবন ২টি, ইউনিট ৩টি করে। ৩। ২ তলা ভবন ১টি, ইউনিট ২টি।
১৪। সাধারণ শিক্ষা	:	১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত।
১৫। কারিগরি প্রশিক্ষণ	:	(ক) অটোমোবাইল (খ) ওয়েল্ডিং (গ) ইলেকট্রিকাল (ঘ) ইলেকট্রনিক্স (ঙ) সেলাই প্রশিক্ষণ

প্রতিষ্ঠাকালীন ১৯৯৫ সালের জনবলকাঠামো অনুসারে এ প্রতিষ্ঠানের মোট জনবলের সংখ্যা ৪৯ জন। তন্মধ্যে বর্তমানে ৩৫ জন কর্মরত আছেন এবং ১৪ টি পদ শূন্য রয়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে এ সম্পকির্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো-

সারণী-৪৪: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পুলের হাট যশোরের জনবল কাঠামো ও বর্তমান কর্মরত জনবলের বিবরণ[১৭]

ক্রমিক	পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ	মন্তব্য
১	সহকারি পরিচালক	০১টি	০১ জন	নাই	
২	সহ. তত্ত্বাবধায়ক	০১টি	০১ জন	নাই	
৩	প্রবেশন অফিসার	০১টি	০১ জন	নাই	
৪	প্রসিকিউশন অফিসার	০১টি	নাই	০১টি	
৫	সোসাল কেইস ওয়ার্কার	০২টি	নাই	০২টি	
৬	হাউজ প্যারেন্ট	০১টি	কর্মরত	০১টি	অতি.দায়িত্ব
৭	স্টোনো টাইপিস্ট	০১টি	০১ জন	নাই	
৮	কারিগরি প্রশিক্ষক	০৪টি	০৪ জন	নাই	১জন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রাজশাহীতে প্রেষণে কর্মরত আছেন।

১৭. সূত্র: *মাসিক প্রতিবেদন*, প্রাগুক্ত

৯	প্রধান শিক্ষক (অস্থায়ী)	০১টি	০১ জন	নাই	
১০	ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর	০১টি	০১ জন	নাই	
১১	অফিস সহকারি	০১টি	০১ জন	নাই	
১২	বেঞ্চ সহকারি	০১টি	০১ জন	নাই	
১৩	স্টোর কিপার	০১টি	০১ জন	নাই	
১৪	জি.আর.ও	০১টি	নাই	০১টি	
১৫	কম্পাউন্ডার	০১টি	০১ জন	নাই	
১৬	ধর্মীয় শিক্ষক	০১টি	০১ জন	নাই	
১৭	সহকারি শিক্ষক	০৪টি	০৩ জন	০১টি	
১৮	ড্রাইভার	০১টি	নাই	০১টি	
১৯	লিটারেট কন্সটেবল	০১টি	নাই	০১টি	
২০	হেড গার্ড	০১টি	নাই	০১টি	
২১	ওয়ার্ডার	০৬টি	০৫ জন	০১টি	
২২	গার্ড	০৮টি	০৪ জন	০৪টি	
২৩	ম্যাসেঞ্জার	০৩টি	০৩ জন	নাই	
২৪	মালী	০১টি	০১ জন	নাই	
২৫	বাবুর্চী	০২টি	০২ জন	নাই	
২৬	সুইপার	০২টি	০২ জন	নাই	
		মোট-৪৯টি	মোট-৩৫ জন	মোট-১৪ জন	

জনবল কাঠামোর বিবরণ থেকে দেখা যায় যে, জনবলকাঠামো নীতিমালা অনুযায়ী এ প্রতিষ্ঠানে ৪৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী-স্ট্যাফ থাকার কথা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এখানে কর্মরত রয়েছে মাত্র ৩৫ জন। এখানকার ১৪টি পদই শূন্য রয়েছে। এই জনবল দিয়েই প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। নিম্নে এ প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হলো:

সারণী-৪৫: একনজরে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোরে অবস্থানরত শিশু-কিশোরদের পরিসংখ্যান:[১৮]

বয়সের শ্রেণিবিভাগ			১	৫-৮ বছর	৯-১২ বছর	১৩-১৬ বছর	১৭-১৮ বছর	১৮ বছরের উর্ধ্বে	বয়স উল্লেখ নেই	সর্বমোট
মাসের প্রথম দিন কেন্দ্রের শিশু সংখ্যা	বিচারাধীন	অপঃ জড়িত	২	-	১৯	১৪৯	৮৫	০০	০৬	২৫৯
		নিরাপদ হেফাজতী	৩	-	০৪	০১	-	-	০২	০৭
	মেয়াদপ্রাপ্ত		৪	-	-	০৪	০৪	-	-	০৮
	মোট		৫		২৩	১৫৪	৮৯		৮	২৭৪
সারা মাসে নতুন ভর্তি	বিচারাধীন	অপঃ জড়িত	৬	-	০৫	৭১	৩৭	-	১১	১২৪
		নিরাপদ হেফাজতী	৭	-	-	-	-	-	-	-
	মেয়াদপ্রাপ্ত		৮	-	-	-	-	-	-	-
	মোট		৯	-	০৫	৭১	৩৭	-	১১	১২৪
সারা মাসে মুক্তি	বিচারাধীন	অপঃ জড়িত	১০	-	০৭	৬৪	৪০	-	০৮	১১৯
		নিরাপদ হেফাজতী	১১	-	-	-	-	-	-	-
	মেয়াদপ্রাপ্ত		১২	-	-	-	-	-	-	-
	মোট		১৩	-	০৭	৬৪	৪০	-	০৮	১১৯
মাস শেষে স্থিতি	বিচারাধীন	অপঃ জড়িত	১৪	-	১৯	১৪৬	৮৫		০৫	২৫৫
		নিরাপদ হেফাজতী	১৫	-	০৪	০১	-	-	০১	০৬
	মেয়াদপ্রাপ্ত		১৬	-	-	০৪	০৪	-	-	০৮
	মোট		১৭		২৩	১৫১	৮৯		৬	২৬৯

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যশোরের জুলাই ২০২০খ্রি. মাস শেষে নিবাসীদের স্থিতি দাঁড়িয়েছে সারা মাসে কেন্দ্রে আগমন ১২৪ জন, সারা মাসে কেন্দ্র ও কোর্ট থেকে মুক্তি ১১৯ জন এবং মাস শেষে স্থিতি ২৬৯ জন।[১৯] উন্নয়ন কেন্দ্র ১৯৯৫ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে বর্তমান সময় (২১/৭/২০২০) পর্যন্ত এ কেন্দ্রে মোট আগত শিশুর সংখ্যা ১২০৫০ জন। ভর্তির পরে সংশোধন ও উন্নয়ন শেষে পুনর্বাসিত হয়ে আবার নিজ পরিবার ও সমাজের সাথে একীভূত হয় ১১৭৮১ জন শিশু-কিশোর। নিম্লোক্ত টেবিলে এ সম্পর্কিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো:

---

১৮. *প্রাগুক্ত*

১৯. *প্রাগুক্ত* (উল্লেখ্য যে, সরেজমিন প্রত্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, প্রতিদিনই কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে নিবাসীদের আগমন ও কেন্দ্রসমূহ হতে নিবাসীদের মুক্তির ফলে কেন্দ্রে অবস্থারত নিবাসীদের মোট সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে- গবেষক।)

আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত/ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের বয়সভিত্তিক তথ্যাবলী নিম্নোক্ত সারণীতে প্রদত্ত হলো-

সারণী-৪৬: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যশোর, নিবাসীদের বয়সভিত্তিক পরিসংখ্যান[২০]

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা	বয়স ভিত্তিক নিবাসীর পরিসংখ্যান		
		বয়স	সংখ্যা	শতকরা
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পুলেরহাট, যশোর।	২৬৯ জন	০৯ বছরের নিচে	০০ জন	০.০০%
		০৯ থেকে ১২ বছর	২৩ জন	৮.৫৫%
		১৩ থেকে ১৬ বছর	১৫১ জন	৫৬.১৩%
		১৭ থেকে ১৮ বছর	৮৯ জন	৩৩.০৮%
		১৮ বছরের উর্ধ্বে	০০ জন	০.০০%
		বয়স উল্লেখ নেই	০৬ জন	২.২৩%
		সর্বমোট	২৬৯ জন	১০০%

উপরোক্ত বয়সভিত্তিক নিবাসীদের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৩ থেকে ১৬ বছরের কিশোর অপরাধের সাথে সবচেয়ে বেশি জড়িত হচ্ছে। সর্বমোট কিশোর অপরাধীর অর্ধেকেরও বেশি এই বয়সী কিশোর। দেখা যায় শতকরা প্রায় ৫৩.০১ ভাগের বয়স ১৩ থেকে ১৬ এর মধ্যে। এরপরে রয়েছে ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরদের অবস্থান। অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৩৪.৬ ভাগ অপরাধী কিশোরের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, বাংলাদেশে শিশু-কিশোরদের মধ্যে ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরই বেশি অপরাধপ্রবণ হয় বা অপরাধের সাথে বেশি জড়িত হয়। অপরাধী কিশোরদের মধ্যে এদের শতকরা হার প্রায় ৮৭.৬১ শতাংশ।

সারণী-৪৭: শুরু থেকে জুন ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশু-কিশারের সংখ্যা[২১]

কেন্দ্রের নাম: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোরের		
ক্রমিক	কেইসের ধরন	নিবাসীর সংখ্যা
১	অভিভাবক কেইস	১৫০৮ জন
২	পুলিশ কেইস	১০৫৪২ জন
৩	মোট	১২০৫০ জন

২০. *মাঠ পর্যায়ে জরিপ কর্ম*, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর, *প্রাগুক্ত*
২১. *প্রাগুক্ত*

সারণী-৪৮: শুরু থেকে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত শিশু-কিশোরের সংখ্যা[২২]

কেন্দ্রের নাম	ক্রমিক	কেইসের ধরন	মুক্তিপ্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোরের	১	অভিভাবক কেইস	১৫০৮ জন
	২	পুলিশ কেইস	১০১৬২ জন
	৩	প্রবেশন	১১১ জন
		মোট	১১৭৮১ জন

উপরোক্ত সারণী দু'টিতে দেখা যায় যে, ১৯৯৫ সালে যশোর কিশোর উন্নয়ন ও সংশোধন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে জুলাই ২০২০ সাল পর্যন্ত অভিভাবক কেইসে ১৫০৮ জন এবং পুলিশ কেইসে ১০৫৪২ জন, মোট ১২০৫০ জন নিবাসীকে ভর্তি করে সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ১০১৬২ জন শিশু-কিশোরের বিচার কিশোর আদালতে শেষ হয়েছে, ১৫০৮ জন শিশু-কিশোর সংশোধনের সুযোগ পেয়ে পরিবার ও সমাজে পুনর্বাসিত হয়েছে এবং ১১১ জন প্রবেশন ব্যবস্থায় সংশোধিত হয়েছে। সবমোট ১১৭৮১ জন সংশোধিত হয়ে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পুলের হাট, যশোরে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল নিবাসীর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ দানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ থাকলেও পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে সবার। জেডিসি, এসএসসি, এইচএসসি পর্যায়ে কোন শিক্ষার্থী থাকলে সংশ্লিষ্ট আদালত, বোর্ড এবং কেন্দ্রর সাথে সমন্বয় সাধন করে মামলা ও অপরাধের ধরন অনুসারে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে অথবা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া এখানে রয়েছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। নিম্নোক্ত টেবিল দু'টিতে অত্র কেন্দ্রের নিবাসীদের প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণের বিবরণ প্রদান করা হলো:

সারণী-৪৯: সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমে মোট শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা (বর্তমান)[২৩]

১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	ক্রমিক	শ্রেণি	ছাত্র সংখ্যা
	১	১ম শ্রেণি	৩০ জন
	২	২য় শ্রেণি	৩২ জন
	৩	৩য় শ্রেণি	৩১ জন
	৪	৪র্থ শ্রেণি	২৮ জন
	৫	৫ম শ্রেণি	২৯ জন
		মোট	১৫০ জন

২২. *প্রাগুক্ত*
২৩. *প্রাগুক্ত*

সারণী-৫০: বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা[২৪]

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের ধরন	সংখ্যা
১	অটো মোবাইল	৪৫ জন
২	ইলেকট্রিকাল	৫৫ জন
৩	সেলাই প্রশিক্ষণ	১১ জন
৪	ওয়েল্ডিং	৩৫ জন
	মোট প্রশিক্ষণরত	১৪৬ জন

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের মোট ২৬৯ জন নিবাসীর মধ্যে শুধু মাত্র ১৪৬ জন নিবাসী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় এসেছে। অবশিষ্ট ১২৩ জন নিবাসী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অথবা তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা প্রকার করেছে। এসকল শিশু-কিশোরকেও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা প্রয়োজন।

সারণী-৫১: মামলার ধরন অনুযায়ী যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীর পরিসংখ্যান[২৫]

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা	মামলার ধরন অনুযায়ী নিবাসীর সংখ্যা		
		মামলার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পুলেরহাট, যশোর।	২৬৯ জন	হত্যা মামলা	৯০ জন	৩৩.৪৬%
		নারী ও শিশু নির্যাতন	৭৪ জন	২৭.৫১%
		মাদক দ্রব্য	৫০ জন	১৮.৫৯%
		বিশেষ ক্ষমতা আইন	০৫ জন	১.৮৬%
		অস্ত্র মামলা	০৯ জন	৩.৩৫%
		চুরি মামলা	১৮ জন	৬.৬৯%
		সাজাপ্রাপ্ত	০৮ জন	২.৯৭%
		তথ্যপ্রযুক্তি আইন	০২ জন	০.৭৪%
		নিরাপদ হেফাজতী	০৭ জন	২.৬০%
		অন্যান্য	০৬ জন	২.২৩%
		সর্বমোট	২৬৯ জন	১০০%

২৪. *মাঠ পর্যায়ে জরিপ কর্ম*, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর, *প্রাগুক্ত*
২৫. *প্রাগুক্ত*

উপরোক্ত মামলার ধরন অনুযায়ী নিবাসীর পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, হত্যা মামলা, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাপধের সাথে কিশোররা সবচেয়ে বেশি জড়িত হচ্ছে। এর পরেই রয়েছে চুরি সংক্রান্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্টতা। পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, অপরাধী কিশোরদের মধ্যে ৩৩.৪৬% কিশোর হত্যা, ২৭.৫১ % কিশোর নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ১৮.৫৯% কিশোর মাদকদ্রব্য অপরাধের সাথে জড়িত। এছাড়া চুরি সংক্রান্ত নানা অপরাধের সাথে জড়িত শিশু-কিশোরের সংখ্যাও নেহাত কম নয়, প্রায় ৬.৬৯%। অতএব দেখা যায় যে, শিশু-কিশোরের অপরাধপ্রবণতা এখন আর বিচ্যুত আচরণ বা লঘু অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং তারা এখন প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের ন্যায় চুরি-ডাকাতি, হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন ও পাচার, চোরাকারবারি এবং মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত বড়বড় অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে।

সারণী-৫২: উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানের সময় অনুসারে নিবাসীদের পরিসংখ্যান[২৬]

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা	অবস্থানের সময় অনুসারে নিবাসীর সংখ্যা		
		অবস্থানের সময়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পুলেরহাট, যশোর।	২৬৯ জন	০৬ মাসের নিচে	১৬৩ জন	৬০.৫৯%
		০৬মাস থেকে ১ বছর	৫৮ জন	২১.৫৬%
		০১ থেকে ২ বছর	৩২ জন	১১.৯০%
		২ বছরের উর্ধ্বে	১৬ জন	৫.৯৫%
		সর্বমোট	২৬৯ জন	১০০%

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের আগত নিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬০.৫৯ জন নিবাসী এখানে ৬ মাসেরও কম সময় অবস্থান করছে। ৬ মাস থেকে একবছর অবস্থান করছে এমন নিবাসীদের পরিমাণ শতকরা ২১.৫৬ ভাগ। অবশিষ্ট নিবাসীরা একবছর বা তদুর্ধ্ব সময়কাল উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত আছে।

২৬. *প্রাগুক্ত*

সারণী-৫৩: আদালতে হাজিরা ভিত্তিক নিবাসীদের পরিসংখ্যান[২৭]

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা	আদালতে হাজিরা ভিত্তিক নিবাসীর সংখ্যা		
		আদালতে হাজিরা	সংখ্যা	হাজিরা না করার কারণ
কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পুলেরহাট, যশোর।	২৬৯ জন	একবারও হয়নি	১০৪ জন	চলতি মাসে আসা
		০১ বার	১০৬ জন	
		০২বার	৪২ জন	
		০৩ বার বা তার অধিক	১৭ জন	
		সর্বমোট	২৬৯ জন	

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোরের প্রশাসনিক এলাকা হলো খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ৩২টি জেলা এবং এর অন্তর্গত সকল উপজেলা। কিন্তু কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে সরেজমিনে দেখা যায় যে, প্রায় ৬৪ জেলার অপরাধী কিশোর নিবাসী এ কেন্দ্রে অবস্থান করছে। নিম্নোক্ত সারণীতে জেলা ভিত্তিক অপরাধী শিশুদের বিবরণ উপস্থাপন করা হলো-

সারণী-৫৪: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোরে অবস্থানরত শিশু-কিশোরের জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান:[২৮]

ক্রমিক	জেলার নাম	আদালতভিত্তিক শিশুর সংখ্যা	ঠিকানাভিত্তিক শিশুর সংখ্যা	মন্তব্য
১	খুলনা	১৬	১২	আদালতভিত্তিক শিশু হলো ঐ সকল শিশু যাদের বিচার উক্ত জেলার আদালতের অধীন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আর ঠিকানাভিত্তিক শিশু হলো, যে জেলায় শিশুর ঠিকানা রয়েছে।
২	বাগেরহাট	৪	৪	
৩	সাতক্ষীরা	১২	১১	
৪	কুষ্টিয়া	৯	৯	
৫	চুয়াডাঙ্গা	৩	২	
৬	মেহেরপুর	-	-	
৭	যশোর	১৪	১৩	
৮	ঝিনাইদহ	৫	৫	
৯	নড়াইল	৩	৪	
১০	মাগুড়া	২	২	
১১	বরিশাল	৭	১২	
১২	ঝালকাঠি	৪	৫	
১৩	পিরোজপুর	৪	৫	
১৪	পটুয়াখালী	১০	৯	

২৭. *মাঠ পর্যায়ে জরিপ কর্ম*, প্রাগুক্ত
২৮. *মাসিক প্রতিবেদন*, প্রাগুক্ত

১৫	বরগুনা	১০	১০	
১৬	ভোলা	৭	৭	
১৭	রাজশাহী	১৫	১৪	
১৮	নাটোর	১০	১১	
১৯	নওগাঁ	১৩	১০	
২০	চাপাইনবাবগঞ্জ	৪	৪	
২১	পাবনা	৭	৭	
২২	সিরাজগঞ্জ	১	১	
২৩	বগুড়া	১১	১৪	
২৪	জয়পুরহাট	২	২	
২৫	রংপুর	১১	১১	
২৬	গাইবান্ধা	১০	৯	
২৭	লালমনিরহাট	৫	৫	
২৮	নীলফামারী	৭	৬	
২৯	কুড়িগ্রাম	৪	৫	
৩০	দিনাজপুর	১০	১০	
৩১	ঠাকুরগাঁও	১৩	১০	
৩২	পঞ্চগড়	৫	৫	
৩৩	ঢাকা	৪	২	
৩৪	নারায়নগঞ্জ	২	-	
৩৫	মানিকগঞ্জ	-	-	
৩৬	নরসিংদী	১	১	
৩৭	গাজীপুর	২	৩	
৩৮	মুন্সিগঞ্জ	-	১	
৩৯	ময়মনসিংহ	-	১	
৪০	নেত্রকোণা	-	১	
৪১	কিশোরগঞ্জ	১	২	
৪২	জামালপুর	-	১	
৪৩	শেরপুর	-	১	
৪৪	টাংগাইল	-	১	
৪৫	ফরিদপুর	৭	৫	
৪৬	রাজবাড়ী	-	-	
৪৭	গোপালগঞ্জ	৫	৫	
৪৮	মাদারীপুর	-	-	
৪৯	শরীয়তপুর	১	১	
৫০	চট্টগ্রাম	৪	২	

৫১	কক্সবাজার	১	১	
৫২	রাংগামাটি	-	-	
৫৩	বান্দরবন	-	১	
৫৪	খাগড়াছড়ি	১	১	
৫৫	কুমিল্লা	-	১	
৫৬	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	-	১	
৫৭	চাঁদপুর	-	-	
৫৮	নোয়াখালী	-	-	
৫৯	লক্ষীপুর	-	-	
৬০	ফেণী	-	-	
৬১	সিলেট	১	-	
৬২	সুনামগঞ্জ	-	-	
৬৩	মৌলভীবাজার	১	১	
৬৪	হবিগঞ্জ	-	-	
৬৫	অজ্ঞাত		০১ জন	
		২৬৯ জন	২৬৯ জন	

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) পুলের হাট, যশোরে অবস্থানরত অপরাধপ্রবণ বা অপরাধী কিশোরদের জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এখানে খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মোট ৩২ টি জেলার ২২০টি উপজেলা অধিক্ষেত্র হিসেবে থাকলেও বাংলাদেশের প্রায় ৬৪ জেলা থেকে অপরাধী শিশু-কিশোর নিবাসী এখানে আগমন করে। প্রত্যেকটি উন্নয়ন কেন্দ্রের চিত্রই প্রায় অভিন্ন। এর ফলে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র থাকলেও প্রত্যেক উন্নয়ন কেন্দ্রেই প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রের বাইরের নিবাসী রয়েছে। ফলে এখানে প্রশাসনিক কার্যক্রমে অনেক সময় জটিলতা ও স্থবিরতা দেখা দেয়। বিশেষ করে অপরাধী শিশু-কিশোরদেরকে সংশ্লিষ্ট জেলার আদালতে হাজিরা প্রদানের ক্ষেত্রে সময়ের দীর্ঘসূত্রিতা ও নানাবিধ প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়।

৩। কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর

অন্যান্য শিশু-কিশোরদের ন্যায় মেয়ে শিশু ও কিশোরীদের সুরক্ষা, প্রতিপালন, নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য বিশেষ করে অপরাধপ্রবণ ও সুবিধাবঞ্চিত কিশোরীদের সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে একটি কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন ও উন্নয়ন কেন্দ্র। ঢাকার অদূরে শিল্পাঞ্চল জেলাখ্যাত গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে এ কেন্দ্রটি অবস্থিত। অন্যন্য কেন্দ্রের ন্যায় এ কেন্দ্রটিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদফতরের অধীন পরিচালিত হয়। অপরাধপ্রবণ ও সুবিধাবঞ্চিত বালিকা বা কিশোরীদের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'শিশু আইন, ১৯৭৪', 'জাতীয় শিশু নীতি, ১৯৭৬' এবং 'জাতি সংঘের শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০০২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অফিসিয়াল নাম শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বলিকা), কোনাবাড়ী, গাজীপুর। এর আসন সংখ্যা ১৫০ টি।

বর্তমানে (২০/৭/২০২০ খ্রি. তারিখ) এখানে অবস্থানরত মোট নিবাসীর সংখ্যা ৮২ জন। এটিই একমাত্র উন্নয়ন কেন্দ্র যেখানে আসনের চেয়ে নিবাসীদের সংখ্যা অনেক কম। বালক উন্নয়ন কেন্দ্র দু'টিতে আসনের প্রায় দ্বিগুণ নিবাসী থাকলেও এখানে এর ব্যতিক্রম। কোনাবাড়ীতে ২০০২ সালে সংশোধনী প্রতিষ্ঠানটি চালু হবার পর থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট গার্ডিয়ান কেইসে ৩৯৫ জন, পুলিশ কেইস ৫১৪ জন শিশু (বালিকা) এখানে ভর্তি হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৯ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৭৫ টি শিশুর বিচার কিশোর আদালতে সম্পন্ন হয়েছে, ৪৪০ জন সংশোধনের সুযোগ পেয়েছে এবং সংশোধন শেষে মোট ৮২৭ জন মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে।[২৯] নিম্নে সংক্ষেপে কেন্দ্রের সার্বিক তথ্য তুলে ধরা হলো:[৩০]

১। কেন্দ্রের নাম	:	কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।
২। প্রশাসনিক দফতর	:	সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা।
৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। প্রতিষ্ঠার তারিখ	:	২০০২ খ্রি.
৫। কার্যক্রম শুরুর তারিখ	:	২০০৩ খ্রি.
৬। জমির পরিমাণ	:	৪.১৫ একর
৭। অনুমোদিত আসন সংখ্যা	:	১৫০ জন

২৯. সূত্র: *মাসিক প্রতিবেদন*, প্রতিবেদন কাল: জুন, ২০২০খ্রি. কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।
৩০. *প্রাগুক্ত*

৮। অধিক্ষেত্র	:	প্রশাসনিক বিভাগ	৭টি	ঢাকা, চট্টগ্রাম খুলনা, বরিশাল রাজশাহী, সিলেট ও রংপুর
		প্রশাসনিক জেলা	৬৪টি	
		উপজেলা	সকল	
৯। কেন্দ্রে আগত কিশোরের ধরন	:	(ক) আইনের সংস্পর্শে/ সংঘর্ষে লিপ্ত শিশু-কিশোর (খ) সংশোধনীতে (গ) নিরাপদ হেফাজতী/ ভিকটিম/ সুবিধা বঞ্চিত		
১০। শিশুর অবস্থান কাল	:	৯ থেকে ১৮ বছরের শিশু বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে অত্র কেন্দ্রে আগমন করে। আটককৃত বা সংশোধনরত শিশু অনুর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত কেন্দ্রে অবস্থান করে। তবে ভিকটিম মায়ের সাথে ২ জন নবজাতক শিশু অবস্থান করছে। যাদের প্রত্যেকের বয়স ১ বছরের নিচে।		
১১। কেন্দ্রের অবকাঠামোগত বিন্যাস	:	(ক) প্রশাসনিক ও কিশোর আদালত ভবন (খ) বিচারাধীন ভবন: ডরমেটরি -১ (গ) স্কুল ও প্রশিক্ষণ ভবন (ঘ) রান্নাঘর ও গুদাম (ঙ) গ্যারেজ ও ড্রাইভার কক্ষ (চ) প্লে গ্রাউন্ড।		
১২। নিরাপত্তা ব্যারাক	:	৩ তলা ভবন (০১) একটি		
১৩। আবাসিক কোয়ার্টার	:	১। ৪ তলা ভবন ১টি, ইউনিট-১২টি; ২। ৩ তলা ভবন ২টি, ইউনিট-২টি; ৩। ২ তলা ভবন ১টি, ইউনিট ২টি।		
১৪। সাধারণ শিক্ষা	:	১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত।		
১৫। কারিগরি প্রশিক্ষণ	:	১। টেইলারিং ও শিল্প কল কারখানার কাজ ২। এমব্রয়ডারি ৩। ইলেকট্রনিক্স ৪। পোলট্রি		

বর্তমানে কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুরে ৮২ জন নিবাসী অবস্থান করছে। হত্যা, মাদকাসক্তি, চুরি, নিরাপদ হেফাজত, ভিকটিম প্রভৃতি অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা এখানে অবস্থান করছে এবং সংশোধন ও উন্নয়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে মামলার ধরন অনুযায়ী তাদের পরিসংখ্যান উপস্থান করা হলো:

সারণী-৫৫: মামলার ধরন অনুযায়ী কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের সংখ্যা[৩১]

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান নিবাসী সংখ্যা	মামলার ধরন অনুযায়ী নিবাসীদের সংখ্যা		
		মামলার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার(%)
কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র কোনাবাড়ী, গাজীপুর।	মোট কিশোরী (বালিকা) ৮২ জন	হত্যা	০৭ জন	৮.৫৪%
		নিরাপদ হেফাজতী	১২ জন	১৪.৬৩%
		ভিকটিম	৫৬ জন	৬৮.২৯%
		মাদক	০২ জন	২.৪৪
		চুরি	০৩ জন	৩.৬৬%
		নারী ও শিশু	-	-
		অন্যান্য	০২ জন	২.৪৪
মোট			৮২ জন	১০০%

উপরোক্ত মামলার ধরন অনুযায়ী নিবাসীর পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, হত্যা মামলা, মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাপধ ও চুরি মামলায় কিছু সংখ্যক কিশোরীরর সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গিয়েছে। পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, অপরাধী কিশোরীদের মধ্যে ৮.৫৪% কিশোরী হত্যা, ২.৪৪% কিশোরী মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধের সাথে জড়িত। এছাড়া চুরি সংক্রান্ত অপরাধের সাথে প্রায় ৩.৬৬% কিশোরীর জড়িত রয়েছে। তবে এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নিরাপদ হেফাজতী এবং ভিকটিম কিশোরীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। প্রায় ৬৮.২৯% কিশোরী ভিকটিম হিসেবে এখানে অবস্থান করছে এবং নিরাপদ হেফাজতী কিশোরীর সংখ্যা প্রায় ১৪.৬৩%। অতএব বলা যায় যে, সমাজে আজও শিশু ও নারী অবহেলিত ও বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

৩১. *প্রাগুক্ত*

সারণী-৫৬: কিশোরী (বালিকা) নিবাসীদের প্রাত্যহিক কর্মসূচী[৩২]

	সময়	কাজের ধরন
১	সকাল ৫.০০ থেকে সকাল ৬.০০ পর্যন্ত	ঘুম থেকে উঠে (ফজর) নামাজ আদায়
২	সকাল ৬.০০ থেকে সকাল ৬.৪৫ পর্যন্ত	শারীরিক প্রশিক্ষণ
৩	সকাল ৬.৪৫ থেকে সকাল ৭.৩০ পর্যন্ত	সকালের নাস্তা
৪	সকাল ৭.৩০ থেকে সকাল ৯.০০ পর্যন্ত	হাতের কাজ
৫	সকাল ৯.৩০ থেকে দুপুর ১.০০ পর্যন্ত	পড়াশোনা
৬	দুপুর ১.০০ থেকে দুপুর ১.১০ পর্যন্ত	নামাজ (যুহর নামাজ)
৭	দুপুর ১.১০ থেকে দুপুর ২.০০ পর্যন্ত	দুপুরের খাবার
৮	দুপুর ২.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত	বৃত্তিমূলক শিক্ষা
৯	বিকাল ৫.০০ থেকে বিকাল ৫.১০ পর্যন্ত	নামাজ (আছর নামাজ)
১০	বিকাল ৫.১০ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত	খেলা-ধুলা
১১	সূযাস্তের পর নামাজ	নামাজ (মাগরিব নামাজ)
১২	সন্ধ্যা থেকে ১০.০০ পর্যন্ত	রাতের খাবার স্কুলের পাঠ প্রস্তুতি, নামাজ, টিভি দেখা (প্রয়োজন হল), ঘুমানো।

সারণী-৫৭: কিশোরী (বালিকা) নিবাসীদের বয়স ভিত্তিক পরিসংখ্যান[৩৩]

প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান নিবাসী সংখ্যা	বয়স ভিত্তিক নিবাসী সংখ্যা	
		বয়স (বছর)	সংখ্যা
কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র কোনাবাড়ী, গাজীপুর।	মোট কিশোরীর (বালিকা) সংখ্যা ৮২ জন	৯ বছরের নিচে	০২ জন (নবজাতক)
		৯ বছর থেকে অনূর্ধ্ব ১০ বছর	০ জন
		১০ বছর থেকে অনূর্ধ্ব ১২ বছর	০২ জন
		১২ বছর থেকে অনূর্ধ্ব ১৬ বছর	৩৬ জন
		১৬ বছর থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর	৩৫ জন
		১৮ বছরের উর্দ্ধে	০৪ জন
		বয়স উল্লেখ নেই	০৩ জন
মোট			৮২ জন

৩২. *মাসিক প্রতিবেদন*, প্রাগুক্ত
৩৩. *মাঠ পর্যায়ে জরিপ কর্ম*, কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র কোনাবাড়ী, গাজীপুর, প্রাগুক্ত

সারণী-৫৮: বিচারাধীন/আটকাদেশ ভিত্তিক কিশোরী (বালিকা) নিবাসীদের সংখ্যা[৩৪]

বিচারাধীন/আটকাদেশ ভিত্তিক নিবাসী সংখ্যা			
প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান নিবাসী সংখ্যা	বিচারাধীন/আটকাদেশ প্রাপ্ত	সংখ্যা
কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র কোনাবাড়ী, গাজীপুর।	মোট ৮২ জন শিশুর তথ্যাবলী	বিচারাধীন	৮০ জন
		আটকাদেশ প্রাপ্ত	
		অভিভাবক মামলায় বিচারাধীন	
		অভিভাবক মামলায় আটকাদেশ	
		ভিকটিম মায়ের সাথে নবজাতক শিশু	০২ জন

সারণী-৫৯: অবস্থানের সময় অনুসারে কিরশারী (বালিকা) নিবাসীর সংখ্যা[৩৫]

অবস্থানের সময় অনুসারে নিবাসীর সংখ্যা			
প্রতিষ্ঠানের নাম	বর্তমান নিবাসী সংখ্যা	অবস্থানের সময়	সংখ্যা
কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর।	মোট ৮২ জন কিশোরী (বালিকা) তথ্যাবলী	৬ মাসের নিচে	৪১ জন
		৬ মাস- ১ বছর	১১ জন
		১ বছর- ২ বছর	১২ জন
		২ বছরের উর্দ্ধে	১৮ জন
মোট			৮২জন

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্রের আগত নিবাসীদের মধ্যে ৪১ জন নিবাসী এখানে ৬ মাসেরও কম সময় অবস্থান করছে। ৬ মাস থেকে এক বছর অবস্থান করছে এমন নিবাসীর সংখ্যা ১১ জন। অবশিষ্ট নিবাসীরা এক বছর বা তদুর্ধ্ব সময়কাল উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

৩৪. *প্রাগুক্ত*
৩৫. *প্রাগুক্ত*

সারণী-৬০: আদালতে হাজিরা ভিত্তিক কিশোরী (বালিকা) নিবাসী সংখ্যা[৩৬]

আদালতে হাজিরা ভিত্তিক নিবাসী সংখ্যা			
আদালতে হাজিরা	সংখ্যা	হাজিরা না করার কারণ	মন্তব্য
এক বারও যায়নি	১৭	১। হাজিরা তলব মতে থাকায় ২। নতুন এসেছে পরবর্তীতে তারিখ রয়েছে	১৮ বছরের উর্দ্ধে এবং বয়স উল্লেখ নেই শিশুদের বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১ বার	৬	পরবর্তীতে তারিখ রয়েছে	
২ বার	১৪		
৩ বার বা তার অধিক	২৯		
আন্য কোর্ট	১৪	১। করোনা সংক্রমনরোধে ১৯-২৫ মার্চ পর্যন্ত আদালতে হাজির করা হয়নি। ২। করোনা সংক্রমনরোধে বিজ্ঞ আদালত বন্ধ ঘোষণা করায় হাজির করানো সম্ভব হয়নি।	

২০০২ সালে বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বর্তমান সময় (জুলাই ২০২০খ্রি.) পর্যন্ত এ কেন্দ্রে মোট আগত শিশুর সংখ্যা ৯০৯ জন। ভর্তির পরে সংশোধন ও উন্নয়ন শেষে পুনর্বাসিত হয়ে আবার নিজ পরিবার ও সমাজের সাথে একীভূত হয় ৮২৭ জন শিশু। নিম্নোক্ত টেবিলে এ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান উপস্থান করা হলো:

সারণী-৬১: শুরু থেকে জুন, ২০২০পর্যন্ত ভর্তিকৃত কিশোরীর সংখ্যা[৩৭]

শুরু থেকে এ পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা		
১	অভিভাবক কেইস	৩৯৫ জন
২	পুলিশ কেইস	৫১৪ জন
৩	মোট	৯০৯ জন

৩৬. *মাসিক প্রতিবেদন, প্রাগুক্ত*
৩৭. *প্রাগুক্ত*

সারণী-৬২: শুরু থেকে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কিশোরীর সংখ্যা[৩৮]

শুরু থেকে এ পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত কিশোরীর সংখ্যা		
১	অভিভাবক কেইস	৩৫৭ জন
২	পুলিশ কেইস	৪৪০ জন
৩	অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তর	৩০ জন
৪	মোট	৮২৭ জন

উপরোক্ত সারণী (সারণী: ৬১ ও সারণী: ৬২) দু'টিতে দেখা যায় যে, দেশের একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়ে ২০০৩ সালে কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত অভিভাবক কেইসে ৩৯৫ জন এবং পুলিশ কেইসে ৫১৪ জন, মোট ৯০৯ জন নিবাসীকে ভর্তি করে সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ৪৪০টি কিশোরীর বিচার কিশোর আদালতে শেষ হয়েছে, ৩৫৭ জন সংশোধনের সুযোগ পেয়েছে এবং ৩০ জন অন্য কেন্দ্রে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত হয়েছে। সর্বমোট ৮২৭ জন সংশোধিত হয়ে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সাফল্য

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ (বালক/বালিকা) প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ইনোভেটিভ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাদের সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ অপরাধপ্রবণ ও অপরাধী শিশু-কিশোরদের চারিত্রিক ও মানসিক সংশোধন, বিভিন্ন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে সমাজের মূল স্রোতের সাথে একীভূত করে এসকল শিশু-কিশোরদেরকে পুনর্বাসিত করছে। নিম্নে অত্র কেন্দ্রের কিছু সাফল্য তুলে ধরা হলো:

১। কিশোর অপরাধীদেরকে সমাজে পুনর্বাসন

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র মূলত অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের সংশোধন এবং তাদের উন্নয়নে কাজ করে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহ নানা সংশোধনমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে। উন্নয়ন কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় সাফল্য হচ্ছে- প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা অসংখ্য অপরাধী শিশু-কিশোরের সংশোধন ও উন্নয়ন সাধন করে পরিবার ও সমাজের মূল স্রোতের সাথে একীভূত করতে পেরেছে। তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রে থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা যায়, এই তিনটি কেন্দ্রে জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩১৩১৮ জন নিবাসীকে সংশোধন ও উন্নয়ন সেবা প্রদান করেছে।

৩৮. *প্রাগুক্ত*

তন্মধ্যে পুলিশ কেইসে ২১৯২৭ জন নিবাসী এবং অভিভাবক কেইসে ৯৩৯১ জন নিবাসীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এসকল শিশু-কিশোরকে সংশোধন ও উন্নয়ন শেষে সমাজে পুনবার্সিত করা হয়েছে। সর্বমোট ৩০৫৬২ জন নিবাসী কিশোর-কিশোরীকে সংশোধনপূর্বক পরিবার ও সমাজে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এরমধ্যে প্রবেশন ব্যবস্থায় ৪২৮ জন, পুলিশ কেইসে ২০৯৩৩ জন এবং অভিভাবক কেইসের ৯১৪১ জন অপরাধী নিবাসীকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণী দুটিতে এ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো-

সারণী-৬৩: শুরু থেকে জুন, ২০২০খ্রি. পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিশু-কিশোরের সংখ্যা (তিন কেন্দ্রে একত্রে)[৩৯]

ক্রমিক	কেইসের ধরন	টঙ্গী	যশোর	কোনাবাড়ী	মোট নিবাসী
১	অভিভাবক কেইস	৭৪৮৮ জন	১৫০৮ জন	৩৯৫ জন	৯৩৯১ জন
২	পুলিশ কেইস	১০৮৭১ জন	১০৫৪২ জন	৫১৪ জন	২১৯২৭ জন
৩	মোট	১৮৩৫৯ জন	১২০৫০ জন	৯০৯ জন	৩১৩১৮ জন

সারণী-৬৪ : শুরু থেকে জুন, ২০২০খ্রি. পর্যন্ত পুনর্বাসনকৃত শিশু-কিশোরের সংখ্যা (তিন কেন্দ্রে একত্রে)[৪০]

ক্রমিক	কেইসের ধরন	টঙ্গী	যশোর	কোনাবাড়ী	সর্বমোট নিবাসী
১	অভিভাবক কেইস	৭২৭৬ জন	১৫০৮ জন	৩৫৭ জন	৯১৪১ জন
২	পুলিশ কেইস	১০৩৬১ জন	১০১৬২ জন	৪৭০ জন	২০৯৯৩ জন
৩	প্রবেশন	৩১৭ জন	১১১ জন	-	৪২৮ জন
৪	মোট	১৭৯৫৪ জন	১১৭৮১ জন	৮২৭ জন	৩০৫৬২ জন

উপরোক্ত সারণী দু'টিতে দেখা যায় যে, ১৯৭৮ সালে প্রথম কিশোরী উন্নয়ন ও সংশোধন কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে জুলাই ২০২০খ্রি. পর্যন্ত অভিভাবক কেইসে ৯৩৯১ জন এবং পুলিশ কেইসে ২১৯২৭ জন, মোট ৩১৩১৮ জন নিবাসীকে ভর্তি করে সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ২০৯৯৩ জন শিশু-কিশোরের বিচার কিশোর আদালতে শেষ হয়েছে, ৯১৪১ জন শিশু-কিশোর সংশোধনের সুযোগ পেয়ে পরিবার ও সমাজে পুনর্বাসিত হয়েছে এবং ৪২৮ জন প্রবেশন ব্যবস্থায় সংশোধিত হয়েছে। সবমোট ৩০৫৬২ জন সংশোধিত হয়ে মুক্তি পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে। এছাড়াও কেন্দ্রসমূহের নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সাফল্য লক্ষ্য করা যায়:

৩৯. সূত্র: *মাঠ পর্যায়ে জরিপ কর্ম*, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ (টঙ্গী, যশোর ও কোনাবাড়ী), প্রাগুক্ত
৪০. *প্রাগুক্ত*

২। পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় অপরাধী শিশু-কিশোরকে পরিবারের নিকট হস্তান্তর। এর মধ্যে প্রতিবন্ধি, হারানো ও জিডি মূলে আসা শিশুরা রয়েছে।

৩। সাফল্যজনকভাবে ট্রেডের বিভিন্ন বিভাগে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে মুক্তি পেয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মমুখী কার্যক্রমে নিয়োজিত।

৪। পাচারের শিকার শিশু-কিশোরকে অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর। এছাড়া অন্যান্য প্রক্রিয়ায় আসা ভারতীয় শিশুদের ভারতীয় হাইকমিশনের মাধ্যমে অভিভাবকের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

৫। চাইল্ড সেনসেটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্পের আওতায় আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে নিবাসী শিশু-কিশোরদেরকে পরিবারে পুনর্বাসন।

৬। শিশু-কিশোর নিবাসীদের সুস্থ মানসিক বিকাশের জন্য নিজস্ব পাঠাগার স্থাপন করা।

৭। নিজস্ব উদ্যোগে কিছু প্রয়োজনীয় ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

৮। পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী শিশু-কিশোরদের জন্য স্পেশাল কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৯। খেলা-ধুলার মান উন্নয়নের জন্য নিজস্ব উদ্যোগে ফুটবল ও ক্রিকেট কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১০। ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রাখার জন্য নিয়মিত কুরআন শিক্ষার ক্লাস শুরু করা হয়েছে।

১১। সাক্ষরজ্ঞানহীন শিশুদের সাক্ষরজ্ঞানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২। একটি সাংস্কৃতিক দল গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়।

১৩। মামলা পরিচালনায় অক্ষম শিশু-কিশোরদের আইনগত সহায়তা প্রদান।

১৪। লিগ্যাল এইড ও ব্লাস্ট এর মাধ্যমে জামিন/মুক্তির ব্যবস্থা করা। এছাড়া স্থানীয় উদ্যোগে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে:

১৫। স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় এবং এনজিওদের সহযোগিতায় বিভিন্ন সময় শীতবস্ত্র, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সামগ্রী প্রভৃতি সংগ্রহ পূর্বক নিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস সফলভাবে উদযাপন করা হয়।

কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন কার্যক্রম

জন্মগতভাবে কোন মানুষই অপরাধী নয়। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন, রাষ্ট্রব্যবস্থাপনা এককথায় সার্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই ব্যক্তি অপরাধীতে পরিণত হয়। এজন্য আধুনিক অপরাধবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বিশেষ করে কিশোর অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে তাদের বিভিন্ন সংশোধনমূলক কার্যক্রমের আওতায় এনে চারিত্রিক সংশোধনের কথা উল্লেখ করা হয়। কিশোর যেমন পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবে অপরাধী হয়ে উঠে তেমনি আবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে অর্থাৎ মানসিক সাপোর্ট, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া হলে ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। বর্তমানে অপরাধবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ গবেষকরা এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে কিশোর অপরাধীকে তার চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দিলে অপরাধপ্রবণতা অনেকাংশেই হ্রাস করা সম্ভব। তাই সংশোধনমূলক কার্যক্রম কিশোর অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের একটি আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত।

সংশোধনী কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারতীয় উপমহাদেশে শিশু-কিশোরদের সংশোধনমূলক কার্যক্রমের ইতিহাস বেশি দিনের নয়। শিশু বা কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে আলাদা শাস্তির ধারণা ভারতবর্ষে আনয়ন করে ইংরেজরা তাদের শাসনামলে। বৃটিশ শাসনামলের পূর্বে মুসলমান ও হিন্দু শাসকরা এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশ শাসন করতেন এবং ঐসময়ে হিন্দু ও মুসলিম আইন ব্যবহৃত হত। কিন্তু হিন্দু বা মুসলিম আইনের কোনটিতে নির্দিষ্টভাবে এমন কোন আইন ছিল না,[৪১] যা কিশোর অপরাধীদের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে প্রযোজ্য। শিশুদের প্রতি কি আচরণ করা হবে- এই মর্মে কেবল একটি হিন্দুদের নৈতিক বিধানে উল্লেখ রয়েছে। এটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

A parent should not administer any punishment for any offence to a child who is under five years of age. Children of such tender age should be nursed and educated with love and affection only. After the age of five, punishment may be given in some suitable from, such as physical chastisement or rebuke by the parents. Towards the latter half of childhood, however, punishment should be

---

৪১. কিশোর অপরাধ সম্পর্কে জনাব আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* শীর্ষক গ্রন্থে এই মতমত তুলে ধরেন। তবে, এই মতামতের সাথে গবেষক পুরোপুরি একমত পোষণ করেন না। কারণ ইসলামে কিশোর অপরাধ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধানমালা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছ। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি গায়রে মুকাল্লাফ। অর্থাৎ শরী'আতের হুকুম আহকাম পালনের জন্য নির্দেশিত নয়। নাবালেগ বা অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা প্রচলিত পরিভাষায় কিশোর-কিশোরীদের বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে রাসূল্লাহ (সা.) থেকে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে। শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী নয় বরং রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে কিশোরের বিচার ফয়সালা দিয়েছেন। বনূ-কুরায়যা যুদ্ধ অপরাধ ও চুক্তিভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে বিচার ফয়সালায় তাদের পুরুষদের হত্যার ধিান দেওয়া হলেও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকদেরকে হত্যা না করে মুক্তি দেওয়া হয়। এসংক্রান্ত হাদীস এবং উক্ত বিচারের ঘটনাটি পরবর্তী অধ্যায়: 'কিশোর অপরাধ দমনে ইসলামের বিধানে' বিস্তারিত আলোচনা করা হবে-ইনশাআল্লাহ। তবে ভারতীয় উপমহাদেশে কিশোর অপরাধের জন্য আলাদাভাবে ইসলামি আইনের প্রয়োগ হয়েছে কিনা সেটি অবশ্য গবেষণার বিষয়। -গবেষক

gradually withdrawn and replaced by advice. From age of sixteen upward, sons and daughter should be treated as friends by the parents."[৪২]

মোঘল আমলে সকল executive law এর ভিত্তি ছিল ধর্মীয় ও নৈতিক এবং কিশোর সম্পর্কিত কোন আইন ছিল না। ইংরেজরা ভারত দখলের পর কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনীর পর English Laws মুম্বাই, কোলকাতা ও চেন্নাই এ প্রয়োগ করা শুরু হয়। ভারতের অন্যান্য অংশে অবশ্য 'মহামেডান আইন' অনুসারে আদালতগুলো পরিচালিত হত। ইংরেজ শাসনামলে প্রথম আইন কমিশন গঠিত হয় ১৮৩৭ সালে। এই কমিটি দ্বারা একটি Penal Code প্রণীত হয় যদিও চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ার কারণে ১৮৬০ সালের আগে এটি Indian State Book -এ স্থান পায়নি। ১৮৬১ সালে The Criminal Procedure Code পাশ হয়। এটি ছিল বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর আইন সংবিধিবদ্ধকরণে সবচেয়ে বড় প্রচেষ্টা। এই আইন প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোর অপরাধীদের সমানভাগে প্রয়োগ হতে লাগল। তখন পর্যন্ত আলাদা কোন বিচার ব্যবস্থা কিশোরদের জন্য গ্রহণ করা হয়নি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে Apprentice Act (Indian Act xix of 1850), Penal Code, The Criminal Procedure Code এবং The Reformatory School Acts এর ক্ষেত্রে বৃটেনে ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ঘনিষ্টভাবে অনুসরণ শুরু হয়। কালক্রমে এই প্রক্রিয়া ও অনুশীলন শুরু হওয়ার পর উনিশ শতকের শেষ দিকে কিশোর ও যুব অপরাধীদের জন্য আলাদা আইন প্রণয়নের উদোগ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে ভারতে Apprentice Act সরাসরি কিশোর অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিশেষ আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষানবীশ, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে বিধিবিধান প্রদান করা। দুঃস্থ অপরাধী শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার লক্ষ্যে এটি প্রথম আইনগত প্রচেষ্টা। এই আইন মেজিস্ট্রেটকে ১০ থেকে ১৮ বছর বয়সের মধ্যে শিশু, যারা ছোটখাট অপরাধ করেছে বা যারা দুঃস্থ তাদেরকে নবীন হিসাবে তালিকাভুক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

কিশোর অপরাধ সংশ্লিষ্ট এর পরবর্তী প্রচেষ্টা ছিল Reformatory School Act, 1870। এটি ছিল কিশোর অপরাধীদের জন্য ২য় আইন। ১৮৯২ সালে Prison Conference -এর কিছু সুপারিশ অনুযায়ী এই Reformatory School Act, 1870 (Indian Act viii of 1897) পাশ হয়। এই আইন পাশ হওয়ার পর উনিশ শতকের শেষভাগে কিছু কিছু রাজ্যে Reformatory School প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য রাজ্যে কিশোর অপরাধীদের বয়স্ক অপরাধীদের জন্য নির্মিত কারাগারে পাঠানো হত। বিশ শতকের প্রথম দিকে উল্লিখিত আইন The Penal Code, The Code of Criminal Procedure এবং The

৪২. উদ্বৃত: আব্দুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা: কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৮

Reformatory School Acts, 1897 ছাড়া কিশোর অপরাধীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্য কোন উল্লেখ যোগ্য আইন প্রণীত হয়নি। তবে একটি আইন যা Whipping Act of 1909 প্রণীত হয়েছিল।[৪৩] উল্লেখ্য যে, ১৯১৪ সালে ভারতে প্রথম House of Detention সহ একটি কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। স্মর্তব্য যে, বিশ্বে প্রথম কিশোর আদালত স্থাপিত হয় ১৮১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যে।[৪৪]

বাংলাদেশে সংশোধনমূল কার্যক্রম

বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের ইতিহাস সাম্প্রতিক কালের। শুরুর দিকে Reformatory School Acts, 1897 কিছুকিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখা যায়।[৪৫] ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পরে শিল্পায়ন, নগরায়ন, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী শহর কেন্দ্রিক হওয়ায় গ্রামের লোকজনের শহরমুখী যাত্রা অব্যাহত থাকে এবং ধীরে ধীরে অপরাধের মাত্রা ও পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। তাই সমাজ বিজ্ঞানীগণ শিল্পায়ন, নগরায়নকে কিশোর অপরাধ সৃষ্টির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল হাকিম সরকার বলেন, "With the advancement in industrialization, urbanization and with the continued mobility of rural people to urban areas the problem of crime particularly delinquency has begun to noticeably soar in the town or city areas."[৪৬]

সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, শিশু-কিশোরদের ভবিষ্যৎ উন্নত জীবন প্রদান ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণের সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে নব্য শিশু-কিশোর অপরাধীদের সুরক্ষা একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এরূপ চিন্তা-ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান শাসনামলে Probation of Offenders Ordinance,1960 নামে সর্বপ্রথম শিশু-কিশোরদের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৪ সালে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে এই অর্ডিন্যান্স Probation of Offenders Act,1964 সংক্ষেপে প্রবেশন এক্ট এ রূপান্তরিত হয়।[৪৭] Probation of Offenders Act,1964 পাসের পর সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় কেইসওয়ার্ক, গ্রুপ-ওয়ার্ক, কমিউনিটির উন্নয়ন এবং সাধারণ সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে সাথে শিশু-কিশোর অপরাধীদের প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনা করত। এ ক্ষেত্রে শিশু-কিশোরদের প্রথম ও লঘু অপরাধের জন্য এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত শর্তের ভিত্তিতে প্রবেশন প্রদান করা হতো। এ কার্যক্রমের আওতায় অপরাধপ্রবণ

---

৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮
৪৪. Joan Mccord (Edited), *Juvenile Crime Juvenile Justice* (Washington DC: The National Academy Press, 2001), p. 157
৪৫. *Reformatory School Act, 1897,* Act No.008 of 1897, 11 March,1897
৪৬. Abdul Hakim Sarker, *ibid*, p. 282
৪৭. Dr. Nahid Ferdousi, *Juvenile Justice System in Bangladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2012), p. 38

বা অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের একজন প্রবেশন অফিসারের অধীনে স্থানান্তর করা হত। একজন প্রবেশন অফিসার এরূপ শিশু-কিশোরকে তার পরিবার ও সমাজের মূল স্রোতের সাথে রেখেই দেখাশুনা এবং সংশোধন কার্যক্রম পরিচালনা করতেন।[৪৮]

এসময় ১৯৫৪[৪৯] সালে বাংলাদেশে ঢাকার অদূরে (বর্তমানে নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন মুরাপাড়া ইউনিয়নে অবস্থিত) মুরাপাড়ায় একটি Borstal School প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ থেকে ২১ বছরের কিশোর-কিশোরীর অপরাধপ্রবণতা সংশোধনের জন্য অনধিক তিন বছরের অবস্থানের প্রবিধান রেখে এ প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়।[৫০] প্রতিষ্ঠাকালীন এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে ছিল। Borstal School মূলত Reformatory School হিসেবে কাজ করতো। তৎকালে এটি ছিল একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান, এতে ২০০ জনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। সেই সঙ্গে ছিল কিছু বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। কিশোর অপরাধীদের সাধারণ আদালতে বিচারকার্য সম্পাদিত হওয়ার পর সংশোধনের জন্য এ স্কুলে প্রেরণ করা হতো। এ প্রতিষ্ঠানের দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী বা প্রশিক্ষণের সুবিধাদি প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকলেও এটি ছিল তখন পর্যন্ত কিশোর সংশোধন ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিষ্ঠান।[৫১]

পাকিস্তান আমলে শিশু-কিশোরদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৬০)[৫২] এবং দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫) শিশু-কিশোরদের জন্য নানা রকমের সংশোধনী প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয় এবং শিশু-কিশোরকে সমাজে অরক্ষিত বলে উল্লেখ করা হয়।[৫৩] তারপর এদেশে ১৯৬২ সালে যে সংশোধনী কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে সেটি দু'টো আলাদা প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে। একটি Probation of Offenders Project এবং অন্যটি হচ্ছে After Care Service Project নামে দু'টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।[৫৪] যে দার্শনিক ভিত্তির ওপর ঐ প্রজেক্ট দু'টো প্রবর্তন করা হয় তা হচ্ছে, **প্রথমত,** শুধুমাত্র শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে অপরাধীকে শোধরানো সম্ভব হয় না; বরং উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশনসহ আফটারকেয়ার সার্ভিস ঐসব অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে সহায়ক ব্যবস্থা এবং প্রবেশনসহ আফটারকেয়ার সার্ভিসের ফলে অপরাধের নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ অনেকটা সম্ভব। **দ্বিতীয়ত**, এ প্রজেক্টের অন্য একটি দিক হচ্ছে ছোট বড় সকল অপরাধীর ক্ষেত্রে একই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ নয়। কারাগারে অবস্থানরত ছোট-বড়,

---

৪৮. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, p. 38
৪৯. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম তার 'বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা' শীর্ষক গ্রন্থে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠার সাল ১৯৪৯ বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ১৯৪৯ সালে ঢাকার অদূরে মুড়াপাড়া নামকস্থানে একটি " Borstal School " প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এদেশে কিশোর অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রমের যাত্র শুরু হয়। (বিস্তারিত দেখুনঃ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, ঢাকাঃ তাসমিয়া পাবলিকেশনস, ২০১১, পৃ. ২৯৪)
৫০. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, p. 152
৫১. Abdul Hakim Sarker, *ibid*, p. 282
৫২. *The Frist Five Years Plan 1955-1960,* The planing Board, Government of Pakistan
৫৩. *The Second Five Years Plan 1960- 65,* The planing Commission , Government of Pakistan
৫৪. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, p. 38

লঘু ও গুরুতর অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত একসঙ্গে ও একই পরিবেশে থাকার কারণে ছোট অপরাধীরা বড়দের কাছ থেকে আরো খারাপ কিছু শিখে ও তারাও বিপদজনক অপরাধী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত হয়।[৫৫]

আরো একটি উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় হচ্ছে, জেল-ফেরৎ অপরাধীরা সহজে সমাজে পুনর্বাসিত হতে পারে না। কারণ জেলে অবস্থানকারী ব্যক্তি একটি 'সীল' নিয়ে বের হয়। এই 'সীল' শুধু যে ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সমস্যার সৃষ্টি করে তা নয়, তার পরিবারের জন্যও দারুণ সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। অতএব, এমতপরিস্থিতিতে নব্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে সমাজে পুনর্বাসন বা সমাজের মূল স্রোতের সাথে একীভূত করার বিষয়টি বড় করে দেখে তাদেরকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রয়াস নেয়ার উদ্দেশ্যেই এসব প্রজেক্ট। এর ফলে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে প্রবেশনসহ আফটারকেয়ার সার্ভিস ঐসব অপরাধীদের সংশোধন ও পুনর্বাসনে সহায়ক কর্মসূচীর শুভ সূচনা হয়। এছাড়া এর ফলে শিশু অপরাধী ও পরিণত অপরাধীর শাস্তির ধরন এবং ভিন্ন পরিবেশে তাদেরকে রাখার বিষয়টি সামনে চলে আসে।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ শিশু আইন প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি সংশোধনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। দেশে আরো দু'টো অনুরূপ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়; তন্মধ্যে একটি ছেলেদের জন্য এবং অন্যটি মেয়েদের জন্য। এর একটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে যশোরে ছেলেদের জন্য; আর মেয়েদের জন্য গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয় ২০০২ সালে। সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও কিছু বেসরকারী সংশোধন প্রতিষ্ঠান কিশোর-কিশোরীদের সংশোধনে দেশে কাজ করছে। এর একটি হচ্ছে চট্রগ্রামের কুমিরায়। এ প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে, 'মাসজিদ্দা হাই স্কুল' আর একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে খুলনায়। এটির নাম 'খুলনা কর্ডন স্কুল'। পরবর্তীতে দেশে বর্ধিত হারে এই সেবার প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণে The Assoiciation for Correction Social Reclamation (ACSR) ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি ছ'টি শাখা বিশিষ্ট একটি জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান এবং এটি সরকার অনুমোদিত একটি Certified Institute। এছাড়া Bangladesh Retried Police Officers Association তার Assistance Plan for Juvenile Delinquent (APJD) -এর আওতায় সংশোধনী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কিশোর অপরাধের প্রতিরোধ ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে Human Nursery for Development (HND) নামক একটি প্রতিষ্ঠান তার School Assistance কর্মসূচির মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[৫৬]

---

৫৫. *Ibid*, pp. 282-83
৫৬. আবদুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা: কল্লোল প্রকাশনী, ২০০৫খ্রি.), পৃ. ২৫২-২৫৩

সংশোধন কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাধারণত সংশোধনমূলক কার্যক্রম বলতে এমন এক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যেখানে অপরাধীকে শাস্তিদানের পরিবর্তে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে অপরাধীদের অপরাধপ্রবণতা থেকে মুক্ত করা হয় এবং তাকে স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য করা হয়। অর্থাৎ সংশোধন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় কারারুদ্ধকরণ ও শাস্তিপ্রদানের পরিবর্তে প্যারোল, প্রবেশন এবং আদর্শ শিক্ষামূলক কর্মসূচি ও সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। এজন্য অপরাধীকে বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। এ কার্যক্রমের ফলে ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। তাই সমাজে অপরাধের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সমাজব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। সংশোধনমূলক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. কিশোর অপরাধীকে সামাজিক পরিবেশে রেখে চরিত্র সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা।
২. অপরাধীকে সামাজিক পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলা।
৩. মুক্তিপ্রাপ্ত শিশু-কিশোরের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে খাপ খাওয়ানোর মাধ্যমে তাদের পুনর্বাসনে সহায়তা করা।
৪. কিশোর অপরাধীকে সামাজিক পঙ্গুত্ব ও কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করা।
৫. কিশোর অপরাধীদের প্রতিশোধ ও জিঘাংসামূলক মনোভাব থেকে নিবৃত করা।
৬. কিশোর অপরাধীর মধ্যে তার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা জাগ্রত করে তার মধ্যে মানসিক প্রশান্তি সৃষ্টি করা।
৭. কারাগারের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে শিশু-কিশোরকে রক্ষা করা।
৮. শাস্তিমূলক পদ্ধতির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং সাধারণ জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করা।
৯. কিশোরের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
১০. কিশোর অপরাধী আইনের অস্পষ্টতার কারণে শাস্তি ভোগ করলে তাকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করা।
১১. পরিবেশের শিকার কাঁচা কিশোর অপরাধীদের কারা ব্যবস্থার কু-প্রভাব থেকে রক্ষা করা।
১২. সংশোধন পদ্ধতির শর্ত পালনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মধ্যে আনুগত্যবোধ সৃষ্টি করা।
১৩. সমাজ থেকে বিকশোর অপরাধের পরিমাণ হ্রাস করা।
১৪. কিশোরের উপর নির্ভরশীল সদস্যদের মধ্যে যাতে প্রতিশোধমূলক মনোভাব জাগ্রত না হয় তার ব্যবস্থা করা।
১৫. কিশোরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করা।

সংশোধনমূলক কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য

সংশোধনমূলক কার্যক্রমের সংজ্ঞা, স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ-

১. শাস্তির পরিবর্তে অপরাধপ্রবণ কিশোরকে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করে।

২. সংশোধনকালে কিশোর অপরাধীকে সামাজিক সুবিধা প্রদান করা।

৩. অপরাধীকে শিশু-কিশোরকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়।

৪. অপরাধী শিশু-কিশোরের মধ্যে সামাজিক চেতনা ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা হয়।

৫. কিশোর অপরাধীর জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়।

৬. কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৭. অপরাধী কিশোরের চরিত্র সংশোধনকালে সমাজের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

৮. শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসুস্থ শিশু-কিশোরকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

৯. অপরাধী শিশু-কিশোরের চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়।

১০. অপরাধী শিশু-কিশোরের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১১. শিশু-কিশোর অপরাধীর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়।

১২. সর্বোপরি অপরাধী শিশু-কিশোরের ব্যক্তিত্ব গঠনের মাধ্যমে তাকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

বাংলাদেশে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব

বাংলাদেশে অসংখ্য সামাজিক সমস্যা রয়েছে। সামাজিক সমস্যার প্রভাবে এদেশে অপরাধী ও কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হবে। তাই সামাজ থেকে অপরাধ তথা অপরাধমূলক কার্যক্রম দূর করতে হলে সংশোধনমূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে হবে। কিশোর অপরাধীকে শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের ব্যবস্থা করা ধর্মীয় ও বিজ্ঞানসম্মত কাজ। নিম্নে বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের সংশোধন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো-

১. সামাজিক অনাচার রোধ: অপরাধী শিশু-কিশোরকে সংশোধন করার সুযোগ দিলে সে স্বাভাবিক জীবনে পুর্নবাসিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পায়। তাই সামাজিক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা দূর করার ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. সামাজিক সমস্যার সমাধান: কিশোর অপরাধীকে শাস্তি দিলে সে পুনরায় প্রতিশোধ স্পৃহায় অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে সমাজে সমস্যা আরো বেড়ে যেতে পারে। অথচ কিশোরকে সংশোধনের সুযোগ দিলে সামাজিক সমস্যা অনেকাংশেই হ্রাস পায়।

৩. সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ: একজন কিশোরের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যত প্রতিক্ষা করে থাকে। তাকে যদি শাস্তি না দিয়ে চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে সে নিজের সুপ্ত প্রতিভা ও মননের বিকাশ সাধনে লিপ্ত হতে পারে। ফলে একজন কিশোর অপরাধী হয়েও সামাজিক সুযোগ-সুবিধার কারণে সে আবার সমাজে পুনর্বাসিত হয়ে নিজেকে একজন মানব সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সে আর অপরাধী থাকে না, হয়ে উঠে সমাজের অন্যতম একজন হিসেবে। তাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার চেয়ে সংশোধনমূলক কার্যক্রম সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবারের জন্য সহায়ক।

৪. স্বনির্ভরতা অর্জন: কিশোর অপরাধী সংশোধনরত অবস্থায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। এ অবস্থায় তাকে সমাজে পুর্নবাসন দেওয়ার ফলে সে সহজেই জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পায়। নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারে। ফলে সংশোধিত কিশোর ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠে।

৫. অপরাধপ্রবণতা হ্রাস: অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার ফলে সমাজে অপরাধের পরিমাণ অনেকাংশে কমে যায়। কেননা কিশোর তখন অপরাধ করার চেয়ে স্বাভাবিক জীবনকে শ্রেয় মনে করে। এর ফলে সামাজিক সমস্যাও তখন অনেকাংশে কমে যায়।

৬. অর্থের অপচয় রোধ : অপরাধী কিশোরকে সংশোধনের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করলে সরকারি প্রশাসনের প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হয়। কেননা অপরাধীর স্বাভাবিক জীবনে চলে যাওয়ার ফলে কারা প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও অপরাধীদের ভরণ-পোষণ বাবদ অনেক অর্থ বেঁচে যায়।

৭. বিপথগামীতা থেকে রক্ষা: বর্তমানে নেতিবাচক পরিবেশের প্রভাবে কিশোর-কিশোরী ও যুবসমাজ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। অথচ এই যুবসমাজ জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তাই বিপথগামিতা রোধ করার জন্য সংশোধনমূলক কর্মসূচির গুরুত্ব অপরিসীম।

৮. মানসিক অবস্থার উন্নয়ন: কিশোর অপরাধীকে সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সংশোধনই একমাত্র পথ। কেননা কোন কিশোর অপরাধী সাব্যস্ত হলে সমাজের চোখে ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠে। ফলে মানসিক দিক দিয়ে সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই শাস্তি দিলে কিশোর আরো অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠেবে। এক্ষেত্রে একমাত্র সংশোধনের মাধ্যমে তার মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

৯. অপরাধের ধরন জানা: কিশোর অপরাধের ধরন জানা থাকলে সমাজের কিশোর অপরাধপ্রবণতা ও অপরাধ প্রতিরোধ করা যায় এবং অপরাধীকে সংশোধনের সুযোগ করে দেওয়া যায়। সংশোধন পদ্ধতিতে অপরাধের কারণ, পরিবেশ-পরিস্থিতি, অপরাধীর চরিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণের সুযোগ থাকে। ফলে কিশোর অপরাধী সংশোধনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সুযোগ পায়।

১০. পৃথক ব্যবস্থায় বিচার: সংশোধন পদ্ধতিতে কিশোর অপরাধীদের পৃথক ব্যবস্থায় বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়। সে দাগী ও বড় অপরাধীদের ছোঁয়া থেকে রক্ষা পায়। ফলে সঙ্গদোষে অপরাধী হওয়ার সুযোগ থাকে না। এছাড়া এ ব্যবস্থার মাধ্যমে কিশোর অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করা সহজ হয়।

১১. সচেতন নাগরিক সৃষ্টি: সংশোধনমূলক পদ্ধতিতে কিশোর অপরাধীর চরিত্রের পরিবর্তন হয় এবং দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক হিসেবে সে নিজেকে গড়তে সক্ষম হয়। তাই দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১২. পারিবারিক ভাঙ্গন রোধ: কিশোর অপরাধীকে শাস্তি দিলে তার পরিবার তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়। অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক নানা সমস্যায় পতিত হয়। সংশোধনমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে পরিবারের স্বাভাবিক কার্যক্রমকে স্বাভাবিক থাকে।

১৩. মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ: সংশোধনমূলক পদ্ধতিতে অপরাধী শিশু-কিশোর তাদের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। সংশোধন প্রক্রিয়ায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন করে শর্তসাপেক্ষে সমাজে পুনর্বাসনের মাধ্যমে কিশোর সহজেই নিজেকে সমাজের সাথে খাপ-খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়। ফলে সে আর অপাধমূলক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয় না।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংশোধনমূলক কার্যক্রম

বর্তমানে সংশোধনমূলক কার্যক্রম অপরাধ সংশোধনের একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক নিরাপত্তা, অপরাধের সংখ্যা হ্রাস এবং শিশু-কিশোরদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংশোধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আবাসিক সংশোধন প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো কিশোর অপরাধীদের মন থেকে অপরাধপ্রবণতা দূর করার মাধ্যমে তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া। ভবিষ্যতে তারা আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে এবং স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজে বসবাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করাই সংশোধন প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব। অপরাধপ্রবণতা দূর করার জন্য সংশোধনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা, বাস্তব শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এলক্ষ্যে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে ৩টি করে বিভাগ রয়েছে। এ বিভাগসমূহের মাধ্যমেই অপরাধপ্রবণ বা অপরাধী শিশু-কিশোরের সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এগুলো হলো-

(ক) কিশোর আদালত (Juvenile Court)

(খ) কিশোর হাজত (Remand Home)

(গ) ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (Training Institute)।

এছাড়াও প্রবেশন (Probation) ব্যবস্থা; প্যারোল (Parole) ব্যবস্থা, সেইফ হোম, মুক্ত কয়েদিদের পুনর্বাসন সেবা (After care services for the released prisoners) এবং বোর্স্টাল স্কুল (Borstal school) কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু-কিশোরের সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নিম্নে শিশু-কিশোরদের জন্য সংশোধনমূলক কার্যক্রমসমূহ সবিস্তারে পর্যালোচনা হলো-

(ক) কিশোর আদালত (Juvenile Court)

কিশোর আদালত কিশোর অপরাধীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষ ধরনের আদালত যা সাধারণ আদালত অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির। এর উদ্দেশ্য কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয় এবং কতিপয় প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে অপরাধীর চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা। কেননা, অপরাধী কিশোরের চারিত্রিক সংশোধন সম্ভব হলে ভবিষ্যতে সমাজে বয়স্ক অপরাধের সংখ্যাও কমে আসার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং সমাজের অধিক কল্যাণ সাধিত হবে। এই আদালতে কিশোর অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন আইনজীবীর প্রয়োজন নেই। আবার তাকে অপরাধী চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করার জন্য অথবা নির্দোষ প্রমাণ করার কোন ব্যবস্থা নেই।[৫৭] এক্ষেত্রে আদালত তার নিজস্ব ব্যবস্থায় অপরাধীর অপরাধ ও তার কারণ পর্যালোচনা করে অপরাধীকে পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মচারীর সমন্বয়ে কিশোর আদালত গঠিত হয়। অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে অপরাধীর পিতা-মাতা, ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন, সমাজকর্মী, শিক্ষক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শিশু-কিশোর আদালতের বিচার কার্য অনুষ্ঠিত হয়। অপরাধীর মানসিক উন্নয়ন এবং চরিত্র সংশোধনই আদালতের মূল উদ্দেশ্য।

কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করে 'শিশু আইনে বলা হয়েছে যে, (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং উহার অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে এবং ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় কমপক্ষে একটি আদালত থাকবে, যা শিশু আদালত নামে অভিহিত হবে। (২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে আইন ও বিচার বিভাগ, সুপ্রিমকোর্ট এর সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলা এবং ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার এক বা একাধিক অতিরিক্ত দায়রা জজ এর আদালতকে শিশু-আদালত হিসাবে নির্ধারণ করবে এবং একাধিক আদালত নির্ধারণ করা হলে তাদের প্রত্যেকটির আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্দিষ্ট করবে।[৫৮]

---

৫৭. বোরহান উদ্দিন খান ও মঞ্জুর কাদের, *অপরাধবিজ্ঞান পরিচিতি* (ঢাকা/চট্টগ্রাম: কামরুল বুক হাউজ, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৩৪

৫৮. *শিশু আইন*, ২০১৩, বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, এস.আর.ও নং ২৭৫-আইন/২০১৩ (২০১৩ সালের ২৪ নং আইন) অনুচ্ছেদ: ১৬

কিশোর আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে অপরাধীর আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তথা কিশোরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। এ কাজটিতে যারা সহযোগিতা করেন তারা হচ্ছেন, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত প্রবেশন অফিসার। কিশোর আদালত প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট অনুযায়ী অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সাক্ষী, অপরাধীর অভিভাবক, শিক্ষক বা ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন এবং স্থানীয় সমাজকল্যাণমূলক কোন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে অপরাধীর শুনানী গ্রহণ করে এবং তাকে তার ভুল বুঝবার সুযোগ দিয়ে চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপদেশ, নির্দেশ প্রদান করে অথবা বিশেষ কোন সংশোধনমূলক প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয়।[৫৯]

সাধারণত কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রে তিনটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে শিশু-কিশোরদেরকে ভর্তি করা হয়।

১। শিশু বা কিশোর-কিশোরী তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক কর্তৃক নিয়ন্ত্রণে অসাধ্য বা অবাধ্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরিত হয়। আইন অনুসারে সে শিশু 'অবহেলিত শিশু' হিসেবে বিবেচিত হবে না। 'শিশু আইন, ২০১৩' -এর অনুচ্ছেদ-৯০ অনুযায়ী এধরনের শিশুদেরকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়।

২। শিশু-কিশোর কোন অপরাধে সংশ্লিষ্ট হয়ে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে এখানে প্রেরিত হয়। এরকম শিশু বা কিশোরকে 'কিশোর অপরাধী' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিশু আইনের ৯১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এধরনের শিশুদেরকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়।

৩। যে শিশু-কিশোর গৃহহীন বা ছন্নছাড়া, পরিত্যক্ত, প্রাণঘাতী বিপদগ্রস্ত অথবা স্বাভাবিক জীবনযাপনের পরিবর্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়ায়।[৬০] এরকম শিশু-কিশোর 'অবহেলিত শিশু-কিশোর' হিসেবে বিবেচিত হয়। শিশু আইন,২০১৩ এর ৮৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৬ শ্রেণির শিশুকে অবহেলিত বা সুবিধাবঞ্চিত শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।

তাহলে দেখা যায় যে, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বা সংশোধনী কেন্দ্রে তিন (৩) শ্রেণির শিশুদের আশ্রয় প্রদান করা হয়। প্রথম শ্রেণি হচ্ছে অবাধ্য শিশু-কিশোর, যারা পিতামাতা কর্তৃক অবাধ্যতার কারণে এখানে প্রেরিত হয়েছে। শিশু আইনের আলোকে পিতামাতা, অভিভাবক কোর্টের বরাবর অভিযোগ করে তার সন্তান নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতার কথা জানালে আদালত তিন বছরের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে বা প্রত্যয়িত কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে তাকে প্রেরণ করবেন। দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে অপরাধপ্রবণ বা অপরাধী শিশু-কিশোর, যারা কোন অপরাধ সংঘটন করে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে আদালতের মাধ্যমে এখানে প্রেরিত হয় এবং তৃতীয় শ্রেণি হচ্ছে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অবহেলিত শিশু-কিশোর, যারা বিভিন্ন সমাজ কর্মী, প্রবেশন কর্মকর্তা এবং পুলিশ

---

৫৯. বোরহান উদ্দিন খান ও মঞ্জুর কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

৬০. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, p.145

কর্মকর্তার মাধ্যমে এখানে প্রেরিত হয়। শিশু আইনের অনুচ্ছেদ ৯০ অনুযায়ী, যদি কোন সমাজকর্মী বা প্রবেশন অফিসার লক্ষ্য করেন যে, কোন শিশু গৃহহীন, পরিত্যক্ত এককথায় অবহেলিত হচ্ছে, এরকম শিশুদেরকে তারা পুলিশ অফিসারের মাধ্যমে নথিভুক্ত করে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে নিয়ে আসতে পারেন।

কিশোর আদালতের বৈশিষ্ট্য

সাধারণ আদালত থেকে কিশোর আদালতের ভিন্ন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মূলত প্রাপ্তবয়স্ক সাধারণ ফৌজদারী আদালত থেকে ভিন্ন পরিবেশে সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি আদর্শ কিশোর আদালত পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার স্থলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করে এবং কিশোর অপরাধীর বিচার হয় সম্পূর্ণ অনানুষ্ঠানিকভাবে। তাই আদর্শ কিশোর আদালতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১। অপরাধের শুনানীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ: অন্যান্য সাধারণ আদালতের ন্যায় কিশোর অপরাধের বিচারের শুনানী একই রকম হবে না। শিশু-কিশোরদের অপরাধ বিচারের শুনানী ভিন্ন ব্যবস্থাপনায় হবে। যদি একই মামলায় বয়স্ক অপরাধীর সাথে শিশু ও কিশোর অপরাধী জড়িত থাকে তাহলেও পৃথক চার্জশীটের ভিত্তিতে পৃথকভাবে, পৃথক অধিবেশনে শিশুর শুনানী ও সাক্ষ্যগ্রহণ করতে হবে। শিশু আইনের অনুচ্ছেদ: ১৭ (২) -এ সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে:

কোন মামলায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সহিত কোন শিশু জড়িত থাকিলে, ধারা ১৫ এর অধীন পৃথক চার্জশীটের ভিত্তিতে, শিশু-আদালতকে উক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব, একই দিবসে পৃথকভাবে পৃথক অধিবেশনে সম্পন্ন করতে হবে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তা একই নিয়মে পরবর্তী কর্মদিবসে বিরতিহীনভাবে অব্যাহত থাকবে।[৬১]

২। আদালতের কার্যপ্রণালীতে অনানুষ্ঠানিকতা পালন: এখানে সাধারণ ফৌজদারী আদালতের ন্যায় আনুষ্ঠানিক কার্যপ্রণালী অনুসরণ করা হয় না বরং ঘরোয়া পরিবেশে বিচারকার্য পরিচালিত হয়। সাধারণত যে সকল দালান বা কামরায় সাধারণ আদালত পরিচালিত হয় সে আদালত ব্যতীত ভিন্ন আদালতে কার্যপ্রণালীর অনানুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়। এখানে প্রচলিত আদালতের ন্যায় কাঠগড়া, লালসালু ঘেরা আদালত, কালো গাউন পড়া আইনজীবি থাকবে না। বরং সাধারণ কোন কক্ষে সাধারণ জামা-কাপড় পরিহিত অবস্থায় আদালত কার্যপ্রণালী সম্পন্ন হবে। যাতে শিশুর মনে কোন ধরনের শঙ্কা বা এর বিরূপ প্রভাব না পড়ে।

৩। কিশোর অপরাধীকে নিয়মিত প্রবেশনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান। অর্থাৎ আদালত কর্তৃক নির্ধারিত প্রবেশন অফিসার অপরাধী এবং তার পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং তার চরিত্র সংশোধনের জন্য বিভিন্ন পন্থা ও সুপারিশ অব্যাহত রাখেন।

---

৬১. *শিশু আইন*, ২০১৩, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: ১৬৭ (২)

৪। কিশোর অপরাধীর জন্য পৃথক আটক নিবাস স্থাপন করা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বয়স্ক অপরাধীর সংস্পর্শে যাতে কিশোর অপরাধী না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা।

৫। কিশোর আদালত বিচার পরিচালনায় অপরাধী এবং তার চারিত্রিক সংশোধনের জন্য প্রবেশন রেকর্ডসমূহ বিশেষ পন্থায় সংরক্ষণ করে থাকে। এর উদ্দেশ্য কিশোর অপরাধীর প্রতি আদালতের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং ভবিষ্যতে একই অপরাধীর বিচার পরিচালনায় পূর্ববর্তী রেকর্ডের সাহায্য নেয়া।

৬। সাধারণ আদালতের ন্যায় সাধারণ জনগণ কিশোর আদালতে উপস্থিত হতে পারে না। শুধুমাত্র আইন দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিগণই আদালতে উপস্থিত থাকতে পারে।

৭। কিশোর অপরাধীর মানসিক এবং শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ্য রাখাও কিশোর আদালতের একটি কাজ।[৬২]

ফৌজদারী আদালত ও কিশোর আদালতের মধ্যে পার্থক্য

কিশোর আদালতের বৈশিষ্ট্য থেকে দেখা যায় যে, সাধারণ ফৌজদারী আদালতের কার্যপ্রণালী থেকে কিশোর আদালতের কার্যপ্রণালী সাধারণত ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। নিম্নে কিশোর আদালত ও ফৌজদারী আদালতের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো:

১। কিশোর আদালতে অপরাধীর শুনানীর ক্ষেত্রে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অপরাধীর অভিভাবক শুনানীর সময় উপস্থিত থাকেন। অপরপক্ষে ফৌজদারী আদালতে শুনানীর কাজটি মুক্ত আদালতে অনুষ্ঠিত হয়।

২। কিশোর আদালত শুনানীর কাজটি অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হয়। এখানে কিশোর অপরাধীর অপরাধ কর্ম সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়, যার পেছনে কোন মহলের এমন কোন উদ্দেশ্য থাকে না, যা কিশোর অপরাধীকে দোষী সাবস্ত করে শাস্তির জন্য সুপারিশ করবে। অন্যদিকে ফৌজদারী আদালতের শুনানীর কাজটি আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। অপরাধীকে দোষী বা নির্দোষ প্রমাণ করার এমন এক বিশেষ প্রচেষ্টা চলে যেখানে উভয় পক্ষের আইনজীবীরা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

৩। কিশোর আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে অপরাধীর পারিবারিক এবং আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে প্রায় ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান চালানো হয় এবং শুনানীর সময় সমাজিক অনুসন্ধান রিপোর্টের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অপরপক্ষে, ফৌজদারী আদালতের ক্ষেত্রে এমনটি লক্ষ্য করা যায় না।

---

৬২. বোরহান উদ্দিন খান ও মঞ্জুর কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫

৪। কিশোর অপরাধীকে যখন আদালতের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন এটা সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, আপত্তিকর বা সমাজবিরোধী কোন কাজ করছে বলেই তার বিষয়টি বিবেচিত হতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিচারালয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে কিশোরটি কেন এ ধরনের আচরণে প্রবৃত্ত হলো তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা। অপরপক্ষে, ফৌজদারী আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে নেয়া হয় যে, মূলত নিরাপরাধী যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে সন্দেহাতীতভাবে আইন এবং সাক্ষী দ্বারা অপরাধী হিসেবে প্রমাণ করা যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানে সাক্ষ্য প্রমাণ ব্যতিরেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

৫। বিচারের ক্ষেত্রে অন্তত তাত্ত্বিকভাবে হলেও কিশোর অপরাধীকে সংশোধনমূলক প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে মুক্তি দেওয়া হয়। কোন শাস্তি প্রদান করা হয় না। অন্যদিকে ফৌজদারী আদালতে শাস্তির প্রসঙ্গটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[৬৩]

কিশোর আদালতে শুনানীর পরবর্তী ব্যবস্থা

একটি আদর্শ কিশোর আদালত কর্তৃক গৃহীত সম্ভাব্য ব্যবস্থাবলি সাধারণ আদালত থেকে ভিন্ন। কিশোর আদালতে শুনানীর পর যেসব ব্যবস্থা সাধারণত গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ:

১. অপরাধী সম্পর্কে আনীত অভিযোগ বা ঘটনা আদালত কর্তৃক খারিজ ঘোষিত হতে পারে। এর অর্থ এই যে, কিশোরটি কোন আপত্তিকর কাজ করেনি এবং তাই সে নির্দোষ।

২. কিশোরটি অপরাধী বলে বিবেচিত হলে তাকে কোন একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে।

৩. অপরাধী কিশোরকে তার বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে কোন বিশেষ লালনপালন কেন্দ্রে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখা যেতে পারে।

৪. অপরাধী কিশোরকে কোন আবসিক সংশোধন কেন্দ্রে পাঠিয়ে তার চারিত্রিক সংশোধনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. অপরাধী কিশোরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা যেতে পারে।[৬৪]

৬৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬
৬৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

কিশোর আদালতের বিচারকের দায়িত্ব

কিশোর আদালতের কার্যাবলি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হলে বিচারককে বিচার কাজ পরিচালনা, প্রবেশন কর্মসূচি তদারক করা, অপরাধীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে করতে হয়। এ সম্পর্কে একজন বিচারককে নিম্নলিখিত দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে হয়:

১। কিশোর আদালতের বিচারকার্য পরিচালনায় তাকে সততা এবং সাম্যের আদর্শ প্রদর্শন করতে হবে। এ কাজে তিনি ব্যর্থ হলে অপরাধী কিশোর আইনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে এবং পরিণামে অপরাধী কিশোর অপরাধমূলক কাজে আরও তৎপর হয় উঠবে।

২। বিচারকের অন্যতম কাজ হচ্ছে সমাজকে রক্ষা করা। তিনি বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নেবেন যে, অভিযুক্ত কিশোরটিকে সমাজের পরিমণ্ডলে স্বাভাবিক জীবনযাপনের অনুমতি দিবেন কিনা- অর্থাৎ কিশোরটির দ্বারা পুনরায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে কিনা সে বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে ভেবে দেখবেন।

৩। তিনি সিদ্ধান্ত নিবেন যে, কিশোরটিকে তার পিতৃগৃহে ফেরৎ পাঠাতে হবে -নাকি তাকে কোন লালনপালন কেন্দ্রে বা কোন সংশোধনমূলক কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

৪। অপরাধী কিশোরকে পুনর্বাসনের জন্য কি ব্যবস্থা গৃহীত হবে তা বিচারক স্থির করবেন।

৫। অধিকন্তু, অপরাধী কিশোরের সংশোধনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের কাজকর্ম তদারক করাও বিচারকের অন্যতম দায়িত্ব।

এছাড়া কিশোর আদালতের বিচারককে তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হলে তাকে দেশের প্রচলিত আইন, সমাজিক রীতিনীতি, ধর্ম, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। তিনি জনগণের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং শিশু কিশোরদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। তাছাড়া তাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসামনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকল্যাণ বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অধিকন্তু, তিনি হবেন একজন দক্ষ প্রশাসক এবং প্রবেশন কর্মকর্তাসহ অন্যান্যদের কাজকর্ম তদারক করতে হবেন সিদ্ধহস্ত। সর্বোপরি তিনি কিশোরদের সঙ্গে আচরণে সহৃদয়তার পরিচয় দেবেন এবং সেই সঙ্গে আদালতের মর্যাদা রক্ষায় হবেন বদ্ধপরিকর।[৬৫]

৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯-৪০

কিশোর অপরাধীদের সাথে আচরণ

কিশোর অপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ (CRC,1989) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৩৭ ও ৪০ এ স্পষ্ট করে বলা আছে যে, একজন শিশু-কিশোর যখন আদালতের সংস্পর্শে আসবে তখন তাকে কিভাবে বিবেচনা করতে হবে, তার সাথে আচরণ কি হবে। CRC -এর ৩৭ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

(১) কোন শিশুর সাথে নিষ্ঠুর অমানবিক বা খারাপ আচরণ করা যাবে না এবং অমানবিক নিষ্ঠুর সাজা দেওয়া যাবে না।

(২) ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না এবং মুক্ত হবার সম্ভাবনা না থাকলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যাবে না।

(৩) বেআইনীভাবে বা স্বেচ্চাচারী আদেশের দ্বারা কোন শিশুকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কেবলমাত্র আইনানুযায়ী তাদেরকে গ্রেফতার করা এবং আটক রাখা যাবে তবে তা হতে হবে শেষ উপায় হিসেবে এবং যত কম সময় সম্ভব।

(৪) যেসব শিশুকে গ্রেফতার ও আটক করে রাখা হবে তাদের সাথে তাদের বয়সের কথা চিন্তা করে মানবিক আচরণ করতে হবে।

(৫) বন্দি অবস্থায় শিশুদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে রাখা যাবে না।

(৬) তাদেরকে তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রাখার সুযোগ দিতে হবে।

(৭) এসব শিশুকে যথাযথ আইনের সহায়তা পাওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে আদালতে আত্মরক্ষা করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।[৬৬]

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ CRC, 1989 -এর ৪০ নং অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়:

(১) যেসব শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আছে বা অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তাদের মর্যাদা বা সম্মানের দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের সাথে আচরণ করতে হবে। যাতে করে তারা অন্যের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের প্রতি যত্নশীল হয় এবং সমাজে গঠনমূলকভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হয়।

৬৬. *Convention on the Rights of the Children,* CRC,1989, অনুচ্ছেদ: ৩৭ ও ৪০

বাংলাদেশের “শিশু আইন, ২০১৩”-এর ৫৪ অনুচ্ছেদে আদালতের সংস্পর্শে আসা একজন শিশু-কিশোরকে কিভাবে বিচেনা করতে হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে:

(১) বিচার প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা ও পরিপক্কতার বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

(২) শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষ শিশুবান্ধব পরিবেশে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে উক্ত শিশুর মাতা-পিতা অথবা তাদের অবর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তার, যাদের উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজি থাকে বা স্বাচ্ছন্দবোধ করে, উপস্থিতিতে একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হবে।

(৩) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে শিশুর সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য শিশু-আদালত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করতে পারবে, যথা:

(ক) বিচার প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সকল তথ্য গোপন রাখা এবং এমন কোন তথ্য প্রকাশ না করা, যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুটিকে শনাক্ত করা যায়;

(খ) সাক্ষ্য প্রদানকারী শিশুর ছবি বা দৈহিক বর্ণনা গোপন করার উদ্যোগ গ্রহণ অথবা শিশুর ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য, প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা:-

(অ) পর্দার আড়ালে;

(আ) শুনানির পূর্বে শিশু-সাক্ষীর ভিডিওকৃত সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে, তবে উক্ত ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণকালে আসামীপক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট শিশুকে জেরা করার সুযোগ প্রদান করতে হবে;

(ই) একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে;

(ঈ) দ্বারবদ্ধ (Camera Trial) অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে; বা

(উ) ভিডিও লিংকেজ পদ্ধতি চালু হলে উক্ত পদ্ধতিতে;

(গ) আসামীর উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষ্য প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে বা যদি এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে শিশুটি সত্য কথা বলতে বাধাগ্রস্ত হতে পারে, তাহালে আসামীকে সাময়িকভাবে পুলিশের হেফাজতে আদালত পরিত্যাগের আদেশ প্রদান করা; তবে উক্ত ক্ষেত্রে আসামী পক্ষের আইনজীবীকে আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকতে এবং শিশুকে প্রশ্ন করার সুযোগ প্রদান করতে হবে;

(ঘ) শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় বিরতির সুযোগ প্রদান করা;

(ঙ) শিশুর বয়স ও পরিপক্কতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দিন ও তারিখে শুনানির সময়সূচি নির্ধারণ করা; এবং

(চ) মামলার সাক্ষী বা ভিকটিম হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানকালে, সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে ও পরে শিশুকে তার অভিভাবকসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করা; বা

(ছ) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ এবং আসামীর অধিকার বিবেচনায় নিয়ে আদালত যেরূপ বিবেচনা করবে, সেরূপ অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা।

(৪) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য শিশু-আদালত পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ মীমাংসার জন্য আদেশ প্রদান করতে পারবে।[৬৭]

কিশোর আদালতের অধিবেশন, ক্ষমতা ও এখতিয়ার

সাধারণ আদালতের ন্যায় কিশোর আদালতেরও স্বতন্ত্র অধিবেশন ও ক্ষমতা রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু আইনে এ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ সম্পর্কে শিশু আইনে বলা হয়েছে:

১। আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু কোন মামলায় জড়িত থাকলে, যেকোন আইনের অধীনেই হোক না কেন, উক্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার কেবল শিশু-আদালতের থাকবে।

২। কোন মামলায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে কোন শিশু জড়িত থাকলে, ধারা ১৫ এর অধীন পৃথক চার্জশীটের ভিত্তিতে, শিশু-আদালতকে উক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব, একই দিবসে পৃথকভাবে পৃথক অধিবেশনে সম্পন্ন করতে হবে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তা একই নিয়মে পরবর্তী কর্মদিবসে বিরতিহীনভাবে অব্যাহত থাকবে।

৩। শিশু-আদালত ধারা ১৮-এর বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্থান, দিন এবং পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে, উহার অধিবেশন অনুষ্ঠান করবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত শিশু-আদালতের বিচারক তাহার স্বীয় বিবেচনায় বিচারের দিন, ক্ষণ, স্থান নির্ধারণক্রমে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে, অধিবেশন আরম্ভ এবং সমাপ্ত করবেন।

৪। সাধারণতঃ যে সকল দালান বা কামরায় এবং যে সকল দিবস ও সময়ে প্রচলিত আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তা ব্যতীত, যতদূর সম্ভব, অন্য কোন দালান বা কামরায়, প্রচলিত আদালতের ন্যায় কাঠগড়া ও লালসালু ঘেরা আদালতকক্ষের পরিবর্তে একটি সাধারণ কক্ষে এবং অন্য কোন দিবস ও সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত শুধুমাত্র শিশুর ক্ষেত্রে শিশু-আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠান করতে হবে।

---

৬৭. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৫৪

৫। এছাড়া ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন দায়রা আদালতের ক্ষমতাসমূহ, সমন জারি, সাক্ষী তলব ও উপস্থিতি, কোন দলীল বা বস্তু উপস্থাপন এবং শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার সমূহ কিশোর আদালত ভোগ করবে।[৬৮]

কিশোর আদালতের পরিবেশ

কিশোর আদালতের পরিবেশ হতে হয় শিশু-কিশোর বান্ধব,যাতে শিশুদের মনে কোন ধরনের ভয়-ভীতি প্রবেশ না করে বা শিশু-কিশোর আদলতের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ না হয়। এ কারণে শিশু আইনে আদালতের পরিবেশ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিশু আইনে এ সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে বলা হয়েছে:

(১) আদালতকক্ষের ধরন, সাজসজ্জা ও আসন বিন্যাস বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।

(২) শিশু-আদালতের আসন বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যেন সকল শিশু বিচার প্রক্রিয়ায় তাহার মাতা-পিতা বা তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ বা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা ও আইনজীবীর, যতদূর সম্ভব সন্নিকটে বসতে পারে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আদালতকক্ষে শিশুর জন্য উপযুক্ত আসনসহ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য, প্রয়োজনে, বিশেষ ধরনের আসন প্রদানের বিষয়টি শিশু-আদালত নিশ্চিত করবে।

(৪) অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক শিশুর বিচার চলাকালীন, আইনজীবী, পুলিশ বা আদালতের কোন কর্মচারী আদালতকক্ষে তাদের পেশাগত বা দাপ্তরিক ইউনিফরম পরিধান করিতে পারবেন না।[৬৯]

এছাড়া আদালত চলাকালীন বেশি লোকজন বা অপরিচিত লোকজন উপস্থিত থাকলেও শিশু-কিশোরদের মনে ভিন্ন প্রভাব পড়তে পারে। এজন্য শিশু আইনে কিশোর আদালতে যেসকল ব্যক্তিবর্গ উপস্থি থাকতে পারবেন তাদেরকে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। শিশু আইনের ২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি শিশু-আদালতের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে পারবেন না, যথা :-

(ক) সংশ্লিষ্ট শিশু;

(খ) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য;

(গ) শিশু-আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারী;

---

৬৮. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ১৭
৬৯. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ১৯

(ঘ) শিশু-আদালতে উত্থাপিত মামলা অথবা কার্যধারার পক্ষগণ, শিশুবিষয়ক বা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা, মামলা সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এবং প্রবেশন কর্মকর্তাসহ মামলা অথবা কার্যধারার সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি; এবং

(ঙ) হাজির থাকার বা হবার জন্য শিশু-আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

এর মধ্য থেকেও আদালত প্রয়োজন মনে করলে শিশুদের অধিকতর সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য যাদেরকে আদালতকক্ষ থেকে বের করে দিতে পারবে, তাদের ব্যাপারে শিশু আইনের, ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

(১) শিশু-আদালত প্রয়োজন মনে করিলে, কোন মামলা শুনানিকালে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত ধারা ২৩ এ উল্লিখিত যেকোন ব্যক্তিকে উক্ত আদালত হইতে বহিরাগমণের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবে এবং উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আদালত পরিত্যাগ করতে বাধ্য থাকবেন।

(২) শালীনতা বা নৈতিকতা বিরোধী কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা শুনানিকালে কোন শিশুকে সাক্ষী হিসাবে তলব করা হলে, সংশ্লিষ্ট মামলা বা কার্যধারার সাথে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এবং শিশু-আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রবেশন কর্মকর্তা ব্যতীত শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে যাদেরকে প্রত্যাহার করা যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন হবে, শিশু-আদালত তাদেরকে প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে পারবে এবং উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আদালত পরিত্যাগ করতে বাধ্য থাকবেন।[৭০]

কিশোর আদালত কার্যক্রমের গোপনীয়তা

কিশোরদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্পর্শকাতর একটি বিষয়। এই বিচারিক প্রক্রিয়াকে সবসময়ই গোপন রাখা প্রয়োজন। যাতে করে একজন শিশুর স্পর্শকাতর বা ক্ষতিকর কোন বিষয় জনসম্মুখে এসে তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়। শিশু আইনে এ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করে বলা হয়েছে:

(১) শিশু-আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় জড়িত বা সাক্ষ্য প্রদানকারী কোন শিশুর ছবি বা এমন কোন বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটে প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে না যা সংশ্লিষ্ট শিশুকে শনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

(২) শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশুর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হবে না মর্মে শিশু-আদালতের নিকট প্রতীয়মান হলে উক্ত আদালত সংশিস্নষ্ট শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি প্রদান করতে পারবে।[৭১]

৭০. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ২৫
৭১. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ২৮

বিচার সমাপ্তির সময়সীমা

শিশু-কিশোরের বিচারের যেন দীর্ঘ সূত্রিতা না হয় সেদিকে আদালতের নজর দেওয়া উচিত। সবসময়ই যতস্বল্পসময়ে সম্ভব শিশু-কিশোরের বিচার সম্পন্ন করা উচিত। এ কারণেই কিশোর আদালতে শিশু-কিশোর অপরাধের বিচার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম সময় থেকে সর্বোচ্চ ৩৬০ দিনের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করতে হয়। শিশু আইনে শিশু আদালতে একজন কিশোর অপরাধীর বিচার কার্যের সময়সীমা উল্লেখ করে বলা হয়:

> (১) ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত উক্ত আদালতে শিশুর প্রথম উপস্থিত হওয়ার তারিখ হতে ৩৬০ (তিনশত ষাট) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে।
>
> (২) কোন যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে শিশু-আদালত, উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সংশ্লিষ্ট বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা আরও ৬০ (ষাট) দিন বর্ধিত করতে পারবে।
>
> (৩) শিশু-আদালতে বিচার আরম্ভ হবার পর হতে, বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে, একাদিক্রমে তার কার্যক্রম প্রত্যেক কার্যদিবসে বিনা বিরতিতে চলতে থাকবে।
>
> (৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করা না হলে সংশ্লিষ্ট শিশু, হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত, শিশু-আদালতের বিবেচনায় তাহার বিরুদ্ধে আনীত লঘু মাত্রার অভিযোগ হতে অব্যাহতি পাবে এবং একই অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিচার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাবে না: তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অভিযুক্ত থাকিলে তার মামলা অব্যাহত থাকবে।[৭২]

শিশু আদালতের তদন্ত প্রক্রিয়া

শিশু-কিশোরের বিচারিক তদন্ত প্রক্রিয়া একটু ভিন্ন প্রকৃতির। শিশু-কিশোরের বিচারের জন্য তদন্ত পদ্ধতি 'শিশু আইন, ২০১৩' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটিকে সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন বলা হয়। শিশু আইনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে:

> (১) শিশুকে শিশু-আদালতে হাজির করার অনধিক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রবেশন কর্মকর্তা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, শিশু-আদালতে একটি সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করবেন এবং এর অনুলিপি নিকটস্থ বোর্ড-এ ও অধিদপ্তরে দাখিল করবেন।

---

৭২. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৩২

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক শিশুর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, পটভূমি এবং কোন অবস্থায় ও এলাকায় সে বসবাস করে এবং কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, ইত্যাদির বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩) প্রবেশন কর্মকর্তার সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনসহ শিশু সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিবেদন গোপনীয় বলে গণ্য হবে।[৭৩]

শিশুর বিচারকালীন সুরক্ষা

শিশু আদালতে বিচার চলাকালীন সময়ে অপরাধী শিশু-কিশোর আইন অনুযায়ী কিছু সুরক্ষা পেয়ে থাকে। শিশুর বিচারকালীন সুরক্ষা সম্পর্কে শিশু আইনে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে:

> বিচার প্রক্রিয়ার যেকোন পর্যায়ে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা, ক্ষেত্রমত, আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রতীয়মান হলে সংশ্লিষ্ট শিশুর তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শিশুর জন্য নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যথা :-
>
> (ক) সংশ্লিষ্ট শিশুর সাথে অভিযুক্ত ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষাৎ পরিহার করা;
>
> (খ) পুলিশ বা অন্য সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুর নিরাপত্তা বিধান এবং উক্ত শিশু কোথায় অবস্থান করছে তা গোপন রাখা;
>
> (গ) আদালত বা পুলিশের নিকট সংশ্লিষ্ট শিশুর এবং, প্রয়োজনে, শিশুর পরিবারের সদস্যদের সকল পর্যায়ে যথোপযুক্ত নিরাপত্তার জন্য আবেদন করা।[৭৪]

কিশোরের গ্রেফতার

শিশু আইনে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোর বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু-কিশোরের গ্রেফতার প্রক্রিয়া এবং এখতিয়ার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে শিশু আইনে বলা হয় যে, ৯ বছরের নিচের কোন শিশুকে কোন অবস্থাতেই গ্রেফতার করা যাবে না। শিশুকে গ্রেফতারের পরে পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারের কারণ, স্থান, অভিযোগের বিষয়বস্তু ইত্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে শিশু বিষয়ক কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। গ্রেফতার করার সময় শিশুকে কোন অবস্থাতেই হাতকড়া বা কোমড়ে রশি লাগানো যাবে না। তার বয়স সম্পর্কিত জন্মনিবন্ধন সনদ না থাকলে স্কুলে ভর্তির সময় প্রদত্ত বয়স বিবেচনা করতে হবে। এবং গ্রেফতার করার পরেই ন্যূনতম সময়ে আদালতে হাজির করতে হবে।

---

৭৩. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৩১
৭৪. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৫৮

শিশু-কিশোরের জামিন

যদি গ্রেফতারকৃত শিশু-কিশোরকে বাহ্যিকভাবে শিশু আইন অনুসারে শিশু বলে মনে হয় যার বিরুদ্ধে জামিনের অযোগ্য মামলার অভিযোগ রয়েছে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে জামিনে মুক্তি দিতে পারবেন। কিন্তু তিনি যদি মনে করেন যে, তাকে ছেড়ে দিলে সে অভ্যাসগত অপরাধীদের সাথে মিশতে পারে বা তার জীবনের ঝুঁকি রয়েছে তাহলে তাকে মুক্তি দেওয়া যাবে না।[৭৫] শিশু-কিশোরের জামিন সম্পর্কে বলা আরো বলা হয় যে, কোন শিশুকে গ্রেফতার করিবার পর এই আইনের অধীন মুক্তি প্রদান বা বিকল্প পন্থায় প্রেরণ করা অথবা তাৎক্ষণিকভাবে আদালতে হাজির করা সম্ভবপর না হলে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুটিকে, তার মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শর্ত ও জামানত সাপেক্ষে, অথবা, শর্ত ও জামানত ব্যতীত জামিনে মুক্তি প্রদান করতে পারবেন। জামিনে মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধ জামিনযোগ্য বা জামিন অযোগ্য কি না তা শিশু-বিষয়ক কর্মকর্তা বিবেচনায় নিবেন না।[৭৬]

অপরাধের প্রকৃতি গুরুতর বা ঘৃণ্য প্রকৃতির হলে বা জামিন প্রদান করা হলে উহা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী হলে বা জামিন প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট শিশু কোন কুখ্যাত অপরাধীর সাহচর্য লাভ করতে পারে বা নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হতে পারে বা জামিন প্রদান করা হলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিশুকে জামিন বা মুক্তি প্রদান করবেন না।

শিশু-কিশোরকে এভাবে মুক্তি দেওয়া নাহলে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারের পর আদালতে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ সময় ব্যতীত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিকটস্থ শিশু-আদালতে হাজির করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। শিশুকে আদালতে উপস্থাপন করা হলে শিশু আদালত তাকে জামিন প্রদান করবে বা নিরাপদ স্থানে বা কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার আদেশ প্রদান করবে।[৭৭] এছাড়াও শিশু-কিশোরকে পুলিশ অপরাধের দায়ে ধরে থানায় আনার পরেও থানা কর্মকর্তা ইচ্ছা করলে তাকে মুক্তি প্রদান করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে তার বৈধ অভিভাবক, প্রবেশন কর্মকতা বা সমাজ কর্মীর উপস্থিতিতে লিখিত বা মৌখিক সতর্কীকরণের পর মুক্তি প্রদান করতে পারবে।[৭৮]

---

৭৫. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ২৯(১), (২)
৭৬. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৫২
৭৭. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৫২(১), (২),(৩),(৪),(৫)
৭৮. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৪৭ (২/ক)

কিশোরদের বিচার (Trial)

শিশু-কিশোর অপরাধের বিচারে শিশু-কিশোর অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩-এর ১৫ নং ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে বলা হয়েছে যে, কিশোরদেরকে প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে একসাথে চার্জসিট প্রদান ও বিচার করা যাবে না। যে অপরাধে কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক লোক একসাথে অভিযুক্ত হয় সেখানে আমলী আদালতকে অব্যশই কিশোর অপরাধীর আলাদা বিচার করার আদেশ দিতে হবে। ১৮৯৮ সালের Criminal Procedure Code এর ২৩৯ নং ধারায় একত্রে চার্জ গঠন করার কথা বলা হয়েছে। একই সাথে কৃত অপরাধের জন্য সমস্ত অপরাধীর বিচার একসাথে হবার সেই বিধান ফৌজদারী কার্যবিধিতে রয়েছে। তার ব্যতিক্রম হিসেবে শিশু আইনের ১৫ নং ধারাটি ব্যবহৃত হবে। কোন আদালত যদি এই ধারা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় এবং পরিণত ব্যক্তিদের সাথে কিশোরদের বিচার করে তবে তা হবে ঐ আদালত এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ। Shiplu and another vs. State মামলায় ১৬ বছরের কম বয়স্ক এক শিশুর বিচার প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীদের সাথে একসাথে করায় হাইকোর্ট বিভাগ ঐ রায়কে বাতিল করে দিয়েছেন।[৭৯]

অপরাধ সংঘটনের সময় কোন ব্যক্তির বয়স ১৬ বছরের কম (বর্তমানে ‘শিশু আইন, ২০১৩’ অনুসারে ১৮ বছরের কম) কিন্তু উক্ত অপরাধের বিচারকার্য শুরু হবার সময় তার বয়স ১৬ বছর পূর্ণ হলে ঐ ব্যক্তির আলোচনা করা হয়নি। Bimal das vs. State[৮০] মামলায় হাইকোর্ট ডিভিশন রায় দিয়েছেন যে, যেহেতু বিচারের সময় উক্ত ব্যক্তির বয়স ১৬ বছর অতিক্রম করেছে, সে কিশোর আদালতের বিচার পাবার অধিকারী নয়। কিন্তু কিশোর আইন ২০১৩ তে বলা হয়, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে অপরাধ সংঘটনের তারিখই হবে শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ।[৮১]

শিশু আইনে কিশোরদের বিচারের অধিবেশন রুমের পরিবেশকে সাধারণ আদালতের অধিবেশন কক্ষের পরিবেশ থেকে একটু আলাদা করে দিয়েছে। কারণ, একজন কিশোরকে স্বাভাবিক আদালতের জটিল কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা রাখা। আদালতে প্রাঙ্গণের নেতিবাচক পরিবেশ তাকে যাতে স্পর্শ করতে না পারে। আদালতের কাঠগড়ার দাঁড় না করিয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে তার বিচারকার্য সম্পাদন করাই এই ধারার উদ্দেশ্য। children Act এই ধারা অমান্য করলে বিচার প্রক্রিয়া অবৈধ হবে না। Munna and other state[৮২] মামলার এই প্রশ্ন উঠেছে এবং আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, এই ধারাটি mandatory নয় বরং directory। যদিও ফৌজদারী আদালত হচ্ছে Open Court, কিশোর আদালতের ক্ষেত্রে কিশোরদের বিচারকালীন সময়ে যে কেউ উপস্থিত থাকার বিধান নেই। শিশু আইন, ২০১৩-এর ২৩ অনুচ্ছেদ কিশোর

---

৭৯. *৪৯ ডি.এল.আর HDC* ৫৩
৮০. *৪৯ ডি.এল.আর HDC* ৪৬০
৮১. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ২০
৮২. *৭ বি.এল.সি HDC* ৪০৯

আদালতে বিচারকালীন সময়ে যেসব ব্যক্তি উপস্থিত থাকেতে পারবে তাদের তালিকা প্রদান করেছে। এ তালিকায় প্রদত্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও শিশুর অধিকতর নিরাপত্তা ও সুক্ষোর জন্য আদালত ইচ্ছা করলে তাদেরকে আদালতের বাহিরে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারবে।[৮৩]

কিশোর অপরাধীর সাজা: শিশুর উপর নির্দিষ্ট দণ্ড আরোপে নিষেধাজ্ঞা

শিশু আদালতের কাজ শাস্তি প্রদান করা নয় বরং সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পুনএকত্রীকরণে সহায়তা করাই শিশু আদালতের মূখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য শিশু আদালত অন্য আদালতের ন্যায় সকল দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করতে পারে না। বিশেষ করে মৃত্যু দণ্ড, যাবজ্জীবন কারা দণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদান করা যায় না। দণ্ড আরোপের নিষেজ্ঞা প্রদান করে শিশু আইনের ৩৩ ও ৩৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, কোন শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে না। তবে কোন শিশু মারাত্মক ধরনের অপরাধ সংঘটিত করলে আদালত ইচ্ছা করলে কারাদণ্ড প্রদান করে কারাগারে প্রেরণ করতে পারবেন। তবে আদালত তার বয়স বিবেচনা করে কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে রাখার ব্যবস্থাও করতে পারবেন। এছাড়াও শিশু যদি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানের মত কোন অপরাধ করে থাকে সেক্ষেত্রে শিশু আদালতের করণীয় বর্ণনা করে ৩৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এ ক্ষেত্রে আদালত শিশুকে অনুর্ধ্ব ১০ বছর এবং অন্যূন ৩ বছর মেয়াদের আটকাদেশ প্রদান করে কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে আটকে রাখার আদেশ প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে কিশোর অপরাধীকে সাজা দেওয়ার সময় বা কোন আদেশ দেওয়ার সময় কতগুলো বিষয় আদালতকে অব্যশই বিবেচনা করতে হবে:

(ক) শিশুর বয়স ও লিঙ্গ;

(খ) শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা;

(গ) শিশুর শিক্ষাগত যোগ্যতা বা শিশু কোন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত;

(ঘ) শিশুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক অবস্থা;

(ঙ) শিশুর পরিবারের আর্থিক অবস্থা;

(চ) শিশুর ও তাহার পরিবারের জীবন-যাপন পদ্ধতি;

(ছ) অপরাধ সংঘটনের কারণ, দলবদ্ধতার তথ্য, সার্বিক পরিস্থিতি ও পটভূমি;

(জ) শিশুর অভিমত;

(ঝ) সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন; এবং

---

৮৩. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ২৫ (১),(২)

(ঞ) শিশুর সংশোধন ও সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আনুষঙ্গিক যে সকল বিষয় বিবেচনার্থে গ্রহণ করা আবশ্যক ও প্রয়োজন।[৮৪]

এছাড়া শিশু-কিশোরদের বিচারের কোন আদেশ প্রদানের ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। শিশু আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিশু আদালত কোন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির পরিভাষা 'অপরাধী', দণ্ডিত, দণ্ডাদেশ' শব্দসমূহ ব্যবহার না করে এর পরিবর্তে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি, দোষী সাব্যস্তকরণ বা মার্জিত কোন শব্দ ব্যবহার করবে।[৮৫]

কোন একজন শিশু অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল বলে তাকে কোন চাকরির জন্য অযোগ্য বা চাকরি থেকে বাদ দেওয়া যাবে না অথবা কোন নির্বাচনে অযোগ্য করা যাবে না। কারণ এসম্পর্কে শিশু আইনে তাদের অবমুক্তি প্রদান করা হয়েছে।[৮৬] কোন শিশু যখন দোষী হিসেবে সাব্যস্ত হবে, আদালত সুবিধাজনক মনে করলে কোন সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠানে বন্দি করার আদেশ দিতে পারেন। এ বন্দি থাকার সময় ২ বছরের কম বা ১০ বছরের বেশি হবে না এবং এ শিশুর সয়স ১৮ বছর অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত সে ঐ সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করবে। আদালত এসব তরুণ অপরাধীদের কোন সার্টিফাইড প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ না করে-

১. তিরস্কার করে ছেড়ে দিতে পারেন।

২. ভাল আচারণ প্রদর্শন করবে এই মর্মে তার পিতামাতা, অভিবাবক বা অন্য কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে তাকে ছেড়ে দিতে পারেন।

৩. আদালত তাকে কোন প্রবেশেন অফিসারের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিতে পারেন।[৮৭]

কিশোর আদালত যখন কোন ব্যক্তিকে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করেন তখন আদালত ঐ জেলার প্রবেশন অফিসারদের মধ্যে যাকে উপযুক্ত মনে করেন তাকে নিয়োগ দেবেন অথবা এরূপ প্রবেশন অফিসার না থাকলে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত মনে করেন তাকে প্রবেশন অফিসার হিসেবে নিয়োগ দিবেন।[৮৮] উক্ত অফিসার ঐ শিশুর খোঁজ-খবর রাখবেন, তার আচরণ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সময়ে সময়ে আদালতে প্রতিবেদন পেশ করবেন। প্রবেশন অফিসারের রিপোর্ট হবে অত্যন্ত গোপনীয় এবং এই রিপোর্ট প্রকাশ করা বা শিশুর কোন ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

উল্লিখিত আলোচনায় লক্ষণীয় যে, অপরাধীর পুনর্বাসনই কিশোর আদালতের অন্যতম লক্ষ্য। আদালত তাকে তার অপরাধের জন্য কোন শাস্তি প্রদান করে না। তবে আদালত তাকে কিশোর অপরাধী, অবহেলিত কিশোর, পরনির্ভর বা স্পর্শকাতর কিশোর ইত্যাদি হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার মঙ্গলের জন্য তথা

৮৪. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৩০
৮৫. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৩৬ (১), (২)
৮৬. বিস্তারিত দেখুন: *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৪৩
৮৭. বিস্তারিত দেখুন: *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৫২
৮৮. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৩১

চারিত্রিক সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কিশোর অপরাধীদেরকে সাধারণ অপরাধীদের মত বিবেচনা না করে তাদেরকে সংশোধনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা এবং পিতৃ-মাতৃ প্রকৃতির দরদভরা শাসনের এখতিয়ার নিয়ে এই কিশোর আদালত কার্যক্রম পরিচালিত হয়। মূলত এই আদালতের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ, তদন্ত, প্রতিবেদন এবং অপরাধের ধরনের প্রেক্ষিতে কিশোর-কিশোরীদের জন্য সংশোধন কেন্দ্রে অবস্থানের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়।

(খ) কিশোর হাজত (Remand Home)

কিশোর উন্নয়নকেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হলো কিশোর হাজত। অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট শিশু-কিশোরের বিচারের অন্তবর্তীকালীন সময়ে আটক ও নিরাপদ হেফাজতের জন্য কিশোর হাজত (Remand Home) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অপরাধের প্রকৃত কারণসমূহ নির্ণয়ের জন্য কিশোর অপরাধীদের বিচারের পূর্বে বা বিচারকালীন সময়ে কিংবা বিচারের পর সংশোধনের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে যে আলাদা ব্যবস্থায় রাখা হয় সেটিই হলো কিশোর হাজত। এর অপর নাম আটক নিবাস। আদালতে মামলার কার্যক্রম শুরু হওয়া থেকে মামলা নিষ্পত্তি পর্যন্ত কিশোর অপরাধীদের জেল হাজতে না রেখে এ স্থানে রাখা হয়। এখানে অপরাধীদের শাস্তি না দিয়ে বিভিন্নভাবে সমাজকর্মী কর্তৃক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। এ সময়ে একজন সমাজকর্মী প্রবেশন কর্মকর্তা কিশোর আদালতের সিদ্ধান্তের পূর্বে অপরাধী কিশোর সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়ার এবং ঘটনা অনুসন্ধানের পর্যাপ্ত সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ সময় প্রবেশন কর্মকর্তার কাজ অপরাধী কিশোর অপরাধ সমস্যার সামাজিক কারণ নির্ণয় করা।

কিশোর হাজতে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কিশোর-কিশোরীদের জন্য খেলা-ধুলা, ধর্মীয় শিক্ষা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। শুধুমাত্র স্বল্পসময়ের জন্য কিশোরদের কিশোর হাজতে রাখার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু আইনে এ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। শিশু আইনে বলা হয়েছে, "বিচারকালীন শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখার বিষয়টি সর্বশেষ পন্থা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে, যার মেয়াদ হবে যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের জন্য। সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরাপদ হেফাজতে রক্ষিত শিশুকে বিকল্পপন্থায় পরিচালনার জন্য প্রেরণ করতে হবে। শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা একান্ত প্রয়োজন হলে শিশু-আদালত, সংশ্লিষ্ট শিশুকে উক্ত আদালত হতে যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করার জন্য আদেশ

প্রদান করবে। তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোন শিশুকে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী অধিক বয়স্ক শিশুদের হতে প্রেরিত শিশুকে পৃথক করে রাখতে হবে।"[৮৯]

কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আদালতের মত নিজস্ব কিশোর হাজতবাস রয়েছে। যদিও হাজতবাস নামে এ বিভাগটি পরিচিত কিন্তু সনাতনী অর্থে এটা কোন হাজত নয়। প্রতিষ্ঠানটিকে পর্যবেক্ষণ বিভাগ নামকরণ করা যেতে পারে। আদালতে মামলা উঠার পর এবং মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কোন কোন কিশোরকে প্রয়োজনবোধে এই হাজতে রাখা হয়। এ সময়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভিন্নভাবে কিশোরকে পর্যবেক্ষণ ও জিজ্ঞাসাবাদ করে তার চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। তাদের চেষ্টা ও অভিভাবকমণ্ডলীর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রবেশন অফিসার বা তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। কিশোর হাজতখানায় থাকাকালে কিশোর বিভিন্ন ধরনের খেলা-ধুলার সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, কিন্তু এ সময়ে তারা পড়াশোনা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। যেহেতু এটা অল্প সময়ের ব্যাপার, তাই তাদের পড়াশোনা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের তেমন ক্ষতি হয় না।

(গ) **ট্রেনিং ইনস্টিটিউট** (Training Institute)

সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা এবং আচরণের সংশোধন করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য তৈরি করা। কিশোর অপরাধীকে বিচারের পর থেকে সংশোধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংশোধনাগারে রাখা হয়। অপরাধী কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উন্নয়ন সাধন করা এই সংশোধনী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এই প্রতিষ্ঠান কিশোরদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাদের প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের সংশোধন ও উন্নয়নকল্পে কাউন্সিলিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী কিশোরদের শারীরিক গঠন, বুদ্ধিমত্তা ও তাদের মননশীলতা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে সংশোধনী ইনস্টিটিউটের। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাধারণ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, খেলা-ধুলা, সংস্কৃতি ও চিত্তবিনোদন প্রভৃতি কার্যক্রম।

৮৯. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ২৬

অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সমাজকর্মী ও অন্যান্য কর্মকর্তা কিশোরদের পর্যবেক্ষণ, কেস রেকর্ডিং, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন আনতে প্রচেষ্টা চালায়। সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে থাকার ফলে কিশোর-কিশোরী অপরাধীদের মধ্যে পরিবর্তন আসে এবং তাদের মন থেকে অপরাধপ্রবণতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। এখানে অপরাধী নিবাসীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য শারীরিক পরিশ্রম, বিচিত্রানুষ্ঠান, পিকনিক ও পর্যাপ্ত খেলা-ধুলার ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে নিবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন হতে পারে। সংশোধনী কেন্দ্রের নিবাসীদের নানামুখী জটিলতা ও সমস্যার সমধানের জন্য শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১। সাধারণ শিক্ষা প্রোগ্রাম

২। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা

৩। সামাজিক শিক্ষা

৪। কারিগরি শিক্ষা প্রোগ্রাম

৫। সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য কাউন্সেলিং এবং

৬। বিনোদন।

১। সাধারণ শিক্ষা বা বিদ্যালয় শিক্ষা প্রোগ্রাম

কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে শিশু-কিশোরদের শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বা একেবারে নতুনভাবে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করার জন্য শিশু শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৯০] বাংলাদেশে সরকারি যেসব শিশু-কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে, সে সকল প্রতিষ্ঠানে কিশোর উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রোগ্রামকে আবশ্যিক করা হয়েছে। এসব সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তবে উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ নিজস্ব ব্যবস্থায় ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান অব্যাহত রেখেছে। যেসব শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে তাদেরকে আরো শিক্ষা দানের ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। তবে সাধারণ শিক্ষার আওতায় সর্বোচ্চ ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে যে সকল জেএসসি, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চায়, উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, আদালত এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের সাথে সমন্বয় সাধন করে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে থাকে। ঢাকা বোর্ডের বিশেষ অনুমতিক্রমে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। শিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ১৯৯৮ সালে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীরা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে নিবাসীদের মেধা, দক্ষতা এবং তাদের স্কুলের পূর্ববর্তী

৯০. Abdul Hakim Sarker, *ibid*, p. 289

রেকর্ড যাচাইবাচাই করে অনেক নিবাসীকে কেন্দ্রের বাহিরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়।[৯১] উন্নয়ন কেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে- অপরাধে জড়িত শিশু-কিশোরদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। এক দল দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন আদর্শ নাগরিক তৈরির উদ্দেশ্য অর্জনে কেন্দ্রসমূহ কার্যকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা

নিবাসী শিশু-কিশোরদের মধ্যকার অস্থিরতা কাটিয়ে উঠার জন্য এবং তাদেরকে ধর্ম সচেতন ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলার জন্য এখানে বিশেষ ধর্মীয় শিক্ষা এবং অনুশীলনের ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অনেকটা বাধ্যতামূলভাবেই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। সংশোধনের উদ্দেশ্যে আগত প্রত্যেক শিশু-কিশোর অপরাধী নিবাসীকে তাদের স্ব-স্ব ধর্মের শিক্ষা প্রদান ও অনুশীলনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে প্রত্যহ ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ইবাদতসমূহ অনুশীলন করানো হয়। প্রত্যেক শিশু-কিশোরকে নিজ নিজ ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে করে তারা নৈতিক শিক্ষা লাভ করতে পারে।

৩। সামাজিক শিক্ষা

নিবাসী শিশু-কিশোরদেরকে সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে পরিচিতি ঘটানোর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যাতে করে তারা তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে উপলব্দি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা, জাতীয় দিবস ও উৎসব পালন করা, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে সালাম প্রদান করা, ছোটদেরকে স্নেহ করা, বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা ও সম্ভাব বজায় রাখা প্রভৃতি তাদেরকে সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধের সাথে পরিচিতি ঘটায়।

৪। কারিগরি শিক্ষা প্রোগ্রাম

সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও বিনোদন কাযক্রমের পাশাপাশি বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো যাতে নিবাসীরা তাদের পরবর্তী জীবনে সামাজিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সমাজে উপযুক্ত কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে। শারীরিক গড়ন ও শক্তিমত্তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিচক্ষণতা-বুদ্ধিমত্তা, স্বাভাবিক কুশলতা ও ঝোঁক এবং কাজের সুযোগ-সুবিধার উপর ভিত্তি করে নিবাসীরা কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পছন্দ করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থী যারা আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় আগ্রহী হবে না বলে মনে হয় তারাই এই কারিগরি শিক্ষায় বেশি অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের তিনটি সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে নিম্নোক্ত কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে:

৯১. *Ibid*, p.174

সারণী-৬৫: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (তিন কেন্দ্রে একত্রে)[৯২]

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর	কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর	কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর
১। টেইলারিং ও শিল্প কল কারখানার কাজ ২। অটোমোবাইলের কাজ ৩। ওয়েল্ডিং (ঝালাই) ৪। বৈদ্যুতিক তারের কাজ ৫। কাঠের কাজ ৬। মোটর ড্রাইভিং ও মেরামত ৭। রাজমিস্ত্রী	১। টেইলারিং ও শিল্প কল কারখানার কাজ ২। অটোমোবাইলের কাজ ৩। ওয়েল্ডিং (ঝালাই) ৪। বৈদ্যুতিক তারের কাজ ৫। ইলেকট্রনিক্সের কাজ ৬। চুলকাটা	১। টেইলারিং ও শিল্প কল কারখানার কাজ ২। এমব্রয়ডারি ৩। ইলেকট্রনিক্স ৪। পোলট্রি

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রে কারিগরি প্রোগ্রামে যে সমস্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে সেগুলো অনেকটাই সেকেলে এবং পুরানো। বর্তমান আধুনিক যুগে এসবের উপযোগিতা বা চাহিদা নাই বললেই চলে। তাই এসব প্রশিক্ষণ প্রোগামে পরিবর্তন এনে আধুনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরী। নিম্নোক্ত টেবিলে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের কারিগরি প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদের বিবরণ দেওয়া হলো:

সারণী-৬৬: বর্তমানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষার্থী শিশু-কিশোরের সংখ্যা (তিন কেন্দ্রে একত্রে)[৯৩]

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	শিক্ষার্থী শিশুর সংখ্যা		
		টঙ্গী কেন্দ্র	যশোর কেন্দ্র	কোনাবাড়ী কেন্দ্র
১	অটোমোবাইল ট্রেড	২০ জন	৪৫ জন	-
২	কাঠ শিল্প ট্রেড	২০ জন	-	-
৩	ইলেকট্রিক ট্রেড	২০ জন	৫৫ জন	০৪ জন
৪	দর্জিবিজ্ঞান ট্রেড	২০ জন	১১ জন	১১ জন
৫	ওয়েল্ডিং	-	৩৫ জন	-
৬	এমব্রয়ডারি	-	-	১৫ জন
৭	পোলট্রি	-	-	০৫ জন
	মোট প্রশিক্ষণরত	৮০ জন	১৪৬ জন	৩৫ জন

৫। কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে সাধারণ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অপরাধপ্রবণ একজন শিশু-কিশোরকে মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কাউন্সেলিং কার্যক্রমের ব্যবস্থা রয়েছে। কিশোর অপরাধীদের

৯২. সূত্র: *মাঠ পর্যায়ে জরিপ কর্ম*, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ (টঙ্গী, যশোর ও কোনাবড়ী), প্রাগুক্ত
৯৩. *প্রাগুক্ত*

আচরণ সংশোধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মানসিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা, যথাযথ সামাজিকীকরণ এবং তারা যাতে সমাজের সাধারণ সদস্য হিসেবে ফিরে আসতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে সমাজকর্মী ও প্রবেশন অফিসারগণ কাজ করে যাচ্ছেন।

৬। বিনোদন

প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের সাক্ষাৎকারে দেওয়া তথ্য মতে, কিশোর সংশোধনী কেন্দ্রগুলোতে নিবাসীদের যথাযথ মানসিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলা-ধুলা, শরীর চর্চা এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত উন্নয়ন কেন্দ্রের বিনোদনমূলক কার্যক্রমকে তিনভাগে ভাগ করা যায়:

প্রথমত, সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: ইনস্টিটিউটের সুন্দর অডিটরিয়ামে সাপ্তাহিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং সামষ্টিক জীবনে আরো উন্নতি প্রকাশের লক্ষ্যে এই অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য সঙ্গীত, বিতর্ক, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, কৌতুক প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।[৯৪] সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপরোল্লিখিত বিষয়ে নিবাসীদের প্রত্যেককে তাদের নিজস্ব চাহিদা ও রুচি অনুযায়ী কিছুনা কিছু উপস্থাপন করতে হয়। সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সংশ্লিষ্টতার মাধ্যম্যে সম্ভাব্য সমাধানের জন্য তাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় সমস্যা উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানানো হয়। সংশোধনী কেন্দ্রের কর্মকর্তাগণও তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত আদর্শ পালনে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের জীবন ও কর্ম উপস্থাপন করে থাকেন এবং বিপরীতক্রমে দণ্ডবিধি উল্লেখ পূর্বক বিভিন্ন অপরাধ কর্মের উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করে ব্যক্তি ও সমাজের উপর -এর খারাপ প্রভাব উপস্থাপন করেন।

দ্বিতীয়ত, শারীরিক কসরত: একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের অধীনে প্রত্যহ সকালে আবশ্যিকভাবে শারীরিক কসরত অনুশীলন করানো হয়। সকল নিবাসীকে সাধারণ সমাবেশে একত্র করা হয় এবং এখানে জাতীয় সংগীত ও শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।

তৃতীয়ত, ক্রীড়া অনুষ্ঠান: এখানে নিবাসী শিশু-কিশোরদের উন্মুক্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন ও বহিঃক্রীড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সূর্যাস্তের দুই ঘন্টা পূর্বে প্রত্যেক নিবাসীকেই আবশ্যিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে হয়। যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে মাঠপর্যায়ে জরিপকার্য পরিচালনাকালীন সময়ে সেখানে চলমান বিনোদনমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশীয় একটি খেলার বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

---

৯৪. Abdul Hakim Sarker, *ibid*, pp. 289-90

খেলার নাম: যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ফুটবল লীগ, ২০১৮

- টিম গঠনের জন্য প্লেয়ারস নিলাম অনুষ্ঠান- ২১ অক্টোবর ২০১৮
- মোট টিম সংখ্যা ৬টি, দেশের ৬টি বিভাগের নামের সাথে মিল রেখে বরিশাল টিম, ঢাকা টিম, খুলনা টিম, চট্টগ্রাম টিম, রাজশাহী টিম ও রংপুর টিম নামে নামকরণ করা হয় ফুটবলের দলগুলোকে। এ ছয়টি টিমকে দু'টি ভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। যথা: গ্রুপ-"এ" ও গ্রুপ-"বি"
- "এ" গ্রুপের দলগুলো হলো, চট্টগ্রাম খুলনা ও ঢাকা।
- "বি" গ্রুপের দলগুলো হলো: রংপুর, রাজশাহী ও বরিশাল
    - ছয় (৬) টি টিমের আইকন প্লেয়ারগণ হলেন–

    ১. বরিশাল টিম- মোঃ মাসুম

    ২. ঢাকা টিম- মোঃ রবিউল

    ৩. খুলনা টিম– রেজাউল ইসলাম

    ৪. চট্টগ্রাম টিম - সজিব

    ৫. রাজশাহী টিম- তন্ময়

    ৬. রংপুর টিম - রূপক

প্রত্যেক টিমের কোচ, ম্যানেজারসহ মোট ২৩ জন সদস্য নিলামের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত দলসমূহ তাদের নিজ নিজ গ্রুপে লীগ পর্যায়ে দু'বার মুখোমুখি হয় এবং প্রথম রাউন্ড শেষে প্রত্যেক গ্রুপের লীগ টেবিলের শীর্ষ দুই টিম সেমি ফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করে। এভাবে দুই গ্রুপের চারটি টিম সেমিফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করে। 'এ' গ্রুপের শীর্ষ পয়েন্টধারী 'বি' গ্রুপের রানার্সআপ পয়েন্টধারীর সাথে সেমিফাইলে মুখোমুখী হয়। বিপরীতক্রমে 'এ' গ্রুপের রানার্স-আপ পয়েন্টধারীর 'বি' গ্রুপের শীর্ষ পয়েন্টধারীর সাথে সেমিফাইলে মুখোমুখী হয়। পরবর্তীতে সেমিফাইনালে জয়ী দু'টি দল ফাইনালে মুখোমুখী হয় এবং একটি আকর্ষণীয় খেলা উপহার দিয়ে ফুটবল লীগ ২০১৮ সমাপ্ত হয়।[৯৫]

আত্মসচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন, সহযোগী মনোভাব সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধকরণ ও উৎসাহ দানের জন্য বিভিন্ন সমাজ কর্মী ও সংশোধনী কর্মকর্তাগণ এসকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। এছাড়া শিশু-কিশোরদের আনন্দ উপভোগের জন্য টিভি এবং বেতারের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট চ্যানেল এবং অনুষ্ঠান উপভোগের অনুমতি প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিবাসীদের ব্যবহারের জন্য পড়া-লেখার সুব্যবস্থাসহ এখানে লাইব্রেরীও রয়েছে।

---

৯৫. সূত্র: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র যশোর-এ ০৫ থেকে ০৮ অক্টোবর, ২০১৯খ্রি. পর্যন্ত মাঠ সমীক্ষা পরিচালনা কালীন সময়ে গবেষক সরাসরি এ খেলাটি উপভোগ করেন এবং তথ্য সংগ্রহ করেন।

এসকল শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড ছাড়াও কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্মকণ্ড রয়েছে:

(ক) রুটিন কাজ

উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদেরকে আবশ্যিকভাবে দৈনন্দিন রুটিন কাজ সম্পাদন করতে হয়। শ্রম ও শ্রমিকের মর্যদা এবং আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় তারা নিজেদেরকে ফুলের বাগান, সবজি চাষসহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত রাখে।

(খ) বাৎসরিক বনভোজন/পিকনিক

প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বর জাতীয় বিজয় দিবসে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (কিউক) এবং নিবাসীদের যৌথ আর্থিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে পিকনিক বা বাৎসরিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন এবং খাওয়া-দাওয়া ও উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা এ দিনটি উদযাপন করে।

(গ) চিকিৎসা সেবা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের (কিউক) নিবাসীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দেখা-শুনার জন্য পার্টটাইম ডাক্তার, স্থায়ী কম্পাউন্ডার এবং মহিলা নার্সের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল টিম রয়েছে। শিশু নীতি ১৯৭৬ এর ১৫ নং বিধান অনুসারে, “An inmate, immediately after his detention in certified institute or approval home, shall be medically examined in such way and by such a physician as specified by Director. An inmate, suffering from any contagious disease, shall be kept in segregation from other inmates and special arrangement shall be made for her/his treatment by the superintendent or by the managers of the certified institute or approved home. Arrangement shall also be made for medical check-up of inmates at regular intervals.”[৯৬]

এছাড়া জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১ এর ৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, কিশোর কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যথাযথ বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। কিশোর কিশোরীদের শারীরবৃত্তীয় ও আবেগজনিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে পারিপার্শ্বিক পরিবেশে প্রজনন স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য প্রয়োনীয় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।[৯৭]তবে কিশোরদের স্বাস্থ্যসেবা ও সুস্বাস্থ্য বর্তমানে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

---

৯৬. *The Children Rules,1976,* Rule:15
৯৭. *জাতীয় শিশু নীতি*, ২০১১, অনুচ্ছেদ: ৭ (২),(৩)

(ঘ) খাদ্য ও পোশাক

শিশু নীতি ১৯৭৬ এর ১৮ নং বিধান মতে উন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের জন্য শিশু নীতির তালিকা অনুযায়ী খাদ্য-পানীয় এবং পরিধেয় জামা-কাপড় সরবরাহ করতে হবে। শিশু-কিশোরদের অসুস্থতার সময় ডাক্তারের পরামর্শক্রমে বিশেষ খাদ্য সরবরাহ করার কথা বলা আছে। এছাড়া বাংলাদেশের উৎসবের দিনসমূহে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে শিশু-কিশোরদের আগমনের পর প্রত্যেক নিবাসীদের জন্য জামা-কাপড় এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নিবাসী কিশোর-কিশোরীর খাদ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের দৈনন্দিন খাদ্যের চার্ট দেওয়া হয়েছে (সারণী-৩৭ঃ নিবাসীদের সাপ্তাহিক খাদ্য তালিকা)।

(ঙ) সাক্ষাৎ দিবস

প্রতি ইংরেজি মাসের ৭ ও ২২ তারিখ (নির্ধারিত দিনে সরকারী ছুটি হলে পরের দিন) পিতামাতা বা অভিভাবকগণ তাদের শিশু-কিশোর নিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারে। এসময় তারা ইচ্ছা অনুযায়ী খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সরবরাহ করতে পারে।

(চ) অভিভাবক সম্মেলন

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আদান প্রদানের জন্য প্রতি দুই মাস কিংবা তিন মাস অন্তর অন্তর অভিভাবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা শিশুদের জন্য ভবিষ্যতে আরো কল্যাণকর যৌথ কমর্সসূচী গ্রহণে ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়।

(ছ) ছুটির বিধান

সাধারণ একজন নিবাসী তার শর্তের দুই-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত করার পর ছুটি উপভোগ করতে পারে। এছাড়া সে নির্দিষ্ট কিছু জরুরী অবস্থায় এরকম ছুটি উপভোগ করতে পারে। যেমন, তার অতি প্রিয়জন পিতামাতা, নিকটাত্মীয়দের মৃত্যু, কঠিন রোগ প্রভৃতির সময়।

(জ) মুক্তি

নির্ধারিত সময় অতিবাহিত করার পর অথবা যদি শিশু-কিশোর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, নিবাসী নিজেকে সন্তোষজনক পর্যায়ে সংশোধন ও উন্নয়ন করতে পেরেছে তাহলে অনেক সময় নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সে মুক্ত হতে পারে।

আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অনুশীলন আমাদের শিশু-কিশোরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে বিরত রাখে। যৌথ পারিবারিক ব্যবস্থায় সন্তানের উপর পিতামাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠসহ সমাজের নিয়ন্ত্রণ থাকায় খুব সহজেই তারা অপরাধী হতে পারে না। আধুনিক সমাজের ছোঁয়া পেয়ে এবং ভিন্ন সংস্কৃতির আগ্রাসনে আমাদের দেশেও কিশোর অপরাধীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা প্রশংসার দাবী রাখলেও এ কার্যক্রম প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের জন্য সরকারি পর্যায়ে আরো নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং চলমান কার্যক্রমসমূহ আরো বেগবান করা প্রয়োজন।

(ঘ) প্রবেশন (Probation)

প্রবেশন অপরাধ সংশোধনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। প্রবেশনের ঐতিহাসিক আলোচনায় দেখা যায় যে, ১৮৪১ সালে আমেরিকার বোস্টন শহরের এক জুতার কারিগর জন অগাস্টস (John Augustus) প্রবেশন ব্যবস্থার সূচনা করেন। আমেরিকান কনগ্রেসে প্রবেশন আইন প্রথম উপস্থাপন করা হয় ১৯০৯ সালে। কিন্তু ১৯২৫ সালের আগ পর্যন্ত বিলটি অনুমোদন দেওয়া হয়নি। ফেডারেল কোর্ট কর্তৃক প্রবেশন অনুমোদিত হয় ১৯২৫ সালে। আমেরিকার ম্যাসাসুয়েটস-এ সর্বপ্রথম প্রবেশন অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয় ১৯২৭ সালে।[৯৮] বাংলাদেশে (তৎকালীন পাকিস্তানে) প্রথম প্রবেশন আইন প্রণীত হয় ১৯৬০ সালে এবং তা চালু করা হয় ১৯৬২ সালে।

ইংরেজি প্রবেশন 'Probation' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 'Probare' থেকে। এর অর্থ পরীক্ষা করা, চেষ্টা করা বা প্রমাণ করা। যে ব্যবস্থায় (বিশেষত তরুণ) অপরাধীদের দ্বিতীয়বার আইনলঙ্ঘন না করার শর্তে প্রথম অপরাধেরর শাস্তি মওকুফ করা হয় তাই প্রবেশন বা অবেক্ষণ ব্যবস্থা।[৯৯] তাই শব্দগত অর্থে প্রবেশন হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চেষ্টা ও প্রমাণের দ্বারা শর্তসাপেক্ষে অপরাধীকে মুক্ত করে সংশোধনের ব্যবস্থা করা। সাধারণ অর্থে বলা যায়, আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তির বিচার কার্য স্থগিত রেখে শর্তাধীনে একজন প্রবেশন কর্মকর্তার অধীনে সংশোধনের নিমিত্তে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থাকে প্রবেশন বলে। আমেরিকান

৯৮. County of San Mateo, *Redwood City*, San Francisco, www.smcgov.org

৯৯. Zillur Rahman Siddiqui (Edited), *Bangla Academy English Bangla Dictionary* (Dhaka: Bangla Academy, 2006), p.610

অপরাধবিজ্ঞানী Walter C. Reckless (1899-1988) এর মতে, "প্রবেশন হচ্ছে কোর্ট কর্তৃক দণ্ডের বোঝা না চাপানো এবং দণ্ডের কষ্ট থেকে অপরাধীকে অব্যাহতি দান।"[১০০]

আমেরিকান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চার্লস শিরম্যান (Charles Shireman, 1925-2006) বলেন, "Probation is a process of treatment, prescribed by the court for persons convicted of offences against the law, during which the individual on probation lives in the community and regulates his own life under conditions imposed by the court (or the constituted authority) and is subject to supervision by a probation office."[১০১] অর্থাৎ প্রবেশন হচ্ছে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির চরিত্র সংশোধনের এমন একটি প্রক্রিয়া, যাতে আদালত আরোপিত শর্ত এবং প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অপরাধীকে তার নিজ সমাজে জীবনযাপনের সুযোগ দানের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা চালানো হয়।

ভারতীয় অপরাধবিজ্ঞানী V.V, Devasia & Leelamma Devasia বলেন, "প্রবেশন এক প্রকার আইনসম্মত সংশোধন ব্যবস্থা যা অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্ত সাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করাকে বোঝায়।"[১০২]

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, নতুন অপরাধী যার পূর্বে কোন রেকর্ড নেই, তার শাস্তি স্থগিত রেখে আদালত থেকে শর্তাধীনে প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে মুক্তিদানের প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রবেশন। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এর ফলে অপরাধী সংশোধনের মাধ্যমে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের সুযোগ পায়। বাংলাদেশ 'শিশু আইন,২০১৩' -তে প্রবেশন ব্যবস্থা আরো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রাখা হয়। শিশু আইনের অনুচ্ছেদ: ৫ (১) এ বলা হয়, এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, ক্ষেত্রমত, প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। (২) উপ-ধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে, বিদ্যমান অন্য কোন আইনের অধীন কোন ব্যক্তিকে প্রবেশন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হলে, তিনি, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া

১০০. Walter C. Reckless, *The Prevention of Juvenile Delinquency* (Ohio: Ohio State University Press, 1972), p.44
১০১. Charles Shireman, *Rehabilitating Juvenile Justice* (Chicago: Chicago University press,1986), p.116
১০২. V.V Devasia & Leelamma Devasia, *Criminology Victimology and Corrections* (New Delhi: Ashis Publishing House,1992), p. 45

পর্যন্ত, এ আইনের অধীন প্রবেশন কর্মকর্তা হিসাবে এমনভাবে দায়িত্ব পালন করবেন যেন তিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন।[১০৩]

প্রবেশন সুযোগ প্রাপ্তির পদ্ধতি

প্রবেশন মঞ্জুর করা মূলত আদালতের একটি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা। প্রবেশন ব্যবস্থায় বিচার কার্যের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর শিশু-কিশোর যখন আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপক্রম হয় কিংবা শিশু-কিশোর যদি দোষ স্বীকার করে তখন আদালতের কাছে প্রবেশনের সুযোগ পাওয়ার জন্য আদালতের গোচরিভূত করা যায়। আদালত যদি উপযুক্ত মনে করেন যে, আইনের অধীনে প্রবেশন আদেশের শর্তাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে অপরাধী তার সংশোধন ও পুনর্বাসনে উপকৃত হতে পারে, তখন আদালতে নিয়োজিত প্রবেশন অফিসারকে অপরাধীর চরিত্র, প্রাক বংশ পরিচয়, পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তথ্যাদি বা অবস্থাদি তদন্ত করে একটি প্রাক দণ্ডাদেশ প্রতিবেদন আদালতের নিকট দাখিল করার অনুরোধ করেন। তদন্তে প্রবেশন অফিসার যদি বুঝতে পারেন যে, অপরাধীর প্রবেশনের বা সমাজ ভিত্তিক সংশোধনের সুযোগ রয়েছে তা হলে তিনি প্রবেশনের সুপারিশ করেন। অন্যথায় অপরাধীকে শাস্তি পেতে হয়। আদালত মামলার কাগজপত্র ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে স্ব-উদ্যোগেও প্রবেশন মঞ্জুর করতে পারেন।

সেবাদান কেন্দ্র ও সেবা গ্রহীতা

প্রবেশন সেবা প্রদানের জন্য কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান কেন্দ্র রয়েছে। যেমন:

(১) প্রবেশন অফিস, সংশ্লিষ্ট জেলা (জেলা শহরে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে অবস্থিত)।

(২) প্রবেশন অফিস, সিএমএম কোর্ট, ঢাকা।

(৩) প্রবেশন অফিসার, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ।

(৪) উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় (সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

প্রবেশন আইনের অধীন সেবা গ্রহীতা তথা একজন অপরাধী শিশু-কিশোর যে সকল সেবা পেয়ে থাকেন:

(ক) প্রবেশন অফেন্ডার্স অব এ্যাক্ট ১৯৬০ মোতাবেক প্রথম লঘু অপরাধ বা লঘু অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করে।

(খ) শিশু আইন ২০১৩ মোতাবেক লঘু অপরাধী শিশুদের কারাগারে না রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে শিশুর মানসিকতার উন্নয়ন।

১০৩. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৫ (১) ও (২)

(গ) কারাবন্দী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

(ঘ) কারাবন্দী ব্যক্তিদের জন্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

(ঙ) কারাগারে আটক শিশুদের মুক্তি/উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তরে সহায়তা প্রদান।

(চ) কারামুক্ত কয়েদীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন।

সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি

নিম্নলিখিত আইন ও বিধির আলোকে প্রবেশনর কার্যক্রম পরিচালিত হয়ঃ

১. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিনেন্স, ১৯৬০ (সংশোধিত ১৯৬৪)

২. কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬

৩. শিশু আইন, ২০১৩

৪. প্রবেশন অব অফেন্ডার্স রুলস, ১৯৭১

প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব-কর্তব্য

অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে প্রবেশন কর্মকর্তার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চূড়ান্ত বিচারে আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তির বিচার কার্য স্থগিত রেখে আদালত একজন দায়িত্বরত প্রবেশন কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত শিশু-কিশোরের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন (এটিকে Pre-Sentence Investigation Report বলে) দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন। এই প্রতিবেদনের আলোকে একজন প্রবেশন অফিসারের অধীনে সংশোধনের নিমিত্তে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থাকে প্রবেশন বলে। প্রবেশন কর্মকর্তাকে এই অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন তৈরিতে সবচেয়ে বেশি যেসব বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয় তাহলো, শিশু-কিশোরের বয়স, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, তার সামগ্রিক চরিত্র, পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, তার সম্প্রদায় প্রভৃতি।[১০৪] প্রবেশন কর্মকর্তা ঘটনার মেরিট বিবেচনা করে আদালত কর্তৃপক্ষের নিকট তার প্রবেশনের জন্য আবেদন করবেন। প্রকৃতপক্ষে এটা হলো একজন প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কিছু শর্তারোপ করে একজন শিশু-কিশোর অপরাধীর প্রয়েজনীয় সংশোধন এবং সমাজে পুনর্বাসনের জন্য একটি আয়োজন। বাংলাদেশ ‘শিশু আইন, ২০১৩’ অনুসারে একজন প্রবেশন কর্মকর্তা থানায় আগত শিশু-কিশোর, আদালতে উপস্থাপিত শিশু-কিশোর কিংবা উন্নয়ন কেন্দ্র বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরিত শিশু-কিশোরের সার্বিক

১০৪. Abdul Hakim Sarker, *ibid*, p.284

সামাজিক অনুসন্ধান ও প্রতিবেদন প্রদান করে থাকেন। নিম্নে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব-কর্তব্য উপস্থাপন করা হলো-

(ক) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে থানায় আনয়ন করা হলে অথবা অন্য কোনভাবে থানায় আগত হলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,-

(অ) আনয়ন বা আগমনের কারণ অবগত হওয়া;

(আ) সংশ্লিষ্ট শিশুর সহিত সাক্ষাৎ করা এবং সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তাহাকে আশ্বস্ত করা;

(ই) সংশ্লিষ্ট অভিযোগ বা মামলা চিহ্নিত করতে পুলিশের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা;

(ঈ) সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা-পিতার সন্ধান করা এবং তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পুলিশকে সহায়তা করা;

(উ) শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে শিশুর জামিনের সম্ভাব্যতা যাচাই বা, ক্ষেত্রমত, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট মামলার প্রেক্ষাপট মূল্যায়নপূর্বক বিকল্পপন্থা গ্রহণ করা;

(ঊ) বিকল্পপন্থা অবলম্বন বা যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে, নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঋ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

(খ) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু-আদালতে উপস্থিত করা হলে-

(অ) আদালতে অবস্থান বা বিচারকালীন আদালতে উপস্থিত থাকা এবং, যখনই প্রয়োজন হবে, সংশ্লিষ্ট শিশুকে, যতদূর সম্ভব, সঙ্গ প্রদান করা;

(আ) সরেজমিনে অনুসন্ধানপূর্বক সংশ্লিষ্ট শিশু ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনাক্রমে, সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং আদালতে দাখিল করা;

(ই) শিশুকে, প্রয়োজনে, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মাধ্যমে আইনগত সহায়তা প্রদানসহ শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;

(ঈ) শিশুর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার নিমিত্ত, উপ-দফা (ই) এর উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ন না করে, প্রয়োজনে, বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত আইনগত সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা এবং শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা; এবং

(উ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

(গ) আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,-

(অ) প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক নথি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা;

(আ) ধারা ৮৪ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ ও যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করা;

(ই) নিয়মিত বিরতিতে শিশুর সাথে সাক্ষাৎ করা বা শিশুর ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার যাচিত সময়ে তাকে সাক্ষাৎ প্রদান করা;

(ঈ) মাতা-পিতা, বর্ধিত পরিবার বা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক সংশ্লিষ্ট শিশুর তত্ত্বাবধানের শর্তাবলী সঠিকভাবে পালন করছেন কি না তা, যতদূর সম্ভব, পর্যবেক্ষণ বা মনিটর করা;

(উ) শিশুর আনুষ্ঠানিক ও কারিগরী শিক্ষা সঠিকভাবে প্রদত্ত হচ্ছে কি না তাহা সরেজমিনে তদারকি করা;

(ঊ) নিয়মিত বিরতিতে, শিশুর আচরণ এবং শিশুর জন্য গৃহীত ব্যবস্থার যথার্থতা সম্পর্কে, আদালতকে অবহিত করা এবং আদালত কর্তৃক তলবকৃত প্রতিবেদন দাখিল করা;

(ঋ) শিশুকে সৎ উপদেশ প্রদান করা, যথাসম্ভব বন্ধুভাবাপন্ন করে তোলা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা; এবং

(এ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ঘ) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,

(অ) বিকল্পপন্থা বা বিকল্প পরিচর্যার শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ করা; এবং

(আ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।[১০৫]

প্রবেশনের শর্তাবলী

একজন কিশোর অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবেশনের মাধ্যমে সমাজে পুনএকত্রীকরণের সুযোগ দেওয়া হয়। তবে প্রবেশন ব্যবস্থায় মুক্তিদানের জন্য অপরাধীকে কতিপয় শর্ত পালন করতে হয়। এসব শর্তের উপর ভিত্তি করেই অপরাধীকে প্রবেশন অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রবেশনের শর্তসমূহ নিম্নরূপ-

১. ভবিষ্যতে অপরাধ করবে না বলে কিশোর অপরাধীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া;

২. সমাজের সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা;

৩. প্রবেশন কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী চলাফেরা করা;

---

১০৫. *শিশু আইন*, ২০১৩, প্রাগুক্ত, অনুচ্ছেদ: ৬

৪. সমাজে অবস্থানকালীন অন্য কোন অপরাধী কিশোরের সংস্পর্শে না যাওয়া;

৫. সামাজিক নিয়ম-কানুন, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতি মেনে চলা;

৬. সমাজে বসবাসরত অবস্থায় সাধারণ কাজ-কর্ম চালিয়ে যাওয়া;

৭. প্রবেশন কর্মকর্তার অনুমতি না নিয়ে নিজস্ব কর্মস্থল বা বাসস্থান ত্যাগ না করা;

৮. আদালত প্রদত্ত নির্দিষ্ট তারিখে অবশ্যই হাজিরা দিতে হবে;

৯. প্রবেশন কর্মকর্তা যেকোন সময় অপরাধী কিশোরের গৃহ পরিদর্শন করতে পারবেন। এতে অপরাধীর কোন আপত্তি থাকবে না।

১০. কিশোর অপরাধী তার আয়ের উৎস সম্পর্কে প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করবে:

১১. সংশোধনের পর তাকে যেভাবে পুনর্বাসিত করা হয় তা মেনে নিতে হবে:

১২. আদালত কর্তৃক কোন নির্ধারিত স্থানে কিশোর অপরাধীকে বসবাস করতে হতে পারে।

প্রবেশনের মৌলিক উপাদন

প্রবেশন ব্যবস্থায় কতগুলো মৌলিক উপাদন রয়েছে যা ব্যতীত প্রবেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা যায় না। এগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. শিশু-কিশোরের চূড়ান্ত সাজা স্থগিত রাখা;

২. আদালত কর্তৃক প্রবেশনের অনুমোদন লাভ করা;

৩. শিশু-কিশোরের অপরাধ করার কারণ নির্ণয় এবং ফলাফল বিবেচনা করা;

৪. শিশু-কিশোর অপরাধীর উপর শর্তারোপ করা;

৫. অন্য কোন অপরাধীর সংস্পর্শে না যাওয়া;

৬. প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা;

৭. শিশু-কিশোর অপরাধীকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

৮. প্রবেশনে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা;

৯. অপরাধের ধরন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে প্রবেশন নির্বাচিত করা;

১০. প্রয়োজনে কিশোর অপরাধীর আর্থ-সামাজিক ও মনোদৈহিক দিক যাচাই-বাচাই করা;

১১. কিশোর অপরাধীর বিবেকবোধ ও সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলা।

বাংলাদেশে প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনা

বাংলাদেশে "প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০"[১০৬] নামে একটি অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সর্বপ্রথম সংশোধনমূলক কার্যক্রম শুরু হয়।[১০৭] এ অধ্যাদেশের আওতায় কোন শিশুর প্রথম ও ছোট-খাট অপরাধের বিচার পরিচালনা ও রায় প্রদানকালে তাকে কারাগারে রাখার পরিবর্তে মানবিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বিচারের পর দণ্ডাদেশ দেওয়া হলে জেলখানার পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট (সর্বনিম্ন ১ এবং সর্বোচ্চ ৩ বছর) সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নিজ পরিবারে বা সামাজিক পরিবেশে রেখে তার সংশোধন ও সামাজিকভাবে উন্নয়নের সুযোগ দেওয়া হয়।[১০৮] অবশ্য প্রথম ও লঘু অপরাধের সংবেদনশীল প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদেরও প্রবেশনে রাখার বিধান এ আইনে রয়েছে। তবে শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রবেশন ব্যবস্থায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে পাকিস্তান আমলে প্রণীত প্রবেশন আইনটি যেমন পুরোনো তেমনি যথাযথ বাস্তবায়ন নেই।[১০৯] এ প্রবেশন অর্ডিন্যান্সের পর ১৯৭৪ সালে দেশে 'শিশু আইন ১৯৭৪' প্রণীত হয় যেখানে এ প্রবেশন ব্যবস্থা কার্যকরি করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[১১০] শিশু আইনটি কার্যকর করার জন্য ১৯৭৬ সালে শিশু বিধিমালা প্রবর্তন করা হলেও এ পর্যন্ত প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় নীতিমালা নেই।

প্রবেশন আইনের বাস্তব পরিস্থিতি

আইনের একটি দিক শাসন অপরটি প্রতিপালন। স্বাভাবিকভাবে শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে আইনের শাসনের চেয়ে প্রতিপালনের দিকটা বেশি জোর দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, শিশু আইন ও প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ দ্বারা শিশু-কিশোরদের বিচার না করে অপরাধের সাথে সম্পর্কিত শিশু-কিশোরদেরকে ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার আওতায় বিচার করে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হচ্ছে।[১১১] ১৯৬০ সালের প্রবেশন আইন অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট আদালত (a) [The High Court Division]; (b) A Court of Sessions; (c) A District Magistrate; (e) A Magistrate of the 1st Class; and (f) any other magistrate especially empowered in this behalf. অর্থাৎ হাইকোর্ট বিভাগ, জেলা দায়রা আদালত, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম ও লঘু অপরাধে জড়িত শিশু, কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে শর্ত সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ১ (এক) বছর থেকে সর্বোচ্চ ৩ (তিন)

---

১০৬. *The Probation of Offenders Ordinance, 1960* (Ordinance No. xlv of 1960) [1st November, 1960]

১০৭. ড. নাহিদ ফেরদৌসি, শিশু অপরাধ: বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশন আইনের উপযোগিতা, *ইসলামী আইন ও বিচার*, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, বর্ষ- ৭, সংখ্যা: ২৭, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১১, পৃ. ৬৩

১০৮. Borhan Uddin Khan and Muhammad Mahbubur Rahman, *Protection of Children in Conflict with the Law in Bangladesh* (Dhaka: Save the Children, UK, 2008), p. 15

১০৯. মোহাম্মদ সাইফুল আলম, *প্রবেশন নির্দেশিকা* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ৪

১১০. মো: নুরুল ইসলাম ভূইয়া ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

১১১. M Enamul Hoque, et al, *Under-Aged Prison Inmates in Bangladesh: A Sample Situation of Youth Offenders in Freater Dhaka* (Dhaka: Action Aid Bangladesh and Bangladesh Retired Police Officers Welfare Association, 2008), p. 18

বছরের জন্য প্রবেশন মঞ্জুর করতে পারেন। তবে প্রবেশন দেওয়ার এই ক্ষমতা শুধু বিচারকারী আদালত নির্ধারণ করে থাকেন।[১১২]

প্রবেশন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক রূপ হচ্ছে আদালত কর্তৃক নিয়োজিত প্রবেশন অফিসারের অধীনে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের সামাজিক ব্যবস্থায় সমাজে স্থান দেওয়া ও তত্ত্বাবধান করা। যে শিশু প্রবেশনের অধীনে থাকে তাদেরকে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত কিছু শর্ত ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। শিশু-কিশোররা এসব শর্ত ও নিয়ম মানতে ব্যর্থ হলে তাদের উপর থেকে প্রবেশন নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়। এভাবে আদালত শিশু আইনের অধীনে শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশুর অনুর্ধ্ব তিন বছরের জন্য ভালো হওয়ার শর্তে প্রবেশনের অধীনে ছেড়ে দিতে পারে। আদালত যদি প্রবেশন অফিসারের কাছ থেকে এমন প্রতিবেদন পায় যে, উক্ত শিশু-কিশোর প্রবেশাধীন সময়ে ভাল আচরণ করেনি, তাহলে বাকি সময়ের জন্য তাকে কোনো অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে আটকাদেশ দিতে পারে।[১১৩]

ব্যতিক্রম হলো, প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ, ১৯৬০ আদালতকে শাস্তিযোগ্য অপরাধীদের প্রবেশন ক্ষমতা দিলেও মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডযোগ্য ও ফৌজদারি দণ্ডবিধির অধীনে অন্যান্য আরো কিছু অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। তবে প্রবেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু-কিশোরের কারাদণ্ডের একটি বিকল্প হিসেবে প্রবেশনের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও বিচারব্যবস্থায় এ বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশ শিশু আইন সরকারকে প্রতিটি জেলায় প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষমতা দিয়েছে এবং যেখানে এ ধরনের একজন ব্যক্তি নিয়োজিত আছে সেখানে ঐ জেলার আদালত কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট কেসের প্রয়োজনের সময় অন্য আরেকজন প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করা যেতে পারে। আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রবেশন কর্মকর্তা তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যদি কিশোর আদালত না থাকে তাহলে ফৌজদারি আদালতের অধীনে থাকবে।

শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী, পুলিশ অফিসারের সাথে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগের পর অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরের সমস্ত দায়-দায়িত্ব প্রবেশন অফিসারের। প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব শিশু-কিশোরকে গ্রেফতার থেকে শুরু করে তার শাস্তি ও সমাজে পুনর্বাসন ও একত্রীকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। সে কারণে শিশু-কিশোরের বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশন অফিসারের সামাজিক তদন্ত প্রতিবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবেশন অফিসারের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। এ দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সম্পাদিন করতে হয়। তাই এটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কিন্তু ২০০৭ সালে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হলেও শিশু-কিশোরের বিচার ব্যবস্থার কোন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা

১১২. *The Probation of Offenders Ordinance, 1960,* ibid, Article:3
১১৩. ড. নাহিদ ফেরদৌসি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

যায়নি।[১১৪] যদিও ২০০৩ সালে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বন্দি শিশু-কিশোরদের মুক্তি দেওয়ার জন্য সুয়োমটো রুল জারি করে।[১১৫] এতে শিশুর কারাগারে আটক বা অন্যান্য শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে অবিলম্বে তাদের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তরের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল। এর ফলে দেশের বিভিন্ন কারাগারে কারাবন্দি শিশু-কিশোরের সংখ্যা অনেকটা কমে যায়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোনো অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি।

অতএব, দেশে প্রচলিত কিশোর আদালত ও ফোজদারি আদালত, কোন ব্যবস্থাতেই পুরোপুরিভাবে শিশু-কিশোরের সুরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না। বিচারের ক্ষেত্রে অবশ্যই শিশুর প্রতি সম্পূর্ণ পৃথক মনোভাব নিয়ে শিশু বান্ধব পরিবেশে বিচার করা প্রয়োজন।

প্রবেশন আইন ব্যবহার না হওয়ার কারণ

বাংলাদেশের শিশু-কিশোর অপরাধের বিচারব্যবস্থায় প্রবেশন আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার হচ্ছে না। প্রবেশন আইন প্রয়োগ বা ব্যবহার না হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে-

১. **আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব**

বাংলাদেশে অপরাধে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের কোন একক বিচার ব্যবস্থা নেই। বাস্তবে শিশু অধিকার ও শিশু বিষয়ক আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অবগত না থাকায় তারা শিশু আইনের প্রয়োগ করতেও উৎসাহবোধ করে না। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে অনেক সময় বিচারব্যবস্থা শিশু-কিশোরদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রবেশন আইনটি সম্পর্কে যথাযথভাবে সচেতন না থাকার কারণে এবং আইনটি পালনে যত্নবান না থাকার কারণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোন কাজ হয় না।[১১৬]

২. **শিশু-কিশোর অপরাধীর বিচারে ফৌজদারি ব্যবস্থার অনুসরণ**

বাংলাদেশে শিশু আইন অনুযায়ী শিশু-কিশোর অপরাধীর বিচারকার্য শিশু আইনের আওতায় সম্পন্ন করার নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করা হয় এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়। শিশু আইনের ১৫ ধারায় আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে

---

১১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬
১১৫. *Suo Moto Order* no. 248, 2003; 11 BLT 2003 HCD 281
১১৬. ড. নাহিদ ফেরদৌসী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

যে ১০টি বিষয়ে[১১৭] বিবেচনা করতে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে আদালত শিশুর আইনসম্মত সে বিষয়গুলো বিবেচনায় না এনে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ শুধু পুলিশ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।[১১৮] বস্তুত কোন শিশু বা কিশোর সত্যিই অপরাধ করেছে কিনা তা নিরূপণের জন্য প্রবেশন অফিসারের সামাজিক প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন।

৩. **অপর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবেশন অফিসার**

আমাদের দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবেশন অফিসার নেই। কিন্তু জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল প্রবেশন অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসারকে কারাগারে আটক শিশু-কিশোর ও কিশোরীদের তালিকা সমাজসেবা অধিদফতরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া আছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মধ্যে মাত্র ২২টি জেলাতে ২৩ জন প্রবেশন অফিসার আছে। বাকী ৪২টি জেলার উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব এবং স্বল্প সংখ্যক প্রবেশন অফিসার থাকায় প্রবেশন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না।[১১৯]

অতএব বলা যায় যে, আইন সম্পর্কে জনসচেতনতার অভাব, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার শিথিলতা প্রদর্শন, ফৌজদারী আদালতের অবহেলা, প্রবেশন নীতিমালা তৈরি না হওয়া এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রবেশন অফিসার না থাকায় প্রবেশনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কিশোর অপরাধ সংশোধনী কার্যক্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

অপরাধ সংশোধনের আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে প্রবেশনের গুরুত্ব

প্রবেশন কিশোর অপরাধীর সংশোধনের বহুল প্রচলিত আধুনিক পদ্ধতি। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের লক্ষ্যে প্রবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেসব কারণে প্রবেশন বর্তমানে আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. চরিত্র সংশোধন

মানুষের ভুলভ্রান্তি থাকতেই পারে; বিশেষ করে শিশু-কিশোরের ভুল-ভ্রান্তি হওয়া সাধারণ ব্যাপার। ভুলভ্রান্তির কারণে তাকে শাস্তি দিলে সে বড় ধরনের অপরাধীতে পরিণত হতে পারে। তাকে শাস্তির পরিবর্তে চরিত্র সংশোধনের সুযোগ দিলে সে সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপানে অভ্যস্ত হবে। প্রবেশন পদ্ধতি এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকে।

২. দাগী অপরাধীর সংস্পর্শ থেকে রক্ষা

---

১১৭. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৩০

১১৮. Sumaiya Kabir, “Juvenile Justice Administration and Correctional Service in Bangladesh: A Critical Review”, *Journal of the Faculty of Law*, The Dhaka University Studies Part- F, vol. 16, 2005, p.12

১১৯. ড. নাহিদ ফেরদৌসী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৬৭-৬৮

প্রবেশন ব্যবস্থায় শিশু বা কিশোর অপরাধীকে জেলখানার দাগী কয়েদীদের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখা হয় যাতে সে আরো অপরাধপ্রবণ বা বড় অপরাধী হতে না পারে। ফলে প্রবেশন প্রাপ্ত শিশু-কিশোরটি সহজেই তার ভুল সংশোধনের সুযোগ নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে অপরাধীর অন্যের দ্বারা খারাপ হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

৩. মানসিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা

প্রবেশন ব্যবস্থার ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত শিশু-কিশোর ব্যর্থতা, হতাশা, নিরাশা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়। তাকে শাস্তি না দেওয়ার ফলে তার মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয় এবং সে নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং সংশোধনের জন্য তৎপর হয়।

৪. আচরণের পরিবর্তন

প্রবেশন অপরাধী কিশোরকে সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপনে সুযোগ করে দেয়। ফলে শিশু-কিশোর প্রতিবেশীর খারাপ মনোভাব থেকে রক্ষা পায়। এ সুযোগে অপরাধী কিশোর সহজেই তার আচরণের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়।

৫. গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি

প্রবেশন ব্যবস্থা সবসময়ই গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে কাজ করে। সমাজের পরিবেশ অনুকূল হওয়ার ফলে অপরাধী নিজের চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পেয়ে থাকে।

৬. প্রবেশন কর্মকর্তার সহযোগিতা

প্রবেশন কর্মকর্তার সহায়তার ফলে এ পদ্ধতি ফলপ্রসূ অবদান রাখে। তিনি নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের মাধ্যমে অপরাধীর তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। যার ভিত্তিতে শিশু-কিশোর অপরাধীকে মুক্তি দেওয়া হয়। তার সার্বক্ষণিক তদারকির ফলে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের চরিত্র সংশোধন করা সম্ভব হয়।

৭. পক্ষপাতিত্ব নেই

প্রবেশন ব্যবস্থায় পুলিশ, আদালত এবং প্রবেশন কর্মকর্তা পক্ষপাতিত্ব বা প্রভাব খাটানোর কোন সুযোগ নেই। ফলে অপরাধী স্থায়ীভাবে নিজেকে সংশোধনের সুযোগ পায়।

৮. শিক্ষামূলক পদ্ধতি

প্রবেশন ব্যবস্থায় অপরাধী গঠনমূলক আচার-আচরণ, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে ও সচেতন হয়। ফলে তার মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়।

৯. প্রবেশনের শর্তপালন

এ ব্যবস্থায় অপরাধী প্রবেশনের শর্তপালনে বাধ্য থাকে। শর্তের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে সে শর্তগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করে। ফলে অপরাধীর মধ্যে গঠনমূলক পরিবর্তন সম্ভব হয়।

১০. শ্রদ্ধা ও আনুগত্য

প্রবেশন ব্যবস্থায় অপরাধী শিশু-কিশোর সংশোধনের সুযোগ পাওয়ার ফলে সে বিচার ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রদর্শন করতে শিখে।

১১. পুনর্বাসনের পদক্ষেপ

এ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু-কিশোর অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে অপরাধী স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত হতে সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজের অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পায়। এভাবে একজন অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোর সমাজে আবার পুনর্বাসিত হয়।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অপরাধ সংশোধনের ক্ষেত্রে প্রবেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এটি আধুনিক ও বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। শাস্তিমূলক পদ্ধতির তুলনায় এটি অধিক গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের মন থেকে অপরাধপ্রবণতা দূর করার জন্য এ ব্যবস্থা খুবই কার্যকর। এর ফলে সমাজে শিশু-কিশোররা অপরাধমুক্ত মানসিকতায় বেড়ে উঠতে সক্ষম হয়। মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং অপরাধীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পায়।

প্রবেশন ব্যবস্থায় ত্রুটি

প্রবেশন ব্যবস্থায় শিশু-কিশোর অপরাধীর সংশোধন ও উন্নয়নের ব্যাপক সুবিধা ও উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও এর কিছু ত্রুটি বা সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এর ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ-

১. প্রবেশন ব্যবস্থায় অপরাধী শিশু-কিশোরের সংশোধনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। অথচ অভিযোগকারীর স্বার্থ এখানে উপেক্ষিত হয়। যা বিচারের মূল্যবোধকে খর্ব করে। অর্থাৎ অভিযোগকারীর স্বার্থ দেখার এখানে কোন সুযোগ নেই।

২. দেশের আদালত যদি কোন কারণে সততার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে দাগী অপরাধীও আদালতের দুর্বলতার সুযোগে প্রবেশনের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে যেতে পারে।

৩. প্রবেশন ব্যবস্থায় অপরাধী পুনরায় তার সমাজে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যায়। কিন্তু সমাজে যদি প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করে তাহলে সে পুনরায় অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. প্রবেশনকালে অপরাধী ভালো হওয়ার ভান করতে পারে। উদ্দেশ্য তার নিঃশর্ত আশু মুক্তি। অর্থাৎ সে সাময়িক সময়ের জন্য লোক দেখানো সাধুবেশ ধারণ করতে পারে। ফলে প্রবেশনের উদ্দেশ্য ব্যহত হতে পারে।

৫. প্রবেশন কর্মকর্তাকে হতে হয় দক্ষ, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও আশাবাদী ব্যক্তিত্ব। কেননা তিনি অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের দায়িত্বে থাকবেন। এক্ষেত্রে প্রবেশন কর্মকর্তা পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নিতে পারে। অন্যদিকে, অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন কাজ।

৬. অপরাধী অনেক সময় প্রবেশন কর্মতাকে হুমকি ও ভয় দেখিয়ে ভালো রিপোর্ট আদায় করতে পারে। বর্তমানে বিশ্ব সমাজে ভয় দেখিয়ে সাক্ষীর সাক্ষ্য পরিবর্তনের ঘটনা অহরহ রয়েছে। তাই এ ব্যবস্থায় প্রবেশন কর্মকর্তা ও তার পরিবারের ঝুঁকি রয়েছে।

উপরোক্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানকালে প্রবেশন ব্যবস্থা খুবই যুগোপযোগী। বিশেষ করে কিশোর অপরাধীর সংশোধন ও সমাজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত কার্যকরী। এ ব্যবস্থায় অপরাধীর শাস্তি স্থগিত রাখা হয় মাত্র। অপরাধী সংশোধন হলে সমাজে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পায়। সমাজের জীবনব্যবস্থাও স্বাভাবিক হয়। ক্ষুদ্র স্বার্থকে ত্যাগ করলেও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ অর্জিত হয়। তাই অপরাধী শিশু-কিশোরের সংশোধনের জন্য প্রবেশন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(ঙ) প্যারোল (Parole)

প্রবেশনের ন্যায় প্যারোল ব্যবস্থা অপরাধী ও কিশোর অপরাধীদের এক নিরীক্ষা কাল। তবে প্রবেশন যেখানে শাস্তি বা দণ্ড স্থগিত রেখে এই নিরীক্ষা পর্যায়ে আনা হয় সেক্ষেত্রে প্যারোলের বেলায় কিছুদিন শাস্তি ভোগ করার পর দণ্ডের মেয়াদ শেষ হবার আগেই অপরাধীকে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিয়ে একজন তত্ত্বাবধায়ক সমাজকর্মীর অধীনে সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ প্রদান করা হয়। প্যারোলের সংজ্ঞায় বলা হয়," Parole is the early release of a prisoner who agrees to abide by certain conditions, originating from the French word *parole* ('speech, spoken words' but also 'promise'). The term became associated during the Middle Ages with the release of prisoners who gave their word."[১২০]

১২০. Parole-Wikipedia, https://en.m.eikipedia.org

ভবিষ্যতে আর অপরাধ করবে না, নিয়মিত বিরতিতে প্যারোলে অফিসারের সাথে দেখা করবে, এবং বিনা অনুমতিতে বাসস্থান ও পেশা পরিবর্তন করতে পারবে না, প্রভৃতি শর্তসাপেক্ষেই কোন অপরাধীকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা হয়।[১২১]

সর্বপ্রথম স্কটিস ভূগোলবিদ ও নেভি ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার মেকোনচি প্যারোলের আধুনিক ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনি ১৮৪৮সালে ব্রিটিশ কলোনি অস্ট্রেলিয়ার নরফ্লোক দীপের বন্দি শিবিরের সুপারিনটেনডেন্ট নিয়োজিত হয়েছিলেন। তিনি এখানে নিবাসীদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিন স্তরের একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। প্রথম দু'টি স্তর অর্জিত হত ভাল ব্যবহার, কঠোর পরিশ্রম এবং অধ্যায়নের মাধ্যমে এবং এ ব্যবস্থাপনার তৃতীয় স্তরটি ছিল নিয়ম-কানুন মেনে বন্দিশিবিরের বাহিরে স্বাধীনভাবে চলাচলের সুযোগ। তবে আইনের যে কোন লঙ্ঘনই আবার তাদেরকে বন্দিশিবিরে ফিরিয়ে আনা হত এবং আবার তারা তিনটি স্তরের শুরু থেকে পুনরায় শুরু করতেন।[১২২] তিনি বন্দিদের মুক্তির জন্য যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেন, এটিই পৃথিবীর প্রথম প্যারোল পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১২৩]

এর পর যুক্তরাজ্যের প্যারোল বোর্ড নির্ধারিত দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত বিশেষ করে আজীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করতো কেননা তাদের মুক্তির কোন নির্ধারিত সময় ছিল না। তাদের মুক্তিদানের শর্তকে অনুমতিপত্র বলা হয়; আর প্যারোল হলো অনুমতিপত্রের ভিত্তিতে মুক্তি প্রদান পদ্ধতি। এ ব্যবস্থায় সকল কয়েদীদের জন্য ৭ টি সাধারণ শর্তের অনুমতিপত্র থাকত। অনুমতিপত্রের শর্ত ৭টি নিম্নরূপ:

১। ভাল আচরণ করা এবং এমন আচরণ না করা যা অনুমতি পত্রের সময়কালের উদ্দেশ্য ক্ষতি সাধন করে।

২। কোন অপরাধ না করা

৩। নির্দেশনা অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সংস্পর্শে থাকা।

৪। তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ অব্যাহত রাখা

৫। তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার সুপারিশকৃত বা অনুমোদনকৃত বাসায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করা এবং এর বাহিরে কোথাও এক বা দুই রাত অবস্থানের ক্ষেত্রে পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করা।

---

১২১. মো: নুরুল ইসলাম ভূইয়া ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, ২৯৬

১২২. Joel Samaha, *Criminal Justice* (Belmont,CA: Thomson /Wadsworth, 2006),ISBN 978053465571; John V. Barry, Maconochie, Alexander , *Australian Dictionary of Biography* (National Centre of Biography: Australian National University, 4 April, 2013), p.129

১২৩. Joan Petersilia, *When Prisoners Come Home: Parole And Prisoner Reentry* (Oxford: Oxford University Press, 2003), p.31

৬। তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোন কাজ অর্থাৎ বিশেষ ধরনের কোন কাজে যোগদান না করা।

৭। যুক্তরাজ্যের বাহিরে কোথাও ভ্রমন না করা।[১২৪]

কিশোর অপরাধ সংশোধনে এবং শিশু-কিশোরের উন্নয়নে প্যারোল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে অপরাধী কিশোর সমাজের মূল স্রোতের সাথে একীভূত হয়ে নিজের ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পায়। ফলে সমাজের প্রতি তার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়। এতে সমাজের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হয় এবং সমাজে অপরাধের মাত্রা কমে যায়। এছাড়া অপরাধী শিশু-কিশোরের সংশোধনের জন্য আরো কিছু সংশোধন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো শিশু আইনের প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাবলে সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালনা করে। 'শিশু আইন,২০১৩' এর অনুচ্ছেদ ৫৯ (২), (৩), অনুচ্ছেদঃ ৬০; ৬১ ও ৬২ -তে প্রদত্ত বিধি মোতাবেক এ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১। পর্যবেক্ষণ গৃহ (Obserbation House)

যে সমস্ত কিশোর অপরাধীকে অপেক্ষকৃত স্বল্পমেয়াদি হেফাজতে রাখা প্রয়োজন তাদেরকে পর্যবেক্ষণ গৃহে রাখা হয়। বিচারাধীন কিশোরদেরও এখানে রাখা হয়। পরিত্যক্ত বা অবহেলিত শিশু যাদের অল্পদিনের জন্য হেফাজতে রাখা দরকার তাদেরও এখানে রাখা হয়।

২। বিশেষ বাড়ি (Special House)

স্পেশাল হোম বা বিশেষ বাড়ি হলো যেখানে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এখানে চিকিৎসা, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। বিশেষ বাড়িতে হেফাজতে থাকা কিশোররা এসব সুবিধা ভোগ করে।

৩। অনুমোদিত বিদ্যালয়

অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ঠিকানাহীন শিশুসহ কিশোর অপরাধীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। উনিশ শতকের সংস্কার স্কুলগুলোই পরবর্তীতে অনুমোদিত স্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হলো যে সব শিশু-কিশোর অপরাধী প্রবেশন পাবার উপযুক্ত নয় তাদের হেফাজতে রেখে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান। অনুমোদিত বিদ্যালয় একটি উন্মুক্ত প্রতিষ্ঠান যেখানে কিশোর অপরাধীরা সুস্থ জীবন লাভের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

---

১২৪. Lisa Gianquitto and Philip Rule, "Licences and Licence Conditions" Inside Time. Archived from the Original on 17 June 2018; "*Licences Conditions and how the Parole Board use them*" gov.uk.Retrived 28 december 2019

৪। বারবনিতার সন্তানদের জন্য পৃথক আবাসিক স্কুল

বেশ্যাবৃত্তি প্রায় সকল সভ্যদেশেই আজও বিদ্যমান। বেশ্যালয়ের নোংরা পরিবেশে দেহপসারিনীদের গর্ভজাত সন্তানরা বড় হলে অপরাধী বা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করবে এটাই স্বাভাবিক। অপরাধী সৃষ্টির অন্যতম উৎসস্থল বেশ্যালয়। তথাকথিত যৌনকর্মীদের গর্ভজাত সন্তানদের বেশ্যালয়ের অবাঞ্ছিত পরিবেশ থেকে এনে পৃথক আবাসিক স্কুলে রেখে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অনেক উন্নত দেশে প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও এরূপ প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বারবনিতারা সাধারণত সন্তান কামনা করে না তথাপি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তান জন্ম হলে, তারা ভবিষ্যতে মায়ের পেশা বেছে নেয় মেয়ে শিশু অথবা সহিংস অপরাধী হয় ছেলে শিশু। বারবনিতাদের সন্তানদের জন্য নির্মিত পৃথক আবাসিক স্কুলে তাদের এমন শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে তারা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

৫। বোর্সটাল স্কুল (Borstal school)

যে সব কিশোর অপরাধীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী সংশোধন কর্মসূচি প্রয়োজন তাদের বোর্সটাল জাতীয় সংশোধন প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। বোর্সটাল শব্দটি ইংল্যান্ডের একটি গ্রামের নাম থেকে এসেছে, সেখানে একটি জেলখানাকে ১৯০২ সালে সর্বপ্রথম ছেলেদের জন্য সংশোধন স্কুলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এ জাতীয় সংশোধন স্কুলগুলোকে বোর্সটাল নামে অভিহিত করা হতে থাকে। ফৌজদারী অপরাধের কারণে কিশোর আদালত কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডিত কিশোরদের সাধারণত প্রচলিত জেলখানায় প্রেরণ করা হয় না। দাগি অপরাধীদের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্তরাখাই এর উদ্দেশ্য। এসব শিশুদের বোর্সটাল প্রতিষ্ঠানে রেখে দীর্ঘমেয়াদী বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ পর্যাপ্ত সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের টঙ্গী ও যশোর জেলায় যে দু'টি সংশোধনাগার রেয়েছে এগুলো প্রকৃতিগতভাবে মূলত বোর্সটাল প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান দু'টিতে দীর্ঘমেয়াদী সংশোধন কর্মসূচির মাধ্যমে কিশোরদের মন থেকে অপরাধপ্রবণতা দূর করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

উপরোক্ত তথ্য-উপাত্ত আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র এদেশের অপরাধপ্রবণ, আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত বা আইনের সংস্পর্শে আশা শিশু কিশোর এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের জন্য সংশোধন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা

উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে কিশোর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রমূহের কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেসব সীমাবদ্ধতা উত্তরণ করা সম্ভব হলে শিশুদের উন্নয়ন, সংশোধন ও সমাজে পুনর্বাসন কার্যক্রম আরো বেশি ফলপ্রসূ করা সম্ভব। নিম্নে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কতিপয় সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করা হলো:

১। প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

শিশু আইনসহ শিশু সংক্রান্ত অন্যান্য আইন ও নীতিমালায় শিশু-কিশোরদের সংশোধন উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত উন্নয়নকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও ২০০২ সালের পর আর কোন নতুন সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়নি। অথচ ২০০২ সালের পর অপরাধী নিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুণ। শিশু আইন,২০১৩ এর ৫৯ নং অনুচ্ছেদে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ৬ষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আরো একাধিক উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও এখনও নতুন কোন উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়নি। প্রতিষ্ঠানগত এ সীমাবদ্ধতা শিশু-কিশোরদের বিশেষ করে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নের মূল অন্তরায়। এ সীমাবদ্ধতার কারণে শিশুদের জন্য মানসম্মত আবাসন, চিকিৎসা, বিচার সর্বোপরি সংশোধন ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ফলে শিশুদের উন্নয়নের সামগ্রিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের সমস্ত জেলা এবং যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে বরিশাল, রাজশাহী, খুলনা ও রংপুর বিভাগের সকল জেলা প্রশাসনিক এরিয়া হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের নিবাসীদেরকে আদালতে হাজিরা বা বিচারের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় আনা নেওয়া করতে হয়। স্বল্পতম সময়ে মধ্যে এ যোগাযোগ সম্ভব নয় বিধায় আদালত কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা দেয়। বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার ফলে কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রমও অনেকটা ব্যাহত হচ্ছে। কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ৭টি বিভাগ থেকে অর্থাৎ সারা বাংলাদেশ থেকে নিবাসী ভর্তি হয়। এছাড়াও দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই প্রায় ৬৪ জেলা থেকে নিবাসীরা আগমন করে। সুতরাং এই তিনটি শিশু-কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বাংলাদেশের জন্য যথেষ্ট নয়। ১৭ কোটি জনগণের দেশে মাত্র তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র কতটা সফলভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে তা সহজে অনুমেয়।

২। আইনগত সীমাবদ্ধতা

'শিশু আইন,২০১৩' শিশু-কিশোরের সুরক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ঘোষিত শিশু অধিকার গুচ্ছের সকল অধিকার এ আইনে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করে এটি শিশুদের অধিকার রক্ষা এবং তাদের সামগ্রিক উন্নয়নে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি আইন। এর পরেও এ আইনে কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। ২০১৩ সালে এ আইনটি সংশোধন হলেও এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন এখনো হচ্ছে না। কিশোর আদালতের এখতিয়ারের একটি সীমাবদ্ধতা, এ আদালত শিশু বা কিশোরের কোনো গুরুতর অপরাধ যেমন, হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর মামলা আমলে নিতে পারে না। 'শিশু আইন,২০১৩' -এর ৩৩ ও ৩৪ অনুচ্ছেদে এ ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। এ গুরুতর অপরাধের মামলাগুলোর বিচার করে জেলা ফৌজদারি আদালত।

৩। শিশু আদালতের স্বল্পতা

শিশু আদালত হচ্ছে শিশু-কিশোরের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংশোধন ও উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপ। এখানেই অপরাধপ্রবণ শিশুদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু সক্ষমতার অভাবে এ আইনের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিশু কিশোর তথা রাষ্ট্র। তাই এ আইনের ১৬ ধারায় যে আদালত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইতিবাচক মনোভাবের কথা বলা আছে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে তিনটি আদালত দিয়ে দেশের সব শিশু ও কিশোর অপরাধের বিচার করা ও তাদের সংশোধন করা যাবে না। আইনে জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় শিশু আদালত প্রতিষ্ঠার কথা বলা আছে। কিন্তু দেশের ৬৪টি জেলা শহরের জন্য আছে মোট তিনটি কিশোর আদালত। এ আদালতগুলো আছে যথাক্রমে যশোর, টঙ্গি ও কোনাবাড়ির কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে। ৬৪টি জেলার জন্য তিনটি আদালত কতটা অপ্রতুল তা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া, জনসংখ্যা ও কিশোর অপরাধীদের সংখ্যার তুলনায় তা খুবই কম। দূরত্বের হিসেবেও কিশোর আদালতের সংখ্যা আরো বাড়ানো প্রয়োজন। কিশোর আদালত ও কিশোর সংশোধনাগার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিরাজ করছে অপ্রতুলতা।

৪। জনবল সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধনপূর্বক উন্নয়ন ও সমাজে পুনর্বাসনে সরকারের বড় সীমাবদ্ধতা হলো এর জনবল কাঠামো। শিশু- কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাকালীন যে জনবল কাঠামো ছিল আজও তা বলবৎ রয়েছে। সময়ের বিবর্তনে চাহিদা মোতাবেক জনবল কাঠামোতে কোন পরিবর্তন বা সংস্কার আনা হয়নি। শুরু থেকে জনবল কাঠামো অনুসারে চিকিৎসকের স্থায়ী কোন পদ ছিল না। আজও এখানে চিকিৎসকের জন্য কোন স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয়নি। এছাড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ইনস্ট্রাকটরদের পদও স্থায়ী নয়। তাছাড়া জনবল কাঠামোতে যে জনবলের কথা বলা হয়েছে তারও অধিকাংশ পদ শূন্য পড়ে রয়েছে।

৫। বাজেট সীমাবদ্ধতা

উন্নয়ন ও সংশোধন কার্যক্রমের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে এর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বা বাজেট। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট প্রতিষ্ঠানের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। সম্প্রতি বরাদ্দ বৃদ্ধি করে মাথাপিছু বরাদ্দ ৩৫০০ টাকয় উন্নীত করা হয়েছে। বরাদ্দ বৃদ্ধির পরের এ টাকার একজন শিশু-কিশোরের বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মানসম্মতভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই বাজেট সীমাবদ্ধতা শিশুর উন্নয়ন, সংশোধন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

৬। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে আসন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রেই আসনগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় নিবাসীদের জন্য আসন সংখ্যা একেবারেই কম। টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে সরকার অনুমোদিত আসন সংখ্যা ২০০টি পরবর্তীতে ১০০ আসন বৃদ্ধি করে ৩০০টি আসন অনুমোদন দেওয়া হয়। অন্যদিকে যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) এর আসন সংখ্যা ১৫০টি। আর কোনাবাড়ীর একমাত্র বালিকা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের আসন সংখ্যাও ১৫০টি। সর্বমোট ৬০০টি আসন দিয়ে তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

৭। বাংলাদেশে প্রবেশন নীতি মালা নেই

বাংলাদেশে ১৯৬০ সালে প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে সর্বপ্রথম সংশোধনমূলক কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর শিশু আইন কার্যকর করার জন্য ১৯৭৬ সালে জাতীয় শিশু নীতিমালা প্রবর্তন করা হলেও আজ পর্যন্ত প্রবেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয় নীতিমালা নেই। শিশু আইনে প্রবেশনের কথা বলা হলেও এখন পর্যন্ত কোন নীতি প্রণয়ন করা হয়নি। শিশু-কিশোরের শাস্তি বা কারাদণ্ডের বিকল্প হিসেবে প্রবেশনের ব্যাপক উপযোগিতা ও সম্ভাবনা থাকলেও বিচারব্যবস্থায় এ বিষয়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। তাই বর্তমান সময়ে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে প্রবেশনকৃত শিশুদের সংখ্যা নেই বললেই চলে।

৮। শিক্ষা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক পড়াশুনার ব্যবস্থা রয়েছে। ৫ম শ্রেণি পরে আর এখানে পাঠদান করা হয় না। আমাদের দেশে সাধারণত ৬ থেকে ১১ বছর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা স্তর; ১১ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর এবং ১৫ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তর হিসেবে গণ্য করে। অথচ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের জন্য শুধুমাত্র পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার সুযোগ রাখা হয়েছে। যা বয়সগত দিক বিবেচনায় ১১ বছর বয়সকালে সমাপ্ত হয়ে যায়। অথচ গবেষণায় শিশুদের বয়সগত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত নিবাসীদের ৯৫% এর বয়সই ১২ বছর থেকে তার উপরে। অতএব মাধ্যমিক

ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের ব্যবস্থা না থাকায় নিবাসীরা শিক্ষার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৯। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবাগত সীমাবদ্ধতা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের জনবল কাঠামো অনুসারে কোন কেন্দ্রেই চিকিৎসকের স্থায়ী কোন পদ নেই। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই অস্থায়ী ডাক্তার দিয়ে আপদকালীন ব্যবস্থা করা হত। একজন নার্স ও একজন কম্পাউন্ডারের সমন্বয়ে এখানে মেডিকেল টিম রয়েছে। স্থায়ী ডাক্তার না থাকার কারণে শিশু নিবাসীরা নানারকম রোগের শিকার হচ্ছে এবং চিকিৎসার অভাবে অনেকে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে।

১০। প্রশিক্ষণগত সীমাবদ্ধতা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, এখানে আগত শিশুদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে সমাজের মূল স্রোতের সাথে একীভূত করা। কিন্তু কারিগরি ট্রেডসমূহের জন্য স্থায়ী কোন প্রশিক্ষক না থাকায় এ উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া দক্ষ প্রশিক্ষক এবং এ প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা সার্টিফিকেট না থাকায় কর্ম জীবনে এ প্রশিক্ষণ কোন উপকারে আসে না।

উপরোল্লিখিত সীমাবদ্ধতার কারণে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অপরাধপ্রবণ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরের উন্নয়ন ও সংশোধনপূর্বক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে সমাজে সম্মানজনক পুনর্বাসন আশানুরূপ ফলপ্রসূ হচ্ছে না। তাই কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রেসমূহের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এ সীমাবদ্ধতাসমূহের আশু সমাধান করা প্রয়োজন।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সমস্যা

দেশে ক্রমবর্ধমান শিশু-কিশোর অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলোর ভূমিকা থাকলেও বর্তমানে এসব কেন্দ্র নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বাজেট স্বল্পতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, অপর্যাপ্ত জনবল, অনুন্নত সংশোধন প্রক্রিয়া ও অপ্রতুল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পুনর্বাসন কার্যক্রম নিয়ে চলছে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের শিশুদের মানসিক উন্নয়ন ও সামাজিক পুনর্বাসন কর্মসূচি। সম্প্রতি “দৈনিক কালের কণ্ঠ” পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই প্রতিবেদনে কেন্দ্রসমূহের বর্তমান সময়ের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই নিম্নে প্রতিবেদনটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

“২০০ আসনে হাজার নিবাসীর বাস ৪১ বছরেও নিয়োগ হয়নি চিকিৎসক”

সন্ধ্যার পরপরই শুরু হয় মেঝেতে বিছানা পেতে জায়গা দখলের প্রতিযোগিতা। কার আগে কে ঘুমানোর একটু জায়গা কবজায় নেবে- এ নিয়ে চলে ধাক্কাধাক্কি, টানাটানি, গালাগাল আর মারামারি। টঙ্গী শিশু-উন্নয়ন কেন্দ্রের (কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান) এমন ছবি নিত্যদিনের। ২০০ আসনের এ কেন্দ্রে বর্তমানে নিবাসীর সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। প্রতিদিন গাদাগাদি করে তাদের ঘুমাতে হয়। ঘুমানোর জায়গা না পেয়ে স্টিলের খাট দখলে নিতে হয় মারামারি। এ কারণে সরিয়ে ফেলা হয়েছে সব খাট। লেখা-পড়া, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদনসহ অন্য সব বিষয়েও একই হাল। দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় ভুগছে কেন্দ্রটি। উন্নয়ন ও সংশোধনী কার্যক্রমে নিয়ে আসা শিশু-কিশোরদের মৌলিক চাহিদাগুলোই ঠিকমত পূরণ হচ্ছে না, সংশোধন হবে কী- এ প্রশ্ন অভিভাবক মহলে। সময়ের প্রয়োজনে কেন্দ্রের জনবল কাঠামো পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ জরুরি হলেও প্রতিষ্ঠাকালীন অর্গ্রানোগ্রাম অনুসারে জনবল এখনও অপরিবর্তিত। ২৩ টি পদ এখনও শূন্য রয়েছে। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজে রয়েছে একধরনের স্থবিরতা।

কিশোর মন থেকে অপরাধপ্রবণতা দূর করে সংশোধনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরকে তার স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে ১৯৭৮ সালে যে প্রতিষ্ঠানের জন্ম, দীর্ঘ ৪১ বছরেও সে প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়ন হয়নি। বাড়ন্ত কিশোরদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা অতি জরুরী হলেও স্বাস্থ্যসেবা বলতে এখানে কিছুই নেই। কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত এখানে চিকিৎসকের পদ সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের কিকিৎসায় একজন কম্পাউন্ডারই ভরসা। সম্প্রতি এখানে শুভ নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়, যার রোগের কারণই জানা জায়নি। কর্তৃপক্ষ বলছে জ্বরে সে মারা গেছে। তবে সহপাঠীদের অভিযোগ, চিকিৎসার অবহেলাই তার মৃত্যুর কারণ। এই কেন্দ্রে চিকিৎসাসেবা বাবদ জনপ্রতি মাসে ১০০ টাকা বরাদ্দ থাকলেও জরুরী অথবা প্রাথমিক চিকিৎসায় কোন কিশোরকে কেন্দ্র থেকে কোন ওষুধ সরবরাহ করা হয় না। কোন কিশোর খুব বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে নেওয়া হয় টঙ্গী সরকারি হাসপাতালে। সে হাসপাতালে আবার প্রাথমিক চিকিৎসা ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই।

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয় বিভিন্ন মামলার অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সের কিশোরদের। প্রতিদিনই নির্ধারিত ৩৩ জেলা থেকে বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত কিশোরদের এখানে এনে ভর্তি করা হয়। তাদের জন্য এখানে শুধু পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখা-পড়া করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে হত্যা মামলার শতাধিক অভিযুক্ত কিশোর নিবাসীসহ বিচারাধীন ৮১০ জন ও সাজাপ্রাপ্ত সংশোধন কার্যক্রমের অধীন ১২৬ জন রয়েছে, যাদের অনেকেই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র হলেও এখানে তাদের শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো যাচ্ছে না।[১২৫]

উপরোক্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত চিত্রটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোর সংশোধনী প্রতিষ্ঠান) টঙ্গী, গাজীপুরের হলেও বাকী দু'টি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অবস্থাও এর চেয়ে ভাল নয়। এই প্রতিবেদন এবং সরেজমিন প্রত্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কাগজে-কলমে শিশু-কিশোরদের সুন্দর আবাসন, বিভিন্ন বয়সী শিশু-কিশোরদের একত্রে না রাখার কথা থাকলেও বাস্তব চিত্র একেবারেই ভিন্ন। 'শিশু আইন,২০১৩' -তে বলা হয়েছে, ৯ (নয়) বৎসরের ঊর্ধ্বের কোন শিশুর সাথে ১০ (দশ) বৎসরের এবং ১০ (দশ) বৎসরের ঊর্ধ্বের কোন শিশুর সাথে ১২ (বার) বৎসরের ঊর্ধ্বের শিশুকে একত্রে একই কক্ষে এবং ফ্লোরে রাখা না হয়; আর ১২ (বার) বৎসর এবং তদুর্ধ্ব বয়সের বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা, শিশুর বাড়ন্ত শারীরিক কাঠামো, সবলতা, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে তাদের আবাসনের বিষয়টি সতর্কভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবং, যতদূর সম্ভব, তাহাদের পৃথক পৃথক কক্ষে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) দণ্ডবিধির ধারা ৮২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ৯ (নয়) বৎসর বয়সের কম বয়সী কোন শিশুকে কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে রাখা যাবে না।"[১২৬]

শিশু আইনে এসকল সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হলেও এর ন্যূনতম সুবিধাও পাচ্ছে না নিবাসীরা। ফলে শিশুদের সংশোধন ও উন্নয়ন দূরের কথা মৌলিক মানবিক অধিকার থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে তারা। যার বাস্তব চিত্র কিছুটা অনুধাবন করা যায় উল্লিখিত প্রতিবেদনে। সরেজমিনে প্রত্যবেক্ষণ এবং উল্লিখিত প্রতিবেদনের আলোকে বলা যায় যে, কেন্দ্রগুলোতে মোটামুটি শিশু-কিশোর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা শিশু-কিশোর সংবেদনশীল প্রত্যেকটি বিষয়েই কম-বেশি সংকট রয়েছে। এর মধ্যে আবাসন, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য-পুষ্টি, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংকট সবচেয়ে বেশি। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের সমস্যাকে দু'ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়-

(ক) প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সমস্যা;

(খ) নিবাসীদের সংশ্লিষ্ট সমস্যা।

১২৫.১২৫. মো. মাহবুব আলম, '২০০ আসনে হাজার নিবাসীর বাস, ৪১ বছরেও নিয়োগ হয়নি চিকিৎসক', *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৪ অক্টোবর, ২০১৯

১২৬.১২৬. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৬৩ (২),(৩)

(ক) প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সমস্যা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে সমস্যার অন্ত নেই। নানাবিধ সমসস্যায় জর্জরিত এ প্রতিষ্ঠানসমূহ। নিম্নে প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তা আলোচনা করা হলো-

১। বাজেট স্বল্পতা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট প্রতিষ্ঠানের চাহিদার তুলনায় খুবই কম। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থিত শিশুদের মাথাপিছু প্রতিমাসে ২৬০০ টাকা বরাদ্দ ছিল। গত অর্থবছরে বৃদ্ধি করে তা ৩৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এরপরেও এ টাকায় একজন কিশোররের থাকা-খাওয়া চিকিৎসা, প্রশাসন ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা সম্ভব না। এ বাজেটের মধ্যে খাদ্য ও জ্বালানী বাবদ ২৫০০/ টাকা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ঔষধ, পোষাক ও অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বাবদ ১০০০/ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই স্বল্প পরিমাণের অর্থ দ্বারা নিবাসীদের উপযুক্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য, জামা-কাপড়, সেনিটেশন সুবিধা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা-ঔষধ, বইপত্র, প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদির প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। খাদ্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করলে ভ্যাট, ঠিকাদারের লাভ বাদ দিলে যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে বর্তমান বাজার মূল্য অনুপাতে এই টাকা দ্বারা খরচ নির্বাহ করা এবং বাড়ন্ত বয়সের কিশোর-কিশোরীর জন্য খাদ্যের মান বজায় রাখা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এছাড়া জেনারেটর ও গাড়ীর জন্য তেল ও মেরামতের জন্য সামান্য বরাদ্দ রয়েছে। এ বরাদ্দ দিয়ে তেল খরচ ও মেরামত করা সম্ভব হয় না। ফলে উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকাংশ যানবাহনই সঠিকভাবে কাজ করছে না। বিশেষ করে যখন নিবাসীদের কেউ আহত বা অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বাহন পাওয়া যায় না।

২। জনবল সংকট

তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রেই সরেজমিনে দেখা যায় যে, তাদের জনবল কাঠামো অনুসারে যে পরিমাণ জনবল থাকার কথা তাদের অধিকাংশই শূন্য রয়েছে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র টঙ্গীর ৫৮টি পদের মধ্যে ২৩টি পদ শূন্য রয়েছে এবং যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৪৯টি অনুমোদিত পদের মধ্যে ১৫টি পদ বর্তমানে শূন্য আছে। এছাড়া একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের ৪৫ পদের মধ্যে ১৮ টি পদ শূন্য রয়েছে। যা মোট পদের প্রায় ৩৭%। তাছাড়া এ জনবল কাঠামোটিও অনেক পুরোনো। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কর্মকর্তা যেমন, প্রবেশন অফিসার, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষক, কারিগরি প্রশিক্ষক, উপদেষ্টা এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ সাধারণত স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয় না এবং সম্মানজনক সম্মানীরও ব্যবস্থা নেই। ফলে নিবাসী কিশোরদের যথাযথ শারীরিক উন্নয়ন ও মানসিক বিকাশে তারা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না। অনেক সময় কিশোরের সামাজিক অনুসন্ধান সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রদানে অনেক দেরি হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুমোদিত পদ শূন্য পড়ে থাকে। আবার কিছু পদ পদায়ন ও বদলিজনিত কারণে শূন্য থাকে; কিন্তু

এসকল শূন্য পদ আবার নতুন করে পদায়ন বা নিয়োগ দিয়ে যথাসময়ে পূরণ করা হয় না। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের জন্য কোন স্থায়ী ডাক্তার বা ডাক্তারের পদ নেই।

৩। প্রশাসনিক সমস্যা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় লজেস্টিক সাপোর্টের অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় পরিবহণ, ড্রাইভার, ফুয়েল প্রভৃতি ছাড়াই অকেজো দু'একটা গাড়ী রয়েছে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি গাড়ী ব্যবহার করতে চায় তাহলে নিজের পকেট থেকে অর্থ প্রদান করতে হয়। প্রবেশন অফিসার, সমাজিক অনুসন্ধান কর্মীও পরিবহণের কোন সুবিধা পায় না। অতএব কর্মকর্তাদের গৃহ পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, অনুবিক্ষণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালনে খুবই কষ্ট শিকার করতে হয়। কিউকের নিবাসীদের মানসিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য কিউকের ব্যক্তিবর্গের কোন প্রফেসনাল প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা নেই। কারিগরি প্রশিক্ষণে নেই আধুনিক ও পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি। ফলে প্রশিক্ষকগণ নিবাসীদেরকে উপযুক্ত প্রযুক্তিগত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ দিতে পারে না। কর্তৃপক্ষের সচেতনতার পরেও একজন স্থায়ী চিকিৎসকের অভাবে উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে পারছে না। এছাড়া নিবাসীদের মুক্তির জন্য রয়েছে একটি জটিল পদ্ধতি। নিবাসী ১৮ বছরে উপনীত হলে তাকে আদালতের পরামর্শক্রমে মুক্তি বা আরো ডিটেনশনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিকট অর্পন করা হয়। নিবাসীদের মুক্তির এই পদ্ধতি খুবই লম্বা এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

এ সম্পর্কে 'শিশু আইন, ২০১৩' এর ৩৪(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর আচরণ, চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটলে এবং হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত না হলে, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শিশুকে মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হবার অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে।

৪। শিশু-কিশোরের বিচারের ক্ষেত্রে সমস্যা

আইন থাকার পরেও অনেক সময়ই বিচারের ক্ষেত্রে শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংবাদ দেখতে পাওয়া যায়। মাঝেমধ্যেই শিশু-কিশোর ও বয়স্কদের একইভাবে একই আদালতে প্রকাশ্যেই বিচার করা হয়। যা শুধু আইন নয়, মানবিকতা ও মানবাধিকারেরও পরিপন্থী। শিশু আইনে স্পষ্টকরে বলা হয়েছে যে, ৯ বছরের নিচে কোন শিশুকে গ্রেফতার করা যাবে না এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুর বিচারকার্য কিশোর আদালতে সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু আইনে থাকলেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি মানা হচ্ছে না। ফলে বিচার প্রক্রিয়াটি শিশু বান্ধব হয় না। দৈনিক প্রথম আলোর ৩১ অক্টোবর তারিখে শিশুদের বিচারের

ক্ষেত্রে অবহেলা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এ প্রতিবেদনে কিশোর আদালতের দৈন্যদশার চিত্র পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। নিম্নে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

"আইনে মানা তবু ১২১ শিশুর দণ্ড"

শিশু আইনে স্পষ্টই বলা আছে, অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, অপরাধে জড়িত থাকা শিশুর বিচার শুধু শিশু আদালতেই হবে। অথচ ভ্রাম্যমাণ আদালত শিশুদের দণ্ড দিয়ে চলেছেন। এ মুহূর্তে টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে ১২১টি শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের দণ্ড দিয়েছেন র‌্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এরা তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ করছে। শিশু আইনের পাশাপাশি হাইকোর্টের একাধিক রায়েও বলা হয়েছে, শিশুর বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগের বিচার শুধু শিশু আদালতেই হতে হবে। ভ্রাম্যমাণ আদালত দূরের কথা, অধস্তন আদালতের কোনো বিচারক শিশুদের বিচার করলেও তা হবে বেআইনি। ২০০৭ সালে হাবিব মণ্ডল বনাম রাষ্ট্র মামলায় দেখা যায়, এক শিশু ধর্ষণ করে হত্যার দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেয়। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। কিন্তু হাইকোর্ট তাকে বেকসুর খালাস দেন। কারণ, শিশুটির বিচার শিশু আদালতে হয়নি।

২০১৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর হাইকোর্ট একই ধরনের আরেকটি রায় দেন। ১৫ বছরের আবদুল জলিল একটি ধর্ষণ মামলায় ভোলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পায়। হাইকোর্ট বলেছেন, শিশু আইন বাদ দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক ধরে নিয়ে ভুল আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তার সাজা হয়েছে। তাই তা বাতিল করা হলো। জলিল ১৪ বছর সাজাভোগ করেছিল। হাইকোর্ট ক্ষতিপূরণ বাবদ জলিলকে ৫০ লাখ টাকা দিতে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেন। টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এ বছরের ৩ মে থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত র‌্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডিত ১২১ জন শিশু সেখানে রয়েছে। এদের মধ্যে ১৭ বছর বয়সী আছে ২৮ জন। ২৬ জনের বয়স ১৬, ২০ জনের বয়স ১৫, ১৬ জনের বয়স ১৪, ১১ জনের বয়স ১২ বছর। ৭ জনের বয়স ১৩ বছর। বাকি ১২ জনের বয়স ৮ থেকে ১১ বছর। একজনের বয়স উল্লেখ নেই।

দণ্ডিতদের মধ্যে ৭৫ জনকে দণ্ডবিধির ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী চুরির দায়ে ছয় মাস এবং ৩৪ জনকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৪২ ধারা অনুযায়ী এক বছর করে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। শুধু একটি শিশু দণ্ডবিধির ১৮৯ ধারায় ছয় মাসের সাজা পেয়েছে। ১৩ বছর বয়সী শিশুটির বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৮৯ ধারায় সাজা দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারীকে ক্ষতিসাধনের হুমকির অভিযোগ আনা হয়েছে। ৩৪ জন শিশু ঠিক কী ধরনের মাদক অপরাধ করেছে, তার উল্লেখ নেই। তবে মাদক আইনের ৪২ ধারা উল্লেখ করে সাজা দেওয়া হয়েছে। এই ধারায় দু'টি দফা আছে। প্রথম দফা বলছে, মাদক আইনে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি, এমন 'মাদকদ্রব্য অপরাধ করলে অনধিক এক বছর

জেল দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় দফা বলছে, মাদক অপরাধ দমনে নিয়োজিত আইন প্রয়োগকারী কাউকে বাধা দিলে কমপক্ষে দুই বছর ও অনধিক ১০ বছর দণ্ড পাবে। এ ছাড়া যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রেও ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডিত একটি শিশু আছে। কেশবপুরের এই শিশুটি বাল্যবিবাহের কারণে এক মাসের সাজা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ওই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক মো. আবদুল্লাহ আল মাসুদ। কেন্দ্রটিতে ৩৩০টি শিশু রয়েছে। জামিন বিষয়ে জানতে চাইলে টঙ্গী শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রবেশন কর্মকর্তা কে এম ওবায়দুল্লাহ আল মাসুদ গতকাল রাতে প্রথম আলোকে বলেন, ১২১ জন শিশুর বেশির ভাগই (৯৯ জন) র‍্যাব সদর দপ্তরের ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডিত। শিশুদের অভিভাবকেরা দীর্ঘদিন ঘোরাফেরা করেও জামিন করাতে পারছেন না। কারণ, র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নথি পাঠায় না।

টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে ধারণ ক্ষমতা ৩০০ শিশু। গতকাল পর্যন্ত আছে ১০০১ জন। ভ্রাম্যমাণ আদালতের দণ্ড পাওয়া শিশু গতকাল পর্যন্ত ১২১ জন। যশোরে দণ্ডিত শিশু একজন। ওবায়দুল্লাহ মাসুদ জানান, টঙ্গীতে ধারণ ক্ষমতার তিন গুণের বেশি শিশু অন্তরীণ আছে। ধারণ ক্ষমতা ৩০০, গতকাল বুধবার পর্যন্ত শিশু আছে ১ হাজার ১ জন। র‍্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলমের ৩০ জুলাই ও ২৪ আগস্ট সই করা দুটি, ২৬ আগস্ট র‍্যাব-৩ টিকাটুলীর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আক্তারুজ্জামানের সই করা একটি এবং ৯ আগস্ট র‍্যাব-৪ মিরপুর-১-এর আইন কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিজাম উদ্দিন আহমেদের সই করা চারটি আদেশে দেখা যায়, তাঁরা টঙ্গীর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রকে-কিশোর সংশোধন কেন্দ্র উল্লেখ করেছেন। লক্ষণীয় যে, তাঁরা যে ফরম পাঠিয়েছেন, তাতে বাংলাদেশ ফরম নম্বর ৩৯৬৩ এবং হাইকোর্ট ফৌজদারি পরোয়ানা ফরম নম্বর ৩৭ উল্লেখ আছে। ২০১৭ সালের ১১ মে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন হাইকোর্টে অসাংবিধানিক বলে চিহ্নিত হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের আপিল বিচারাধীন রয়েছে। যোগাযোগ করা হলে র‍্যাবের মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম বলতে পারবেন। কিন্তু সারওয়ারের মুঠোফোনে গত মঙ্গলবার কল করে এবং খুদে বার্তা পাঠিয়েও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি। ফরমের বিষয়ে লিখিতভাবে জানতে চাইলে সুপ্রিম কোর্টের মুখপাত্র সাইফুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন বিচারাধীন থাকার কারণে এ বিষয়ে তাঁর কোনো মন্তব্য নেই।[১২৭]

১২৭. ১২৭. মিজানুর রহমান খান, 'আইনে মানা, তবু ১২১ শিশুর দণ্ড', *দৈনিক প্রথম আলো* ,৩১ অক্টোবর ২০১৯, পৃ. ১

৫। প্রবেশন কার্যক্রমের অভাব

বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য প্রবেশন অফিসারের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। এ দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সম্পাদিন করতে হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত সকল প্রবেশন অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রবেশন অফিসারকে কারাগারে আটক শিশু-কিশোর ও কিশোরীদের তালিকা সমাজসেবা অধিদফতরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া আছে। বর্তমানে ৬৪ জেলার মধ্যে মাত্র ২২টি জেলাতে ২৩ জন প্রবেশন অফিসার আছে। বাকী ৪২টি জেলার উপজেলা সমাজকল্যাণ কর্মকর্তা অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সমন্বয়ের অভাব এবং স্বল্প সংখ্যক প্রবেশন অফিসার থাকায় প্রবেশন আইনের সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। প্রবেশনের এ কাজটি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা সমীচীন নয়। কিন্তু ২০০৭ সালে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হলেও শিশু-কিশোরের বিচার ব্যবস্থার কোন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

(খ) প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের সংশ্লিষ্ট সমস্যা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সকল নিবাসী শিশু আইন ১৯৭৪ পরবর্তীতে সংশোধিত শিশু আইন, ২০১৩ অনুসারে পরিচালিত হয়ে আসছে। জাতীয় শিশু নীতিতে শিশু-কিশোরের জন্য ন্যূনতম চিকিৎসাসেবা, খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ প্রভৃতি সরবরাহের কথা বলা হয়েছে। এসব মৌলিক প্রয়োজন এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বস্তুত তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রত্যেক নিবাসীই বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন: পুষ্টিসম্মত পর্যাপ্ত খাদ্য, পরিধেয় পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ও চিকিৎসাসেবার অভাব এবং কিউকের কর্মচারীদের অসদাচরণ প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এছাড়াও এখানে নিবাসীদের বয়স, কেইস হিস্টরি এবং অপরাধের ধরন অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসকরণের ব্যবস্থা ও অনুশীলন নেই বললেই চলে। কিশোর নিবাসীদেরকে বয়স, অপরাধ ও শাস্তির মাত্রা নির্বিশেষে একত্রে রাখা হচ্ছে। নিবাসীদের এরকম নানাবিধ সমস্যার ফলে যথাযথ মনোদৈহিক উন্নয়ন সাধিত হয় না। নিম্নে নিবাসীদের কয়েকটি সমস্যা আলোচনা করা হলো-

১। চিকিৎসাসেবাগত সমস্যা

জাতীয় শিশু নীতি ও শিশু আইনে প্রত্যেক নিবাসীর জন্য চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ-সুবিধা খুবই অপর্যাপ্ত। তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রের একটিতেও শিশু বিশেষজ্ঞ বা শিশু ডাক্তার নেই। এখানে নিবাসীদের চেকআপের জন্য নিয়মিত বা স্থায়ী কোন ডাক্তার নেই; এমনকি অসুস্থতার সময়ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া যায় না। মাদকাসক্তি, ব্যক্তিত্ব সমস্যা, শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি

প্রভৃতির কোন বিশেষ চিকিৎসাসেবা নেই। যখন নিবাসীরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তাদেরকে নিকটস্থ ফার্মেসিতে আনা হয় এবং কোনরকম ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ঔষধ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক উন্নয়ন কেন্দ্রেই কিছু কমন রোগ-বালাই রয়েছে যেমন, ঠান্ডা জ্বর, চোখের সমস্যা, বুকের ব্যাথা, গ্যাসের ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, রিউমেটিক ফিভার, এলার্জি, অর্থপেডিক সমস্যা, সাধারণ দুর্বলতা এবং অন্যান্য সাধারণ রোগ-বালাই বিশেষ করে চুলকানি (ঘা-পাঁচড়া) প্রভৃতি ব্যাপকভাবে নিবাসীদের আক্রান্ত করে। এ ব্যাপারে অনেক নিবাসী মন্তব্য করেছে যে, প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ খুবই কম এবং পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য। কঠিন অসুস্থতার ক্ষেত্রে নিবাসীদেরকে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এছাড়া নিবাসীদের পর্যাপ্ত সাবান, তেল দেওয়া হয় না। ৮ রুমের ৫০ থেকে ৬০ জন নিবাসীর জন্য টয়লেট ১ টি, গোসলখানা ২টি। অপরিচ্ছন্ন কক্ষের ফলে বিভিন্ন চর্ম রোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

২। প্রয়োজনীয় পুষ্টিসম্মত খাদ্যের অভাব

নিবাসীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট খাদ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা ঠিকাদার নিম্নমানের খাবার সরবরাহ করে। তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রের মধ্যে শুধু কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীরা তাদের খাবারের মান সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য করেন। বালকদের উন্নয়ন কেন্দ্র দু'টির ব্যাপারে আরো বলা হয় যে, তারা যথাসময়ে খাদ্য সরবরাহ করে না এবং খাদ্যের পরিমাণও যথেষ্ট থাকে না। পানির সাপ্লাই তেমন সুবিধার নয়, এত উচ্চমাত্রার আয়রন রয়েছে যা নিবাসীদের অনেক রোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কর্তৃপক্ষ খাদ্যের পরিমাণ ও গুণগত মান বৃদ্ধির ব্যাপারে সদিচ্ছা রয়েছে কিন্তু নিবাসীদের মাথাপিছু বরাদ্দ কম থাকার কারণে সম্ভব হচ্ছে না। সপ্তাহে দুই বা তিন দিন মাছ বা মাংস দেওয়া হয়। তবে ধর্মীয় এবং জাতীয় উৎসবে উন্নত মানের খাবার ও মিস্টি পরিবেশন করা হয়।

৩। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সমস্যা

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে সাধারণত তিন ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম রয়েছে, সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং ধর্মীয় শিক্ষা। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা সকলের জন্য আবশ্যিক নয়। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ৫ম শ্রেণির পরে আর কোন শ্রেণির শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ নিবাসীই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই কিউক কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থায় ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যা এখানে অবস্থানের সর্বোচ্চ বয়সসীমার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুমতি সাপেক্ষে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় এসএসসি পরীক্ষার বন্দোবস্ত রয়েছে। এখানে অবস্থানরত নিবাসীদের বয়স ৯ থেকে ১৮ হওয়ায় তারা অধিকাংশই মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের আগ্রহ কম বলে

নিবাসীরা অভিযোগ করেন। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের মাধ্য ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ দেয়া যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। যশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে মন্ত্রীর আগমনে এ সম্পর্কে এটা আবেদন করা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী এ ব্যাপারে ওয়াদা দিয়েছিলেন বলে নিবাসীরা জানান। কিন্তু নতুন এক অজানা তা এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি বলে জানা যায়।

নিবাসী কিশোরদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে সমাজে একীভূত করার জন্য যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা খুবই অপ্রতুল। কেন্দ্রসমূহে দক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যাক প্রশিক্ষক নেই। কাগজে কলমে অনেকগুলো ট্রেডের ব্যবস্থা থাকলেও মূলত এর কোন কার্যকারিতা নেই। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে উল্লেখ করার মত ৪-৫টি বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, ইলেকট্রিকাল, কাঠমিস্ত্রী, দর্জি এবং অটোমোবাইল। আর কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে শুধুমাত্র সেলাই ও দর্জি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, যা আবার পুরানো আমলের-আধুনিক নয়। অনেক সময় নিবাসীরা এসকল প্রশিক্ষণ গ্রহণে অনীহা জানায়, কারণ তারা মনে করে এসব তাদের ভবিষ্যতে কোন কাজে আসবে না। দিনে দুই সিপ্টে ১ ঘন্টা করে সপ্তাহে দুই দিন আগ্রহী নিবাসীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্থায়ী প্রশিক্ষকের অভাব, অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ সামগ্রী, প্রশিক্ষকের অদক্ষতা ও দায়িত্ব অবহেলার কারণে অধিকাংশ নিবাসী কারিগরি প্রশিক্ষণ থেকে সামান্য জ্ঞানার্জনেও ব্যর্থ হয়। এছাড়াও এসকল প্রশিক্ষণ সফলভাবে সমাপ্তের পর কোন সার্টিফিকেট প্রদান না করায় এই প্রশিক্ষণের গুরুত্ব থাকে না। সর্বোপরি নিবাসীরা তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য শিক্ষা কিংবা সহশিক্ষা কার্যক্রমের সহায়তা পায় না।

সাধারণত ধর্মীয় বিধি-বিধান, নীতি-নৈতিকতা, বিশ্বাস মানুষকে ভাল কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। শিশু আইনে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিধান রয়েছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই কিছু সংখ্যক হিন্দু নিবাসী রয়েছে; কিন্তু, কেন্দ্রগুলোতে ইসলাম ধর্মের শিক্ষকের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের কোন শিক্ষক নেই। এ হিসেবে সংখ্যালগু নিবাসীদের ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা হচ্ছে না।

৪। আফটার কেয়ার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের অভাব

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সংশ্লিষ্টগণ অপরাধী নিবাসীদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে পেশাদারিত্বের সাথে অব্যাহত চেষ্টা করেন। তারা অপরাধী কিশোরের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে সমাজে মুক্ত করে দেন। কিন্তু আফটার কেয়ার সার্ভিস এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের বাস্তবতা না থাকায়, এ সকল শিশু-কিশোর মুক্ত হবার পরে আবার অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে। এটি মোটেও কাম্য নয়। এটি গ্রহণযোগ্য নয় যে,

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অপরাধী কিশোরদের পুনর্বাসনের জন্য সামাজিক কার্যকরী কোন প্রকল্প নেই, যা কিশোর অপরাধ বিচার ও সংশোনের জন্য অপরিহার্য ভিত্তি।

৫। কর্মকর্তার খারাপ ব্যবহার

কিছু সংখ্যক নিবাসী অভিযোগ করে যে, তাদের সাথে কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন করে। অনেক কর্মকতা-কর্মচারী শিশু-কিশোরদের কাছাকাছি থাকে; কিন্তু কারো কারো দুর্ব্যবহার ও নির্যাতন কাম্য নয়। অভিযোগ রয়েছে যে, সমাজিক অনুসন্ধান কর্মী বা সমাজকর্মীরা কদাচিৎ কেন্দ্র পরিদর্শন ও শিশু-কিশোরদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও নিবাসীদেরকে অনেক সময় উন্নয়ন কেন্দ্রের ভিতর আটকিয়ে রাখা হয় এবং কেন্দ্রের কর্মচারীদের দ্বারা প্রায়শই অপমানকর কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন, গাড়ী পরিচ্ছন্ন করা, ফার্নিচার পরিস্কার করা প্রভৃতি। এমনকি স্টাফরা শিশু-কিশোরদেরকে আটকিয়ে রেখে দুর্ব্যবহার করে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের কাজ করায়। উপরন্তু, নিবাসীদেরকে তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সাথে ১৫-২০ মিনিটের বেশি কথা বলতে দেওয়া হয় না। এটিও আবার মাসে দু'বার (মাসের ৭ম ও ২২তম দিন)। পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা বলার সীমাবদ্ধতা নিবাসীদের উপর মানসিক প্রভাব পড়ে। এনকি এখানে কর্তৃপক্ষের সময়মত যথাযথ পদক্ষেপের অভাবে তাদের মৌলিক অধিকারও লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনাও দেখা যায়। এছাড়া সকল উন্নয়ন কেন্দ্রেই রশি ও হাতকড়া পড়িয়ে ঝুলিয়ে শারীরিক প্রহার ও অন্যান্য অবমাননাকর শাস্তি প্রয়োগ করা হয় বলে নিবাসীরা অভিযোগ করেন।

৬। অপর্যাপ্ত পরিধেয় বস্ত্র

শিশু নীতি ১৯৭৬ এর ১৭ নং ধারা অনুসারে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সকল নিবাসীর জন্য পরিধেয় বস্ত্র বিনামূল্যে বিতরণের কথা বলা হয়েছে। নিবাসীরা ময়লা কাপড় পরিধান করে ক্লাসে উপস্থিত হয় এবং সরাসরি তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করে গবেষকের সামনে এটি প্রতীয়মান হয় যে, তাদেরকে পর্যাপ্ত জামা-কাপড়ই দেওয়া হয় না। অধিকাংশ নিবাসীই প্রয়োজনীয় তেল, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি সঠিকভাবে পায় না।

৭। পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা নেই

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের আলোচনায় কিছু কিছু বিনোদনমূল কার্যক্রমের বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল কার্যক্রম অনিয়মিত হওয়ায় শিশুদের যথার্থ বিনোদন হচ্ছে না। তাদের জন্য এক ফ্লোরে একটি টিভি, ক্যারাম, দাবা প্রভৃতি ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত, অধিকাংশ খেলা-ধুলার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম নেই। বিশেষ করে কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে খেলা-ধুলার সরঞ্জাম এবং বিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। তারা বর্ণনা করে যে, তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক নিবাসীই বহিঃক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে। তারা যে সুযোগ-সুবিধা পায় সেটি

কোনক্রমেই যথাযথ নয়। এখানে প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে উল্লেখ করার মত কিক্রেট মাঠ, ব্যাডমিন্টন কোটসহ একটি ফুটবল মাঠ রয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে প্রতিষ্ঠানের নিবাসীরা সঠিকভাবে তাদের বিনোদনমুলক কার্যক্রম উপভোগ করতে পারে না। তাদের অধিকাংশই টিভি দেখে, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করে, তাস খেলে, গল্পকরে অবসর সময় কাটায়।

৮। কিশোরী নিবাসীদের অবস্থা

কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের মেয়ে নিবাসী বা কিশোরীদের ঘটনা কিশোরদের থেকে অনেকটা ভিন্নতর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা সামান্য অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। প্রায়ই তাদেরকে মাদক ও অস্ত্রবহন, পাচার সন্দেহে আটক করা হয়। অপরাধমূলক কাজে অংশগ্রহণের জন্য শাস্তি প্রদান মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যাপার, যেখানে মূলত তারা ভিকটিম। অধিকন্তু, গ্রেফতার ও জিজ্ঞাসাবাদকালীন সময়ে মেয়েদের যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনাবাড়ী কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী এখানে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম খুবই কম। এছাড়া তাদের পর্যাপ্ত বিনোদনমূলক ব্যবস্থা নেই। যদিও জাতীয় শিশু নীতিতে প্রত্যেকটি শিক্ষায়াতনে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য মানসম্পন্ন বিনোদন, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ[১২৮] এবং বেইজিং রুল্‌সে[১২৯] এ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত রুলসের ৩২ ও ৮১ ধারায়ও শিশু-কিশোরের সকল অধিকার বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৯। অবকাঠামোগত সমস্যা

যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে। অধিকাংশ ভবনই পুরোনো। আবার অনেক ভবন প্রতিষ্ঠার পর থেকে একবারও মেরামত করা হয়নি। এ উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), ১৯৯২ সালে নির্মিত হওয়ার পর আর কোন মেরামত করা হয়নি। বর্তমানে কোয়ার্টারসহ অন্যান্য ভবনগুলো মেরামত করা একান্ত প্রয়োজন। টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অবস্থাও প্রায় একই। এছাড়া পয়ঃনিষ্কাসন/ ড্রেনেজ সমস্যা দীর্ঘ দিনের, পানি নিষ্কাসনের ব্যবস্থা নেই। প্রতিষ্ঠানের বাহিরে বাড়ী-ঘর তৈরি হওয়ার কারণে পানির ড্রেনেজ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পানি সরবরাহের লাইনের পাইপ নতুনভাবে সংস্কার করা প্রয়োজন।

---

১২৮. বি. দ্রঃ *জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ*, ১৯৮৯ অনুচ্ছেদ: ৩১

১২৯. বি. দ্রঃ *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty,1990,* rules:32

১০। নিবাসীদের আবাসন সমস্যা

উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের মধ্যে বিশেষ করে টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) ও যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), এ দু'টি উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের আবাসন সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে এটি তাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এখানে নিবাসীদের থাকার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। টঙ্গী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে ৩০০ আসনের বিপরীতে নিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১০০০ হাজার। অন্যদিকে যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) এর সিট সংখ্যা ১৫০ জন। এর বিপরীতে এখানেও প্রায় দ্বিগুণ কখনও তার চেয়েও বেশি নিবাসী অবস্থান করে। বর্তমানে এখানে নিবাসীর সংখ্যা ২৬৯ জন। সিট সংকটের কারণে ২/৩ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন রুমে অবস্থান করছে ১০/১২ জন নিবাসী। তাদের থাকার জন্য পর্যাপ্ত খাট না থাকায় বর্তমানে এসব উঠিয়ে রাখা হয়েছে। সকল নিবাসী শিশু-কিশোর ফ্লোরে বিছানা পেতে ঘুমায়। এভাবে তারা আবাসন সমস্যার কারণে মানববেতনর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

১১। বয়সভেদে কোন বিভাজন নেই

অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোর সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য শিশু আইনে নিবাসীদের বয়সভিত্তিক আবাসন বিন্যস্ত করা জন্য বলা হয়েছে। ৯ (নয়) বৎসরের কোন শিশুর সাথে ১০ (দশ) বৎসরের এবং ১০ (দশ) বৎসরের ঊর্ধ্বের কোন শিশুর সাথে ১২ (বার) বৎসরের ঊর্ধ্বের শিশুকে একত্রে একই কক্ষে এবং ফ্লোরে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং ১২ (বার) বৎসর এবং তদুর্ধ্ব বয়সের বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা, শিশুর বাড়ন্ত শারীরিক কাঠামো, সবলতা, ইত্যাদি বিবেচনা করে তাদেরকে পৃথক পৃথক কক্ষে রাখার জন্য বলা হয়েছে।[১৩০] কিন্তু আইনে নিবাসীদের বয়সভিত্তিক বিভাজন থাকলেও এসকল কেন্দ্রে তা মানা হচ্ছে না; মূলত মানা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ নিবাসীদের সংখ্যা আসনের তুলনায় অধিক হওয়ায় এ বিধান পালন করা সম্ভব নয় বলে কর্তৃপক্ষ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ছোট ও বড় শিশুদের একত্রে রাখার ফলে ছোটদের মধ্যে বড় অপরাপধপ্রবণ শিশুদের মানসিকতা প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এটি বরং তাদের মানসিক উন্নয়নের পরিবর্তে চাপ বৃদ্ধি করছে।

উপরোক্ত সমস্যা ছাড়াও পরিবহণ সমস্যাসহ আরো নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো। তাই উল্লিখিত সমস্যাসমূহের আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন। তা নাহলে কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

১৩০. বি.দ্র: *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিশোর উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিশোর উন্নয়নে জাতীয় পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন

শিশু-কিশোরদের নিয়ে যথাযথ জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশল ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের চাবিকাঠি। কোন জাতি শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও উন্নয়নে সঠিক কর্মকৌশল গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কারণ আজকের যারা শিশু-কিশোর তারাই আগামী দিনে রাষ্ট্রের কর্ণধার। অতএব, শিশু-কিশোরদের উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুষ্ঠু ও যথাযথ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল থাকা বাঞ্ছনীয়। এদেশে সুখী, সমৃদ্ধ, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম সকল শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সংবিধানে অন্যান্য নাগরিকদের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চিয়তা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিধান প্রণয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, সুযোগের সমতা, অধিকার ও কর্তব্য এবং জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (Convention on the Rights of the Child, CRC,1989) -এ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থনকারী প্রথম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এর নির্দেশনা মেনে এদেশে ১৯৯৪ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়।

শিশু-কিশোরদের অধিকতর সুরক্ষা ও উন্নয়ন এবং গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিনকে ‘জাতীয় শিশু দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং ১৯৯৬ সালের জাতীয় শিশু নীতিকে যুগোপযোগী করণের মধ্য দিয়ে ২০১১ সালে সময়োপযোগী ও আধুনিক একটি শিশু নীতি ও ২০১৩ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিশু নীতি ও শিশু আইন বাংলাদেশের শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একটি সদূরপ্রসারী রূপকল্প। বর্তমান অধ্যায়ে শিশু-কিশোরদেরকে সৎ, দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় পরিকল্পনা, কর্মকৌশল ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হবে।

শিশু-কিশোরের জন্য জাতীয় পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

শিশুর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার সার্বিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই শুরু করা একান্ত আবশ্যক। শিশুর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার যত্নশীল ও সক্রিয় বলে দৃশ্যত অনুমেয়। সাম্প্রতিক সময়ে মানব সম্পদের উন্নয়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। শিশু ও মাতৃমুত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিশুর মৃত্যুহার হ্রাসে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে UN Millennium Award 2010 প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রসারিত টিকাদান কার্যক্রমের (EPI) আওতায় শতকরা ৮৭ ভাগ শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে যা সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা (MDG-3) পূরণ করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।[১]

শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দরিদ্রতা প্রধান অন্তরায়। বৃহৎ অংশের শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, নিরাপদ আশ্রয়, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। হতদরিদ্র ও ছিন্নমূল শিশুদের পুনর্বাসন, পর্যায়ক্রমে শিশুশ্রম নিরসন, শিশুদেরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার বন্ধ করা, তাদের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে শিক্ষা ও বিনোদনের উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম। ২০০৬ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্যান্য সকল শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে মৌলিক মানবাধিকার ভোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে; বাংলাদেশ সরকার এ সনদে অনুস্বাক্ষর করেছে। সনদে শিশুদের স্বার্থ বিবেচনায় প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিশু নির্যাতন বন্ধ করা, বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য এবং নির্যাতন বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা বিধান করা এর অন্যতম লক্ষ্য।[২]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্রিটিশ শাসনামলে Reformatory School Act, 1897 এর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে কিশোর অপরাধীর সংশোধন কার্যক্রম শুরু হয়। বৃটিশ শাসনের পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আমলে শিশু-কিশোরদের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কিছু জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শুরুর দিকে দেশের ১০টি জেলায় ভিন্নভাবে Probation of Offenders Project এবং After Care Service Project[৩]এই দু'টি প্রকল্প শুরু হয়। ১৯৬৫ সালে প্রকল্প দুটিকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রাণালয়ের অধীন একত্র করে

১. *জাতীয় শিশু নীতি*, ২০১১ (ঢাকা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ফেব্রুয়ারী ২০১১), পৃ. ৩
২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪
৩. Dr. Nahid Ferdousi, *Juvenile Justice System in Bangladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2012), p. 38

২১টি ইউনিটে বিভক্ত করে ২১ জেলার সদর দফতরে কার্যক্রম শুরু করে। এর পর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬৫-৭০) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের জন্য পৃথক কিশোর আদালত পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর ১৯৬৪ সালে Probation of Offenders Act, 1964 প্রণয়ন করা হয়।[৪]

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে শিশু কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য শিশু নীতি ও পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। এসময়ে বাংলাদেশের সংবিধানে শিশু সংবেদনশীল অধিকারসমূহ সংরক্ষণ করা, শিশু আইন ও জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন এবং কিশোর সংশোধনী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতা পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে কিশোর উন্নয়ন ও কিশোর সংশোধন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে ৪টি স্তরে ভাগ করা যায়। এই স্তরসমূহ হলো-

(ক) শিশু-কিশোরদের জন্য আইন প্রণয়ন;

(খ) সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা;

(গ) জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করা;

(ঘ) সাম্প্রতিক আইনী সংশোধন।

(ক) শিশু-কিশোরদের জন্য পৃথক আইন প্রণয়ন

পৃথিবীর অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচার ও সংশোধনের জন্য পৃথক আইন ও নীতিমালা রয়েছে। শিশু-কিশোরদের বয়স বিবেচনায় নিয়ে শিশু ও কিশোর অপরাধের বিচার ও সংশোধন করার জন্য এ ব্যবস্থা চালু হয়। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ এর আওতায় অধিকাংশ দেশেই কিশোর অপরাধের বিচার করার জন্য ভিন্ন আদালত ও বিচার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আমাদের বিদ্যমান আইনেও প্রাপ্তবয়স্ক আসামিদের সাথে একই আদালতে বা কার্যক্রমের মতো শিশুদের বিচার না করার বিধান আছে। আইনে শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচারের চেয়ে তাদের সংশোধনের বিষয়টিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই তাদের বিচারের প্রক্রিয়াটিও হতে হবে সংশোধনমূলক যেনো কিশোরদের হৃদয়ে তা কোনভাবেই বিরূপ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে। সে আলোকেই তাদেরকে পৃথক আইন ও পৃথক আদালতে বিচারের কথা এবং কিশোর সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনাতার পরে শিশুদের জন্য পৃথক আইন ও বিচার ব্যবস্থার সূচনা হয় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালে। এ বছর বাংলাদেশ “শিশু আইন ১৯৭৪”[৫] প্রণয়ন করা হয়, যা শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন ও সংশোধনের জন্য একটি মাইল ফলক। এর পর শিশু-কিশোরদের স্বার্থ রক্ষায় প্রণয়ন করা

---

৪. *Ibid*, p. 38

৫. *The Children Act,1974,* (Act.No.xxxix of 1974)

হয় জাতীয় শিশু নীতি, ১৯৭৬।[৬] ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং ১৯৭৬ সালের জাতীয় শিশু নীতিই শিশু-কিশোরদের বিচার, সংশোধন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আইন ও বিধি। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের মূলনীতি ছিল কিশোর অপরাধীদের শাস্তির পরিবর্তে সুরক্ষা ও উন্নয়ন করে তাদের স্বাভাবিক সামাজিক জীবন ফিরিয়ে দেওয়া।[৭] এর পর থেকে বিভিন্ন আইনে শিশু অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আইন ১৯৭৪ সালের শিশু আইনটিই। এই শিশু আইনটি পূর্বেকার সকল আইন যেমন, Reformatory School Act, 1897 the Bengal Children Act,1922 প্রভৃতি আইন একত্রীকরণ করে ১৬ বছরের নিচে কিশোর অপরাধীদের নিরাপদ হেফাজত, সুরক্ষা এবং তাদের জীবনের সকল স্তরে সকল ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকার বিস্তৃত সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই আইনে পৃথকভাবে শিশু আদালত স্থাপন, বয়স্ক অপরাধীর সাথে একত্রে অপরাধ করলেও শিশু-কিশোর অপরাধীকে বয়স্ক অপরাধীর সাথে একত্রে বিচার নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের সকল নীতি যথাযথভাবে অনুশীলন ও বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৬ সালে জাতীয় শিশু নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতিমালায় প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়ন প্রদান পদ্ধতি, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, নিবাসীদের পর্যবেক্ষণ এবং প্রবেশন কর্মকর্তার ক্ষমতা ও দায়িত্ব-কর্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে।[৮]

শিশু আইন ও জাতীয় শিশু নীতি ছাড়াও অন্যান্য আইনের নির্দিষ্ট কিছু বিধান সুনির্দিষ্টভাবে কিশোরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। সর্বপ্রথমে শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশর সংবিধানে কল্যাণ ও সামাজিক বিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[৯] এছাড়া অন্যান্য আইন যেমন, Special Powers Act, 1974; The Arms Act,1887; Women and Children Repression Prevention Act, 2000 (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০) প্রভৃতি পাস করা হয়েছে। এসব আইনে পুলিশকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্যক্রমের সন্দেহভাজন হিসেবে কিশোরকে গ্রেফতার এবং নারী ও শিশু নিযাতনের মত জঘন্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। একইভাবে অন্যান্য দণ্ডবিধির ন্যায় ছয়টি মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনে (যেমন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন ১৯৭৬; চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন ১৯৭৮; খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন ১৯৮৫; রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন ১৯৯২; সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন ২০০৬ এবং বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ আইন ২০০৬) কিশোর অপরাধ যেমন, ইভটিজিং, রাত্রিকালীন সন্দেহজনক পরিস্থিতি প্রভৃতি অবস্থায় বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশকে গ্রেফতার করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।[১০]

---

৬. *The Children Rules 1976,* (Rules No. S.R.O.103-L76)
৭. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid,* p. 39
৮. *The Children Rules 1976,* Rules-3,4,6,8,9 and 21
৯. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আইন,বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৭২), অনুচ্ছেদ: ২৭,২৮ এবং ৩১
১০. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid,* p. 40

(খ) সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা

বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অপরাধপ্রবণ বা অপরাধী কিশোর-কিশোরীর সংশোধন, শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন সাধনের জন্য একাধিক কিশোর সংশোধনী বা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার মাধ্যমে সরকার সকল শিশু-কিশোরের সাথে অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়া কিশোরদেরকেও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনে স্বাভাবিক বিকাশ সাধন ও পুণর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত তিনটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র (কিউক) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এগুলো হলো কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর, ১৯৭৮; কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর, ১৯৯৫ এবং সর্বশেষ কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর, ২০০৩। একজন কিশোর যে কোন ধরনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন অনুসারে তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। শিশু আইন, ২০১৩ ও প্রবেশন অব অফেন্ডার্স অর্ডিনেন্স, ১৯৬০ -এর অধীনে এ উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হয়। এসকল কেন্দ্রে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়া শিশু-কিশোরদের কেইস ওয়ার্ক, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন, ডাইভারসন ইত্যাদি স্বীকৃত পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন করে শিশুর অধিকার বাস্তবায়ন করে আসছে।

সংশোধন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিশু আইন, ১৯৭৪ -এর প্রেক্ষাপটে (গাজীপুরে) টঙ্গীতে কিশোর আদালত, রিমান্ড হোম নিয়ে একটি সংশোধনী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। বিচার, নিরাপদ হেফাজত ও সংশোধনী কার্যক্রম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালনা করার লক্ষ্যে এই কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হয় ১৯৭৮ সালে। দেশে আরো দু'টি অনুরূপ সংশোধনী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়, এর একটি প্রতিষ্ঠিত হয় যশোরে বালক নিবাসীদের জন্য আর বালিকা নিবাসীদের জন্য গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এছাড়া The Assoiciation for Correction Social Reclamation (ACSR) এবং Bangladesh Retried Police Officers Association তার Assistance Plan for Juvenile Delinquent (APJD) -এর আওতায় সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। Human Nursery for Development (HND) নামক প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেশ কিছু এনজিও সংশোধনী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১১]

(গ) জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন করা

জাতীয় পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ের আলোচনাকে আমরা দু'টি ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করতে পারি। একটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চুক্তি ও দায়বদ্ধতার দিক থেকে এবং দ্বিতীয়ত, এরই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে শিশু সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা, আইন ও নীতিমালার গঠন। নিম্নে এসম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হলো-

---

১১. আবদুল হাকিম সরকার, *অপরাধবিজ্ঞান তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* (ঢাকা: কল্লোল প্রকাশনী, মে ২০০৫খ্রি.), পৃ. ২৫২-২৫৩

(১) আন্তর্জাতিক চুক্তি ও দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) এবং ২০০৭ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক সনদ অনুমোদ করে। অনুমোদনের দিক থেকে বাংলাদেশ ছিল বিশ্বের প্রথম দিকের দেশসমুহের অন্যতম। সামগ্রিকভাবে শিশুদের এবং সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্র এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে এ দু'টি চুক্তির বিশেষ অবদান রয়েছে। চুক্তি দু'টিতে শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং তাদের বঞ্চনা ও সহিংসতা নিরসনে আন্ত:রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে অনুস্বাক্ষর করেছে। United Nations Convention on the Rights of the Child, (CRC), 1989 দলীলের ৪ নং অনুচ্ছেদ এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ অনুচ্ছেদে জাতীয় বাজেটে শিশুদের জন্য বরাদ্দ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপক্ষসমূহ এই কনভেনশনে স্বীকৃত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নে প্রশাসনিক, আইনগত ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষণে অংশীদেশগুলো তাদের সামর্থ্যের নিরিখে সর্বোচ্চ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া বাংলাদেশ শিশু-কিশোর বিভিন্ন ধরনের অধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক নীতি, রুলস এবং গাইডলাইনের অনুসমর্থন ও অনুস্বাক্ষরকারী। তন্মধ্যে কতিপয় আন্তর্জাতিক নীতি হলো:

১। Standard Minimum Rules for the treatment of Prisoners, 1955. এখানে অল্পবয়স্ক বন্দিদের বয়স্কদের থেকে পৃথক রাখা এবং কতগুলো সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২। International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966. এই কনভ্যান্টে ১৮ বছরের কম বয়স্ক অপরাধীদেরকে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধকরণ এবং তাদের বিচারের ক্ষেত্রে বিশেষ বিচার পদ্ধতি (শিশু আদালত) অনুসরণের উপর জোর দেওয়া হয়।

এই দলীলসমূহে অন্যদের সাথে শিশু-কিশোরদের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া শুধুমাত্র শিশুদেরকে কেন্দ্র করে যেসব আন্তর্জাতিক দলিলসমূহ রয়েছে তাহলো:

১। United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC), 1989

২। United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justic, 1985 (এটিকে বেইজিং রুলস বলা হয়)।

৩। United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, 1990

৪। United Nations Guidences for the Prevention of Juvenile Delinquency (এটিকে রিয়াদ গাইড লাইন বলা হয়)।

শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে প্রণীত আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নীতিমালা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসকল আন্তর্জাতিক চুক্তি ও নীতিমালা শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয় আইনী কাঠামোর আওতার মধ্যেই শিশু-কেন্দ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অনুসৃত ব্যবস্থা এ ধরনের রূপরেখা প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে।

(২) শিশু সংক্রান্ত পরিকল্পনা, আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রদত্ত শিশু অধিকার রক্ষায় এবং জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু-কিশোরদের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করে। এসকল পরিকল্পনা ও নীতিমালার মধ্যে National Programme of Action (NPA) of Frist NPA (1973-1978); Second NPA (1980-1985); Third NPA (1985-1990); Fourth NPA (1990-1995); Fifth NPA (1997-2002); Sixth NPA (2011-2015); Seventh NPA (2016-2020) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও নীদিমালায় শিশু-কিশোরদের সামগ্রিক সুরক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উপরন্তু ১৯৯২ সাল থেকে কিশোর উন্নয়ন ও সংশোধন ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল করার জন্য সরকার কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কাউন্সিল এবং জাতীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। মূলত এসময় থেকেই শিশু-কিশোরের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নয়নের বিষয় আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।[১২]

শিশু-কিশোর অধিকার রক্ষায় এবং সকল ক্ষেত্রে তাদের সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৯৪ সালে একটি জাতীয় শিশু নীতি (National Child Policy,1994) প্রণয়ন করে এবং ১৯৯৫ সালে জাতীয় শিশু পরিষদ (National Council for Children 1995) গঠন করে। ২০০২ সালে Inter-Ministerial Committee on Improving the Condition of Children Confined in Jails নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি হাজতে শিশু-কিশোর অপরাধীর অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেন। এছাড়া একজন কিশোর অপরাধীকে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলোকে তুলে ধরার জন্য এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনের জন্য ২০০৩ সালে একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই টাস্কফোর্স নিয়মিতভাবে কাজ করেছে। এসময় তারা অপরাধী কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই জাতীয় টাস্কফোর্স অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে

---

১২. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid*, p. 41

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে আর কোন মূখ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের দৃশ্যমান পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি। অদ্যাবধি এ ব্যাপারে একই অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানা যায়।

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কিশোর নিবাসীদের উন্নয়নের জন্য সরকার ২০০৫ সালে জাতীয় সমাজ কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়ন করে। এছাড়া জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১; জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি, ২০০৫; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০; এবং শ্রম আইন, ২০০৬ সহ আরো অনেক জাতীয় পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল এবং নীতিমালায় শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি অপরাধপ্রবণ বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাছাড়া, বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার কয়েকটি শিশু সহায়ক আইন ও নীতি গ্রহণ করেছে, যার চুম্বক অংশ (বক্স-১)-এ প্রদান করা হলো:

সারণী-৬৭: বাংলাদেশে শিশু-কিশোর সংক্রান্ত আইনী কাঠামো

ক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষায় বাংলাদেশের সংবিধানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৭ শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদটি হলো নিম্নরূপ:

রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

এছাড়া অনুচ্ছেদ ২৮(৪) এ শিশুরা যেন কোন ধরনের বঞ্চনার শিকার না হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে: নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবে না।

খ। শিশু আইন, ২০১৩

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়ন, শিশু সুরক্ষা এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত বিধান সংযোজন করে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দেশের শিশুদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনী পদক্ষেপ। এ আইনের বিশেষ দিকগুলো হলো:

- সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জাতীয়, জেলা এবং উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন;
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ, প্রত্যেক থানায় শিশু বিষয়ক ডেস্ক গঠন ও শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নির্ধারণ, শিশু আদালত গঠন, তদন্ত, বিচার, আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন, উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিকল্প পরিচর্চা (alternative care) বিধান ইত্যাদি।

গ। জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জাতিসংঘের United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) -

এ বিধৃত অঙ্গিকারের আলোকে জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণীত হয়েছে। এ নীতির ১৪ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়:

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশুদের উন্নয়ন একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এ প্রেক্ষিতে সকল দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন ও শিশু উন্নয়নের বিষয়সমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।[১৩]

ঘ। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা -ষষ্ঠ (২০১১-২০১৫) এবং সপ্তম (২০১৬-২০২০) গৃহীত হয়। তিনটি বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আবর্তন হয়েছে তন্মধ্যে সর্বপ্রথম হলো:

- জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃজন, এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসন;

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অর্জনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ প্রয়োজন। এপরিকল্পনায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন দক্ষ ও অধিকতর উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনার অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সপ্তম পঞ্চপরিকল্পনার অধীনে যে ১০টি বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় তন্মধ্যে শিশু-কিশোরের উন্নয়ন ও মানবসম্পদে রূপান্তর অন্যতম। যেমন, (ঙ নং লক্ষ্যমাত্রা) মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা)। এতে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো:

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তির লক্ষ্য অর্জন;
- পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থী ধরে রাখার হার বর্তমান ৮০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগে বৃদ্ধি;
- ৫ বছরের নিম্নে মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে ৩৭ জনে নামিয়ে আনা;
- প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত প্রতি ১০০০০০ জীবিত জন্মে ১০৫ জনে নামিয়ে আনতে হবে ইত্যাদি।[১৪]

এছাড়া সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন কাজের পরিমাণগত ফলাফল পরিমাপের জন্য মূল, সামষ্টিক ও খাত ভিত্তিক পর্যায়ের কর্মসূচী পরিবীক্ষণ করা হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য ১৩ টি খাতের মোট ৮৮টি নির্দেশক সমবায়ে উন্নয়ন ফলাফল কাঠামো (ডিআরএফ) গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে শিশু-কিশোরের সুরক্ষা, উন্নয়ন এবং দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের জন্য সরাসরি তিনটি খাত রয়েছে। যেমন, খাত ১০: স্বাস্থ্য; খাত ১১: শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং খাত ১২: বিনোদন, সংস্কৃতি ও ধর্ম।[১৫]

এছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ: ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪১ -এ শিশু-কিশোরসহ সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ: ১১, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ও ২৮(৪) -এ সকল শিশু-কিশোরের শিক্ষাসহ সকল মৌলিক প্রয়োজন ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে তাদের অধিকারে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

১৩. *জাতীয় শিশু নীতি ২০১১*, অনুচ্ছেদ: ১৪

১৪. *৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/১৬-২০১৯/২০*, অক্টোবর-২০১৬, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. xxiii

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. xxv-xxix

(ঘ) সাম্প্রতিক আইনী সংশোধন

২০০০ সালের পরে এসে শিশু-কিশোর সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালায় তাৎপর্যপূর্ণ কিছু পরিবর্তন ও সংশোধন সাধিত হয়। ২০০৩ সালের বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোট ডিভিশনের কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রায় এবং ১৯৭৪ সালের শিশু আইন বাস্তবায়নের জন্য সুয়োমোটো অর্ডাও (Suo Moto Order)[১৬]-এর মাধ্যমে কিছু নির্দেশনা প্রদান করে। এ সকল আইনী নির্দের্শনা বাংলাদেশের অপরাধী কিশোরের উন্নয়নে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। ২০০৪ সালে সরকার ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি (The Penal Code,1860) ধারা-৮২ ও ৮৩ পরিবর্তন করে অপরাধের দায়-দায়িত্বের নিম্নতম বয়স ৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ৯ বছরে উন্নীত করে।[১৭] একই বছরে জন্ম এবং মৃত্যু নিবন্ধন আইন ১৮৭৩ বাতিল করে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ পাশ করা হয়। এই আইনের ১(২) অনুচ্ছেদটি পুনরায় ২০০৬ সালে সংশোধন করা হয়। এই আইনে সকলের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে জন্মনিবন্ধন ও মৃত্যু রেজিস্ট্রারের বিধান রাখা হয় এবং জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান আবশ্যিক করা হয়।[১৮] বিশেষ করে, এই আইন জন্মনিবন্ধনের সেকেলে আইন ও নীতির পরিবর্তে নিয়ামক হিসেবে আর্বিভূত হয় এবং বাংলাদেশে নিবন্ধনের কষ্টকর পদ্ধতি দূরীভূত হয়। এই আইন অনুসারে ৩ জুলাই ২০০৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং বিনামূল্যে করা হয়, যা কিশোরদের অধিকার রক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে United Nations Convention on the Rights of the Child,1989 (CRC)-এ বর্ণিত শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষার জন্য জন্মনিবন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্থানীয়ভাবে কোন শিশু-কেন্দ্রিক উন্নয়ন কর্মসূচী যথার্থভাবে পরিকল্পিত হবে না যদি না সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সহজলভ্য হয়। একইভাবে শিশু নির্যাতনের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য অপরাধীর বয়স নিরুপণ করা জরুরী।[১৯] তাই শিশু ও বয়স্ক উভয়ের জন্মনিবন্ধনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নতুনভাবে ২০০৬ সালের জুলাই মাসে "Universal Birth Registration Strategy,2006" নামে সর্বজনীন জন্মনিবন্ধন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।[২০] ২০০৮ সালে সরকার জন্মনিবন্ধন কার্যক্রমকে নিশ্চিত করে, যা শিশুর বয়স নির্ণয়ে জন্য একটি কার্যকরী পদক্ষেপ।

বর্তমানে, সরকার অপরাধপ্রবণ কিশোর বা কিশোর অপরাধীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের কল্যাণকর কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নীতিগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০০৬ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৭৪ সালের শিশু আইন ও ১৯৭৬ সালের শিশু নীতি সংশোধন করার জন্য একটি কমিটি

---

১৬. Suo Moto Order no. 2480 of 2003, 11 BLT 2003 HCD 281
১৭. *The Penal Code* (Amendment) Act,2004, (Act No.XLV of 2004)
১৮. Shahnaz Huda , *A Child of One's Own* (Dhaka: Bangladesh Shishu Adhikar Forum, 2008), p.38
১৯. ১৯. Kamal Siddiqui, *Better Days Better Lives: Towards A Strategy for Implementation on the Rights of the Child in Bangladesh* (Dhaka: The University Press Limited, 2001), p.64
২০. ড. নাহিদ ফেরদৌসি, "জন্ম নিবন্ধনের আইনগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপট: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ", *ইসলামী আইন ও বিচার ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা* (ঢাকা: ইসলামি ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ, সংখ্যা-১৮, এপ্রিল-জুন, ২০০৯), পৃ. ৯৭

গঠন করে। উক্ত কমিটি শিশু সংশ্লিষ্ট আইনের বিভিন্ন পুনর্বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রদান করে। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার ১৯৭৪ সালের শিশু আইন সংশোধনের প্রস্তাব আনে এবং প্রস্তাবিত খসড়া আইনের নাম দেওয়া হয় 'শিশু আইন, ২০১০'। খসড়া শিশু আইন আরো পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর ২০১৩ সালের আগষ্ট মাসে এই আইনটি সংসদে পাশ করা হয় এবং এর নামকরণ করা হয় "শিশু আইন, ২০১৩"।

আইনের উপরোক্ত পরিবর্তনের ফলে কিশোর-কিশোরী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় আইনে সমানভাবে আচরণ পাবার অধিকার পায়। এছাড়াও সরকার ১০ নভেম্বর ২০১০ সাল থেকে দণ্ডবিধি ১৮৬০ -তে ৫০৯ ধারা যুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতনের দ্রুত বিচার পরিচালনা করার জন্য 'Mobile Court Ordinance, 2007'-এর অধীন মোবাইল কোর্টকে ক্ষমতা প্রদান করে।[২১] অধিকন্ত, 'জাতীয় শিশু নীতি ২০১১'; স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা সেক্টরের কৌশলগত বিনিয়োগ (HNPSIP) পরিকল্পনা ২০১৭-২০২২; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩ প্রণয়ন করে শিশু-কিশোরের অধিকার সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। এই আইন ও নীতিসমূহে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, অপরাধপ্রবণ বা অপরাধী শিশু-কিশোরদেরকে অন্যান্য অপরাধীর মত দেখা যাবে না এবং তাদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে শিশু আইনের অধীন হতে হবে। এজন্য দেশের সকল জেলায় একটি করে শিশু আদালত স্থাপনের কথা জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২]

সাধারণত শারীরিক দুর্বলতা ও মানসিক অপরিপক্কতার কারণে শিশু-কিশোর সমাজে সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত থাকে। একারণেই তারা সাধারণত পিতা-মাতা এবং নিকটজনদের প্রতি বেশি নির্ভরশীল হয়। তাই তাদের স্বার্থ রক্ষায় সমাজ রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হয়। অন্যদিকে এই শিশু-কিশোরই আবার সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভবিষ্যৎ সমাজ বিনির্মাণের কর্ণধার। একারণে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে শিশু-কিশোরের সার্বিক অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এসকল জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে শিশু অধিকার ও কিশোর অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ার উপর ৩৫ টি আইন এবং শুধু কিশোর অপরাধের উপর ২০টি আইন ও নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে।[২৩] এখন আমাদের সামনে মূল চ্যালেঞ্জ হলো সরকারের এসকল জাতীয় পরিকল্পনা, আইন, নীতি বাস্তবায়নে আমরা কতটুকু সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছি -সেটি।

---

২১. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid,* p. 43
২২. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ১৫,১৬,৪৪
২৩. Dr. Nahid Ferdousi, *ibid,* p. 45

শিশু-কিশোরদের সুরক্ষায় জাতীয় পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের সামগ্রিক সুরক্ষা নির্ধারিত হয় মূলত পিতামাতার সিদ্ধান্তে। পিতা-মাতা বাল্যকাল থেকে সাবালকত্ব পর্যন্ত শিশু-কিশোরের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন। এই সব মৌলিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে পিতা-মাতা ব্যর্থ হলে সরকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, জীবনধারণের মৌলিক উপাদান যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং বেকারত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা থেকে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন অথবা বিধবা, এতিম ও বয়স্কদের সহায়তা করা সরকারের মৌলিক দায়িত্ব। বাংলাদেশ সরকার শিশু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সনদ ও চুক্তি এবং সংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নকল্পে শিশু-কিশোরদের সার্বিক উন্নয়নের কার্যক্রমকে ১৩টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে বণ্টন করা হয়েছে। এ সকল মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প/ কর্মসূচী/কার্যক্রমকে জাতিসংঘ ঘোষিত শিশু-কিশোরের চারটি অধিকার গুচ্ছ, যথা- টিকে থাকার অধিকার, উন্নয়নের অধিকার, সুরক্ষার অধিকার এবং আশ্রয় গ্রহণের অধিকার-ইত্যাদিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গুচ্ছের অধীনে প্রকল্প/কর্মসূচী/কার্যক্রমগুলোকে বিষয়ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে। নিচের সারণি-৬৮ এ প্রতিটি অধিকারগুচ্ছের বিপরীতে বিষয়ভিত্তিক সাব-গ্রুপিং, সংবিধান, শিশু আইন, শিশু নীতি জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ (CRC) প্রভৃতির ধারা উল্লেখপূর্বক তার সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণীতে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত শিশু অধিকারগুচ্ছের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের শিশু কল্যাণ মাত্রা দেখানো হলো-

সারণী-৬৮: শিশু কল্যাণ মাত্রা (জাতিসংঘের শিশু অধিকারগুচ্ছের ভিত্তিতে)[২৪]

অধিকারগুচ্ছের শ্রেণিবিন্যাস	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস	বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট আইনী বিধান	CRC এর সংশ্লিষ্ট ধারা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১. টিকে থাকার অধিকার				
	খাদ্য, পুষ্টি	সংবিধানের ধারা-১৫; শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ-৬.২	CRC ধারা ২৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	পানি	সংবিধানের ধারা-১৫;	CRC ধারা ২৪	স্থানীয় সরকার
	স্বাস্থ্যসেবা	সংবিধানের ধারা-১৫; শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ-৬.১/৬.২/৬.৩	CRC ধারা ২৪	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
	আশ্রয়, বাসস্থান	সংবিধানের ধারা-১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৮৪/৮৫	CRC ধারা ২৭	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত; ভূমি মন্ত্রণালয়
	পরিবেশ দূষণ	সংবিধানের ধারা-১৮(ক); শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ-৬.১২	CRC ধারা ২৪	পরিবেশ ও বন; স্থানীয় সরকার বিভাগ

২৪. *বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ*, শিশু বাজেট ২০১৭-২০১৮, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১৬-১৭

২. উন্নয়নের অধিকার				
	শিক্ষা	সংবিধানের ধারা-১৫, ১৭ শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ- ৬.২/৬.৪/ ৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা; শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	অবসর বিনোদন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড	সংবিধানের ধারা-১৫; শিশু আইন: অনুচ্ছেদ- ৬.৫/৬.৬	CRC ধারা ৩১	নারী ও শিশু বিষয়ক; যুব ও ক্রীড়া; সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	তথ্য	শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ- ৬.৫	CRC ধারা ১৩, ১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়
৩. সুরক্ষার অধিকার				
	শোষণ, শিশু শ্রম	শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ- ৯ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, অনুচ্ছেদ-৩৪, ৩৫	CRC ধারা ৩২	শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়
	নির্যাত ও বৈষম্য থেকে সুরক্ষা	সংবিধানের ধারা-২৮ শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৬.৯, ১৩, ১৪ শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ- ৬.৭	CRC ধারা ৩৩, ৩৬	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতা	শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৬.৯ শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ- ৬.৭	CRC ধারা ১৯, ৩৭	স্বরাষ্ট্র; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
	বিদ্যালয়ে সহিংসতা	শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ-৬.৫	CRC ধারা ২৮	প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা; শিক্ষা মন্ত্রণালয়
	সামাজিক নিরাপত্তা	সংবিধানের ধারা-২৮ শিশু আইন: অনুচ্ছেদ-৮৪ শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ-৬.২/৬.১২	CRC ধারা ১৬, ২৬, ২৭	সমাজ কল্যাণ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪. অংশগ্রহণের অধিকার				
	জন্ম নিবন্ধন, জাতীয়তা	জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪: অনুচ্ছেদ-১৮; শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ- ৬.১০	CRC ধারা ৭,৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ
	তথ্য	সংবিধানের ধারা-৩৯ শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ- ৬.৫	CRC ধারা ১৩, ১৭	তথ্য মন্ত্রণালয়
	মত প্রকাশের অধিকার, মতামত শোনা; সংগঠনের অধিকার	সংবিধানের ধারা-৩৮,৩৯ শিশু নীতি: অনুচ্ছেদ- ৬.১৩	CRC ধারা ১২-১৫	তথ্য মন্ত্রণালয়; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, উন্নয়ন, সুরক্ষা এবং অধিকার ও কল্যাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে উল্লিখিত প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রয়েছে। এসকল মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়নকৃত ও পরিকল্পনাধীন কার্যক্রমের বাস্তব চিত্র অনুধাবনের জন্য নিম্নে ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রম উপস্থাপন করা হলো:

সারণী-৬৯: সামগ্রিক শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বাজেট[২৫]

	মন্ত্রণালয়ের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		মন্ত্রণালয় বাজেটে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের অংশ (%)	
	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২০.২৩	১৭৭.৯৮	২১৮.৭১	১৭৬.৯১	৯৯.৩১	৯৯.৪০
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৫২.৭১	৪৭.৫৬	৩৮.৪৩	৩৩.৮২	৭২.৯১	৭১.১১
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ	২৩১.৪৮	২১৭.১০	১৫৪.৫৫	১৪৪.৬১	৬৬.৭৭	৬৬.৬১
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৪৪.৭৬	-	১৭.৪৯	-	৩৯.০৫	-
স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১৬২.০৩	১৪৮.৫৮	৬৩.০২	৩৯.৯৯	৩৮.৮৯	
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৫.৭৬	২১.৭৪	৯.২৪	৮.২৯	৩৫.৮৭	৩৮.২৪
দুর্যোগব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৮৮.৫৩	৮৯.৪৭	২৪.৭২	২৫.৮৮	২৭.৯১	২৮.৯৩
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪৮.৩৪	৪১.৪০	১০.৪২	৮.৫৭	২১.৫৬	২০.৭০
স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়	২৪৬.৭৪	২২২.৫৩	১৬.৪৩	১৬.৮২	৬.৬৬	৭.৫৬
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.৬৩	২.৯০	০.১৭	০.২৬	৬.৮৪	৮.৯৭
জননিরাপত্তা বিভাগ	১৮২.৮৮	১৬৭.৮৩	৫.২১	৪.৭৭	২.৮৫	২.৮৪
তথ্য মন্ত্রণালয়	১১.৪৬	৮.৩৩	০.১০	০.১৪	০.৭৯	১.৬৮
আইন ও বিচার বিভাগ	১৪.২৪	১৪.২৭	০.১০	০.১১	০.৭০	০.৭৭
সর্বমোট (নিবাচিত ১৩টি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ)	১৩৩১.৮০	১১৫৯.৭০	৫৫৮.৬০	৪৬০.২০	৪১.৯০	৩৯.৭০

২০১৬-১৭ এর সংশোধিত বাজেটের সাথে তুলনা করলে ২০১৭-১৮ সালে নির্বাচত ১৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বেড়েছে ১৪.৮ শতাংশ। একই সময়ে শিশু-কেন্দ্রিক বাজেট ৪৬ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৬ হাজার কোটি টাকায়, প্রবৃদ্ধি হিসেবে যা ২১.৪ শতাংশ। যেহেতু মন্ত্রণালয়গুলোর সার্বিক বরাদ্দের প্রবৃদ্ধির চেয়ে শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রমের বরাদ্দের প্রবৃদ্ধি বেশি, তাই বুঝা যাচ্ছে যে, শিশু-কেন্দ্রিক প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রচেষ্টা বিগত বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। মন্ত্রণালয় ভিত্তিক শিশুসংবেদনশীল কার্যক্রম এবং শিশুদের উপর এর প্রভাব নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো:

১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। যার মোট ব্যয়ের ৯৯.৩১ শতাংশই শিশুকল্যাণের জন্য নিবেদিত। সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করা যেমন রাষ্ট্রের

২৫. *বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ*, শিশু বাজেট ২০১৭-২০১৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নয়ন ও তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এর বাইরেও এ মন্ত্রণালয় বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যা সরাসরি শিশুদের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে রয়েছে, 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট' পরিচালনা, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন, শিশু কল্যাণ ট্রাস্টকে অনুদান প্রদান ইত্যাদি।[২৬] একাজে মন্ত্রণালয়ের রয়েছে বিভিন্ন নীতি, কৌশল, আইনী কাঠামো এবং মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তরগুলোর সমন্বয়ে একটি কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো। এ অংশে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় শিশু কল্যাণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, নীতি ও অগ্রাধিকার আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ:

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল কর্মপরিধি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৭ এর সাথে সম্পর্কিত। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:[২৭]

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০ শিক্ষা বিষয়ে সরকারের রূপকল্প জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০ এ বিস্তারিতভাবে বিধৃত রয়েছে। 'সকলের জন্য শিক্ষা' বাস্তবয়নে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের বিষয়টি এ নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতির মূলভিত্তি	জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০ এ প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ: • মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা; • কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচী সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা; • সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তর চালু করার মাধ্যমে শিশুদের মেধা ও মননের বিকাশ সাধন করা; • প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর থেকে ৮ বছর করা; • সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুবিধাবঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এ শিক্ষা নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার সকল দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সবার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য সরকার ধীরে ধীরে সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য

২৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০
২৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

	প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদকাল ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৮ বছর করা হয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় আধুনিক পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি, ২০০৬	সরকার ২০০৬ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে, যার মূল উদ্দেশ্য হল দেশের নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করে সকলকে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করা। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা যারা কর্মস্থলে যোগ দিয়েছে, তাদের শিক্ষার জন্য দ্বিতীয় সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়াই এ নীতির মূল উদ্দেশ্য।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার বৃদ্ধি	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যগুলো সন্নিবেশিত আছে: ● স্কুলসমূহে পাঠদান ও শিক্ষণ পদ্ধতি উন্নয়ন; ● সমাজের অসাম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা; ● প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তির লক্ষ্য অর্জন; ● পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষার্থী ধরে রাখার হার বর্তমান ৮০ শতাংশ থেকে ১০০ ভাগে বৃদ্ধি; জাতীয় শিক্ষা নীতিকে অনুসরণ করে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা সম্পূর্ণভাবে দূর করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ নির্ধারণ করেছে: ● শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন; ● নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের মেরামত, পুন:নির্মাণ ও সংস্কার সাধন; ● স্কুল টিফিন কার্যক্রম চালুকরণ; ● সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ;

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের কৌশলগত উদ্দেশ্য

- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ;
- প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন;
- সাক্ষরতার হার বাড়ানো।

নিম্নোক্ত সারণীতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল উপস্থাপন করা হলো-

সারণী-৭০: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মকৃতি নির্দেশক ও ফলাফল[২৮]

কর্মকৃতি নির্দেশক	কর্মকৃতি নির্দেশনার মান	
	২০১০	২০১৫
গ্রস স্কুল ভর্তির হার (%)	১০৭.৭	১০৮
নিট ভর্তির হার (%)	৯৪	৯৮
শিক্ষা সমাপনের হার (%)	৯৪	৯৮
৫ম শ্রেণি হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তরণের হার (%)	৫৫	৮০
শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত	১: ৪৯	১: ৪০

২। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০১৬ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগের কার্যক্রমগুলো শিশুদের উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এ বিভাগ অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে দেশব্যাপী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং মাদ্রাসা পরিচালনা করে। উপরন্তু, এ বিভাগ ছাত্র এবং শিক্ষদের উপবৃত্তি ও প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এ বিভাগের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ:

- কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি ও কার্যক্রম প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিনামূল্যে প্রদত্ত পাঠ্য বই বিতরণে সহায়তাকরণ;
- তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সামগ্রী বিতরণ।

৩। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

এটিও সরকারের নতুন প্রতিষ্ঠিত একটি বিভাগ। এই বিভাগেরও শিশুদের উন্নয়নের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট শিশু-সংবেদনশীল অনেকগুলো কার্যক্রম রয়েছে। এ বিভাগের মূল ম্যান্ডেট হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায় পর্যন্ত মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা, যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশে রয়েছে শিশু-কিশোর। এ বিভাগের বাজেটে

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

মোট ব্যয়ের ৬৬.৭৭ শতাংশ শিশু সংবেদনশীল। এই বিভাগ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে বই এবং অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে, দেশব্যাপী 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ' কার্যক্রম পরিচালনা করে, বাংলাদেশ স্কাউটস এবং বাংলাদেশ গার্লসগাইড এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় স্কুল শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কাউটিং-কে উৎসাহিত করে। মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিচালনা-ইত্যাদি কাজ এ বিভাগ পরিচালনা করে। এছাড়া সে সকল সংস্থায় অনুদান প্রদান করে যা শিশুদের শিক্ষা, বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের উন্নয়নের অধিকারকে ত্বরান্বিত করে। মাধ্যমিক শিক্ষার সুবিধা এবং গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এরমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো "ন্যাশনাল একাডেমী ফর অটিজম এন্ড নিউরোডেভেলপমেন্ট ডিজএ্যাবিলিটি" প্রতিষ্ঠা, যা প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি সরকারের দৃঢ় অঙ্গিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ: মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ[২৯] সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০	জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১০ এ মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ: • শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা; • কর্মজগতে অংশগ্রহণের জন্য একটি পর্যায়ের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা; • বিভিন্ন রকমের মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো; জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলো নিম্নরূপ: • বিভিন্ন কারণে কম সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূর করা; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ১:৩০ এ উন্নীত করা; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করা; • মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতেই জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ: • মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করা;

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২-৪৩

নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অর্জনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ প্রয়োজন। এ পরিকল্পনায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন দক্ষ ও অধিকতর উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	• মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ানো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন। **কৌশলসমূহ:** • সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন; • শিক্ষাদানের মান উন্নীতকরণ; • যথাসম্ভব নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদান; • শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির মধ্যকার পার্থক্য কমিয়ে আনা; • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বাড়ানো; • ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানো; • নারী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান; • শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য কমানো।
মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রাধিকারসমূহ	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ নিম্নবর্ণিত অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছে: • গুণগত মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষায় সকলের সুযোগ বৃদ্ধি করা; • শিক্ষার সকল স্তরে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা; • শিক্ষা ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক সক্ষমতা বাড়ানো; • মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান; • বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা	• ২০৩০ সালের মধ্যে সকল বালক-বালিকার সমতা-ভিত্তিক গুণগতমান সম্পন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করা; • ২০৩০ সালের মধ্যে সকল যুবক ও যুবমহিলাসহ প্রায় অধিকাংশ নারী-পুরুষকে সাক্ষরতায় আওতায় আনা; • ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীকে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করা; • সকলের জন্য একটি নিরাপদ, অহিংস অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিশু, প্রতিবন্ধী এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করা; • ২০২০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে স্বল্প উন্নত দেশসমূহের জন্য শিক্ষা বৃত্তি পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা; • ২০৩০ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শিক্ষকের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা।

৪। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

শিশু-কিশোর কল্যাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর মধ্যে একটি হলো তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এটি তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কেও সম্প্রতি দু'টি বিভাগে বিভক্ত করে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ নামে আলাদা দু'টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মধ্যে, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে। এ বিভাগের স্বাস্থ্য শিক্ষা অংশের শিশু-কিশোরের সম্পৃক্ততা কম হলেও পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিবার কল্যাণ অংশ শিশু স্বাস্থ্যের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এ বিভাগের মোট ব্যয়ের ৩৯.০৫ শতাংশ শিশুকল্যাণে নিয়োজিত। এ বিভাগ অধিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর মাধ্যমে মেডিকেল কলেজ, প্যারামেডিক ইনস্টিটিউট, নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল এবং অন্যান্য বিশেষায়িত মেডিকেল শিক্ষা পরিচালনা করে থাকে, যা শিশু কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত না হলেও শিশুর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। অন্যদিকে, পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোর অধীনে দেশজুড়ে পরিবার-পরিকল্পনা এবং মাতৃত্ব পরিসেবা প্রদান করা হয়, যা সরাসরি শিশু-সংবেদনশীল কার্যক্রম। মেটারনিটি ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে প্রদত্ত মাতৃত্বকালীন সেবা দেশে মৃত্যুহার এবং শিশু মৃত্যুহারের উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। এ বিভাগের অধীনে ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), বেসরকারিভাবে পরিচালিত মাতৃস্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ ক্লিনিক, শিশু স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে অনুদান দিয়ে থাকে।[৩০]

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ উন্নয়ন বাজেটের আওতায় শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যসেবার সুবিধা ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। শিশুকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে এমন প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে 'নার্সিং ও ধাত্রী শিক্ষা সেবা প্রকল্প', 'ইনস্টিটিউট অব পেডিয়াট্রিক', 'নিউরো-ডিসঅর্ডার এবং অটিজম ইন BSMMU প্রকল্প' এবং "মেটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসেন্ট হেলথ প্রকল্প" ইত্যাদি।

৫। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

এ বিভাগটি শিশুকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে, যা শিশু কল্যাণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত। এ বিভাগ শিশু-কিশোরের সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এ বিভাগের অধীন দেশ জুড়ে সকল হাসপাতালে তাদের নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে শিশু-কিশোরের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। প্রায় সকল হাসপাতালেই নবজাতক এবং শিশুদের জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ড বা বিশেষ ইউনিট রয়েছে। উপরন্তু এ বিভাগ শিশুদের জন্য বিভিন্ন টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যা সম্পূর্ণরূপে শিশু-কেন্দ্রিক এবং শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শিশুদের সংক্রামক রোগের জন্য বিশেষায়িত

৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩-২৪

বেসরকারি হাসপাতালগুলোকেও এই বিভাগ অনুদান প্রদান করে থাকে। বিদ্যালয় স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রও এ বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়া আরো কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকল্প রয়েছে যা শিশু কল্যাণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হচ্ছে, যেমন 'সেইফ মাদারহুড প্রমোশন-অপারেশন রিসার্চ অব সেইফ মাদারহুড এন্ড নিউবার্ণ সারভাইভাল' প্রকল্প এবং 'ম্যাটারনাল, নিউনেটাল এন্ড চাইল্ড হেল্থ প্রোগ্রাম' ইত্যাদি।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ: স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ[৩১] নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সবার জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। এ নীতিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সকল নাগরিকের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম সাংবিধানিক দায়িত্ব।	স্বাস্থ্য নীতিতে শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত যে সকল লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ: • পুষ্টিহীনতার মাত্রা কমানো, বিশেষ করে শিশু ও মাতৃত্বকালীন পুষ্টিহীনতা কমানো; • শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো; • শিশু-মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রাম পর্যায়ে নিরপদ শিশু প্রসবের অবকাঠামো স্থাপন; • প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সম্প্রসারণ; • মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারণ; • প্রয়োজনীয় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছানো; • সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো।
স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা সেক্টরের কৌশলগত বিনিয়োগ (HNPSIP) পরিকল্পনা ২০১৭-২০২২	HNPSIP এর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ: • স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সকল নাগরিকের নিকট পৌঁছে দেওয়া; • স্বাস্থ্য খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরো তথ্যভিত্তিক করা; • স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা ও এ বিষয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)	জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত SDGs Mapping মোতাবেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১২ টি target এর ২২ টি indicator বাস্তবায়নে কাজ করছে।

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যতম প্রধান কাজ হলো শিশুর অধিকার বাস্তবায়ন এবং শিশুর সুরক্ষা ও উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। আইনগত বাধ্যতামূলক দলিল শিশু অধিকার সনদের ৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সম্পদের ব্যবহার এবং সব ধরনের যথাযথ প্রশাসনিক, আইনী ও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় শিশু নীতি গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় শিশু নীতি প্রণয়ন করে। এই নীতির মূলকথা হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবিধান, শিশু আইন এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রীতির আলোকে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা।[৩২]

এ মন্ত্রণালয় অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে শিশু কল্যাণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো পথশিশুদের পুনর্বাসন, দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্ব ভাতা প্রদান, দারিদ্র্য দূর করার 'স্বপ্ন প্যাকেজ' এর আওতায় মায়েদের জন্য সহায়তা প্রদান এবং শহুরে দরিদ্র মা ও শিশুদেরকে পুষ্টি সেবা প্রদান, তৈরি পোশাক কারখানা শ্রমিকদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি। এর অধীনে আরো দু'টি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হচ্ছে, শিশু পুরস্কার প্রদান এবং কিশোর-কিশোরীদের ক্লাবে সংগঠিত করে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শিশুদের মেধা ও মননের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বছরব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে, পাশাপাশি শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা, জাতীয় শিশু দিবস পালন এবং শিশুদের জন্য উপযোগী বিভিন্ন বই এবং সাময়িকী নিয়মিত প্রকাশ করে। মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি-কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো:[৩৩]

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শিশু আইন,২০১৩	জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে এ কনভেনশনের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। এ আইনে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
জাতীয় শিশু নীতি,২০১১ জাতীয় শিশু নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো সংবিধানের আলোকে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা। এতে আরো	জাতীয় শিশু নীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ: • সকল শিশুর জন্য বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, সামাজিক, আঞ্চলিক ও জাতিগত পরিচয় নির্বিশেষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদন ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুর সর্বোচ্চ উন্নয়ন। • কন্যাশিশু, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ। • শিশুদেরকে সৎ, দেশ প্রমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫
৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬

উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি, পরিবকল্পনা, কর্মসূচি এবং জাতীয় বাজেটে শিশুদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।	গ্রহণ। • ভবিষ্যতে বিশ্ব চাহিদার সাথে তাল মেলানোর জন্য শিশুদেরকে একটি বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তোলা। • শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জীবনে প্রভাব পড়ে এমন যে কোন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। • শিশু অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন।

৭। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

শিশুদের সুরক্ষার অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকারের সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের সম্পৃক্ততা রয়েছে। যদিও এ মন্ত্রণালয় এমন কোন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে না, যা সম্পূর্ণভাবে শিশু-কেন্দ্রিক। তবে এর বেশির ভাগ কার্যক্রমে শিশু-সংবেদনশীল উপাদান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সকল ধরনের মানবিক সহায়তা কর্মসূচিতে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় নীতি গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত দুর্যোগকালীন আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে শিশু, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়। অধিকাংশ আশ্রয়কেন্দ্র বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে নির্মাণ করা হয়, যাতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সারা বছর সেগুলো ব্যবহার করতে পারে এবং এর থেকে শিশুরা উপকৃত হতে পারে।[৩৪]

৮। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সংবিধান অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর। সরকারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ দারিদ্র্য, আয় বৈষম্য ও বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রাপ্তির বৈষম্য কমাতে নানা ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তন্মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হচ্ছে জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশল বাস্তবায়নে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম, যা নানাভাবে শিশু কল্যাণে অবদান রাখছে। এ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটের ২১.৫৬ শতাংশ শিশু সংবেদনশীল কার্যক্রমে ব্যয় হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেটের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু-কেন্দ্রিক কার্যক্রম ও কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ডিসেবিলিটি প্রটেকশন ট্রাস্ট, শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট, প্রতিবন্ধীদের যন্ত্র এবং সহায়তা কেন্দ্র, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কার্যক্রম ইত্যাদিতে এ মন্ত্রণালয় সহায়তা প্রদান করে। এসকল কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের একটি বড় অংশ শিশু-কিশোর। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বেসরকারি মাদ্রাসার ছাত্রদের অনুদান প্রদান, প্রতিবন্ধী শিশুদের বৃত্তি প্রদান এবং শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা

৩৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬-২৭

করা হয়।[৩৫] শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হলো কিশোর অপরাধীদের বিচার, সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের জন্য 'কিশোর সংশোধন কেন্দ্র' পরিচালনা করা। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে তিনটি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। যা অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট বা অপরাধপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের সংশোধন ও উন্নয়নে এবং কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত পর্যালোচনা অন্য অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষায়িত বেসরকারি স্কুলেও এ মন্ত্রণালয়ের কর্মতৎপরতা এবং অনুদান রয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো:[৩৬]

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শিশু আইন,২০১৩	জাতি সংঘের শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের জন্য ১৯৭৪ সালের শিশু আইন সংশোধন করে ২০১৩ সালে যুগোপযোগী শিশু আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো: প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ, জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠন, সকল থানায় শিশু সংক্রান্ত ডেস্ক স্থাপন, শিশু আদালত প্রতিষ্ঠা, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। শিশুদের সুরক্ষার পাশাপাশি এ আইনে সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সেবা কেন্দ্র স্থাপানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন,২০১৩	রাষ্ট্রের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে দায়িত্ব হতে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা যেমন, বাক প্রতিবন্ধিতা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতাসহ সকল শিশুর উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা রক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি, ২০০৫	এ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও ঝুঁকির মুখে থাকা পথশিশু, এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সুরক্ষা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, শিশুর উন্নয়ন ও শিশু অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে দেশের সকল শিশুর নিরাপত্তা বিধান, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, পুষ্টি ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক Mapping মোতাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গোল ৫ এর লক্ষ্য ৫.৪ -এ লিড মিনিস্ট্রি এবং গোল ৪-এ এর লক্ষ্য ৪.৫ এবং ৪ এর কো-লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয় ২৪ টি লক্ষ্য অর্জনে সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করছে।

৩৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪
৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ

নিরাপদ সুপেয় পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। এ কাজগুলো ছাড়াও জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। যা শিশুদের অংশগ্রহণের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত। এ প্রেক্ষাপটে, শিশু-সংবেদনশীল কার্যক্রমে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের ৬.৬৬ শতাংশ অর্থ শিশুবান্ধব কার্যক্রমে ব্যয়িত হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের শিশু সংবেদনশীল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প হলো, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট, আরবান পাবলিক অ্যান্ড এনভাইরনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং ঢাকা এনভাইরনমেন্টাল সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট ইত্যাদি।[৩৭]

১০। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শিশুশ্রম ও কর্মক্ষেত্রে শোষণের হাত থেকে শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া শিশু অধিকার বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ কাজটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অধীনে বাস্তবায়িত হয়। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় দু'টি অধিদপ্তর শিশুশ্রম প্রতিরোধে কাজ করছে। এগুলো হলো কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর। যদিও মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত দপ্তরের প্রায় সকল কার্যক্রমেই শিশুশ্রম প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় নীতি ও কৌশলসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণনা করা হলো:[৩৮]

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ এবং শ্রম আইন, ২০০৬	• ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা। • কর্মজীবি শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। • শিশুশ্রম সংশ্লিষ্ট বাস্তবমুখী আইন প্রণয়ন করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে এ আইনকে কার্যকর করা। • শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে শিশুর পিতামাতা, সাধারণ জনগণ এবং সুশীল সমাজের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। • কর্মজীবি শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক এবং কর্মমুখী শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা, যাতে করে তারা কাজ হতে বের হয়ে শিক্ষার সুযোগ পায়।

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭-২৮
৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫-৬৬

	শিশুশ্রম নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ ● শিশুশ্রম বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা; শিশুদের জন্য ৩৮টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ● শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে "ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩টি পর্যায়ে ৯০,০০০ হাজার শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪র্থ পর্যায়ে মোট ১ লক্ষ শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হতে বের করে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ● শিশুদের জন্য জাতীয় নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। ● শিশুশ্রম নিরসনের জন্য টাইম বাইন্ড প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র থেকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের উপাদানসমূহ প্রত্যাহার করে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলতে সহায়তা করা হয়েছে। ● জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রমিকের উচ্চতর উৎপাদনশীলতা অর্জন এবং উচ্চ আয়ের শোভন কর্মসংস্থান সৃজনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।	● শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসন করা। ● সকল প্রকার শিশু শ্রম নিরসনের মাধ্যমে শিশু জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা। ● শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন প্রোগ্রাম/প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) শিশুশ্রম নিরসনে ৮নং গোলের ৮.৭ লক্ষ্যমাত্র অর্জনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।	● জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (SDGs) বলা হয়েছে, সকল প্রকার ফোর্সড লেবার আধুনিক দাসত্ব এবং মানব পাচার প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ সকল কাজ নিষিদ্ধ ও ২০২৫ সালের মধ্যে সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে শিশুদের নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

১১। জননিরাপত্তা বিভাগ

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ ও সর্বজনীন সমাজ গঠন রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক কর্তব্য। শিশু তথা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যক্তিগত ও সাইবার জগতের নিরাপত্তা নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ সৃজনে জননিরাপত্তা বিভাগ কাজ করছে। শিশুদের সুরক্ষা অধিকারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্যাতন ও বৈষম্য এবং নিষ্ঠুরতা ও সহিংসতা হতে সুরক্ষা দেওয়া, যা অনেকাংশে জননিরাপত্তা বিভাগের কর্মসূচি। এ বিভাগের আওতায় বেশ কিছু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী

কার্যক্রম পরিচালনা করে যেমন, বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল, কোস্ট গার্ড ইত্যাদি। এসকল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দৈনন্দিন কার্যক্রমে নানাবিধ শিশু-সংবেদনশীল উদ্যোগ রয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ

জননিরাপত্তা বিভাগ দেশের অভ্যন্তরে, সীমান্তে, অভ্যন্তরীন ও উপকূলীয় জলপথে এবং সাইবার জগতে নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, কৌশল ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। নিম্ন উল্লিখিত নীতি ও বিধিমালার আলোকে তারা জননিরাপত্তা বিধান করে থাকে। যেমন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭, বাল্যবিবাহ নিরোধ বিধিমালা ২০১৭, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)।

১২। তথ্য মন্ত্রণালয়

শিশুর চারটি অধিকারগুচ্ছের মধ্যে উন্নয়নের অধিকার অন্যতম। এ অধিকারে আবার তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথমটি হলো শিক্ষার অধিকার, যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিভাগসমূহের কর্মপরিধিভুক্ত। অপর দু'টি হলো অবসর, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অধিকার এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার, যা তথ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধিভুক্ত। এ মন্ত্রণালয় তাদের অনেকগুলো দপ্তর, সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে শিশু সংবেদনশীল সামাজিক সচেতনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করে। এ মন্ত্রণালয় থেকে শিশুদের উপযোগী শিক্ষা ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি করে টেলিভিশন ও রেডিওতে সম্প্রচার করা হয়।

১৩। আইন ও বিচার

শিশুর সুরক্ষার অধিকারের অন্যতম উপাদান হলো নির্যাতন ও সহিংসতা হতে শিশুকে রক্ষা করা, যার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে এ ধরনের ঘটনায় ভিকটিম শিশুর ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। শিশুদের আর্থিক সামর্থ্য ও সামাজিক প্রভাব বড়দের তুলনায় কম থাকায় ন্যায় বিচার না পাওয়ার ঝুঁকি তাদেরই বেশি। আর এ কারণেই বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব হলো শিশুর ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ বৃদ্ধি করা। শিশুদের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ ইউনিসেফের সাথে সরাসরি কাজ করে। এ বিভাগের সকল কাজকর্ম সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের অংশীদারগণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আইন ও বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ:[৩৯]

নীতি/কৌশল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শিশু আদালত (শিশু আইন,২০১৩)	• শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শিশু নিরাপত্তা রক্ষা, বিশেষ করে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে শিশু আইন, ২০১৩ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিশু আইন, ১৯৭৪ বাতিল করে অত্র আইন করা হয়েছে। শিশু হিসেবে গণ্য হওয়ার বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মর্মে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছে। • আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রবেশন অফিসার নিয়োগ, প্রতিটি থানায় শিশুদের সহায়তা ডেস্ক স্থাপন, প্রতি জেলা/মহানগরে একটি করে শিশু আদালত স্থাপনের বিধান শিশু আইনে রাখা হয়েছে। • শিশু কর্তৃক যে কোন ধরনের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে তার বিচার শিশু আদালতে হতে হবে। এ আইনে শিশু নির্যাতন রোধে গৃহীত পদক্ষেপ এবং শিশুদের গ্রেফতার সংক্রান্ত বিধানাবলীও বিধৃত হয়েছে। • শিশু আইন, ২০১৩ এর বিধানাবলী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের আইন ও বিচার বিভাগ এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে অতিরিক্ত জেলা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারক নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে শিশু আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উক্ত কর্মনীতি ও কৌশল গ্রহণের কারণে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিশু মৃত্যুর হার লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। এজন্য বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে প্রশংসা জুটেছে। এরপরেও এদেশের শিশুরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলো জরুরী ভিত্তিতে অপনোদন করা প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বিপদাপন্ন দেশে পরিণত হচ্ছে। আজকের শিশু এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতির বোঝার বড় অংশ বহন করবে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এবং সামাজিক পথপরিক্রমায় শিশুদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এ কারণে শিশু-সংশ্লিষ্ট জাতীয় কৌশলগত কর্ম পরিকল্পনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। আমরা আন্তরিকভাবে আশা করি সকলের স্নেহ, মায়া-মমতার ছায়ায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে ভয়শূন্য চিত্তে শিশুরা বেড়ে উঠবে। তাদের অন্তর্গত সম্ভাবনাগুলো অজস্র পত্র-পল্লবে বিকশিত হবে। একদিন তাদের যোগ্য নেতৃত্বেই দেশ এগিয়ে যাবে এবং জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাড়াঁবে।

৩৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬

'শিশু আইন,২০১৩' কিশোর উন্নয়নের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী

"শিশু আইন, ২০১৩" বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বিশেষ করে অপরাধপ্রবণতায় জড়িত বা অপরাধের সংস্পর্শে আশা শিশু-কিশোরদের জন্য এই আইন যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই আইনে এগারটি অধ্যায় এবং ১০০টি ধারা রয়েছে। প্রতিটি ধারা আবার অসংখ্য সাবধারায় বিভক্ত। এটি ২০ জুন ২০১৩ সালে পাশ করা হয় এবং ২০১৩ সালের ২৪ নং আইন। এই শিশু আইন বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে একটি সদূরপ্রসারী রূপকল্প। এই আইনের শিশু-কিশোরের উন্নয়ন ও কল্যাণকর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক হলো:

১। প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ;

২। শিশুকল্যাণ বোর্ড স্থাপন;

৩। প্রত্যেক থানায় সাব-ইপেক্টরের নেতৃত্বে শিশু-কিশোর ডেস্ক স্থাপন;

৪। প্রত্যেক জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় কমপক্ষে একটি করে শিশু-কিশোর আদালত স্থাপন;

৫। গ্রেফতার ও জামিন সংক্রান্ত নির্দেশনা;

৬। আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সহায়তা প্রদান;

৭। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ও প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিধান;

৮। শিশুর সাথে সংঘটিত অপরাধের দণ্ড;

৯। বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ;

১০। সুবিধাবঞ্চিত শিশুর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা প্রদান; এবং

১১। কিশোর হাজত প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

এ আইনের **প্রথম অধ্যায়ে শিশু** আইনের সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন ছাড়াও শিশু-কিশোরের সংজ্ঞাসহ ২৪ টি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের ৪র্থ ধারায় ১৮ বৎসর পর্যন্ত শিশুর বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে প্রবেশন কর্মকতা নিয়োগ এবং তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত নির্দেশনা। ৫(১) অনুচ্ছেদে প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়।[৪০]

তৃতীয় অধ্যায়ে শিশুকল্যাণ বোর্ড এবং এর কার্যাবলি সম্পর্কিত বিধিবিধান আলোচিত হয়েছে। একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং বোর্ডের কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ: ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ডের সদস্যগণ[৪১] হলেন:

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, এই বোর্ডের সভাপতি;

---

৪০. *শিশু আইন*,২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৫(১), বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, এস.আর.ও নং ২৭৫-আইন/২০১৩ (২০১৩ সালের ২৪ নং আইন)

৪১. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৭(১)

২. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

৩. জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন মহিলা সংসদ সদস্য, যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন সরকার দলীয় এবং ১ (এক) জন বিরোধী দলীয় হইবেন;

৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদকর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপমহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;

৬. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

৭. স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

৮. শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

৯. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

১০. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

১১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

১২. তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

১৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

১৪. মহা-কারা পরিদর্শক;

১৫. ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, পদাধিকারবলে;

১৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালক;

১৭. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

১৮. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

১৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

২০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

২১. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক, পদাধিকারবলে;

২২. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উহার কার্যনির্বাহী কমিটির ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

২৩. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;

২৪. বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালক,পদাধিকারবলে;

২৫. সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি;

২৬. সরকার কর্তৃক মনোনীত, জেলা পর্যায়ে বেসরকারি সেচ্ছাসেবী শিশুবিষয়ক সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

২৭. সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে যিনি এই বোর্ডের সদস্য-সচিব হইবেন।

এছাড়াও জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ডের অধীনে জেলা পর্যায়ে 'জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড', এবং উপজেলা পর্যায়ে 'উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড' গঠনের পাশাপাশি তাদের কার্যাবলী বিধৃত হয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়ে প্রত্যেক থানায় একজন সাব-ইন্সপেক্টরের অধীন একটি শিশু বিষয়ক ডেস্ক গঠনের কথা বলা হয়। এই আইনের ১৫নং ধারাটি শিশু-কিশোরের বিচার ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। কারণ এ

অনুচ্ছেদে বয়স্ক অপরাধীর সাথে শিশু-কিশোরের চার্জসীট প্রদান নিষিদ্ধ করা হয়। এছাড়া এ অধ্যায়ে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। ১৪ নং অনুচ্ছেদে দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়:

(ক) শিশুবিষয়ক মামলার জন্য পৃথক নথি ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন শিশু থানায় আসলে বা শিশুকে থানায় আনা হলে-

(অ) প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করা;

(আ) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করা এবং বিস্তারিত তথ্যসহ আদালতে হাজির করার তারিখ জ্ঞাত করা;

(ই) তাৎক্ষণিক মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;

(ঈ) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রেরণ করা;

(উ) শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(গ) সঠিকভাবে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হচ্ছে কি না বা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হচ্ছে কি না তদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখা;

(ঘ) প্রবেশন কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্পপন্থা অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) বিকল্পপন্থা অবলম্বন বা কোন কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

(চ) প্রতি মাসে শিশুদের মামলার সকল তথ্য প্রতিবেদন আকারে থানা হতে নির্ধারিত ছকে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এর কার্যালয়ের মাধ্যমে পুলিশ সদর দপ্তর ও ক্ষেত্রমত, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা; এবং

(জ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পঞ্চম অধ্যায়, শিশু ও কিশোর অপরাধ এবং অপরাধীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ অধ্যায়ে মোট ২৭টি ধারা বা অনুচ্ছেদ রয়েছে। অনুচ্ছেদসমূহে শিশু-কিশোরদের জন্য গঠিত ও পরিচালিত শিশু আদালতের গঠন ও উহার কার্যবলীর ও ক্ষমতা বিধৃত হয়েছে। এটি শিশু-কিশোরের অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিধান সম্বলিত অধ্যায়। এ অধ্যায়ে ১৬(১)নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং উহার অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে এবং, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় কমপক্ষে একটি আদালত থাকবে, যাহা শিশু-আদালত নামে অভিহিত হবে। (২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, আইন ও বিচার বিভাগ, সুপ্রিমকোরর্টের সাথে পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলা এবং, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার এক বা একাধিক অতিরিক্ত দায়রা জজ এর আদালতকে শিশু-আদালত হিসাবে নির্ধারণ করবে এবং একাধিক আদালত নির্ধারণ

করা হলে তাদের প্রত্যেকটির আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্দিষ্ট করবে।”[৪২] এছাড়াও শিশু-আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়ে একটি গাইড লাইন প্রদান হয়েছে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে গ্রেফতার, তদন্ত, বিকল্প পন্থা (Diversion) এবং জামিন সম্পর্কিত বিধি আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া গ্রেফতারের বিষয় প্রবেশন কর্মকর্তা ও পিতামাতাকে অবহিতকরণ সম্পকিত আলোচনা এসেছে। এছাড়াও ৪৫ থেকে ৫৪ নং অুনচ্ছেদে তদন্ত, জবানবন্দী, সতর্কীকরণ ও মুক্তি, বিকল্প পন্থা, পারিবারিক সম্মেলন, বিকল্প পন্থার মেয়াদ, বিকল্প পন্থার শর্ত ভঙ্গ বা বিকল্প পন্থার আদেশ পালনে ব্যর্থতা, জামিন, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু সম্পর্কে পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকতাকে অবহিতকরণ এবং বিশেষ ব্যবস্থা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত বিধি আলোচিত হয়।

৭ম অধ্যায়ে আইনগত প্রতিনিধি ও সহায়তা সম্পর্কিত বিধি-বিধান আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্বকারী ব্যতীত মামলা পরিচালনা না করার কথা এবং মামলার সকল শুনানিতে আইনজীবির উপস্থিতি নিশ্চিত করার কথা বল হয়। ৫৮ নং ধারায় বলা হয়, বিচার প্রক্রিয়ায় শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হলে উক্ত শিশুর জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়।

অষ্টম অধ্যায়ে ৫৯ থেকে ৬৯ নং অনুচ্ছেদে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ করা হয়। এই আইনের অধীনে বর্তমানে দেশে তিনটি সরকারি শিশু-কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র রয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত এই আইনে বেসরকারি শিশু-কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। তবে এসকল প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের বিষয়ে অধিদপ্তরকে অবহিত করার প্রবিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া বৈধ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত পরিচালিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে জরিমানাসহ আইনী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঠিক করে দেওয়া হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি শিশু উন্নয়ন ও প্রত্যয়ন কেন্দ্রের শিশুদের (Minimum Standards of Care) জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড। এছাড়া প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও সরকারের প্রত্যয়নপত্রের প্রত্যাহার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবাসী স্থানান্তর, শিশুর উপর জিম্মাদারের নিয়ন্ত্রন, পলাতক শিশু সম্পর্কে করণীয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রবিধান রাখা হয়েছে।

৯ম অধ্যায়ে শিশু সংক্রান্ত বিশেষ অপরাধসমূহের দণ্ড উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিও শিশু-কিশোরদের অধিকার রক্ষা এবং নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন প্রতিরোধে রক্ষাকবচ। এই ধারাসমূহে শিশুদের সাথে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের দণ্ডের প্রবিধান রাখা হয়েছে। অনুচ্ছেদে ৭০ থেকে অনুচ্ছেদ ৮৩ পর্যন্ত শিশুদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। অপরাধের ধরন অনুসারে ন্যূনতম ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকার উর্ধ্বে যে কোন অর্থ ক্ষতিপূরণ এবং অনাদায়ে অনধিক ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড

---

৪২. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ১৬ (১)

প্রদানের বিধান থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) বৎসরের কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য বিকল্প পরিচর্যার (alternative care) বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়া এ অধ্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যার কথা বলা হয়েছে। প্রায় ১৬ শ্রেণির শিশুকে সুবিধাবঞ্চিত শিশু হিসেবে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে সরকার প্রণীত নীতিমালার আলোকে, নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করবে, যথা:-

(ক) সরকারি শিশু পরিবার;

(খ) ছোটমনি নিবাস;

(গ) দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র;

(ঘ) সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র; এবং

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

এছাড়াও এ অধ্যায়ে বিকল্প পরিচর্যা নির্ধারণ, অধিদপ্তর কর্তৃক বিকল্প পরিচর্যা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বিকল্প পরিচর্যার মেয়াদ ও করণীয় বিধৃত হয়েছে। অধিকন্তু এ অধ্যায়ে ব্যক্তি, সংস্থা বা পুলিশ কর্তৃক শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে শিশু-কিশোর প্রেরণের বিষয়ে বিধি বর্ণিত হয়েছে। শিশুদের নিরাপদ স্থানে রাখার জন্য যাচাইয়ের প্রবিধান পাশাপাশি শিশুকল্যাণ বোর্ডের নিকট সমস্ত তথ্য উপস্থানের এবং বোর্ড কর্তৃক শিশু আদালতে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে।

সর্বশেষ **একাদশ অধ্যায়ে** প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা, আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব, অস্পষ্টতা দূরীকরণ, ইংরেজি পাঠ অনুমোদন এবং ১০০ নং ধারায় শিশু আইন, ১৯৭৪ (Children Act, 1974, Act No. XXXIX of 1974) কে রহিত করা হয়েছে। এছাড়া দেশে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বিভিন্ন নামে কিশোর-কিশোরী সংশোধন ও উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে পরবর্তী নির্দেশনা পর্যন্ত তাদেরকে সে নামেই কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য বলা হয়েছে।

শিশু কল্যাণ কার্যক্রম (Child welfare)

যে কোন অপরাধের কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। কিশোর অপরাধের জন্য এই কার্যকারণ সম্পর্ক বিদ্যমান। যদি শিশু-কিশোরের লালন-পালনের ক্ষেত্রে সে কারণগুলো দূর করা যায় এবং শিশু-কিশোরদের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায় তাহলে তাদেরকে অপরাধ থেকে দূরে রাখা সম্ভব। শিশু কল্যাণ নিশ্চিকরণের জন্য শিশু কল্যাণ বোর্ড গঠনের বিধান রয়েছে শিশু আইনে।"[৪৩]

শিশু আইন, ২০১৩ তে শিশুদের সাবির্ক কল্যাণ সাধনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৯ সদস্যের একটি হাই-অফিসিয়াল "জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ড", জেলা পর্যায়ে জেলাপ্রশাসকের নেতৃত্বে 'জেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড' এবং উপজেলা পর্যায়ে 'উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ড' গঠনের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় শিশু কল্যাণ বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুদের-

(অ) পরিবার ও সমাজ জীবনে পুনঃএকীকরণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান;

(আ) কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে তাহাদের লিঙ্গভিত্তিক সংখ্যা নিরূপণ এবং তাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক এতদ্‌বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ই) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় বিকল্পপন্থা বা বিকল্প পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ এবং উক্তরূপ পন্থা বা পরিচর্যার আওতাধীন শিশুর তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা;

(গ) জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর সুপারিশ অনুমোদন;

(ঘ) জেলা এবং উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর-

(অ) নীতিমালা প্রণয়ন এবং, প্রয়োজনে, সুপারিশ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;

(আ) কার্যক্রম সম্পর্কে, সময় সময়, তাদের নিকট হতে প্রতিবেদন আহবান এবং তাহাদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্তঃবোর্ড সমন্বয় সভার আয়োজন;

(ঙ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।[৪৪]

(২) শিশু আইন, ২০১৩, অনুযায়ী জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট জেলায় বিদ্যমান শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, শিশুদের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যদি থাকে, এবং কারাগার পরিদর্শন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ, ক্ষেত্রমত, তাদেরকে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণ এবং উক্তরূপ পরিচর্যার আওতাধীন শিশুর তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা;

(গ) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

---

৪৩. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৭(১)
৪৪. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৭(২)

(ঘ) উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর সুপারিশ অনুমোদন বা, প্রয়োজনে, অনুমোদনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড-এ প্রেরণ;

(ঙ) উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে, সময় সময়, প্রতিবেদন আহবান করা এবং উক্ত বোর্ড' এর কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্ত:বোর্ড সভার আয়োজন;

(চ) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা, ক্ষেত্রমত, জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা উদ্যোগ গ্রহণ; এবং

(ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।[৪৫]

সমাজবিজ্ঞানী ও অপরাধবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, কিশোর অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য অথবা অপরাধপ্রবণতা থেকে শিশু-কিশোরকে দূরে রাখার জন্য শিশু কল্যাণমূলক পদক্ষেপ ও কার্যক্রম বিশেষভাবে দরকার। নিম্নে শিশু কল্যাণের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব এবং শিশু কল্যাণের মৌলিক উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

শিশু কল্যাণের পরিচয়

শিশু-কিশোররা একটি পরিবারের ক্ষুদ্র সম্রাট হিসেবে বিবেচিত। এজন্যই শিশু-কিশোরদের যথাযথ যত্ন ও প্রতিভা বিকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। জন্মপূর্বকাল থেকেই শিশুদের যত্নের প্রয়োজন হয়। শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের স্বাভাবিক বিকাশসহ সকল ধরনের পদক্ষেপ শিশুকল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। শিশুকল্যাণ একটি ব্যাপাক ও বিস্তৃত বিষয়, যা পিতামাতা ব্যতীত অন্য কান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয়। এটি শুধু দুঃস্থ, অসহায়, পরিত্যক্ত, এতিম প্রভৃতি শিশুদের কল্যাণকেই বুঝায় না, বর্তমানে শিশুকল্যাণ বলতে সকল শ্রেণির শিশুদের কল্যাণকে বুঝিয়ে থাকে। সাধারণত শিশুকল্যাণ বলতে সমাজস্থ সকল শিশুর আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক কল্যাণে নিয়োজিত কার্যক্রমের সমষ্টিকে বুঝায়। অর্থাৎ শিশুদেও জন্য গৃহীত প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কল্যাণমূলক প্রচেষ্টার সমষ্টিই হলো শিশু কল্যাণ।

শিশুকল্যাণকে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সমাজকর্মের পরিভাষায় শিশুকল্যাণ হলো, মানব সেবা ও সমাজকল্যাণ কর্মসূচির সে অংশ, যেগুলো শিশুর সংরক্ষণ, শিশুসেবা এবং সুস্থ বিকাশে নিয়োজিত। শিশুকল্যাণ কার্যক্রম শিশুর ইতিবাচক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অবস্থা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রণীত।

W.A Friedlander (১৮৯১-১৯৮৪) and R.Z.Apte বলেন, সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের যত্নসহ সকল সামগ্রিক মঙ্গল নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি সকল সেবামূলক তৎপরতাকে শিশু কল্যাণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৪৬]

---

৪৫. *প্রাগুক্ত*, অনুচ্ছেদ: ৮(২)

৪৬. W.A Friedlander and R.Z.Apte, *Introduction to Social Welfare* (New York: Prentice Hall,4th edi,1974), p.129

হ্যাজেল ফ্রেদরিক (Hezel Friedrich) তার ‘The Child and His Welfare’ গ্রন্থে বলেন, “Child welfare incorporates the social, economic and health activities of public and private welfare agencies, which secure and protect the well-being of all children in their physical, intellectual and emotional development.”[৪৭] অর্থাৎ শিশু কল্যাণ বলতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত সে সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দৈহিক কার্যক্রমকে বুঝায়; যেগুলো সকল শিশুর দৈহিক বুদ্ধিবৃত্তিক, মানবিক, আবেগীয় উন্নতি ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত।

সর্বোপরি বলা যায় যে, শিশুকল্যাণ হলো সে সব কার্যাবলী যেগুলো শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত। যা সমাজের ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল শ্রেণির শিশুদের সকল প্রয়োজন পূরণ করে তাদের দৈহিক ও অন্তর্নিহিত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যতে দেশের সুনাগরিক ও মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

শিশুকল্যাণের মৌলিক উপাদানসমূহ

শিশুর কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয়ই এর উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এ প্রক্রিয়া শুরু হয় জন্মের পূর্ব থেকে এবং চলতে থাকে কিশোর বয়স পর্যন্ত। শিশুকল্যাণের জন্য নানাবিধ উপাদানের প্রয়োজন হয়। নিম্নে শিশুকল্যাণের উপাদানসমূহ তুলে ধরা হলো-

১. জন্মপূর্ব সেবা (Pre-natal service);
২. পারিবারিক পরিবেশ (Family enviorment);
৩. শিশুর চাহিদা পূরণ (Meeting the needs of the child);
৪. শিশুর যত্ন ও শিশুপালন বিষয়ক জ্ঞান (Knowledge of child care and child rearing);
৫. প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (Institutional service);
৬. পিতা-মাতার ভালবাসা ও স্নেহ (Parental love and effection);
৭. গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ (Conductive social enviorment);
৮. শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ (Education and sociolization);
৯. সংশোধনমূলক কার্যক্রম (Correctional service);
১০. পঙ্গুকল্যাণ কার্যক্রম (Handicapped welfare service);
১১. শিশু পরামর্শ ও ক্লিনিক্যাল সেবা (Child guidance and clinical service);

---

৪৭. Hezel Federiesen, *The Child and His Welfare:* quoted by W.A. Ffriedlander, *Introduction to Social Welfare*, 2nd Edition,2011, p. 344

১২. সামাজিক পরিবেশ (Social enviorment);

১৩. মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা (Mother and Child helth);

১৪. পুষ্টিকর খাদ্য (Nutrition) ;

১৫. আর্থিক নিরাপত্তা (Financial security);

১৬. চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা (Recreation);

১৭. সামাজিকীকরণ (Socialization);

১৮. মা-বাবার শিক্ষা (Parents Education).

শিশুকল্যাণের বৈশিষ্ট্য

সমাজের সকল শ্রেণির শিশুর কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বহুবিধ কল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। যার মাধ্যমে শিশু-কিশোর সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। শিশুকল্যাণের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১. শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণসহ সামাজিকীকরণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
২. শিশুর মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুকল্যাণ কর্মসূচির গুরুত্ব দেখা দেয়।
৩. শিশুকে সকল ধরনের নিরাপত্তা বিধানের প্রতি খেয়াল রাখা হয়।
৪. শিশুর আর্থ-সামাজিক, মনো-দৈহিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগের সুষ্ঠু বিকাশের কর্মসূচি প্রদান করা হয়।
৫. সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে শিশুদের গড়ে তোলা।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার, সমষ্টি ও সামাজিক পরিবেশের সাথে সমন্বয় সাধনের প্রতি শিশুকল্যাণ গুরুত্বারোপ করে থাকে।
৭. এ কর্মসূচির মাধ্যমে গঠনমূলক পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়।
৮. শিশুর বাবা-মা সহ পরিবারের সবাইকে শিশুকল্যাণ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা।
৯. এ কর্মসূচি জাতি–ধর্ম-বর্ণ শ্রেণি নির্বিশেষে সকল শিশুর কল্যাণের জন্য প্রণয়ন করা হয়।
১০. শিশুকল্যাণ সব ধরনের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা বিকাশের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হলেই তাকে শিশুকল্যাণ বলা যায়। এসব বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতিতে ব্যাপক শিশুকল্যাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব। এজন্য প্রয়োজন সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, জনসচেতনতা ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

শিশুকল্যাণের উদ্দেশ্য

শিশুকল্যাণের উদ্দেশ্য বহুমুখী। শিশুর সকল দিকের উন্নয়ন সাধন করা শিশুকল্যাণের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিশুকল্যাণের অন্যান্য উদ্দশ্যসমূহ নিম্নরূপ-

১। সুস্থ ও সবল শিশুর জন্মদান, সঠিক লালনপালন ও বিকাশ সাধন;

২। শিশুদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তীয় ও আবেগীয় বিকাশ সাধনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করা;

৩। মা ও শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধন করা;

৪। অর্থনৈতিক চাহিদাসহ শিশুর ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান করা;

৫। শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করে দায়িত্বশীল, সৃজনশীল ও আত্মনির্ভরশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা;

৬। শিশুদের সুশিক্ষত ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা;

৭। শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনের জন্য নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা;

৮। শিশুদের সকল প্রকার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে সামগ্রিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;

৯। দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক পঙ্গু শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে দেশের সম্পদশালী সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা;

১০। সকল প্রতিকূল অবস্থা থেকে শিশুদের সামগ্রিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা;

১১। শিশুর বিকাশের বাধাসমূহ দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়;

১২। শিশুর পরিবারকে সাহায্যদানের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।[৪৮]

শিশু-কিশোরের মৌলিক চাহিদা

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ন্যায় একজন শিশুরও মৌলিক কিছু চাহিদা রয়েছে। এ সকল চাহিদা পূরণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে। মৌল মানবিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি শিশুদের আরো কিছু অতিরিক্ত চাহিদার প্রয়োজন রয়েছে। নিম্নে শিশু-কিশোরদের মৌলিক চাহিদাসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১. শিশুর জন্মপূর্ব ও জন্ম পরবর্তী চিকিৎসা ও সেবাযত্ন;

২. সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য;

৩. লালন-পালন, যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

৪. স্নেহ ও ভালবাসা;

---

৪৮. ড. এ. এস. এম আতীকুর রহমান ও অন্যান্য, *সমাজ কল্যাণ* (গাজীপুরঃ প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪খ্রি.), পৃ.৫০-৫১

৫. স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান ও পরিধান;

৬. সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ;

৭. সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান;

৮. যথাযথ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা;

৯. শিশুকে নির্যাতন থেকে রক্ষা করা;

১০. প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্মল শিক্ষাঙ্গন;

১১. চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা;

১২. মনো-দৈহিক বিকারগ্রস্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা;

১৩. সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পরিবেশ তৈরি করা।

উপরিউক্ত চাহিদাগুলো শিশুর মৌলিক চাহিদা হিসেবে বিবেচিত। এসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়। তাই শিশুর স্বাভাবিক বর্ধন ও বিকাশ সাধনের মাধ্যমে শিশু কল্যাণ নিশ্চিতকরণের জন্য উক্ত চাহিদাসমূহের গুরুত্ব অত্যধিক।

বাংলাদেশ সরকারের শিশুকল্যাণ কার্যক্রম

শিশুকল্যাণ কার্যক্রম বলতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশের জন্য বাবা-মা ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সেবাকে বুঝায়। কোন সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর সেই সমাজের শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের বিস্তৃতি নির্ভর করে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পুরোপুরি কাঙ্ক্ষিত নয়। ফলে সরকারিভাবে শিশুকল্যাণ কার্যক্রমে এখনো পূর্ণতা আসেনি। এ দেশে শিশুকল্যাণ কার্যক্রম সরকারিভাবে শুরু হয় ১৯৬১-৬২ সালের দিকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে জাতির জনকবঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে বাংলাদেশে শিশু কল্যাণ কার্যক্রম তুলনামূলকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। এরপরে ধীরে ধীরে এ কার্যক্রম আরো বিস্তৃতি লাভ বরে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের শিশু আইন, ২০১৩ শিশু কল্যাণ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করেছে। এ আইনে ১৬ শ্রেণির অবহেলিত শিশুকে বঞ্চিত শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৮৪ ও ৮৫ এর আলোকে তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৮৫ তে বলা হয়েছে, “সুবিধাবঞ্চিত যে সকল শিশুর জন্য ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) অনুযায়ী মাতা-পিতাকেন্দ্রিক পরিচর্যা বা অ-প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করা যাবে না, অধিদপ্তর, এতদুদ্দেশ্যে সরকার প্রণীত নীতিমালার আলোকে, নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করবে। যথা:

(ক) সরকারি শিশু পরিবার;

(খ) ছোটমনি নিবাস;

(গ) দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুর্নবাসন কেন্দ্র;

(ঘ) সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র; এবং

(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।[৪৯]

এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের শিশুকল্যাণমূল সেবা সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

(ক) সরকারি শিশু পরিবার ও শিশু সদন

শিশুদের কল্যাণ ও উন্নয়ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম নীতি। বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু এতিম ও দুস্থ। তাই সরকার এ সকল শিশুদের প্রতি সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে সরকার যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে তারমধ্যে 'সরকারি শিশু পরিবার' অন্যতম। সরকারি শিশুসদন ও শিশু পরিবারের পূর্ব নাম ছিল এতিমখানা। 'এতিম' শব্দটির সাথে করুণা মিশ্রিত থাকায় ১৯৮১ সালে এর নামকরণ করা হয়েছে শিশুসদন। এটি পিতৃ-মাতৃহীন দরিদ্র শিশুদের লালন-পালনের একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান।[৫০] সরকার পিতৃহীন কিংবা পিতৃ-মাতৃহীন এতিম ও দুস্থ শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা, শিশু অধিকার সুরক্ষা ও আদর-যত্নে লালনপালনসহ তাদের সাধারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের জন্য সারা দেশে ৮৫টি শিশু পরিবার পরিচালনা করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বালক শিশু পরিবারের সংখ্যা ৪৩টি ও আসন সংখ্যা ৫৪০০, বালিকা শিশু পরিবারের সংখ্যা ৪১টি ও আসন সংখ্যা ৪৮০০ এবং মিশ্র শিশু পরিবারের সংখ্যা ১টি ও আসন সংখ্যা ১০০ (বালক ৫০, বালিকা ৫০)। এ সকল শিশু পরিবারে শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৫৪,৮৪৫ জন নিবাসীকে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।[৫১] শিশু পরিবারের শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ মেয়ে নিবাসীদের বিবাহ, পরিবার বা সমাজে আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শিশু সদনের কার্যক্রম নিম্নরূপ:

ক. বিনা খরচে এতিম ছেলেদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করা।

খ. অবৈতনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা;

গ. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা।

ঘ. চাকরি বা পুঁজি প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ. ছেলে-মেয়ে উভয়েরই বিবাহের ব্যবস্থা করা।

চ. প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা।

ছ. ছেলে-মেয়েদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে দলীয় তহবিল গঠন করা।

---

৪৯. *শিশু আইন*, ২০১৩, অনুচ্ছেদ: ৮৫, প্রাগুক্ত

৫০. আমীর হোসেন, এতিমের অধিকার সুরক্ষায় ইসলামের নির্দেশনা: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ, *কলা অনুষদ পত্রিকা* (ঢাকা: কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), খ. ৯, সংখ্যা: ১২-১৩, জুলাই ২০১৬-জুন, ২০১৮, পৃ. ১৩০

৫১. *জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৫ স্মরণিকা* (ঢাকা : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৫), পৃ.৫৮

জ. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

ঝ. খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

শিশু পরিবারের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক. এতিম ছেলেমেয়েদের পরিবারের মতো স্নেহ, ভালবাসা ও যত্ন প্রদান করা।

খ. প্রতিটি দল বা পরিবারের জন্য আলাদা রান্নাঘর, খাবার ঘর পড়ার ঘরের ব্যবস্থা করা।

গ. প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের পর প্রয়োজনে এখান থেকে শিশুসদনে স্থানান্তর করা।

ঘ. এদের প্রয়োজনে সদনের বাইরে পড়াশুনা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

ঙ. পরিবারের সদস্যদের জন্য বয়স অনুযায়ী মা, বড় আপা, বড় ভাই নিয়োজিত করা।

নিবাসীদের অবস্থানকাল ও পুনর্বাসন ভাতা

সাধারণত ৫-৯ বছর বয়সের এতিম দরিদ্র শিশুদের শিশুসদন ও শিশু পরিবারে ভর্তি করা হয়। এরপর ১৮ বছর অথবা এইচ.এস.সি পাস পর্যন্ত নিবাসীদের অবস্থানের বিধান রয়েছে। তবে এ সময়ের মধ্যে কেউ নিয়ম-শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কাজ করলে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হয়। শিশুসদন ও শিশু পরিবার থেকে নিবাসীদেরকে সমাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান করা হয়। নিয়ম অনুযায়ী ছেলে নিবাসী ২৫০ টাকা, অবিবাহিত মেয়ে নিবাসী ৫০০ টাকা এবং বিবাহিত মেয়ে নিবাসী ১০০০ টাকা করে পুনর্বাসন ভাতা পেয়ে থাক।

(খ) ছোটমনি নিবাস (বেবি হোম)

পিতৃ-মাতৃপরিচয়হীন বা দাবিদারবিহীন, ঠিকানাবিহীন পরিত্যক্ত ও পাচার হতে উদ্ধারকৃত ০০ হতে ০৭ বছর বয়সী শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ লালনপালনের জন্য ১৯৬২ সালে ঢাকার আজিমপুরে একটি 'ছোটমনি নিবাস' স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালে ১টি করে মোট ৫টি 'ছোটমনি নিবাস' স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এতিম, পরিত্যক্ত অভিভাবকহীন ও অবহেলিত শিশুদের লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি ছোটমনি নিবাস বা বেবি হোম রয়েছে। মাতৃস্নেহে এসব শিশুদের প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলা-ধুলা ও সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে এসব শিশুকে সরকারি শিশু সদনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।[৫২] এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০, এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ১,০৯০ জন।[৫৩] তন্মধ্যে বিগত ৫ বছরে (২০০৯ -২০১৩) ২১৭ জন শিশু পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত হয়েছে।[৫৪]

৫২. আমীর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০

৫৩. *জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৫ স্মরণিকা*, প্রাগুক্ত

৫৪. *পাঁচ বছরের সাফল্য চিত্র (২০০৯ - ২০১৩)*, (ঢাকা: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ডিসেম্বর ২০১৪), পৃ. ১৬

বেবী হোমের মূলত কার্যক্রম হলো- শিশুদের লালন-পালন, সংরক্ষণ, ভরণ-পোষণ, পড়াশোনা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা। এছাড়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সাধারণ শিক্ষা প্রদান, ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা প্রভৃতি এর অন্যতম কাজ। এর পুরো ব্যয়ভার সরকার বহন করছে।

(গ) এতিম ও দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

এতিম, দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষেণ ও ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থসামাজিক পুনর্বাসনের জন্য ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম গাজীপুরে বালকদের জন্য একটি 'দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রামে বালকদের জন্য এবং ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বালিকাদের জন্য 'শেখ রাসেল দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ তিনটি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮০০ এবং নিবাসীর সংখ্যা ৪৫৫ জন। সরকার বিগত ৫ বছরে (২০০৯ -২০১৩) ১,৪৬৩ জন শিশুকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করেছে। এ কেন্দ্রে এ পর্যন্ত মোট পুনর্বাসিত শিশুর সংখ্যা ৪,৪৩৭ জন।[৫৫] এতিম ও দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম একজন সহকারী পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এখানে যে সকল কার্যপরিচালনা করা হয় তন্মধ্যে অন্যতম হলো:

(১) ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। অভিভাবকদের নির্দিষ্ট ফরমে আবেদনের মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

(২) কেন্দ্রে রয়েছে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স। যেমন চামড়া কাজ, দর্জি বিদ্যা, কাঠমিস্ত্রীর কাজ, টিনের জিনিসপত্র তৈরি, মোটর গাড়ী চালনা ও মেরামত প্রভৃতি।

(৩) সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা।

(৪) নিবাসীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

(ঘ) বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান

উপরোল্লিখিত 'শিশু পরিবার' এবং 'ছোটমনি নিবাস' ছাড়াও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দেশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বেসরকারি এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও এতিমের সঠিকভাবে প্রতিপালনের জন্য অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট) প্রদান করছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের সুযোগ রয়েছে। এর আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ৩,৪৪১টি বেসরকারি এতিমখানায় ৬২,০০০ জন নিবাসীকে ভরণপোষণের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা হারে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে। যার পরিমাণ ৭৪.৪০ কোটি টাকা।[৫৬]

---

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭
৫৬. *প্রাগুক্ত*

(ঙ) প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের দক্ষ কারিগর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে ৫টি প্রাক-বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মসূচী চালু হয়েছে। সরকারি শিশু পরিবার তেজগাঁও, সরকারি শিশু পরিবার রূপগঞ্জ, সরকারি শিশু পরিবার চাঁদপুর, সরকারি শিশু পরিবার রাজশাহী এবং সরকারি শিশু পরিবার বাগেরহাট।[৫৭] এসব কেন্দ্রে শিশুদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিজেল ম্যাকানিজম, সাধারণ ফিটার্স, ওয়েল্ডিং, কাঠের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষ কারিগর দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ ৫টি প্রতিষ্ঠানে এ পর্যন্ত ২,২৪২ নিবাসী পুনর্বাসিত হয়েছে।[৫৮]

(চ) আমাদের শিশু

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরের প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড়ে অনেক শিশু মা, বাবা, অভিভাবক হারিয়ে অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। এসব শিশুদের সুরক্ষা ও লালনপালনের জন্য সরকার 'আমাদের শিশু' নামে একটি সমাজভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ইউনিসেফ ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় সমাজসেবা অধিদফতরের তত্ত্বাবধানে 'সিডর' আক্রান্ত ৩টি জেলার ৭টি উপজেলায়, ২১০০ জন পিতৃ-মাতৃহীন ও ঝুকিপূর্ণ শিশুকে সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন এবং সুরক্ষার জন্য প্রতিমাসে শিশুপ্রতি ১৫০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করছে।[৫৯] এছাড়াও CSPB (Child Sensetive Social Protection in Bangladesh) এর আওতায় Drop in Center (DIC), Emergency Night Shelter (ENS), Child Friendly Space (CFS) এবং Open Air School (OAS) এর মাধ্যমে সরকার পরোক্ষভাবে এতিম ও দুস্থ শিশুদের সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।[৬০]

সারণী-৭১ : এক নজরে এতিমের লালনপালনে সরকারি পরিচালনায় এতিম পুনর্বাসন কেন্দ্রের কার্যক্রম [৬১]

কার্যক্রম	ইউনিট সংখ্যা	পুনর্বাসন সংখ্যা
সরকারি শিশু পরিবার	৮৫টি	৫৪৮৪৫ জন
ছোটমনি নিবাস	৬ বিভাগে ৬টি	১০৯০ জন
এতিম ও দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৩টি	৪৩৩৭ জন
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান	৩৪৪১টি	১৯৮৫৪০ জন
এতিম ছেলেমেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪টি	কার্যক্রম শুরু

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এতিমের প্রতিপালন ও পুনর্বাসনের এ সকল উদ্যোগ অবশ্যই সন্তোষজনক। তারপরেও আমাদের দেশের অধিকাংশ এতিম ও দুস্থ শিশুদের প্রকৃত অবস্থা উল্লিখিত অবস্থা থেকে ভিন্নতর এবং

৫৭. আমীর হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২
৫৮. *জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৩ স্মরণিকা* (ঢাকা: সমাজসেবা অধিদফতর, জানুয়ারী ২০১৩), পৃ. ২৩
৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩
৬০. *জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৫ স্মরণিকা*, প্রাগুক্ত,পৃ.৫৯
৬১. *জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৩*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২; *পাঁচ বছরের সাফল্য চিত্র (২০০৯ - ২০১৩)*, প্রাগুক্ত

অনেক ক্ষেত্রে মানবেতরও। তারা সমাজ ও রাষ্ট্রের এ সকল উদ্যোগের পরেও যথার্থ প্রতিপালন ও পুনর্বাসনের অভাবে এবং বৈষম্যমূলক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অসহায় ও মানবেতর জীবন-যাপন করে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেখানেও পারিবারিক পরিবেশে শিশু সন্তান বেড়ে উঠা ও নিজেকে বিকশিত করার উপযুক্ত পরিবেশ নেই, যা ও রয়েছে তা খুবই সামান্য এবং অপর্যাপ্ত। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে খাবার-দাবার, খেলা-ধুলা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুণর্বাসনের ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি 'দৈনিক ইত্তেফাক' -এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়-

> "রাজধানীর আজিমপুরে অবস্থিত 'ছোটমনি নিবাস' এ চিকিৎসক নেই, নানা অব্যবস্থাপনায় চলছে অভিভাবকহীন শিশুদের এই সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে একশ শিশুর জন্য দু'জন চিকিৎসকের পদ থাকলেও দীর্ঘদিন যাবৎ নেই কোন চিকিৎসক। ফলে অসুখেবিসুখে কষ্টের সীমা থাকে না মা-বাবাহীন হতভাগ্য শিশুদের। তাছাড়া ভবন ঘিরে থাকা ময়লা আবর্জনার স্তুপে আছে ডেঙ্গুসহ নানা মশার উপদ্রব। এসব শিশুদের গায়ে নেই জামাকাপড়, পায়ে নেই জুতো, এলোমেলো চুল ও অপরিচ্ছন্ন কামড়া। জায়গার সঙ্কটে পড়ার আর খেলাধুলা এক ঘরেই হয়। ক্লাসরুমে চলে দাপ্তরিক কাজ। পিচ্ছিল শৌচাগারে তাদের যেতে হয় খালি পায়ে।"[৬২]

বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের গুরুত্ব

কিশোরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখার জন্য এবং অপরাধী শিশু-কিশোরের সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশে শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। সুস্থ, সবল ও প্রতিভাবান শিশু সবারই কাম্য। এজন্য শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগীয় ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ একান্ত অপরিহার্য। তাই শিশুর বিকাশের জন্য শিশুকল্যাণ খুবই জরুরি। শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষাদান, প্রশিক্ষণ, মেধার বিকাশ, সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত হয়। নিম্নে বাংলাদেশে শিশুকল্যাণের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো-

১। শিশুমৃত্যুর হার হ্রাসঃ বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার অত্যধিক। প্রসবকালীন মায়ের মৃত্যুর হারও বেশি। স্বাস্থ্যহীনতা, পুষ্টিহীনতা, অযত্ন প্রভৃতি কারণ এর জন্য দায়ী। শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, শিশুর জন্মকালীন ওজন স্বল্পতা দূরীকরণ, প্রসূতি মায়ের মৃত্যু হার হ্রাস প্রভৃতির জন্য এদেশে শিশুকল্যাণ কর্মসূচী অপরিহার্য।

২। এতিম শিশু সমস্যার সংকট দূরীকরণ: এদেশের এতিম শিশুদের অধিকাংশই দরিদ্র; তাই তারা স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতার শিকার। এদেশে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। এদের সন্তানেরা চরম আর্থিক সংকট ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার হন। শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিবারিক সংস্কারের অভাবে এরা সমাজের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে যায়। ফলে এসব এতিমদের অনেকেই আর্থিক অনটনের কারণে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে যায়। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে এমনকি বিভিন্ন জঙ্গী ও সন্ত্রাসীগোষ্ঠী এদেরকে ব্যবহার করে। তাই দেখা যায় এতিম শিশু-কিশোরদের অনেকেই কিশোর অপরাধী হিসেবে বেড়ে উঠে। এসব দরিদ্র এতিম সন্তানদের সমাজের মূল স্রোতের সাথে একীভূত করার জন্য

---

৬২. রাবেয়া বেবী, "ছোটমনিদের ছোটমনি নিবাস", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ আগষ্ট ২০১৫, কলাম: ৪, পৃ. ২০

এবং একজন আদর্শ দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি এতিম শিশুর প্রতিপালন ও পুনর্বাসন একান্ত জরুরী। আর এ জন্যই অধিকসংখ্যক শিশুসদন কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

৩। স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা হ্রাস: স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। এদেশের অধিকাংশ মা ও শিশু স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। বিশেষকরে ভিটামিন 'এ' এর অভাবে অসংখ্য শিশু অন্ধত্ববরণ করছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতায় ভোগা শিশু-কিশোরদের শারীরিক স্বাভাবিক বিকাশ হয় না। ফলে এরা সহজেই শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং দেখা যায় এ সকল শিশু-কিশোররা সহজে অপরাধপ্রবণতায় লিপ্ত হয়ে যায়। তাই এসকল শিশু-কিশোরদের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে এবং দেশের একজন কর্মক্ষম মানব সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য শিশুকল্যাণমূলক কার্যক্রম দরকার।

৪। মৌল চাহিদা পূরণ: মৌল মানবিক চাহিদা ছাড়াও শিশুদের আরো কিছু মৌল চাহিদা রয়েছে। এগুলো সঠিকভাবে ও যথাযথসময়ে পূরণ না হলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হলে তারা সমাজের বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়। শিশুকল্যাণ কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়।

৫। শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা করা: দেশের সকল শিশুর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বিশেষ করে দরিদ্র, প্রতিবন্ধী ও অক্ষম শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুকল্যাণ কর্মসূচীর প্রয়োজন রয়েছে। সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের সমস্যা সমাধানে শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই তাদের জন্য আলাদা করে শিক্ষার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে শিশুকল্যাণ কার্যক্রম বর্ধিত করা প্রয়োজন।

৫। শিশুশ্রম হ্রাস

এদেশে শতকরা ২৫.৫৫ ভাগ শিশু শিশুশ্রমে নিয়োজিত। অপরিণত বয়সে শ্রমদানের ফলে অনেক শিশু অপুষ্টি ও বিকলাঙ্গের শিকার হচ্ছে। ফলে তারা ন্যূনতম মৌল চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছে। শিশুর পরিবার কর্তৃক শিশুদের দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে না পারার কারণে শিশুরা বাধ্য হয়ে শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে। তাই এসকল শিশুর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শিশুকল্যাণ কর্মসূচী গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।[৬৩]

উপরোক্ত আলোচনান্তে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধান, শিশু আইন, শিশু নীতিমালা, জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ ও বার্ষিক বাজেটে যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে শিশু-কিশোর সংবেদনশীল বিষয়সমূহ স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে শিশু-কিশোরের সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য শিশু উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরের বিশেষ সুরক্ষামূলক শিশু কল্যাণ কর্মসূচী চলমান রয়েছে। এসকল আইন, নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়নে শিশু-কিশোরের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব।

---

৬৩. মুস্তফা মান্না, *বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ঢাকা), পৃ. ৩৩

সপ্তম অধ্যায়

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার : ইসলামের দিকনির্দেশনা

সপ্তম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইসলাম ও শিশু-কিশোরের মর্যাদা

ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইসলাম (الإِسْلَامُ) শব্দটি আরবি سلم ধাতু থেকে উদ্ভূত। বুৎপত্তিগতভাবে এর কয়েকটি অর্থ হল: সন্ধি ও নিরাপত্তা, শান্তি, আনুগত্য ও হুকম পালন, আত্মসমর্পন করা ও কল্যাণ লাভ করা।[১] আরবি অভিধানে বলা হয়েছে ইসলাম (الإِسْلَامُ) অর্থ- সমর্পণ, আত্মসমর্পণ, ইসলাম গ্রহণ।[২] سلم এর আরেক অর্থ হলো কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ, যা কাঁটাযুক্ত হওয়ায় বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে।[৩] শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর অনুগত হওয়া, আনুগত্য করা ও তাঁর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা;[৪] বিনা দ্বিধায় তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) যে বিধান নিয়ে এসেছেন সে অনুসারে জীবন যাপন করা।[৫] আর যিনি ইসলামের বিধান অনুসারে জীবনযাপন করেন, তিনি হলেন মুসলিম।[৬] সৈয়দ আমীর আলী বলেন, "সালামা (سلم) শব্দটি প্রাথমিক অর্থে শান্তিতে থাকা, কর্তব্য সম্পাদন করা, দেনা শোধ করা, পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে অবস্থান করা বুঝায় আর গৌণ অর্থে শব্দটি যাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা বুঝায়।"[৭] পবিত্র কুরআনে ইসলাম (الإِسْلَامُ) শব্দটি সরাসরি জীবনবিধান হিসেবে ৮ টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[৮] এছাড়া পবিত্র কুরআনে (سلم) পদমূলটি ১৪০ এরও অধিকস্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।[৯] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অর্থে ব্যবহার নিম্নরূপ:

১। যুদ্ধ বিরতির জন্য সন্ধি বা শান্তির প্রস্তাব অর্থে। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অর্থ: কাফিররা যদি সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তাহলে আপনিও সন্ধি করতে আগ্রহী হবেন (আল-কুরআন, ৮: ৬১)।

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬), খ. ৫, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫১২
২. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫খ্রি.), পৃ. ৯৯
৩. ড. মুহাম্মদ রাওস কালতা'জী (সম্পাদিত), *মু'জামুল লুগাতিল ফুকাহা* (বৈরুত: দারুন নাসায়িস, ১৪৩১হি.), প. ২২২
৪. আল্লামা সা'দুদ্দীন আত-তাফতাযানী, *শরহুল আকাইদ লিন-নাসাফিয়্যা* (ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৪২৮ হি.), পৃ. ৯১
৫. ইমাম আবুল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরাব* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৪১১হি.), পৃ. ২০৮০
৬. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ৩৩
৭. সৈয়দ আমীর আলী, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* (কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৭), পৃ. ২১৯
৮. আল-কুরআন, সূরা ও আয়াত নং-৩: ১৯ ও ৮৫; ৫: ৩; ৬: ১২৫; ৯: ৭৪; ৩৯: ২২; ৪৯: ১৭; ৬১: ৭
৯. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *আল-মু'জামুল মুফাহারাস লিআলফাযিল কুরআন* (কাহেরা: দারুল হাদীস, ১৩৬৪ হি.), পৃ. ৩৫৭

২। ইসলামি বিধান অর্থে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلَامُ- অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান (আল-কুরআন, ৩: ১৯)।

৩। শান্তি কামনাসূচক মুসলিম অভিবাদন অর্থে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ- অর্থ: যখন সে মেহমানগণ ইব্রাহীমের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন: সালাম। জবাবে তিনও বললেন: সালাম (আল-কুরআন, ৫১: ২৫)।

৪। ইসলাম অর্থে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً অর্থ: তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলাম গ্রহণ কর (আল-কুরআন, ২: ২০৮)।

৫। শান্তি প্রস্তাব অর্থে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً অর্থ: কাজেই তারা যদি তোমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তির প্রস্তাব করে। তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে (শাস্তিমূলক) কোন ববস্থা গ্রহণের পথ রাখেননি (আল-কুরআন, ৪: ৯০)।

৬। শান্তি অর্থে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ- অর্থ: আল্লাহ চিরস্থায়ী শান্তির বাসস্থানের দিকে আহ্বান করেন (আল-কুরআন, ১০: ২৫)।

৭। আত্মসমর্পণ করা অর্থে। যেমন, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ- অর্থ: হ্যাঁ (প্রকৃত ব্যাপার হল), যে পুরোপুরি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে (আল-কুরআন, ২: ১১২)। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ- অর্থ: যখন ইব্রাহীমকে তার প্রতিপালক বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', ইব্রাহীম বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ কররলাম। (আল-কুরআন, ২: ১৩১)

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার মনোনীন একমাত্র দীন- একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে একজন মুসলমানকে জীবনযাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থা মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে প্রেরিত ও মনোনীত। পবিত্র কুরআনে এ ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلَامُ অর্থ: "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হল ইসলাম।"[১০]

---

১০. আল-কুরআন, ৩: ১৯; অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে- وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
অর্থ: ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসরণ করলে তা কখনো কবুল করা হবে না বরং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে (আল-কুরআন, ৩: ৮৫)।

ইসলামের পরিচয় দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীসে জীব্রাঈলে বর্ণিত আছে-

عَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا–

অর্থ: ওমর ইবন খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, ... রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, ইসলাম হচ্ছে, তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল, নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ হয় তখন বাইতুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে।[১১]

পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে এ জীবনব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। এরপর মহান আল্লাহ যুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণের মাধ্যম্যে ঐশ্বরিক জীবনব্যবস্থার পথনির্দেশনা অব্যাহত রাখেন। হাদীসের বর্ণনা মতে এ পথপরিক্রমায় ১২৪,০০০ (এক লক্ষ চব্বিশ হাজার) পয়গাম্বর বা নবী রাসূল প্রেরণ করে মহান আল্লাহ মানব জাতির প্রতি তাঁর কল্যাণের পরিপূর্ণতা দান করেন।[১২] হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে নবী-রাসূলগণের যে সিলসিলা শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর মাধ্যমে। হযরত আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে নবী-রাসূলগণের যে সিলসিলা শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে। তিনি সর্বশেষ রাসূল, তাঁর পরে কোন নবী বা রাসূল আসবেন না।[১৩] তাঁর প্রতি সর্বশেষ আসমানী কিতাব আল-কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম্যে পরিসমাপ্ত হওয়া বিধানের নাম ইসলাম।

হযরত আদম (আ.) -এর উপর অবতীর্ণ হওয়া ১০ খানা সহীফা প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের বিধিবিধান অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর উপর অবতীর্ণ কুরআন নাজিল এবং তাঁর ওফাতের মাধ্যমে ইসলামের এ ধারা পূর্ণাঙ্গ হয়। মোট ১০৪ খানা ঐশী গ্রন্থের মধ্যে ১০০ খানা সহীফা ও বাকী ৪ খানা বড় আসমানী গ্রন্থ্। তবে এসব গ্রন্থের মূলবক্তব্য ও বিষয়বস্তু আল-কুরআনে সন্নিবেশিত আছে।[১৪] যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর আগমন এবং তাঁর প্রতি প্রেরিত আসমানী কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতরণের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সমস্ত শরী'আহ রহিত বা বাতিল হয়ে গিয়েছে। তাই এখন ইসলাম বলতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর শরী'আতকে এবং মুসলিম বলতে উম্মতে মুহাম্মাদীকেই বুঝায়। এ হিসেবে ইসলামের সংজ্ঞা হলো,

---

১১. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ বায়ানুল ঈমান ওল ইসলাম ওয়াল এহসান (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৯হি.), হাদীস নং- ৮

১২. বিস্তারিত দেখুনঃ ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল*, মুসনাদুল আনসার, হাদীসু আবূ উমামা আল-বাহলিয়্যা আনিন-নাবী (সা.) (বৈরুতঃ মুওয়াস্‌সাসাতুল রিসালাহ, ১৪১৬ হি.), হাদীস নং-২২২৮৮

১৩. বিস্তারিত দেখুনঃ আল-কুরআন,৩৩ঃ ৪০

১৪. বিস্তারিত দেখুনঃ ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *আল-জামি' লিশু'আবিল ঈমান*, বাবঃ ফি তা'যিমিল কুরআন, ফছলঃ ফি ফাযায়িলিস সূরাত ওয়াল আয়াত/ফাতিহাতুল কিতাব, রিয়াদঃ মাকতাবাতুর রূশদ, ২০০৩খ্রি., হাদীস নং-২৩৭১; আবূল ফদল আব্দুর রহমান জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফি 'উলূমিল কুরআন* (কায়রোঃ মাকতাবাতুল তাওফিকিয়্যা, ২০০৮ খ্রি.), খ.১, পৃ. ১৯২-২০২

هُو تَصديقُ سيِّدِنا مُحمدٍ صلي الله عليه وسلم فى جميعِ ماجاءَ بِهِ عنِ الله تَعالى مِمَّا عُلِم مَجِيئهُ ضَرُورةً– অর্থ: "আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যে আদর্শ ও বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন, যা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করাকে ইসলাম বলে।"[১৫] অর্থাৎ সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নিকট প্রেরিত আসমানী জীবন বিধানকে ইসলাম বলা হয়। এ পরিপূর্ণ জীবন বিধান ইসলাম মৌলিক পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ পাঁচটি স্তম্ভ হলো-ঈমান, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্জ । মহানবী (সা.) -এর পবিত্র বাণীতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ–

অর্থ: আব্দুল্লাহ ইবন ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ সম্পাদন করা এবং রমযানের রোযা রাখা।"[১৬]

উপরোল্লিখিত রুকন বা স্তম্ভসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান যে স্তম্ভ -তার নাম ঈমান। মহান আল্লাহর তাওহীদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসই মূলত ঈমান। আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি এবং এবং কাউকে জন্ম দেননি। তিনি এই মহা জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক এ বিশ্বাসই ঈমান।[১৭] সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায়-

اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ– অর্থাৎ-"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সকল কিছুর ধারক, চির জাগ্রত। তাঁকে তন্দ্রা বা ঘুম স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে এবং পেছনে যা কিছু আছে তিনি সবই জানেন। তিনি যতটুকু আয়ত্ব করতে দেয়ার ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তাঁর আসন স্থাপিত (ব্যাপৃত)। এ সকল কিছুর হিফাযত তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, সর্বোচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ।"[১৮]

---

১৫. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (রহ), *কাওয়াইদুল ফিকহ* (ঢাকা: বই পল্লী, ২০১১খ্রি.), পৃ. ১৭৭

১৬. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাব: দুআউকুম ঈমানুকুম (আল কাহেরা: মাকতাবাতুস সাফা, ১৪২৩হি.), হাদীস নং-৮

১৭. আল-কুরআন, ১১২: ১-৪

১৮. আল-কুরআন, ২: ২৫৫

বর্তমান বিশ্বে সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী ইসলামের অনুসারী। এই মুসলিম অনুসারীদের যাত্রা শুরু ৬১০খ্রিস্টাব্দে মক্কা নগরীর কুরাইশ বংশের হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর রিসালাত তথা নবূওয়াত প্রাপ্তি এবং দাওয়াতের মাধ্যমে। পবিত্র হেরা পর্বতের গুহায় তাঁর প্রতি ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ আসার পর থেকেই মূলত ইসলামের যাত্রা শুরু হয়। তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁর স্ত্রী খাদিজাতুল কুবরা, আবূবকর সিদ্দীক (রা.) এবং আলী (রা.)। আজ ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা ১.৯ বিলিয়ন এর বেশি।[১৯]

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম-দীনে ফিতরাত।[২০] আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে সহজাত প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাই হলো ফিতরাত। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করে ঘোষণা করা হয় যে,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ– অর্থ: "অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং আল্লাহ যে ফিতরাত বা সৎপ্রকৃতি অনুসারে মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর দেয়া সে প্রকৃতির অনুসরণ করুন। বস্তুত আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানে না।"[২১]

ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়; এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার নাম। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তা'আলা প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। কুরআন তাঁর প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ। মহানবী (সা.) -এর নবূওয়াত প্রাপ্তির পর পূর্ববর্তী শরী'আহ ও কিতাব সবই রহিত হয়ে গিয়েছে। এরপর আর কোন নবী আসবেন না। যারা এ আকীদা পোষণ করবেন তারাই মুসলিম। আর এ মুসলিমদের অনুসরণীয় ঐশ্বরিক বিধান ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে কোন খুঁত নেই, নেই কোন অপূর্ণাঙ্গতা, নেই কোন সন্দেহের অবকাশ-এটি একটি শাশ্বত ও পরিপূর্ণ বিধান। ইসলামের পরিপূর্ণতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا– অর্থ: "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমতকে পরিপূর্ণতা দান করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।"[২২] মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সার্বিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতির সন্নিবেশ রয়েছে ইসলামে। এমন কোন মূলনীতি নেই যা ইসলামে আলোচিত হয়নি।[২৩] মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সঠিক পথনির্দেশনা ও সমস্ত কল্যাণের সুসংবাদ রয়েছে

---

১৯. Lipka, Micheal, Hackett and Conard, *World Religion* (Pew Research Center Demographic Projection,2017); "The Future of the World Religions: Population Growth Projection, 2010-2050", Pew Research Centre,2017; religiouspopulation.com; muslimpopulation.com

২০. বিস্তারিত দেখুন: ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাযিয, বাব: মা কিইলা ফি আওলাদিল মুশরিকিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৮৫; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল কাদর, বাব: মা'আনা কুল্লি মাওলুদি ইউলাদু আলাল ফিতরাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৫৮

২১. আল-কুরআন, ৩০: ৩০

২২. আল-কুরআন, ৫: ৩

২৩. বিস্তারিত দেখুন: আল-কুরআন, ৬: ৩৮

আল-কুরআনে।[২৪] পবিত্র কুরআনের এসকল নির্দেশনার আলোকে এ কথা বোঝা যায় যে, মানব জাতির জীবনে যাকিছু প্রয়োজন তার সব কিছুর নীতি-নির্ধারণী বিবরণ আল-কুরআনে আছে। প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর পবিত্র জীবনার্দশের ভিত্তিতে সব কিছুই নির্ধারণ করতে হবে। মানুষের ঈমান-আকীদা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতিসমূহ ইসলামে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষেই পরিপূর্ণ এবং অতুলনীয়। এতে নতুনভাবে কোনকিছু সংযোজন বা বিয়োজন করার আদৌ কোন প্রয়োজন এবং অবকাশ নেই।

ইবাদাত

মহান আল্লাহ তা'আলা সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে উপরোল্লিখিত যে জীবনবিধান-ইসলাম প্রদান করেছেন, তা অনুশীলনের নামই ইবাদাত।[২৫] ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জাতি মহান আল্লাহর আবদ বা বান্দা, যাকে আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ– অর্থাৎ-"আমি জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল এ উদ্দেশ্যে যে, তারা শুধুমাত্র আমার ইবাদাত করবে।"[২৬] এ ইবাদাতের মধ্যে ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের প্রথম স্তম্ভ 'ঈমান' হলো বিশ্বাসগত ইবাদাত এবং বাকী চারটি স্তম্ভ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আনুষ্ঠানিকভাবে মৌলিক ইবাদাতরূপে গণ্য। এর প্রত্যেকটিই শরী'আতের বিধান অনুযায়ী পালন করা অবশ্যকর্তব্য। তবে ইসলামের ইবাদাতের ধারণা শুধুমাত্র নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের ইহজগতের সকল কর্ম বা সার্বিক জীবনাচরণই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত, যদি তা ইসলাম প্রদর্শিত বিধান অনুয়ায়ী পরিচালিত হয়। প্রতিদিনের সকল কাজ-কর্মে আল্লাহর নির্দেশ পালন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর আদর্শ অনুসরণই হলো উল্লিখিত ইবাদাতের তাৎপর্য।

ইমাম তায়মিয়া তাঁর 'রিসালাতিল উবূদিয়্যাত' গ্রন্থে ইবাদাতের পরিচয়ে বলেন, ইবাদাত একটি ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যে কথা ও কাজই তিনি পছন্দ করেন, যাতে তিনি খুশী ও সন্তুষ্ট

২৪. বিস্তারিত দেখুন: আল-কুরআন, ১৬: ৮৯

২৫. المخصص গ্রন্থে বলা হয়েছে, আরবি অভিধান অনুযায়ী ইবাদাত (العبادة) অর্থ الخضوع -বশ্যতা, আনুগত্য, বিনয় ও বাধ্যতা, والتذلُّلُ অবনত, আত্মসমর্পণ। العبادة الخضوع والتذلل الا ستكانه এই শব্দগুলির অর্থ অভিন্ন। বিনয়-অধীনতা-আনুগত্যের ভিত্তিতে আল্লাহর যে আইন পালন তাই ইবাদাত।" (আবূ হাসান আলী ইবন ইসমাইল নাহবী ইবন সিদাহ আন্দালুসী, *আল-মুখাস্সাস*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি., খ. ১৩, পৃ, ৯৬)। ইবাদাত এমন এক ধরনের আত্মসমর্পণমূলক আনুগত্য, যা জীবন, বুঝ-সমঝ, শ্রবণ-দৃষ্টি ইত্যাদির দাতা ছাড়া আর কেউ পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। ইমাম রাগিব তার লুগাত গ্রন্থে লিখেছেন, –العبودية اظهار التذلل والعبادو وابلغ منها لا نها غاية التذيل ولا يستحقماالا من له غاية الافضال و هو الله تعالى অর্থ: "উবুদিয়াত অর্থ বিনয়-নম্রতা-অধীনতা প্রকাশ করা। আর ইবাদাত হচ্ছে তারই চূড়ান্ত মাত্রা; কেননা ইবাদাত অর্থ সর্বশেষ মাত্রার আনুগত্য-অধীনতা-আত্মসমর্পণ। তা কেবল সেই মহান সত্তাই পাওয়ার অীধকারী যিনি চূড়ান্ত মান ও পরিমাণের দাতা। আর তিনিই আল্লাহ। 'লিসানুল আরাব' অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে- 'উবুদিয়াত এর মূল অর্থ হচ্ছে বিনয়, আনুগত্য, অধীনতা ও দাসত্ব (ইমাম আবূল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মানযুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭৭)। এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে-لا يَقُل احدكم عبده عبدى وامتى وليقل فتاى فتاتى অর্থ: "তোমাদের কেউ যেন তার ক্রীতদাস-দাসীকে আমার দাস, আমার দাসী না বলে, বরং যেন বলে, আমার ছেলে, আমার মেয়ে (ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল*, মসনদে আবি হুরাইরাতা রা., বৈরুত: মাওসুসাতুলর রিসালাহ, ১৪১৬হি., হাদীস নং-৯৭২৯)।

২৬. আল-কুরআন, ৫১: ৫৬

হন, যেমন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, সত্য কথা বলা, আমানতের সংরক্ষণ ও ফেরত দান, পিতা-মাতার কল্যাণ সাধন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, ওয়াদাপূরণ, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ, কাফির-মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জেহাদ, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার, ইয়াতীম-মিসকীন-নিঃস্ব, পথিক-অধীন মানুষ ও পশুদের হক আদায়, যিকর, কুরআন তিলাওয়াত এবং এ ধরনের আরও বহু কাজই ইবাদাতরূপে গণ্য। আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা, আল্লাহকে ভয় করা, তাঁরই কাছে আত্মসমর্পিত হওয়া, তাঁর জন্যই আনুগত্য খালেস করা, ধৈর্যসহকারে তাঁর হুকম-বিধান পালন, তাঁর নিয়ামতের শোকর, তাঁর ফয়সালায় রাজি থাকা, তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল, তাঁর রহমত পাওয়ার আশা-বাসনা পোষণ এবং তাঁর আযাবকে ভয় করা প্রভৃতি ইবাদাতের অপরিহার্য গুণাবলী।[২৭]

দীনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ, রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা, মুসলমানদের পাস্পরিক সম্পর্ক, অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক-শান্তি ও যুদ্ধ-এসবকিছু সমান গুরুত্বসহকারে ইবাদাতের মধ্যে শামিল রয়েছে। ফলে মানুষ আল্লাহর আবেদ হতে পারে তখনই যখন তার গোটা জীবন শরী'আতের অনুসারী ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবাদাতের নির্দেশনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ– "আমি আপনার আগে যত রাসূল প্রেরণ করেছি তাদের প্রত্যেকের নিকট এ ওহী প্রেরণ করেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। কাজেই তোমরা কেবল আমারই ইবাদাত কর।"[২৮]

ঈমান

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান স্তম্ভ হলো ঈমান, বাকী সকল স্তম্ভ কারো জীবনে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঈমান ব্যতীত মুমিন হওয়া যায় না। ঈমানের শাব্দিক অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামে ঈমানের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানীর (রহ) মতে, ঈমানের শাব্দিক অর্থ হলো বিশ্বাস করা। শুধু মুখে স্বীকৃতি প্রদান করার নাম ঈমান।[২৯] তবে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রহ.) বলেন, ঈমানের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে।[৩০] আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মতে, ঈমান হলো হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের নাম। 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা উপাস্য নাই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসূল' এই সাক্ষ্য প্রদান করা ইলামের প্রধান ও মূল ভিত্তি। ইসলামের অবশিষ্ট সকল ভিত্তি এবং ইসলামি জীবন দর্শনের সকল নীতি, আদর্শ, বিধি-বিধান, জীবন-দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি সুনির্দিষ্টভাবে এ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈমানে 'আল্লাহ

---

২৭. শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দিন আহমদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তায়মিয়া, *আল-কাওয়াশিফুল মুধিয়াতু লি রিসালাতিল উবূদিয়্যাত* (বৈরুত: দারুল ঈমান, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮-৯

২৮. আল-কুরআন, ২১: ২৫

২৯. হাফেজ আহমদ ইবন আলী ইবন হাজর আসকালানী (রহ.), *ফতহুল বারী বি শারহি সহীহুল বুখারী* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাত, তা.বি.), খ. ১, পৃ. ৪৬

৩০. শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দিন আহমদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তায়মিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

একমাত্র উপাস্য এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর রাসূল' এই সাক্ষ্যের সাথে সাথে আরো কয়েকটি বিশেষ সাক্ষ্য দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে এ সকল অনিবার্য বিষয়ে সাক্ষ্যদানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا– অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং ঈমান আন সে কিতাবের প্রতি যে কিতাব তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন আর সে কিতাবের প্রতিও ঈমান আনে যে কিতাব তিনি এর আগে নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ এবং আখিরাতে অবিশ্বাস করে, সে তো ভয়ানকভাবে অতি দূরত্বের পথহারা হয়ে যায়।"[৩১]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর অসংখ্য হাদীসে ঈমানের বিষয়সমূহ আলোচিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিকট থেকে হাদীসে জীব্রাঈল এর মাধ্যমে ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণিত হয়েছে, জীব্রাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রশ্ন করলেন, فَأَخْبِرْنِي عَنْ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ– অর্থ: হে মুহাম্মাদ (সা.)! আমাকে বলুন ঈমান কী? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "ঈমান হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করা, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি, শেষ বিচার দিবসের প্রতি, তাকদীর বা ভাগ্যেও ভাল-মন্দের (সব আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমান।"[৩২] যিনি এ বিষয়গুলোতে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন করবেন তিনিই মুমিন বা ঈমানদার। ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ–অর্থ: "যার মধ্যে তিনটি গুণ রয়েছে সে ঈমানের পরিপূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া; (২) কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা;(৩) কুফরীতে প্রত্যাবর্তনকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপছন্দ করা।"[৩৩]

---

৩১. আল-কুরআন, ৪: ১৩৬

৩২. ইমাম হাফেজ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ বায়ানুল ঈমান ওল ইসলাম ওয়াল এহসান, প্রগুক্ত, হাদীস নং- ৮

৩৩. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ হালাওয়াতিল ঈমান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬,২১,৬৯৪১; ইমাম হাফেজ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ খিসালু মানিততাসাফা বিহিন্না ওয়াদা হালাওয়াতাল ঈমান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৩

আল্লাহ তা'আলার পরিচয়

আল্লাহ (ﷲ) শব্দটি মহান সৃষ্টিকর্তার ইসমে যাত বা সত্তাবাচক নাম। ইসলাম ধর্মমতে বিশ্বজগতের একমাত্র স্রষ্টা এবং প্রতিপালকের নাম আল্লাহ।[৩৪] সলফে সালেহীনদের বিশুদ্ধ মতানুসারে আল্লাহ শব্দটি ঐ চিরন্তন সত্তার সত্তাবাচক নাম যাঁর অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী এবং যিনি সমস্ত প্রশংসনীয় ও উত্তম গুণাবলীর অধিকারী। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাই এ নামের দ্বিবচন ও বহুবচন হয় না। অধিকাংশ আলিমের মতে আল্লাহ শব্দটি কোন বিশেষ ধাতু হতে উদ্ভূত নয়। কোন ভাষায় এর হুবহু বা যথার্থ অর্থজ্ঞাপক কোন শব্দ নেই। অন্য কোন ভাষায় আল্লাহ শব্দের কোন অনুবাদও হয় না। খ্রিস্ট্রান এবং ইহুদীসহ আব্রাহামীয় সকল ধর্মে আরবি ভাষা-ভাষী লোকই ইশ্বরকে বুঝাতে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করে থাকে।[৩৫] বর্তমান যুগের আরবি ভাষাভাষী খ্রিস্টানদের ব্যবহারের জন্য ঈশ্বরকে ঈঙ্গিত করতে আল্লাহ ব্যতীত উপযোগী অন্য কোন শব্দ নেই। এমনকি আরবি বংশোদ্ভূত মাল্টাবাসী রোমান ক্যাথলিক, ইশ্বরকে বুঝাতে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেন।[৩৬] সুতরাং খোদা, God, ইশ্বর কোনটাই আল্লাহ শব্দের সম্যক পরিচয় বহন করতে পারে না।[৩৭]

শরহুল আকাইদ লিন-নাসাফিয়্যা গ্রন্থে আল্লাহর পরিচয়ে বলা হয়েছে- "এ মহা বিশ্বের অবশ্যই একজন কাদীম তথা অনাদি-অনন্ত সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তিনি সবসময় আছেন এবং থাকবেন। তাঁর অস্তিত্ব সন্দেহাতীত ও অবশ্যম্ভাবী। প্রশংসনীয় সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা তিনি গুণান্বিত। সব ধরনের দোষত্রুটি হতে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। সকল কিছুই তার জ্ঞানের আওতাভুক্ত। সকল সম্ভাব্য বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাশালী। সকল সৃষ্টি তাঁর ইচ্ছায় আবর্তিত। তিনি সর্বশ্রোতা ও সম্যক দ্রষ্টা। তাঁর কোন উদাহরণ নেই। তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং নেই কোন সহযোগী। তাঁর কোন নযীর নেই, তিনি বে-মেছাল সত্তা। তাঁর অবশ্যম্ভাবী ও নিত্য অস্তিত্বে, ইবাদাত-বন্দেগীর অধিকারে এবং বিশ্ব জাহানের শৃঙ্খলা বিধানে কেউ তাঁর শরীক নেই। তিনি অসুস্থকে সুস্থ করেন, সকল সৃষ্টবস্তুর রিয্ক দেন এবং সব ধরনের অসুবিধা ও কষ্ট দূর করেন তিনিই। আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন সত্তায় প্রবিষ্ট ও একীভূত হওয়া থেকে পবিত্র। তিনি দেহ বিশিষ্ট নন এবং কোন দিক বা স্থানের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। মুমিনগণ আখিরাতে তাঁর দীদার লাভে ধন্য হবেন। তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা হয় না। তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কাজ সম্বন্ধে তাঁকে জবাবদিহী করতে হয় না। তার প্রতিটি কাজই হিকমাতপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন। তিনি ব্যতীত যথার্থ কোন নির্দেশ দাতা নেই এবং নেই কোন হাকীম। আরশ্, কুরসী, লাওহ-কলম,

---

৩৪. John Stephen Bowden (edited), *The Encyclopeadia of Christianity*, 'Islam and Christianity' (Oxford: Oxford University Press, 2005), p.284

৩৫. William Bridgwater (edited), *The Colombia Encyclopeadia* (Colombia: Colombia University Press, 2nd Edition, 1950), p. 327

৩৬. Lewis Bernard Holt, Lambton, Ann Katherein Swynford, *The Cambidge History of Islam* (England: Cambridge University Press,1997), p.32

৩৭. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২

আসমান-যমীন, গাছ-পালা, বৃক্ষলতা এককথায় দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যতকিছু রয়েছে সবকিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি চিরঞ্জীব। তিনি স্ব-অস্তিত্বে সর্বদা বিরাজমান।"[৩৮]

আল্লাহ তা'আলা সত্তাগত দিক থেকে যেমনি এক ও অদ্বিতীয়, অনুরূপভাবে গুণাবলীর দিক থেকেও তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি লা শরীক। ইবাদাত-বন্দেগীর ব্যাপারেও তার কেন শরীক নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ- অর্থাৎ-"তোমাদের ইলাহ (উপাস্য) তো একমাত্র ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি পরাম করুণাময়, অসীম দয়ালু।"[৩৯] সূরা এখলাসে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- اللَّهُ الصَّمَدُ- لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ- وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ-

অর্থ: "(হে নবী!) আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ; এক–অদ্বিতীয়; আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"[৪০] এভাবে একাধিক ইলাহ বা উপাস্য থাকার সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ- অর্থ: "যদি আকাশসমূহ ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া আরো ইলাহ থাকত, তাহলে উভয়েই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে আরশের অধিপতি আল্লাহ তা'আলা তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, মহিমাময়।"[৪১] একাধিক ইলাহ হওয়ার ধারণা অবাস্তব। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আরো বর্ণনা করা হয়েছে, مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ- অর্থ: "আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি। তাঁর সাথে (শরীক) কোন ইলাহ নেই, যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেত এবং একজন অন্যজনের উপর প্রভাব বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ কতই না পবিত্র।"[৪২]

একাধিক ইলাহ হওয়ার ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। এর পেছনে কোন যুক্তি-প্রমাণ নেই। এরপরেও কেউ কেউ ভিন্ন কিছুর পূজায় লিপ্ত হয় আবার কেউ নিজেই ইলাহ হওয়ার দাবী উত্থাপন করে। যেমন ফেরাউন ও নমরুদ। এ বিষয়ে নমরুদের সাথে ইব্রাহীম (আ.) এর বিতর্কের বিষয়টি আল-কুরআনে উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ-

৩৮. আল্লামা সা'দুদ্দীন আত-তাফতাযানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২; *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২
৩৯. আল-কুরআন, ২: ১৬৩
৪০. আল-কুরআন, ১১২: ১-৪
৪১. আল-কুরআন, ২১: ২২
৪২. আল-কুরআন, ২৩: ৯১

অর্থ: "(হে রাসূলুল!) আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেননি, যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, এ কারণে যে, যেহেতু আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে (নমরুদ) রাজত্ব দিয়েছিলেন? (স্মরণ করুন সে সময়ের কথা) যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, 'আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান।' সে বলেছিল, 'আমিও জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই।' তখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তুমি পারলে একে পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর।' তখন সে কাফির হতভম্ব হয়ে পড়লো। আর আল্লাহ তো যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত প্রদান করেন না।"[৪৩]

উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহর সত্তা অসীম। আমাদের জ্ঞান সসীম। এ সসীম জ্ঞানের মাধ্যমে অসীম প্রভুর সত্তা সম্বন্ধে যথাযথ পরিচয় লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি আল-কুরআনের বহু আয়াতে নিজের গুণবাচক পরিচয় তুলে ধরেছেন। ইমাম আবূ মনসূর আল-মাতুরিদী (র) এর মতে আল্লাহর সত্তাসূচক গুণ আটটি।[৪৪] হায়াত, ইলম, ইচ্ছা, কুদরত বা শক্তি, শ্রবন, দৃষ্টি, কালাম এবং তাকভীন।[৪৫] আর তার শান যেমন অসংখ্য ও অগণিত, অনুরূপভাবে তাঁর সিফাতও অসংখ্য। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে উল্লেখ করা হয়- إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ –অর্থ: "আল্লাহর নিরানব্বইটি অর্থাৎ একটি কম একশটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা স্মরণে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৪৬]

নবী ও রাসূল

মানুষের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে সকল মহামানবকে মনোনীত করেছেন, তাঁদেরকেই নবী বা রাসূল বলা হয়। রাসূল শব্দের অর্থ প্রেরিত মহামানব বা পয়গম্বর। শরী'আতের পরিভাষায়, আল্লাহর বিধি-বিধান সৃষ্টির নিকট পৌঁছানের লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত ব্যক্তিকে 'রাসূল' বলা হয়।[৪৭] রাসূল শব্দের বহুবচন রুসুল। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে শব্দটি একবচন ও বহুবচন উভয়ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে সত্যস্বপ্ন অথবা ইলহাম অথবা ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে যার প্রতি বিশেষ ধরনের ওহী নাযিল হয়েছে এরূপ মনোনীত মহামানবকে 'নবী' বলা হয়। নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আল্লাহর মনোনীত যেসব বান্দাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে এবং যাঁদেরকে নতুন শরী'আহ দেওয়া হয়েছে, তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়। পৃথিবীতে যেসকল নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নবী-রাসূলের

---

৪৩. আল-কুরআন, ২: ২৫৮

৪৪. ইমাম আবূ মনসূর আল-মাতুরিদী (র), *মিনহাজুল মাতুরিদী ফিল আকিদাতি* (রিয়াদ: দারুল ওত্বান, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৪৫

৪৫. এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে: ৬৭: ১৩-১৪; ৬: ৫৯, ১১: ১০৭; ৩৬: ৮২; ৫৮: ১; ১৮: ২৬; ৩১:২৭; ১৮:১০৯; ৩৭: ৯৬; ৩৬: ৮১-৮২; ৫৫: ২৯

৪৬. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুশ-শুরুতি, বাব: মা ইয়াজুযু মিনাল-ইশতিরাতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৭৩৬; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুয-যিকরু ওয়াদ-দুআই ওয়াত-তাওবাতু ওয়াল-ইসতিগফার, বাব: ফি আসমাইল্লাহ তা'আলা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৭৭

৪৭. আল্লামা সা'দুদ্দীন আত-তাফতাযানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আল-আন'আম- এ ১৮ জন নবী-রাসূলের নাম উল্লেখ করেন,

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ – وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ– وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ– وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ–

অর্থাৎ-"আর ওগুলো ছিল আমার যুক্তি–প্রমাণ যা আমি ১.ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের মোকাবেলার জন্য দিয়েছিলাম। বস্তুত যাকে ইচ্ছা আমি মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মহাবিজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী। আমি ইব্রাহীমকে ২. ইসহাক ও ৩. ইয়াকুব, তাদের প্রত্যেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেছি। তার আগে ৪. নূহকেও সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম। তার বংশধরদের মধ্যে আমি ৫. দাঊদ, ৬. সুলায়মান, ৭. আইউব, ৮. ইউসূফ, ৯. মূসা ও ১০. হারুনকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছি। আর এভাবেই আমি ইহসানকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকে। আমি ১১. যাকারিয়া, ১২. ইয়াহইয়া, ১৩. ঈসা ও ১৪. ইলয়াসকেও সঠিক পথে পরিচালিত করেছি। তারা প্রত্যেকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমি ১৫. ইসমাঈল, ১৬. আল-ইয়াসাআ, ১৭. ইউনূস ও ১৮. লূতকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম। বিশ্বজাহানের সকলের উপর তাঁদের প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।"[৪৮] পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত অন্যান্য নবী ও রাসূলগণ হলেন, মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আ.); হযরত ইদ্রিস (আ.); হযরত হুদ (আ.); হযরত সালেহ (আ.); হযরত যুল কিফল (আ.), হযরত শুআইব (আ.) এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)।

মানুষ সৎপথে চলার যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে প্রবৃত্তির তাড়নায়, শয়তানের প্ররোচনায় এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে সাধারণত অসৎপথে পরিচালিত হয়। ফলে হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, নিষ্ঠুরতা, হত্যা লুণ্ঠন ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। আবার কখনও নিজেকে অতিক্ষমতাধর মনে করে মানুষ সমাজে নানা ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করে। এতে মানব সমাজে নেমে আসে নানা বিপর্যয়। অত্যাচারী, সীমালঙ্ঘনকারীদের সীমাহীন তাণ্ডবলীলায় সমাজে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। অত্যাচার, অনাচার ও পাপাচারে সমাজ হয়ে যায় চরমভাবে কলুষিত। ঘোর অন্ধকার তখন মানব সমাজকে আচ্ছন্ন করে নেয়। মানুষ তখন ভুলে যায় সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীনকে। মানব সমাজকে এ অবক্ষয় থেকে মুক্ত করার জন্য নবী-রাসূলগণের আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। তাই মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন।

৪৮. আল-কুরআন, ৬: ৮৩-৮৬

মানব জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে যত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। তাঁর পর আর কোন নবী-রাসূল পৃথিবীতে আসবেন না এবং আসার প্রয়োজনও নেই। একেই বলা হয় খতমে নবূওয়াত। ঈমানদার হওয়ার জন্য এ আকীদা পোষণ করা অপরিহার্য। তাই কেউ খতমে নবূওয়াত বিশ্বাস না করলে কাফির হিসেবে গণ্য হবে। বস্তুত 'খতম' ও 'নবূওয়াত' আরবি শব্দ। খতম অর্থ সমাপ্ত, শেষ ইত্যাদি। আর নবূওয়াত অর্থ পয়গম্বরী। এ হিসাবে খতমে নবূওয়াত অর্থ হলো নবূওয়াত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটা। হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে নবূওয়াত ও রেসালাতের যে সিলসিলা শুরু হয় এর পরিসমাপ্তি ঘটে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে। সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ আল-কুরআন, রাসূলের সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মাহ এবং কিয়াস শরী'আতের এ দলীল চতুষ্ঠয় দ্বারা এ আকীদা প্রমাণিত। এমনকি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহেও এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। ইমাম শাবী বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.) -এর প্রতি যে সহীফা অবতীর্ণ হয় তাতে উল্লেখ রয়েছে: আপনার সন্তানদের মধ্যে বংশ পরম্পরা চলতে থাকবে। অবশেষে উম্মী নবী (মুহাম্মাদ) আগমন করবেন। তিনি হবেন সর্বশেষ নবী।[৪৯]

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশেষ নবী ও রাসূল এ কথা পবিত্র কুরআন ও পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ দ্বারা প্রমাণিত। মওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী (র) তার 'খতমে নবূওয়াত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খতমে নবূওয়াত বিষয়টি আল-কুরআনের শতাধিক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। গোটা কুরআনই খতমে নবূওয়াতের প্রমাণ বহন করে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا – অর্থ: "মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোন পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সবকিছু জানেন।"[৫০] আলোচ্য আয়াতে وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ এর মধ্যে (خَاتَمَ) শব্দের অর্থ শেষ ও সমাপ্তকারী। আর (النَّبِيِّينَ) আন্নাবিয়্যিন শব্দ দ্বারা সকল নবীগণকে বুঝানো হয়েছে। তাই وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ এর অর্থ হবে নবী-রাসূলগণের সর্বশেষ ব্যক্তি অথবা নবীদের ক্রমধারা সমাপ্তকারী।[৫১] ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (র) 'মুফরাদাতুল কুরআন' গ্রন্থে وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে এ জন্য 'খাতামুন্-নাবিয়্যিন' বলা হয় যে, তিনি নবূওয়াতের সিলসিলা সমাপ্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আগমন করে নবূওয়াতকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং এর ধারাবাহিকতাকে সমাপ্ত করে দিয়েছেন।[৫২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ–

৪৯. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, *খতমে নবূওয়াত* (ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৮ খ্রি.) পৃ. ৪৫৩
৫০. আল-কুরআন, ৩৩: ৪০
৫১. ইমাম আবুল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মানযুর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৫
৫২. মুফতী মোহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

অর্থ: “(স্মরণ করুন সে সময়ের কথা) যখন আল্লাহ নবীগণের নিকট থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেন যে, আপনাদেরকে কিতাব ও হিকমাত যা কিছু দিয়েছি, এরপর যখন আপনাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে আপনাদের নিকট একজন রাসূল আগমণ করবেন, আপনারা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবেন এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ নবীগণকে বললেন, আপনারা কি স্বীকার করলেন এবং এ বিষয়ে আমার অঙ্গীকার কবূল করলেন? তারা বললেন, ‘আমরা স্বীকার করলাম। আল্লাহ বললেন, তাহলে আপনারা সাক্ষী থাকুন আর আপনাদের সাথে আমিও সাক্ষী থাকলাম।”[৫৩] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঐ অঙ্গিকারের কথা উল্লেখ করেছেন যা তিনি নবী-রাসূলগণের নিকট থেকে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সম্পর্কে আত্মার জগতে গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর পবিত্র হাদীস থেকেও ‘খতমে নবূওয়াত’ প্রমাণিত। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ-

অর্থাৎ-“আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পূর্ববর্তী নবীগণের সাথে আমার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি একটি ঘর তৈরি করে এবং সে ঐ ঘরটি খুব সুন্দর ও মনোরম করে তৈরি করে। কিন্তু একটি ইটের জায়গা খালি রেখে দিয়েছে। লোকজন এর চতুর্দিক ঘুরে এর সৌন্দর্য অবলোকন করছে এবং আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলছে, এ একটি ইট কেন সংযোজন করা হলো না? রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমিই সেই ইট। আর আমিই ‘খাতামুন-নাবিয়্যিন’ অর্থাৎ নবূওয়াতের ইমারাত আমার দ্বারাই পূর্ণতা লাভ করেছে।”[৫৪]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي-অর্থাৎ-“অচিরেই আমার উম্মতে ত্রিশজন অতি মিথ্যাবাদীর আর্বিভাব হবে। তারা প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে নবী অথচ আমিই শেষ নবী, আমার পরে কোন নবী নেই।”[৫৫] পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-ই হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। এর মাধ্যমেই ইসলামের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়েছে। সুতরাং তাঁরপরে আর কোন নবী-রাসূলের আগমন করবেন না।

---

৫৩. আল-কুরআন, ৩: ৮১

৫৪. ইমাম আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল মানাকিব, বাবঃ খাতামুন্-নাবিয়্যিন (সা.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৫৩৫; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবঃ যিকরু কাওনিহি (সা.) খাতামান-নাবিয়্যিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২২৮৬

৫৫. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি‘ আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল ফিতানি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাবঃ লা তাকুমুস-সা‘আতু হাত্তা ইয়াখরুজা কায্‌যাবুন (রিয়াদঃ মাকতাবাতল মা‘আরিফ, ১৪১৭ হি.), হাদীস নং-২২১৯

ফেরেশতা

ফেরেশতা (فرشته) শব্দটি ফার্সী। অর্থ আল্লাহর আজ্ঞাবহ জ্যোর্তিময় সত্তা।[৫৬] আরবিতে ফেরেশতাকে একবচনে মালাক ও বহুবচনে মালাইকা বলা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো বার্তাবাহক। ইসলামি পরিভাষায় ফেরেশতা হলো- এমন নূরানী মাখলুক, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁরা কখনও আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ করেন না; বরং সর্বদা আল্লাহর নির্দেশ পালনে রত থাকেন। বস্তুত ফেরেশতা নূর বা জ্যোতির তৈরি। তাঁরা সাধারণত অদৃশ্য, তাঁদের কোন আকার নেই। তবে তাঁরা যে কোন আকার ধারণ করতে পারেন। তাঁদের কামনা-বাসনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, নিদ্রা কিছুই নেই। তাঁরা সব সময় আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকেন। ফেরেশতাগণ সংখ্যায় অসংখ্য, তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা কেবল আল্লাহ তা'আলাই জানেন। যেমন পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ-অর্থাৎ-"আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।"[৫৭] তবে পবিত্র কুরআন সুন্নাহ থেকে আমরা কতিপয় ফেরেশতার নাম ও তাঁদের কাজ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। তাঁরা হলেন, (১) জিব্রাঈল (আ.), তিনি নবী ও রাসূলগণের নিকট আল্লাহর বাণী তথা ওহী পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁকে রুহুল আমিনও বলা হয়। (২) মীকাঈল (আ.), তিনি সকল জীবের জীবিকা বণ্টনের দায়িত্বে নিয়োজিত। (৩) আযরাঈল (আ.), তিনি সকল জীবের জীবন বা রূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত। (৪) ইসরাফীল (আ.), তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি আল্লাহর হুকুমে সাথে সাথে সিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন এবং তৎক্ষণাৎ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এর পর কিয়ামত কায়েম হবে। উপরোল্লিখিত ফেরেশতা ছাড়াও আরো কতিপয় ফেরেশতা হলেন, কিরামান কাতিবীন (মানুষের ভালমন্দ লিপিবদ্ধ কারী দুইজন সনম্মানিত ফেরেশতা), মুনকার ও নাকীর (মানুষের মৃত্যুরর পরে কবরে প্রশ্নকারী ফেরেশতা), জাহান্নামের রক্ষক ফেরেশতা মালিক এবং জান্নাতের যিম্মাদার ফেরেশতার নাম রিযওয়ান।

আসমানী গ্রন্থ

নবী রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে যেসব কিতাব লাভ করেছেন সেসব ধর্মগ্রন্থকে আসমানী কিতাব বলা হয়। সব আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- অর্থাৎ "এবং যারা আপনার প্রতি যে কুরআন নাযিল হয়েছে তার সত্যতায় ঈমান রাখে, আপনার আগে অন্যান্য নবী–রাসূলগণের উপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে তার সত্যতায় ঈমান রাখে আর আখিরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে।"[৫৮] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ–

---

৫৬. মোহাম্মদ হারুন রশিদ (সম্পাদিত), *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি,১ম প্রকাশ,২০১৫), পৃ. ১৪১

৫৭. আল-কুরআন, ৭৪: ৩১

৫৮. আল-কুরআন, ২: ৪

অর্থাৎ-"রাসূল তার প্রতিপালকের নিকট থেকে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছেন এবং মুমিনরাও ঈমান এনেছে। তারা প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাইকার প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি। (তারা বলে) রাসূলগণের মধ্যে আমরা কোন পার্থক্য করি না। তারা আরো বলে, আমরা শুনেছি এবং অনুগত হয়েছি। কাজেই হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আর ফিরে যাওয়া তো আপনার কাছেই।"[৫৯]

নবী-রাসূলগণের মধ্যে ৮ জন রাসূলের প্রতি নাজিল করা হয় আসমানী গ্রন্থ (সহীফা ও প্রধান প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ) যার সংখ্যা ১০৪ খানা। তন্মধ্যে সহীফা- ১০০ খানা বাকী ৪টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ৪ জন প্রসিদ্ধ রাসূলকে প্রদান করেন। সহীফাপ্রাপ্ত রাসূলগণ হলেন, হযরত আদম (আ) ১০ খানা; হযরত ইদ্রিস (আ.) ৩০ খানা; হযরত শীষ (আ.) ৫০ খানা এবং হযরত ইব্রাহীম (আ.) ১০ খানা সহীফা প্রদান করা হয়।[৬০] অবশিষ্ট প্রসিদ্ধ আসমানী গ্রন্থসমূহের মধ্যে- যাবুর হযরত দাউদ (আ); তাওরাত হযরত মূসা (আ); ইঞ্জিল হযরত ইসা (আ) এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন সম্পর্কে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও সহীফাসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, –إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى– صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى–অর্থ: "নিশ্চয় এতো রয়েছে আগের কিতাবসমূহে, লিখিত ছিল ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবে।"[৬১] আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে ঘোষণা করেন, –وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ- অর্থ: "আগে নাযিলকৃত কিতাবসমূহেও এই কুরআনের কথা উল্লেখ ছিল।[৬২] অতএব দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলের মাধ্যমে আসমানী বিধান প্রদান করেছেন। আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত ১০৪ খানা আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে। এরমধ্যে সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআন, যাতে পূর্ববর্তী নাযিলকৃত ১০৩ খানা আসমানী কিতাবের সার নির্যাস সন্নিবেশিত হয়েছে[৬৩] এবং পূর্ব আসমানী গ্রন্থসমূহে আল-কুরআন সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল।

আল-কুরআনের পরিচয়

আসমানীগ্রন্থ সমূহের মধ্যে মানুষ ও জিন জাতির জন্য সর্বশেষ নাযিলকৃত কিতাব হচ্ছে আল-কুরআন। শাশ্বত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয় সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর প্রতি। এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

---

৫৯. আল-কুরআন, ২: ২৮৫
৬০. আবুল লাইস সমরকন্দী, *নবী রাসূল প্রসঙ্গ* (ঢাকা: হামিদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৭), পৃ. ৩৬
৬১. আল-কুরআন, ৮৭: ১৮-১৯
৬২. আল-কুরআন, ২৬: ১৯৬
৬৩. বি.দ্র: আবুল ফদল আব্দুর রহমান জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *আল-ইতকান ফি 'উলূমিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৫

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ–

অর্থ: "যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে, মুহাম্মদের প্রতি যে কুরআন নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান আনে; আর এ কুরআন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত সত্য কিতাব। তাদের মন্দকাজগুলো আল্লাহ দূর করে দেবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন।"[৬৪] অন্য আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ– অর্থ: "আর আপনার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে তা বুঝিয়ে দেন, যা তাদের জন্য নাযিল হয়েছে। এতে করে তারা হয়তো চিন্তা করবে।"[৬৫] কুরআন মাজীদে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারনির্যাস জমা করা হয়েছে বলে তাকে কুরআন বলা হয়। মূলত সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানই কুরআনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।[৬৬] মহান আল্লাহ বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ অর্থ: এই কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি।"[৬৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ অর্থ: "নিশ্চয় আমি মুসলিমদের জন্য প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্টব্যাখ্যা, সঠিক পথের নির্দেশনা, রহমত এবং সুসংবাদ হিসেবে আপনার নিকট কুরআন নাযিল করেছি।"[৬৮]

আল-কুরআনের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করে আল-মানার গ্রন্থকার আল্লামা নাসাফী বলেন,

اَمَّا الكِتَابُ فالقُرآنُ المنَزَّلُ على رسول صلعم. المكتُوبُ فى المصَاحِفِ المنقُولُ عَنهُ نَقلاً مُتَوَتِراً بِلاَ شُبهَةٍ–

অর্থাৎ-"কিতাব বলতে এমন কুরআনকে বুঝায়, যা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর উপর নাযিল করা হয়েছে, যা মাসাহাফ সমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিকট হতে মুতাওয়াতির পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।"[৬৯] পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের পরিচয় দিয়ে বলেন,

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ– نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ–عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ–بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ–

অর্থধ "নিঃসন্দেহে ইহা (আল-কুরআন) বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বাসী সত্য আত্মা (জিব্রাঈল) এ কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছেন; আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি মানুষের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। এ কুরআন নাযিল করা হয়েছে সুস্পষ্ট 'আরবি ভাষায়।"[৭০]

আল-কুরআনে মোট ১১৪ টি সূরা আছে। এর মধ্যে ৮২ টি মাক্কী এবং ২০ টি মাদানী বাকী ১২ টি সূরা নিয়ে মাক্কী কিংবা মাদানী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। মাক্কী সূরাগুলোতে সাধারণত আকীদা তথা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। আর মাদানী সূরাগুলোতে শরী'আতের

৬৪. আল-কুরআন, ৪৭: ২
৬৫. আল-কুরআন, ১৬: ৪৪
৬৬. ড. সুবহি সালিহ, *মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন* (বৈরুত: দারুল ইলম, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ১৯
৬৭. আল-কুরআন, ৬: ৩৮
৬৮. আল-কুরআন, ১৬: ৮৯
৬৯. আহমদ ইবন আবূ সাঈদ মোল্লাজিউন, *নুরুল আনওয়ার* (ঢাকা: মাকতাবাতুল কাসিমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৭
৭০. আল-কুরআন, ২৬: ১৯২-১৯৫

হুকুম-আহকাম, সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সমগ্র কুরআনে ১১৪ টি সূরায় প্রসিদ্ধ মতে আয়াত সংখ্যা ৬২৬০টি।[৭১]এই কুরআন ৩০টি খণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ডকে পারা বলা হয়। শরী'আতের মূলনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে কুরআন মাজীদ। পবিত্র কুরআনে মাত্র পাঁচশত আয়াত আহকাম সম্পর্কিত। এ আয়াতসমূহের উপর ভিত্তি করে শরী'আতের বিধানাবলী রচিত হয়েছে। অন্যান্য আয়াত হচ্ছে ঐতিহাসিক ঘটনা, উপমা, উপদেশ, পরকালের বিবরণ প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত।[৭২]

তাকদীর

তাকদীর ইসলামি আকীদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকদীর শব্দটি কাদরুন শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় তাকদীর হলো,

هُو تَحديدُ كُلِّ مَخلُوقٍ بِحَدِّهِ الَّذِى يُوجَد مِن حُسنٍ وقُبحٍ ونَفعٍ وضَرَرٍ ومَا يَحوِيهِ مِن زمَانٍ او مَكانٍ ومَا يَترَتَّبَ عَليهِ مِن ثوَابٍ وعِقَابٍ– অর্থাৎ-"সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভাল-মন্দ, উপকার-অপকার ইত্যাদির স্থান-কাল এবং এসবের শুভ-অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত হওয়া।"[৭৩] এর অর্থ হলো, জগতের যাবতীয় বস্তু তথা মানুষ ও জিনসহ যত সৃষ্টি রয়েছে সবকিছুর উৎপত্তি ও বিনাশ, ভাল-মন্দ, উপকার ও অপকার ইত্যাদি কখন কোথায় ঘটবে এবং এর পরিণাম কি হবে প্রভৃতি মাখলূক সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। জগতে যাকিছু ঘটছে এবং ঘটবে সবই তাকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। তাকদীরের বাইরে কিছুই নেই। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوْ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ– অর্থাৎ-"সকল জিনিসই তাকদীরের অন্তর্গত। এমনকি নির্বুদ্ধিতা বা অক্ষমতা এবং বিচক্ষণতাও। অথবা বলেছেন, এমনকি বিচক্ষণতা ও নির্বুদ্ধিতাও।"[৭৪]

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকদীরের প্রতি বিশ্বাসের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ–অর্থ: "চারটি বিষয়ে ঈমান না আনা পর্যন্ত কোন বান্দাহ মুমিন হতে পারবে না: সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল, তিনি সত্যসহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। মৃত্যুর উপর ঈমান আনবে; মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর ঈমান

---

৭১. আল-কুরআনের আয়াত সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই মতপার্থক্যের কারণ হলো কুরআনের বর্ণিত হরুফে মুকাত্বাআত, কুরআনের উল্লিখিত দ্বিত্ব আয়াত, বিছমিল্লাহ প্রত্যেক সূরার আয়াত কী না, কুরআনের মানসুখ আয়াত প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন মত থাকার কারণে। (বি. দ্রঃ আবূল ফদল আব্দুর রহমান জালাল উদ্দিন আস-সুয়ূতী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২-২০২)

৭২. আহমদ ইবন আবূ সাঈদ মোল্লাজিউন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮

৭৩. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৪

৭৪. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল কদর, বাব কুল্লা সাইয়্যিন বিকাদরি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৫৫; ইমাম মালেক ইবন আনাস (রহ), *আল-মুয়াত্ত্বা*, কিতাবুল জামি', বাবঃ আন-নাহইউ আনিল কাওলি বিল কাদরে (বৈরুতঃ দারুল ইহইয়াউল তুরাসিল আরাব, ১৪০৬হি.), হাদীস নং- ২৬১৯

আনবে; তাকদীরের উপর ঈমান আনবে।"[৭৫] তাই ইসলামি জীবন বিধানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের ন্যায় তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রাখাও ঈমানের অপরিহার্য বিষয়।

আখিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম

মৃত্যু সকলের অনিবার্য পরিণতি। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে এবং তার কর্মসমূহের প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- অর্থাৎ-"জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে।"[৭৬] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ- অর্থাৎ-"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা যদি সুউচ্চ সুরক্ষিত দুর্গেও থাক।"[৭৭] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ-অর্থাৎ-"বলুন (হে রাসূল!) তোমরা যে মৃত্যু হতে পালিয়ে যেতে চাও, সে মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে।"[৭৮]

মানুষের মৃত্যু পরবর্তী জীবনই হচ্ছে আখিরাত। আখিরাত বলতে মৃত্যুর পর থেকে অনন্তকাল জীবনকে বুঝায়। কবর, হাশর, হিসাব, পুলসিরাত, এবং জান্নাত-জাহান্নাম সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আখিরাতের জীবনকে দু'টি পর্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে। (১) মৃত্যু থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত; (২) কিয়ামাত থেকে অনন্তকাল অবধি। সেখানে মৃত্যু ও ধ্বংস নেই। প্রথম পর্যায়ের নাম 'আলমে বরযখ' বা কবরের জীবন। মৃত্যুর পর মানব দেহ কবরস্থ করা হোক কিংবা সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হোক অথবা আগুনে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেওয়া হোক বা অন্য কোনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হোক, সব অবস্থাই তার জন্য 'বরযখ'। আর দ্বিতীয় পর্যায় হলো, কিয়ামাত, হাশর-নাশর, জান্নাত ও জাহান্নামে অনন্ত কালের জীবন। কিয়ামাত বলতে এমন এক সময়কে বুঝায় যখন আল্লাহর নির্দেশে জগতের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ- অর্থ: "আর আখিরাতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করে।"[৭৯] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ- অর্থাৎ-"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে তোমাদের জন্য কোন পূণ্য নেই। বরং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা; আখিরাত, মালাইকা, কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনাতে পূণ্য রয়েছে।"[৮০] এছাড়া

৭৫. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল কাদরে আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাবঃ মা যাআ ফিল ঈমানি বিল-কাদরে খাইরিহি ওয়াশ-শাররিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৪৫
৭৬. আল-কুরআন, ৩: ১৮৫
৭৭. আল-কুরআন, ৪: ৭৮
৭৮. আল-কুরআন, ৬২: ৮
৭৯. আল-কুরআন, ২: ৪
৮০. আল-কুরআন, ২: ১৭৭

আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাসকারীদের পরিণাম উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ- অর্থাৎ-"যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা হল অহঙ্কারী।"[৮১]

কিয়ামাত বা পুনরুত্থান দিবসের নির্দিষ্ট একটি সময় রয়েছে। ঐসময় যখন আসবে তখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রথমবার ফুৎকার দেওয়ার পর সমস্ত জীবিত প্রাণী মারা যাবে এবং দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেওয়ার পর সকলে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ- অর্থ: "শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। এতে যমীনে যারা যেখানে আছে তারা বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তবে আল্লাহ যাদেরকে বেহুঁশ করতে চাইবেন না তারা বেহুঁশ হবে না। এরপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তখন তারা উঠে দাঁড়াবে এবং (চারপাশে ও একে অপরের দিকে) তাকাতে থাকবে।"[৮২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ- অর্থ: "তারপর কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে আবার জীবিত করা হবে।"[৮৩] অন্য আয়াতে আরো বর্ণনা করা হয়েছে, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى-অর্থাৎ-"আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে আবারো বের করব।"[৮৪]

পুনরুত্থান দিবস সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের সমস্ত সংশয় দূর করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ -قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ- الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ- أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ-

অর্থ: "সে বলে, যখন হাড়-গোশত পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবে তখন কে তাতে প্রাণ সংযোজন করবে? (হে রাসূল!) আপনি বলুন, তাদের মধ্যে আল্লাহই প্রাণ সঞ্চার করবেন যিনি তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ নিশ্চয় সকল সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ তোমাদের জন্য সবুজ-শ্যামল গাছপালা থেকে আগুন সৃষ্টি করেন এবং তোমরা নিজেদের প্রয়োজনে তা জ্বালিয়ে থাক। যিনি আকাশসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের মত অনুরূপ লোক আবারো সৃষ্টি করতে পারবেন না? অবশ্যই পারবেন। নিশ্চয় তিনি মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।"[৮৫] এ আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের সমস্ত সংশয় দূর করে দিয়ে কিয়ামত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়। এর ফলে সত্য অনুসন্ধানকারী সকলে কিয়ামত সম্পর্কে সুদৃঢ় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়।

---

৮১. আল-কুরআন, ১৬: ২২
৮২. আল-কুরআন, ৩৯: ৬৮
৮৩. আল-কুরআন, ২৩: ১৬
৮৪. আল-কুরআন, ২০: ৫৫
৮৫. আল-কুরআন, ৩৬: ৭৮-৮১

কিয়ামাত দিবসে বিচারের পর আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম পুরস্কার হিসেবে প্রদান করবেন। যারা পূণ্যবান তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আর যারা পাপী তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। ইসলামের দৃষ্টিতে জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং তা আল্লাহ পূর্বেই সৃষ্টি করে রেখেছেন। জান্নাতের বিবরণ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ–

অর্থ: "(হে রাসূল!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এসকল বস্তুর চেয়ে উত্তম কোন বস্তুর খবর দেব? যারা মুত্তাকী, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ বয়ে যায়। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর (তাদের জন্য আরো রয়েছে) পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থা সরাসরি দেখেন।"[৮৬] আল্লাহ তা'আলা অপর এক আয়াতে আরো বলেন,

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ– هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ– لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ– سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ–

অর্থ: "নিশ্চয় সেদিন জান্নাতের অধিবাসীগণ মহানন্দে থাকবে। তারা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তাদের জন্য ফলমূল এবং তারা যা চাইবে তার সবকিছুই থাকবে। পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"[৮৭] জান্নাতের বর্ণনা দিয়ে আল-কুরআনে আরো বর্ণনা করা হয়েছে,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ–

অর্থ: "মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা হলো, সেখানে আছে পরিষ্কার পানির ঝর্ণাধারাসমূহ, আছে অপরিবর্তনীয় স্বাদের দুধের ঝর্ণাধারাসমূহ, আছে পানকারীদের জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু পানীয়ের ঝর্ণাধারাসমূহ এবং আছে পরিশোধিত স্বচ্ছ মধুর ঝর্ণাধারাসমূহ। মুত্তাকীদের জন্য সেখানে আছে সবধরনের ফল এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা।"[৮৮]

পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন নামে বর্ণিত এ জান্নাতের সংখ্যা আটটি।[৮৯] এ জান্নাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ– أُرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ–

৮৬. আল-কুরআন, ৩: ১৫
৮৭. আল-কুরআন, ৩৬: ৫৫-৫৯
৮৮. আল-কুরআন ৪৭: ১৫
৮৯. বিস্তারিত দেখুন: আল-কুরআন, ১৮: ১০৭; ২৩: ১১; ১০: ২৫, ৬: ১২৭

অর্থ: "আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। প্রত্যেক স্তরের মাঝে দূরত্ব হলো আকাশ ও জমীনের দূরত্বের সমান। আর ফিরদাউস তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে আছে। তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাতের জন্য দু'আ করলে জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দু'আ করবে। আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ (সা.) এও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশ। আর সেখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ (ঝর্ণা) প্রবাহিত হয়।[৯০] রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مِائَةُ عَامٍ– অর্থ: "জান্নাতে একশ'টি স্তর রয়েছে। প্রত্যেক স্তরের মাঝে একশত বছরের দূরত্বের সমান ব্যবধান রয়েছে।"[৯১]

আটটি জান্নাতের নাম হলো-

১। জান্নাতুল ফেরদৌস,

২। দারুস্-সালাম,

৩। জান্নাতুল মাওয়া,

৪। দারুল খুলদ,

৫। জান্নাতুল আদন,

৬। জান্নাতুন নাঈম,

৭। দারুল মাকাম,

৮। দারুল কারার।[৯২]

অনুরূপভাবে জাহান্নামীদের সম্পর্কেও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ৭৭টি আয়াতে জাহান্নামের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯৩] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ– অর্থ: "আর যারা অস্বীকার করবে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।"[৯৪] আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের শাস্তি প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي **جَهَنَّمَ خَالِدُونَ**– تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ–

---

৯০. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস-সিয়ার, বাব: দারাযাতিল মুজাহিদীনা ফি সাবিলিল্লাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৭৯০

৯১. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, কিতাব: সিফাতিল জান্নাতি আন রাসূলুল্লাহ (সা.) বাব: মা যাআ ফি সিফাতিল দারাযাতিল-জান্নাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫২৯

৯২. আল-কুরআন, ১৮: ১০৭; ২৩: ১৬; ১০: ২৫; ৬: ১২৭

৯৩. মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-১৮৪

৯৪. আল-কুরআন, ২: ৩৯

অর্থ: "আর যাদের পূণ্যের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। তারা চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। আগুন তাদের মুখমণ্ডল জ্বালিয়ে দেবে এবং জাহান্নামে তারা বীভৎস চেহারায় থাকবে।"[৯৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ- يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ- وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ- كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ-

অর্থ: "তারা দু'টি পরস্পর বিরোধী দল, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে। অতএব যারা কুফরি করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক। তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে অতি উত্তপ্ত পানি; সে পানি দিয়ে তাদের পেটের মধ্যে যা আছে তা এবং তাদের শরীরের চামড়া গলিয়ে ফেলা হবে। তাদের জন্য থাকবে লোহার তৈরি গর্দা। যখনই তারা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে জাহান্নামেই ফিরিয়ে আনা হবে এবং (তাদেরকে বলা হবে) 'আগুনে পোড়ানোর শাস্তি ভোগ কর।"[৯৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا-

অর্থ: "যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে নিশ্চয় আমি তাদেরকে আগুনে পোড়াব। যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, তখনই আমি নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানী।"[৯৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ- অর্থ: "যারা তোমার অনুসরণ করবে না তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান হল জাহান্নাম। জাহান্নামের সাতটি দরজা আছে এবং প্রতিটি দরজার জন্য আছে আলাদা আলাদা শ্রেণী।"[৯৮] আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا- অর্থ: "নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। আর তাদের জন্য আপনি কোন সাহায্যকারী পাবেন না।"[৯৯] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ-অর্থ: "(হে রাসূল)! নিশ্চয় আপনাকে আমি সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। জাহান্নামের অধিবাসীদের সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞাসিত হবেন না।"[১০০] পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এ জাহান্নাম সংখ্যা সাতটি। যেমন:

৯৫. আল-কুরআন, ২৩: ১০৩-১০৪
৯৬. আল-কুরআন, ২২: ১৯-২২
৯৭. আল-কুরআন, ৪: ৫৬
৯৮. আল-কুরআন, ১৫: ৪৩-৪৪
৯৯. আল-কুরআন, ৪: ১৪৫
১০০. আল-কুরআন, ২: ১১৯

১। জাহান্নাম

২। জাহীম (জ্বলন্ত আগুন)

৩। হুতামাহ (চূর্ণবিচূর্ণকারী)

৪। হাবীয়াহ (অতল গহ্বর)

৫। সাঈর (উজ্জ্বল অগ্নিকাণ্ড)

৬। সাকার

৭। লাযা।[১০১]

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ শাশ্বত জীবন বিধান। যা সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। মানবজীবনের সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনুগত হওয়া, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এককথায় তাঁর নিকট পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ করাই ইসলাম। ঈমান, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ এ পাঁচটি ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ। ইসলামে রয়েছে মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনের ধারণা। এই পার্থিব জগতের কর্মফলই সে অনন্ত জীবনের একমাত্র পাথেয়। তাই ইবাদাতের মাধ্যমে ইসলামের অনুসারী অপরাধপ্রবণতা থেতে মুক্ত থেকে পরকালের পুরস্কার জান্নাত প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় নিমগ্ন থাকে। আর যারা মহান আল্লাহর ঐশ্বরিক বিধান আল-কুরআন তথা ইসলামের বিধান অমান্য করে বিপথগামী হয় তাদের জন্য পরকালীন অনন্ত জীবনে রয়েছে জাহান্নামের পীড়াদায়ক শাস্তি। কুরআনের প্রয়োগিক উদাহরণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সমস্ত জীবন তথা সুন্নাহ। এই দু'টি উৎসের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নির্দেশনার মূলনীতি। যা অনুসরণ ও অনুকরণ করাই মহান আল্লাহর অভিপ্রায়। ইসলামের এ বিধিবিধানের সমষ্টিই হলো শরী'আহ বা ইসলামি আইন।

ইসলামি শরী'আহ

মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বলোকের স্রষ্টা। বিশ্বলোক পরিচালনার জন্য তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে যা বাস্তবায়নের জন্য তিনি নিরংকুশ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি মানব জাতি সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করে পার্থিব জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটের নিরসন করতে দিয়েছেন জীবন পদ্ধতি। সে জীবন পদ্ধতিই হলো ইসলাম। ইসলাম মহান আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবন বিধান। মহান আল্লাহ এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করে মানব জাতিকে তার কর্তৃত্ব দিয়েছেন এবং বিশ্বভ্রমান্ড পরিচালনার জন্য দিয়েছেন জীবনবিধান ইসলাম।

---

১০১. বি.দ্র: আল-কুরআন, ২:৩৯, ১১৯; ২৩: ১০৩-৪; ২২: ১৯-২২; ৪: ৫৬, ১৪৫; ১৫: ৪৩-৪৪

আল্লাহ চান, দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর নি'আমতসমূহ প্রয়োজন মত পেয়ে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করুক এবং পরকালে আল্লাহর নির্ধারিত চিরন্তন কল্যাণের অধিকারী হোক। তা একটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় আল্লাহর অনুগত হয়ে সার্বিক জীবনযাপনের উপরই নির্ভর করে ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সার্বিক সুখ-শান্তি। আর আল্লাহর আনুগত্য ভিত্তিক সার্বিক জীবনযাপনের লক্ষ্যেই তিনি অবতীর্ণ করেছেন পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের যে অংশ আইন হিসেবে কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট, তা হচ্ছে শরী'আহ বা ইসলামি আইন। এটি মুসলিম জীবন-সাধনার এক অপরিহার্য উপাদান। এর মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর বাণী আল-কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাহ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলমানরা কিভাবে জীবন-পথে চলবে, কিভাবে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার নিষ্পত্তি করবে, তারই নির্দেশক হচ্ছে ইসলামি শরী'আহ।

ইসলামি শরী'আহ ছাড়া কারো পক্ষে ইসলামি জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামি শরী'আতকে বলা হয় মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র। আমরা একে অনায়াসে ইসলামি কর্ম-বিধানরূপেও আখ্যায়িত করতে পারি। দুনিয়ার বুকে মানুষের বসতি শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই আল্লাহর নিকট থেকে নীতি-বিধান নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে। মানুষ সর্বকালেই আল্লাহর নিকট থেকে লাভ করেছে জীবন পরিচালনা ও সমাজ শাসনের জন্য শরী'আতের ব্যবস্থা। আল্লাহর নাযিলকৃত শরী'আহ অত্যন্ত মহান ও পবিত্র এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক কল্যাণকর। আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ শরী'আতের পরম লক্ষ্য হচ্ছে মানব সমাজের সংশোধন ও মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন। ব্যক্তি ও বিশ্ব মানবতাকে কল্যাণ ও পরম সাফল্যের দিকে অগ্রসর করা এবং সকল প্রকারের অন্যায়, যুলুম, দুষ্কৃতি ও পাপ কাজ থেকে তাদের মুক্ত ও বিরত রাখা। বস্তুত ইসলামি শরী'আহ হল মহান আল্লাহর প্রেরিত ব্যবস্থা। এর লক্ষ্য সার্বিকভাবে সমস্ত মানবতার ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কল্যাণ সাধন এবং মানবজীবনের স্বাভাবিক বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে পূর্ণ মাত্রায় সামঞ্জস্য বিধান।[১০২]

শরী'আহ (شَرِيعَة) শব্দটি শার'উন (شَرْعٌ) শব্দ থেকে এসেছে। শব্দটি একবচন এর বহুবচনে شرائع ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হল পানি পানের স্থান, ঘাট, ঝর্ণা। শরী'আহ শব্দটি আভিধানিক অর্থে সেই পানি বুঝায়, যেখানে পিপাসার্তরা একত্রিত হয় এবং একত্রিত হয়ে তা পান করে।[১০৩] এ শব্দ থেকেই শরী'আহ (شَرِيعَة) শব্দটি এসেছে। রাগিব ইস্পাহানী (র) বলেন, শরী'আহকে এ নামে অভিহিত করার কারণ, যে ব্যক্তি যথার্থভাবে শরী'আহ গ্রহণ করবে সে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারীর মত পবিত্র হয়ে যায়।[১০৪] তবে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে শার'উন ও শরী'আহ শব্দ দু'টি আইন বিধান, পথ ও পন্থা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১০৫]

---

১০২. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশ বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৯
১০৩. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরী'আতের উৎস* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী,২০০৬),পৃ. ৯
১০৪. রাগিব ইস্পাহানী (রহ), *আল-মুফরাদাত ফি গারীবিল কুরআন* (কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ৫ম প্রকাশ, ২০০১১ খ্রি.), পৃ. ২৪৭
১০৫. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০০

সাধারণত স্রষ্টার অমোঘ স্বর্গীয় আইন বুঝাতে শরী'আহ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনে এ অর্থে শরী'আহ শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا- অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য সে দীনকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে দীনের আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন।"[১০৬] অপর এক আয়াতে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ- অর্থ: "এরপর আপনাকে আমি দীনের একটি বিশেষ শরী'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। কাজেই আপনি তার অনুসরণ করুন এবং জ্ঞানহীনদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।"[১০৭]

শির'আত (شِرْعَة) শব্দটিও উপর্যুক্ত শব্দ দু'টির সমার্থবোধক। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا- অর্থ: "আমি তো তোমাদের প্রত্যেকের জন্য দীনের বিধি-বিধান ও সহজ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি।"[১০৮] পরিভাষায় শরী'আতের সংজ্ঞা প্রদান করে মওলানা আব্দুর রহীম (মৃ. ১৯৮৭) বলেন, الطَّرِيقَةُ المستقِيمةُ التي يُفيدُ منها المتمَسِّكون بها هِدايةً وتوفيقًا- অর্থ: "এক সুদৃঢ় ঋজুপথ, যদ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপথ লাভ করতে পারে।"[১০৯] ড. আব্দুল করীম যায়দান বলেন, মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধিবিধান জারি করেছেন তাকে শরী'আহ বলা হয়, সে বিধান কুরআন অথবা মহানবী (সা.) -এর বাণী, কর্ম বা সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।"[১১০] মান্না আল কাত্তান (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেন,

ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة فى شعبها المختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم ببعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم فى الدنيا والأخرة-

অর্থাৎ-আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আকীদা, ইবাদাত, আখলাক ও লেনদেন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বান্দাদের সাথে তাদের প্রভুর ও তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের সুখ সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেসব বিধান নির্ধারণ করেছেন তাই শরী'আহ।"[১১১]

ফিকহ শাস্ত্রে শরী'আহ আইনসমূহকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। এ দু'টি বিভাগ হচ্ছে ইবাদাত সম্পর্কিত শরী'আহ বিধান এবং মু'আমালাত সম্পর্কিত শরী'আহ বিধান। শরী'আহ আইনে কোন কর্ম সংঘটনকে বিচারিক বিশ্লেষণ করতে আইনগত অবস্থার পাশাপাশি নৈতিক মানদণ্ডে বিবেচনা করা হয়। এ কারণে শরী'আতের

---

১০৬. আল-কুরআন, ৪২: ১৩
১০৭. আল-কুরআন, ৪৫: ১৮
১০৮. আল-কুরআন, ৫: ৪৮
১০৯. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরী'আতের উৎস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১১০. ড. আব্দুল করীম যায়দান, *আল-'উকূবাত ফি শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* (আলেকজান্দ্রিয়া: দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯
১১১. মান্না খলীল আল-কাত্তান, *তারীখুত তাশরীইল ইসলামি* (কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ৫ম প্রকাশ, ২০০১২ খ্রি.), পৃ. ১৪

সিদ্ধান্তসমূহ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাহ, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম এই শ্রেণিসমূহের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

সর্বোপরি বলা যায় যে, শরী'আহ বলতে বুঝায় সেসব আদেশ-নিষেধ ও পথনির্দেশনা, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি জারি করেছেন। জারী করেছেন এ উদ্দেশ্যে যে, লোকেরা তার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে তদানুযায়ী আমল করবে এবং তদানুরূপ জীবন যাপন করবে। অতএব মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কল্যাণে যে বিধিবিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই শরী'আহ বলা হয় এবং শরী'আতের এ বিধিবিধান মূলত কুরআন ও সুন্নাহ এর আলোকে নির্ধারিত।

ইসলামে শিশু-কিশোরের মর্যাদা

ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর আগমনের প্রাক্কালেও তৎকালীন আরবে কন্যা শিশুদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের কোন সামাজিক অবস্থান বা মর্যাদা ছিল না। কন্যা শিশুর জন্মকে অপয়া মনে করা হতো। এজন্য তারা কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবন্ত প্রোথিত করার মতো জঘন্য কর্ম করতেও দ্বিধা করতো না। তাছাড়া অন্য শিশুরাও ছিল সমাজের সবচেয়ে অসহায়। তাই ইসলাম কন্যা সন্তানের পাশাপাশি সকল মানব শিশু-সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। শিশু-সন্তানের পরিচর্যা ও প্রতিপালনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে মানব সমাজে কন্যাসহ সকল শিশু-কিশোরের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে।

(ক) শিশু আল্লাহর দেওয়া শ্রেষ্ঠ নি'আমত

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করে নি'আমতে পরিপূর্ণ সুন্দর এ বসুন্ধরাতে খলীফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানব জাতির বসবাস উপযোগী করার জন্য মহান আল্লাহ এ পৃথিবীকে সাজিয়েছেন সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং নিখুঁতভাবে। পৃথিবীর খলীফা হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে প্রদান করেছেন অগণিত নি'আমত। এসব নি'আমতের মধ্যে সুসন্তান আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নি'আমত ও বিশেষ দান। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ– অর্থ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের জোড়া থেকে সৃষ্টি করেছেন ছেলে–মেয়ে, নাতি–নাতনি এবং তোমাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছেন।"[১১২] এই আয়াতে সন্তান-সন্ততিকে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

---

১১২. আল-কুরআন, ১৬: ৭২

আল্লামা শাওকানী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যয় লিখেছেন যে, এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতির মধ্য থেকেই জোড়া বানিয়েছেন, যেন তোমরা তার সাথে অন্তরের সম্পর্কের ভিত্তিতে মিলিত হতে পারো। কেননা প্রত্যেক প্রজাতিই তার স্বজাতির প্রতি মনের আকর্ষণ বোধ করে। আর ভিন্ন প্রজাতি থেকে তার মনে অনুরূপ আকর্ষণ থাকে না। মনের এ আকর্ষণ ও বিশেষ সম্পর্কের কারণেই বংশ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আর এ-ই হচ্ছে বিয়ের মূল উদ্দেশ্য।[১১৩] স্বামী-স্ত্রীর আবেগ-উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে সন্তানের মাধ্যমেই। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলঙ্ক পুষ্প বিশেষ। আল্লামা আলূসী (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাচানোর উপায় আর সন্তান-সন্তুতি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রজাতি রক্ষার মাধ্যম।[১১৪] বস্তুত পৃথিবীতে অগণিত মানুষ রয়েছে যাদের সম্পদের কোন অভাব নেই কিন্তু তা ভোগ করার জন্য কোন আপনজন নেই। হাজার চেষ্টা-সাধনা এবং কামনা করেও তারা সন্তান লাভ করতে পারছে না। আবার কত অসংখ্য লোক দেখা যায়, যারা কামনা না করেও বহু সংখ্যক সন্তানের জনক। কিন্তু তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নেই। তাই বলতে হয়, সন্তান হওয়া একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ নি'আমত। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا– অর্থ: "তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা তাকে সন্তানহীন রেখে দেন।"[১১৫] মানুষ যত বৈষয়িক শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারীই হোক না কেন, ইচ্ছামত সন্তান জন্মাবার ক্ষমতা তার নেই। অন্যদের সন্তান দানতো দূরের কথা, যার ভাগ্যে সন্তান নেই সে কোন উপায় অবলম্বন করেও সন্তান লাভ করতে সক্ষম হয় না। আল্লাহ যাকে কেবল পুত্র সন্তানই দিয়েছেন সে কোন উপায়েই একটি কন্যা সন্তান লাভ করতে পারে না। এ ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষই চরমভাবে অক্ষম। এরপরও যদি কেউ আল্লাহ ছাড়া অপর কোন সত্তাকে এরূপ ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করে তবে তা তার অদূরদর্শিতারই ফল।

সন্তান-সন্তুতি পিতা-মাতার জন্য অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার এবং মানব বিকশিত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। সন্তান পিতামাতার জন্য আর্শীবাদ। তাই পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا–অর্থ: "ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্তুতি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য, আপনার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে স্থায়ী সৎকাজ এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয় হিসেবেও উত্তম।"[১১৬] সৎসন্তান থাকলে তারা যদি দু'আ করে এবং সৎকাজে অর্থ–সম্পদ ব্যয় করে মৃত্যুর পরও মানুষ তা দিয়ে উপকৃত

---

১১৩. মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ আশ-শাওকানী, *ফাতহুল কাদির* (বৈরুত: দারুল ওফাই, ১৯৯৪ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ২৪৭
১১৪. আবূল ফযল শাহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ আলূসী বাগদাদী, *রুহুল মা'আনী* (বৈরুত: দারু এহইয়াউল তুরাসিল আরাবি, তা.বি.), খ. ১১, পৃ. ১৯০
১১৫. আল-কুরআন, ৪২: ৪৯-৫০
১১৬. আল-কুরআন, ১৮: ৪৬

হয়। কাজেই ধন–সম্পদ ও অর্থ–সম্পদ স্থায়ী সৎকাজের মাধ্যম হতে পারে। সন্তান-সন্ততির প্রতি মানুষের আসক্তি ও আকাঙ্খা সহজাত এবং চিরন্তন। এ আকাঙ্খার কথা স্মরণ করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا– يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا–

অর্থ: "আমি আমার পরে আমার জাতির লোকদের ব্যাপারে ভয় করি। আমার স্ত্রী বন্ধা। তাই আপনি আমাকে আপনার নিকট থেকে উত্তরাধিকারী দান করুন। যেন সে আমার উত্তরাধিকারী হয় এবং উত্তরাধিকারী হয় ইয়াকূবের বংশধরের। হে আমার প্রতিপালক! আমার সে উত্তরাধিকারীকে আপনার সন্তুষ্টি (অনুযায়ী) দান করুন।"[১১৭] পবিত্র কুরআনের অন্যত্র মানবের এহেন চাহিদার কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا– অর্থ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়াবে এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য (নেতৃত্ব দান করে) অনুসরণযোগ্য করুন।"[১১৮] পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে, قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء–

অর্থ: "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি দু'আ শ্রবণকারী ও গ্রহণকারী।"[১১৯] সন্তান আল্লাহর দেওয়া এক উত্তম নি'আমত। এ নি'আমতের সুফল মৃত্যুর পরেও ভোগ করা যায়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ– অর্থ: "মানুষ যখন মৃত্যুবরণ তখন তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য তখনো তিন প্রকার আমলের ফল সে পেয়ে থাকে। (১) সাদকায়ে জারিয়া (২) এমন বিদ্যা বা জ্ঞান যার সুফল ভোগ করা যায় (৩) এমন চরিত্রবান সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করতে থাকে।"[১২০] সৎসন্তান রেখে যাওয়াকে আমল বলার কারণ এই যে, সন্তান পিতা-মাতার কারণেই দুনিয়ায় আগমণ করে থাকে এবং তাদের সযত্ন প্রতিপালনের ফলেই সে চরিত্রবান হতে পারে। আর এ চরিত্রবান সন্তানই আবার বাবা-মায়ের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা তা সাদাকা হিসেবে কবুল করে নেন। সুতরাং শিশু সন্তানের একটি আদর্শ ভবিষ্যৎ গড়তে হলে, তাকে অপরাধমুক্ত জীবন উপহার দিতে হলে পিতা-মাতাকে প্রথমেই ইসলামি নির্দেশনা মেনে শিশু-সন্তানকে সৎ-চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলতে হবে। সন্তান-সন্ততি যেমন আল্লাহর নি'আমত, তদ্রুপ পরীক্ষার বস্তুও বটে। কারণ পৃথিবী মানব জাতির জন্য পরীক্ষার স্থান হিসেবে স্বীকৃত। তাই আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি

---

১১৭. আল-কুরআন, ১৯: ৫-৬
১১৮. আল-কুরআন, ২৫: ৭৪
১১৯. আল-কুরআন, ৩: ৩৮
১২০. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ওছিয়্যাহ, বাবঃ মা ইয়ালহাকুল ইনসানা মিনাছ চাওয়াবে বা'দা ওফাতিহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৩১; ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবল ওছাইয়া, বাবঃ মা যায়া ফিষ সাদাকাতি আনিল মাইতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৮৮০; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল আহকাম আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাবঃ ফিল ওকফে, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৭৬

পরীক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ– অর্থ: "জেনে রেখ, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা বিশেষ। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।"[১২১] ইসলাম শিশু-কিশোরের প্রতি কত বেশি গুরুত্বারোপ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহান আল্লাহর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর বিভিন্ন হাদীস থেকে। আল্লাহ নিজেই শিশুর নামে শপথ করেছেন এভাবে, لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ অর্থ: "আমি এ নগরীর নামে শপথ করে বলছি এবং এ নগরীতে আপনার কোন প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধা নেই। আর শপথ করছি জন্মদাতার নামে এবং তার ঔরসে জন্মপ্রাপ্ত সন্তানের নামে।"[১২২] শিশুদের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হৃদয় জুড়ে ছিল শিশুদের প্রতি প্রবল ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) শিশুদের ভালবাসো এবং তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا–অর্থ: "যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করে না এবং বড়দের মর্যাদা বা অধিকারের জ্ঞান রাখে না, সে আমাদের কেউ নয়।"[১২৩]

নিম্নোক্ত ঘটনা থেকেও শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার নিদর্শন পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন বিজয়ীর বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করেন, তখন উটের উপর তাঁর সাথে ছিল একজন শিশু এবং একজন কিশোর। শিশুটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর বড় মেয়ে জয়নব (রা.) -এর শিশু পুত্র আলী (রা.) ও কিশোরটি ছিল উসামা (রা.)। নবী নন্দীনী ফাতিমা (রা.) -এর শিশু পুত্র হাসান ও হুসাইন (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) যে কত ভালবাসতেন ইতিহাসে এর বহু ঘটনা উল্লিখিত আছে। শিশুদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর গভীর ভালবাসা কেবল নিজ পরিবারের বা অতিপ্রিয় সাহাবীদের শিশু-সন্তানদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সকল শিশুর ব্যাপারে তাঁর ছিল সমান দরদ। নবী (সা.) শিশুদের কান্না শুনতে পেলে সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিতেন এবং বলতেন, انى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى صلاتى كراهية أن أشق على أمه– অর্থ: "আমি সালাত দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছায় দাঁড়াতাম, কিন্তু, যখন কোন শিশুর কান্না শোনতাম তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করতাম যাতে মায়ের কষ্ট না হয়।"[১২৪] অপর একটি হাদীসে শিশু-কিশোরদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর ভালবাসার চিত্র ফুটে উঠে,

১২১. আল-কুরআন, ৮: ২৮
১২২. আল-কুরআন, ৯০: ১-৩
১২৩. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাব: ফি রাহমাতি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৯৪৩; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল বিররি ওসসিলাতি আন রাসূলুল্লাহ (সা.), বাব: মা যায়া ফি রাহমাতিস সিবইয়ান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯১৯
১২৪. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: আল-আযান, অনুচ্ছেদ: মান আখাফ্ফাস সালাতা ইনদা বুকাইস সাবিয়ী, পাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৫০

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالُوا لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ-

অর্থ: হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন কতিপয় বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর খিদমাতে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন সাহাবীগণ শিশু সন্তানদেরকে চুমু দিয়ে আদর করছেন। তা দেখে তারা বলল, আপনারা কি আপনাদের শিশুদেরকে চুম্বন করেন? তাঁরা উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! তারা বলল কিন্তু, আল্লাহর কসম, আমরাতো শিশুদেরকে চুম্বন করি না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, "আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা ছিনিয়ে নিয়ে থাকেন, তাহলে আমার কিছুই করার নেই।"[১২৫]

দুনিয়াবী জীবনের জন্য যেমন শিশু-সন্তানের গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি পরকালীন জীবনের জন্যও শিশুদের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। পরকালে আল্লাহ তা'আলা সন্তান-সন্ততিকে পিতামাতার সাথে জান্নাতে একত্রে থাকার ব্যবস্থা করবেন, যাতে তারা আনন্দে সময় কাটাতে পারে। নিম্নোক্ত কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ- অর্থ: "যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান–সন্ততির মধ্যে যারা তাদের অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তান–সন্ততিদের জান্নাতে মিলিত করব।"[১২৬] আল্লাহ তাআ'লা এতে শিশু সন্তানকে সুসন্তান ও ঈমানের অনুসারী হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ-অর্থ: "চিরস্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে। তাদের মাতাপিতা, স্বামী–স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততির মধ্যে যারা ভাল কাজ করেছে তারাও সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১২৭] তাই শিশুদের সাথে সদাচরণ করতে হবে। আর এটা ঈমানের পূর্ণতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত।

মানব শিশুর গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে তাদের প্রতি যথার্থ আচরণ ও ব্যবহার করা সকলের দায়িত্ব। আধুনিক ভোগবাদী চিন্তাধারায় মানুষের সুখ-শান্তি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষায় মানব শিশুর প্রতি নানা রকম নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। অনেক দম্পতি স্বাস্থ্যহানি ও ভোগের সুযোগ কমে যাবে মনে করে সন্তান গ্রহণ করতে চায় না। অনেকে তো বিয়ে করতেও রাজি নয়। তারা চায় বিবাহ বন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন। বিয়ের বন্ধন ছাড়াই তারা যৌনজীবনে আগ্রহী। জন্ম নিয়ন্ত্রণের কলাকৌশলের কারণে এসব অবৈধ কাজ অনেক সহজ ও নিরাপদ হয়ে

১২৫. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব: রাহমাতুহু (সা.) আস-সিবইয়ানা ওয়াল 'ইয়ালা. . . ওফাদলু যালিকা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩১৭

১২৬. আল-কুরআন, ৫২: ২১

১২৭. আল-কুরআন, ১৩:২৩

গেছে। একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ অবশ্য শিশু-সন্তানের উজ্জ্বল সমৃদ্ধ জীবন কামনা করে। কাজেই একজন ভাল মানুষের কাছে মানব শিশুর গুরুত্ব অপরিসীম।[১২৮]

(খ) শিশু-কিশোর মানব জাতির রক্ষাকবচ

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব বংশধারা, অস্তিত্ব রক্ষা ও বিস্তারের ভিত্তি হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র দাম্পত্য জীবন। এ দাম্পত্য জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতির বংশ বিস্তার ও মানব সভ্যতার অগ্রায়ণ। মানবশিশু মানব জাতির রক্ষাকবচ। মানব জাতির সূচনা ও বিকাশের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا–অর্থ: “হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন সে ব্যক্তি থেকে তার জোড়া, আর তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পুরুষ ও নারী। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অন্যের নিকট কিছু চাও। আর তোমরা আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্ক হও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।”[১২৯] পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতে মানুষের বংশ বিস্তারে মহান আল্লাহর সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ–অর্থ: “আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং গবাদী পশুর মধ্য থেকে গবাদী পশুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। কোন কিছুই তাঁর মত নয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।”[১৩০] পবিত্র কুরআনে আরো বর্ণনা করা হয়েছে, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا–“তিনি পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তাকে তিনি বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কে সম্পৃক্ত করেছেন। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।”[১৩১]

উপরোল্লিখিত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায় যে, মহান আল্লাহ বিশেষ উদ্দেশ্যে মানব জাতিকে প্রেরণ করেছেন। মানব জাতি বংশ বিস্তারের মাধ্যমে পরম্পরা বজায় রাখছে। মহান আল্লাহ বংশ বিস্তারের সুযোগ না দিলে পৃথিবী থেকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যেত। আর বংশ তথা মানব জাতিকে রক্ষার জন্য সন্তান-সন্ততি দান করেছেন। তাই মানব সন্তান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য নি'আমত এবং এ সন্তান মানব জাতির রক্ষাকবচ।

---

১২৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, “শিশু: আইনী ও ইসলামী দৃষ্টিকোণ”, *আইন ও বিচার ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ.৭, সংখ্যা.২৭, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২১-২২

১২৯. আল-কুরআন, ৪: ০১

১৩০. আল-কুরআন, ৪২: ১১

১৩১. আল-কুরআন, ২৫: ৫৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
শিশু-কিশোরের অপরাধমুক্ত জীবনযাপনে ইসলামের দিকনির্দেশনা : প্রতিপালন ও পরিচর্যার গুরুত্ব

অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরে তার সংশোধন বা বিচারপূর্বক সংশোধনের চেয়ে প্রতিরোধমূলক (Preventive Action) ব্যবস্থার উপর বেশি জোর দিয়েছে। এরপরেও কোন কারণবশতঃ অপরাধ সংঘটিত হলে তার যথাযথ পর্যবেক্ষণ, আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ, অপরাধ সংঘটনের কারণে ক্ষয়-ক্ষতি, অপরাধীর অপরাধ করার কারণ, পরিপ্রেক্ষিত ও বয়স প্রভৃতিকে আমলে নিয়ে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ বিচারকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে আইনের প্রকৃত শাসন বাস্তবায়ন করেছে। আর এভাবেই পূর্ব প্রতিরক্ষা এবং অপরাধ পরবর্তী ন্যায়বিচার তৎপরতা বাস্তবায়ন করে কিশোরদের অপরাধের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। নিম্নে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিশ্লেষণ করা হলো-

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। সঠিক পন্থায় শিশু-কিশোরের মানসিক বিকাশ না হওয়ার কারণেই মূলত কিশোর অপরাধ সংঘটিত হয়। এছাড়াও যেসব কারণে এ ব্যাধির সৃষ্টি হয়, সে সকল কারণসমূহ সমূলে উৎপাটনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ইসলাম সর্বজন স্বীকৃত প্রতিরোধমূলক ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে তার প্রতিকার করেছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থায় ইসলাম বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। আর সংশোধনের অধীন রয়েছে উন্নয়নমূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। নিম্নে ইসলাম প্রদত্ত এসকল ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করা হলো-

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি না হয়, তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা। যেসব কারণে শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়, সেগুলোকে আগে থেকে দূর করাই এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।[১৩২] অর্থাৎ যেসব কারণে শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হতে পারে সে কারণসমূহ পূর্ব হতেই প্রতিহত ও দূরীভূত করে শিশু-কিশোরকে অপরাধের ছোঁয়া থেকে দূরে রাখা। মানবজীবন কতগুলো স্তর বা ধাপের সমষ্টি, এর মধ্যে শিশু ও কিশোর অন্যতম। জীবন পরিক্রমায় এই স্তর বা ধাপ অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। শিশু-কিশোরদের জীবন-প্রকৃতি বড়দের থেকে আলাদা। তাদের চাহিদা এবং বিকাশকালীন প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাও ভিন্নতর বিধায় পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হয়ে তারা যেন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে সে জন্য যেসব কার্যকারণ অপরাধকর্মে লিপ্ত হতে তাদেরকে উৎসাহিত

---

১৩২. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা* (ঢাকা : প্রভাতী লাইব্রেরী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৫৮

করে; অথবা তাদের জন্য সুযোগের সৃষ্টি করে দেয়, কিংবা তাদেরকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকে চিহ্নিত করে অপরাধ সংঘটনের পূর্বেই তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। ইসলাম অপরাধ সংঘটনের পূর্বে তা প্রতিহত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অধীন ইসলাম শিশুদের প্রতিপালন ও পরিচর্যার বিশেষ করে তাদের শৈশব ও কৈশোরে সঠিক পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। আর এজন্য ইসলাম পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের উপর দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে পরিবারের দায়িত্ব-কর্তব্য

শিশু ও কিশোরের অপরাধ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় ইসলাম সর্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে সেটি হচ্ছে পরিবার। কারণ কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের উত্তম স্থান হলো পরিবার। জন্মের পর শিশু পারিবারিক পরিবেশে মাতা-পিতার সংস্পর্শে আসে। শিশুর সামাজিক জীবনের ভিত্তি পরিবারেই রচিত হয়। তাই তাদের আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। এজন্যই ইসলাম শৈশবকাল থেকে ঈমানের শিক্ষা, ইবাদাতের অনুশীলন, ইসলামের যথাযথ জ্ঞানার্জন ও নৈতিকতার উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে পরিবারের উপর।

ইসলাম সন্তানের অপরাধমুক্ত জীবনযাপনের নিমিত্ত পিতা-মাতা ও অভিভাবককে সন্তান জন্মের পূর্বেই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এ লক্ষ্যে ইসলাম পিতা-মাতার সৎ উপার্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। যাতে পিতামাতা সৎ জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে সুদ, ঘুষ, কালোবাজারিসহ সকল অনৈতিক পন্থায় উপার্জন থেকে মুক্ত থেকে জীবন নির্বাহ করে। যাতে উক্ত পিতামাতার সন্তানের উপর সৎ উপার্জনের প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং সন্তান অপরাধের প্রভাবমুক্ত হয়েই মাতৃগর্ভ থেকে শুরু করে শৈশব-কৈশোর অতিবাহিত করতে পারে। কারণ পিতা-মাতার অসৎ উপার্জন সন্তানের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে যা তাদেরকে অপরাধের পথে ঠেলে দেয়।

আগামী দিনের ভবিষ্যৎ শিশু-কিশোররা যাতে অপরাধের সংস্পর্শে আসতে না পারে এবং অপরাধমুক্ত থাকতে পারে সেজন্য ইসলাম পরিবারের সামগ্রিক কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম নিজেকে এবং পরিবারকে অপরাধ থেকে দূরে রেখে পরকালের জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের এবং তাদের পরিজনদের অপরাধমুক্ত জীবনযাপন করার মাধ্যমে জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ – অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদেরকে সে আগুন থেকে রক্ষা কর যে আগুনের জ্বালানী হবে মানুষ এবং পাথর, যে আগুনের পাহারাদার হবে নির্মম হৃদয় ও কঠোরস্বভাবের

অধিকারী ফেরেশতাগণ।"[১৩৩] উক্ত আয়াতের তাৎপর্য বর্ণনা করে প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী বলেন, "আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনদের ইসলামি জীবনব্যবস্থা, সমস্ত কল্যাণকর জ্ঞান ও অপরিহার্য শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া আমাদের কর্তব্য।"[১৩৪] অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) -এর হাদীসেও শিশু-কিশোরদের সুষ্ঠু বিকাশ ও সামাজিকীকরণে পরিবারের দায়িত্বের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নির্দেশিত হয়েছে। ইসলামের সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর একনিষ্ঠ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ-

অর্থ: "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল বা তত্ত্বাবধায়ক এবং এবং প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম বা শাসক সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর একজন পুরুষ তার নিজ পরিবারের রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক এবং সে নিজের অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর একজন স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও তার সন্তানাদির রক্ষক বা অভিভাবক। তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। একজন গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে।"[১৩৫] বর্ণিত হাদীসটি ছাড়াও সহীহ বুখারীর আরো একাধিক হাদীসে পরিবারের একই দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীকে তাদের আহল তথা সন্তান-সন্ততির রক্ষক বা অভিভাবক হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই সন্তানের রক্ষক হিসেবে সমস্ত অন্যায়-অপরাধ কর্ম হতে সন্তানকে রক্ষা করে সন্তানের কল্যাণ চিন্তা করা এবং অপরাধমূলক যাবতীয় কাজ হতে দূরে রাখা পিতামাতার কর্তব্য। সুতরাং পবিত্র কুরআনের এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাহর আলোকে দেখা যায় যে, শিশু-কিশোর তথা সন্তানকে অপরাধমুক্ত জীবন উপহার দেওয়ার জন্য পরিবারের কর্তব্য সর্বাগ্রে। নিম্নে ইসলামের আলোকে শিশু-কিশোরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখার জন্য পরিবারের করণীয়দিকসমূহ আলোকপাত করা হলো-

১। ঈমানের শিক্ষা দেওয়া

ঈমান মানব জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান বিষয়। মহান আল্লাহ যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূলগণ প্রেরণ করেছেন মানব জাতিকে আকীদা তথা ঈমানের পরিশুদ্ধতা প্রশিক্ষণের জন্য।[১৩৬] যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ অর্থাৎ "আমি আপনার

---

১৩৩. আল-কুরআন, ৬৬: ৬
১৩৪. মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন* (আল-কাহেরা: দারুল হাদীস, ১৪২৩হি.), খ. ১৮, পৃ. ৪২০
১৩৫. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: আন-নিকাহ, অনুচ্ছেদ: আল-মারআতু রাইয়াতুন ফি বাইতি জাওযিহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫২০০
১৩৬.মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফি 'উলূমিল কুরআন* (চট্টগ্রাম: মাকতাবাতুল মানার, তা.বি), পৃ.২৩৭

আগে যত রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের প্রত্যেকের নিকট এ ওহী প্রেরণ করেছি যে, নিশ্চয় আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কাজেই তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর।"[১৩৭]

জাগতিক জীবনের প্রকৃত শান্তি, বিশুদ্ধ জীবনযাত্রা, সামগ্রিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি ইত্যাদি সবকিছুর সফলতা প্রকৃত অর্থে ঈমানের বিশুদ্ধতার উপরই নির্ভরশীল। ঈমান হলো সকল প্রকার অপরাধের প্রতিরোধক। অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ঈমানের ভূমিকা অপরিসীম। যার হৃদয়-মনে ঈমান সক্রিয় থাকে, সে কখনই কুরআন সুন্নাহর বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে অপরাধে লিপ্ত হতে পারে না। তবে ঈমান যেমন মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত বানায়, তেমনি কুফর বানায় শয়তানের অনুসারী। যারা নিজেদেরকে শয়তানের অনুসারীতে পরিণত করবে, তারাই শয়তানের প্ররোচনায় সকল প্রকারের পাপকর্ম ও অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য হবে। তাই মহান আল্লাহ ঈমানদারদের শয়তানের অনুসারী না হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন, يايها الَّذِيْن امنُوْا لاتتَّبِعُوْا خُطُواتِ الشَّيْطانِ ط ومنْ يَّتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فاِنَّهُ يأمُرُ بِالْفحْشاءِ والْمُنْكرِ– অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। যে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, শয়তান তাকে অশ্লীলতা ও অপরাধমূলক কাজের নির্দেশ দিবে।"[১৩৮]

কেবলমাত্র ঈমানই পারে মানুষকে খারাপ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে। এজন্যই শিশু-সন্তান যখন প্রথম কথা বলতে শুরু করে, তখন ঈমানের প্রশিক্ষণ হিসেবে পিতা-মাতার উচিত সন্তানের মুখ দ্বারা সর্বপ্রথম আল্লাহর নাম উচ্চারণ করানো। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, افتحوا على صبيانكم أوّل كلمة بلا إله إلاّ الله–ولقّنوهم عند الموت لا إله إلاّ الله– অর্থ: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রথম কথা শুরু করবে এই বলে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' এবং মৃত্যুর সময়ও পাঠ করাবে যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই'।"[১৩৯]

এছাড়াও সন্তানদেরকে আল্লাহর সৃষ্টি জগতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যুক্তির মাধ্যমে মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন তথা ঈমান আনায়নের আহ্বান জানাতে হবে। এ বিষয়ে লুকমান হাকীমের উপদেশগুলো প্রণিধানযোগ্য। যা প্রতিটি মানবসন্তানের ঈমানকে সুদৃঢ়, কর্মকে পরিশুদ্ধ, চরিত্রকে সংশোধন ও সামাজিক শিষ্টাচারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। উক্ত উপদেশ থেকে সন্তানদের শিক্ষাপ্রদানের জন্য আল-কুরআনে উক্ত উপদেশাবলী চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ–অর্থ: "স্মরণ করুন সে সময়ের কথা, যখন লুকমান তার সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে আমার পুত্র! আল্লাহর কোন শরীক করো না। নিশ্চয় শিরক হল ভয়ানক

১৩৭. আল-কুরআন, ২১: ২৫
১৩৮.আল-কুরআন, ২৪: ২১
১৩৯.হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *আল-জামি' লিশু'আবিল ঈমান*, অনুচ্ছেদ: হুকমূল আওলাদ ওল আহলিন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮২৮২

যুলম।"[১৪০] সূরা লোকমানে আরো উল্লেখ করা হয়- يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ- অর্থ: "হে আমার সন্তান! যদি পাপ বা পূণ্য অণু পরিমাণও হয় এবং তা যদি পাথরের মধ্যে অথবা আকাশে কিংবা মাটির ভেতরেও থাকে –তারপরও আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সবকিছু জানেন।"[১৪১]

ইসলামের দাবী হলো পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত লোকমান হাকীমের উপদেশ বাণী অনুসরণ করে অভিভাবকগণ যেন পর্যায়ক্রমে সন্তানদের সামনে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোর পরিচয় অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে তুলে ধরে সেগুলোর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। যাতে মহান আল্লাহর প্রতি মানব সন্তানের ঈমান আরো মজবুত ও সুদৃঢ় হয়। আর ঈমান দৃঢ় ও শিরকমুক্ত হলে নৈতিক গুণাবলী অর্জন তার জন্য অত্যন্ত সহজ হবে। আর নৈতিক গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব হলেই প্রতিটি সন্তান পাপ ও অন্যায়মুক্তভাবে শিশুকাল হতেই বেড়ে উঠবে। এজন্য ঈমান হলো অন্যায়-অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রথম ধাপ।

২। ইসলামের যথার্থ জ্ঞানার্জন

জ্ঞান মানুষের অমূল্য সম্পদ। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই মানবিক গুণাবলী উৎকর্ষ ও বিকশিত হয়। যে জ্ঞানের কল্যাণে মানবজাতি সমগ্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন, সেটি হলো কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান। ইসলামের দৃষ্টিতে আল-কুরআন সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। আর রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাহ বা হাদীস হলো তার প্রয়োগিক জ্ঞান বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এই কুরআন এবং সুন্নাহতেই বিধৃত রয়েছে সমগ্র মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার সকল পথনির্দেশনা। তাই ইসলাম মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কল্যাণকর জ্ঞানার্জনকে সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, اطلبوا العلم ولو بالصّين, فإن طلب العلم فريضةٌ على كل مسلمٍ– অর্থ: "জ্ঞান অন্বেষণ করার জন্য প্রয়োজনে তোমরা চীন দেশে যাও। কেননা, জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয।"[১৪২] ইবনে মাজাহর অনুরূপ এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ– অর্থ:

১৪০. আল-কুরআন, ৩১: ১৩
১৪১. আল-কুরআন, ৩১: ১৬
১৪২. বি.দ্র: বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বায়হাকী তাঁর *শু'আবুল ঈমান*, কিতাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাদীসের শুদ্ধতার ব্যাপারে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বায়হাকী উল্লেখ করেন, হাদীসটির প্রসিদ্ধি মাশহুর পর্যায়ে কিন্তু যতগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি সনদই দুর্বল। (ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *শু'আবুল ঈমান*, অনুচ্ছেদ: ফী তৃলাবিল 'ইলম, প্রাগুক্ত, খ.২, হাদীস নং-১৬৬৩)

"জ্ঞানার্জন সকল মুসলিমের উপর ফরয। অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে 'ইলম গচ্ছিত রাখা শূকরের গলায় মনিমুক্তা খচিত স্বর্ণ হার পরানোর শামিল।[১৪৩]

তাই ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিম্নোক্ত হাদীসে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ قَالَ لَا قَالَ وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ–

অর্থ: "কাসীর ইবনে কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে আবূ দারদা (রা.) এর কাছে বসা ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, হে আবূ দারদা! আমি মদীনাতুর রাসূল (সা.) থেকে আপনার কাছে একটি হাদীস শোনার জন্য এসেছি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নবী (সা.) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন তুমিতো কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আসনি? সে বললো না। তিনি বললেন, সম্ভবত অন্য কোন উদ্দেশ্য হেতু আগমন করেছ? সে বললো না। তিনি বললেন, অবশ্যই আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি 'ইলম অর্জনের জন্য সফর করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন। আর নিশ্চয়ই ফেরেশতাগণ 'ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাঁদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর 'ইলম অন্বেষণকারীর জন্য আসমান ও যমীনবাসী আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করে, এমনকি পানির মাছও। নিশ্চয়ই আলিমের ফযিলত আবিদের উপর, যেমন চাঁদের ফযিলত সমস্ত তারকারাজির উপর। নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দীনার ও দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান নাই, বরং তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে যান 'ইলম দীন। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করলো সে যেন এক বিরাট হিস্সা লাভ করলো।"[১৪৪] এ হাদীস থেকে ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেন, مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ– অর্থ: "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে তিনি দীনের জ্ঞান দান করেন।"[১৪৫]

রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিম্নোক্ত হাদীসে জ্ঞানীর মর্যাদা অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন, فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى

---

১৪৩. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, অধ্যায়: আলমুকাদ্দামাহ, বাব: ফাদলুল 'উলামায়ে ওয়াল হাচ্ছু আলা ত্বলাবিল 'ইলম (রিয়াদ, জেদ্দাহ: দারুসসালাম,২০০৭খ্রি.), হাদীস নং-২২৪

১৪৪. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২২৩

১৪৫. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২২১

الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ–অর্থ: "একজন ইসলামি জ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি (ফকীহ) শয়তানের উপর একহাজার আবিদের (ইবাদাত গুযার) চাইতেও অধিক শক্তিশালী।"[১৪৬]

বস্তুত জ্ঞানার্জন দীনকে ভালভাবে উপলব্ধি করার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ব্যক্তির কল্যাণ ও উৎকর্ষ নির্ভর করে জ্ঞানার্জনের উপর। একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহকে সত্যিকারার্থে ভয় করে, তাঁর আদেশ-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ– "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী (যারা আল্লাহর পরিচয় জেনেছে) কেবল তারাই আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে।"[১৪৭] সুতরাং পিতা-মাতা সন্তানকে ঈমানের শিক্ষা প্রদানের পর ইসলামের যথার্থ জ্ঞান দান করবেন এবং তাদের অনুসন্ধিৎসাকে জাগিয়ে তুলবেন। সৃষ্টিজীবের প্রতি মহান প্রতিপালকের ভালবাসা ও অসীম দয়ার কথা জানতে পারে এবং কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবনত হয়ে যাবতীয় পাপকাজ হতে বিরত থাকতে পারে। যাতে করে তারা অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে এবং নিজেদেরকে অপরাধকর্ম থেকে বিরত রাখতে পারে।

৩। ইবাদাত অনুশীলন

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইবাদাত প্রক্রিয়ার ধরন ও অনুশীলনের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাত যথাক্রমে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেকটিই মানুষের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটিরই চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষকে সকল প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা ও অপরাধপ্রবণতা থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগত বান্দাহ বানানো।[১৪৮] যেমন, সালাত মহান আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দাহদের গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও আত্মসমর্পণের ভাবধারা সৃষ্টি করে। যা তাদেরকে অপরাধমূলক যাবতীয় কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে বাধা দেয়।[১৪৯] আর সিয়াম সাধনা বা রোযা পালনের মাধ্যমে তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয়।[১৫০] যা মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সাহায্য করে।

এভাবেই ইবাদাত পালনের মাধ্যমে যাবতীয় অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টি করতে চায় ইসলাম। মাতা-পিতা শৈশবকাল থেকেই সন্তানদের সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাতসহ ইসলামের মৌলিক 'ইবাদাতসমূহ অনুশীলনের ব্যবস্থা করবেন। যাতে করে তারা কুপ্রবৃত্তি বা শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ কর্মে লিপ্ত

---

১৪৬. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২২২
১৪৭. আল-কুরআন, ৩৫: ২৮
১৪৮. ড. ইউসূফ হামিদ আল-'আলিম, *আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* (রিয়াদ: আদ-দারুল 'আলামিয়াহ লিল কিতাবিল ইসলামি, ১৪১৫হি.), পৃ. ২৩৮
১৪৯. বি.দ্র: আল-কুরআন, ২৯: ৪৫
১৫০. বি.দ্র: আল-কুরআন, ২: ১৮৩

না হয় এবং পরবর্তী জীবনে 'ইবাদাত পালনে অভ্যস্ত হয়। শিশু-কিশোরদের উপর সালাত ফরয না হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনে প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন।[১৫১] রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর এই নির্দেশনা থেকে শিশু-কিশোরদের ইবাদাত অনুশীলনের গুরুত্ব প্রমাণিত। তাই প্রত্যেক মাতা-পিতা তার আদরের সন্তানের অপরাধ ও পাপমুক্ত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে শৈশব থেকেই ইবাদাতের প্রতি আগ্রহী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

৪। শিশুদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করা

চরিত্র মানুষের উত্তম ভূষণ। মানুষের জীবনে যেকোন জিনিসের চেয়ে চরিত্র অধিক মূল্যবান। এই চরিত্র বিনষ্ট হলে তার সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য অ্যামেরিকান ধর্মপ্রচারক মনীষী William Franklin Billy Graham Jr.(1918-2018) বলেন, "When wealth is lost nothing is lost; when health is lost something is lost; when character is lost, all is lost." মানুষের আচার-আচরণ ও দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্য দিয়ে যে স্বভাব প্রকাশিত হয় তাকে আখলাক বা চরিত্র বলে।[১৫২] বিশ্ববরেণ্য ইসলামি চিন্তাবিদ ও দার্শনিক ইমাম গাযালী (রহ) চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "চরিত্র হলো মানব মনে গ্রোথিত এমন অবস্থা, যা থেকে কোন কর্ম চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অনায়াসে প্রকাশিত হয়।"[১৫৩] আর মানুষের আচার-আচরণ ও কাজ-কর্ম সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা আদর্শের আলোকে গড়ে উঠলে তাকে বলা হয় নৈতিকতা। শৈশবকাল থেকেই মূলত নৈতিকতা বিকশিত হওয়া শুরু হয় এবং কৈশোরকালের শেষ পর্যায়ে গিয়ে চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে।[১৫৪]

শিশু-কিশোরের নৈতিকতা উন্নয়নে পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। মা-বাবা এবং পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ সদস্যরা নীতি-নৈতিকতা মেনে চললে এবং শিশু-কিশোরদেরকে তা অনুকরণ করে মেনে চলতে শিখালে তারাও একসময় নৈতিক ও মানবিক হয়ে উঠবে। এভাবে তারা চরিত্র গঠনের নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে পারলে কিশোর অপরাধপ্রবণতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে সক্ষম হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত চরিত্র গঠনের উত্তম গুণাবলী যেমন- তাকওয়া, লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা, ওয়াদা পালন, আমানাতদারিতা, সবর, ইহসান, বিনয়, নম্রতা, উদারতা ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী পরিবারের পক্ষ থেকে সন্তানকে শিক্ষা দানের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। এ ক্ষেত্রে

---

১৫১. বি.দ্রঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবঃ আসসালাত, বাবঃ মাতা ইউমারুল গুলামু বিসসালাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৯৫

১৫২. এএমএম সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৪হি.), পৃ. ৮১

১৫৩. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল গাযালী, *ইহ্ইয়াউল 'উলুমিদ্দীন* (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফা, তা.বি.), খ. ৩, পৃ. ১৭৭

১৫৪. সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪

সন্তানকে উদ্দেশ্য করে লূকমান (আ.) এর উপদেশগুলো[১৫৫] সকল পিতা-মাতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে থাকেবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতার পক্ষে সন্তানের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ হলো উত্তম শিক্ষা প্রদান করা। কারণ ধন-সম্পদ, গাড়ী-বাড়ী কোনটাই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত সম্পদ নয়; এগুলো সবই অস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল। কিন্তু উত্তম শিক্ষা আজীবন তার সাথীকে সঠিক পথ দেখায়। এজন্য শিশুদের সঙ্গে যে কোন ধরনের খারাপ ব্যবহার পরিহার করে তাদের সঙ্গে সব সময় উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দানের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) নির্দেশ প্রদান করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, لان يودب الرجل ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع –অর্থ: কোন ব্যক্তি তার সন্তানদেরকে উত্তম আচরণ শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক দিন' অর্ধ সা' সাদাকা করার চেয়েও উত্তম।"[১৫৬] অতএব শৈশব থেকেই সন্তানদেরকে নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করে ভবিষ্যতে যে কোন বিচ্যুত-সমাজবিরোধী আচরণ এবং অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখা প্রত্যেক মুসলিম পরিবারের অবশ্যকর্তব্য।

৫। পারিবারিক সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা

শিশু যে পরিবেশে মানুষ হবে সে পরিবেশটিকে যথাসম্ভব সবদিক থেকে স্বাস্থ্যসম্মত করে তুলতে হবে। একজন শিশুর ভবিষ্যৎ গঠিত হয় তার পরিবার থেকে। একজন শিশুর মানসিক বিকাশ, শারীরিক গঠন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী গড়ে উঠে পরিবার থেকে। পরিবার যদি শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ দিতে না পারে সে ক্ষেত্রে শিশুর পুর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধিত নাও হতে পারে। পরিবারে সে যদি মানবিক বিকাশের সুস্থ পরিবেশ না পায় তাহলে ভবিষ্যতে তার অপরাধপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একটি শিশুর ভবিষ্যত জীবন অপরাধমুক্ত ও নিষ্কলুষ রাখার জন্য সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ একান্ত জরুরী। তাই পিতা-মাতার উচিত শিশুর জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে সে শৈশবেই সে বিরূপ কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়।

৬। উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া

পিতামাতা সন্তানদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজ সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার শিক্ষা দিবেন। যেমন, খাবার, পানাহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও গৃহে প্রবেশের শিষ্টাচারসহ যাবতীয় আদব শিখাবেন। যা তাদের নৈতিক মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত 'উমার ইবন আবূ সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي

১৫৫. আল-কুরআন, ৩১: ১৭-১৯
১৫৬. ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন আল-বায়হাকী, *আল-জামি' লিশু'আবিল ঈমান*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮২৮৯

بَعْدُ– অর্থ: “আমি শৈশবকালে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খিদমাতে নিয়োজিত ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিক ছুটাছুটি করত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, হে বালক! বিছমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সম্মুখ হতে খাও। এরপর থেকে আমি সব সময় এ নিয়মেই খাদ্য গ্রহণ করতাম।”[১৫৭]

হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তানদেরকে শৈশবকাল থেকে শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে বলেন, فاذا بلغ ست سنين أدب “আর যখন সন্তান ছয় বছর বয়সে পদার্পণ করবে, তখন তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিবে।”[১৫৮] এভাবে ইসলাম প্রত্যেকটি কাজের আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। যাতে করে একজন শিশু শৈশব থেকেই উন্নত চরিত্র ও শিষ্টাচার শিখতে পারে এবং বিচ্যুত কোন আচরণ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। শৈশবেই শিশুকে আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। যেন শিশু প্রশংসনীয় চরিত্রে সজ্জিত হয়ে গড়ে উঠতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দানকে সাদাকা হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন,

لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ–অর্থ: “সন্তানকে আদব তথা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া এক সা' পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সাদাকা করার থেকে উত্তম।”[১৫৯] অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজ সন্তানকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলে অভিহিত করেছেন।[১৬০]

শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে, তখন থেকেই শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। মায়ের মিষ্টি মিষ্টি কথা শিশুর অন্তরে প্রবলভাবে রেখাপাত করে। এজন্য ইসলামের নির্দেশনা হলো শিশুরা মায়ের কোলে থাকাকালীন তাকে আল্লাহর নাম শিক্ষা দেওয়া। নবী-রাসূলগণের ও আওলিয়াকেরামের কাহিনী শুনানো। ইসলামের সুমহান শিক্ষা সুমধুর ভাষায় শিশুর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য হিসেবে নিধারণ করে দিয়েছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র) তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা ‘তরবিয়াতুল আওলাদ’ ও বেহেশতী জেওরের মধ্যে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। উক্ত কিতাব দুটিতে তিনি শিশু-সন্তানের দুগ্ধপান থেকে শুরু করে মজলিসে বসার আদাব শিক্ষাদান পর্যন্ত পিতামাতার ৪১টি কর্তব্য উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেযোগ্য হলো-“শিশু-সন্তানের হাত দিয়ে গরীব-মিসকিনকে সাহায্য করার অভ্যাস গড়ে তোলা। দুষ্টু প্রকৃতির ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে না দেওয়া। মিথ্যা ও অহেতুক কথা এবং অশালীন কাজ থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। বয়স সাত বছর হওয়ার সাথে সাথে নামাজের অভ্যাস করানো। ছেলে-মেয়েদেরকে গান-বাজনা, টিভি, সিনেমা, এবং অশ্লীল নাটক দেখা থেকে বিরত রাখা।

১৫৭. ইমাম আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, অধ্যায়: আল-আত'ইমা, অনুচ্ছেদ: আত-তাসমীয়াতু আলাত ত্ব'আমিল ওয়াল আকলু বিল ইয়ামীন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৩৭৬; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, অধ্যায়: আশরিবাত, অনুচ্ছেদ: আদাবুত-ত্বআমে ওয়াশ্‌শারাবে ও আহকামুহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০২২
১৫৮. আবূ হামিদ মুহাম্মাদ আল গাযালী, *ইহ্ইয়াউল ‘উলুমিদ্দীন*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২১৭
১৫৯. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, কিতাবুল বিররি ওছছিলাহ আন রাসূলুল্লাহ (সা.), বাব: মা যায়া ফি আদাবিল অলাদি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯৫১
১৬০. বি.দ্র: *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-১৯৫২

নিজের কাজ নিজ হাতে করা, উঠা-বসার আদব-কায়দা, রীতি-নীতি শিক্ষা দেওয়া। তারা ভাল কাজ করলে প্রশংসা করা আর মন্দ কাজ করলে মৃদু শাসন করা।"[১৬১]

অপরাধমুক্ত আদর্শ সমাজ ও উন্নত পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে শিশুদের চরিত্র ও অনুপম আদর্শের বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। কেননা শিশুদের আদর্শবান করে গড়ে তুলতে না পারলে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। যদি কোন শিশু বা কিশোরের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় এজন্য সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্থ হয় না বরং ক্ষতির প্রভাব ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিরাট অকল্যাণ ডেকে আনে। কাজেই শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সদা সচেতন থাকা আবশ্যক। চরিত্র গঠন বলতে তাদের মধ্যে আখলাকে হামীদা তথা উন্নত চরিত্র মাধুরীর দ্বারা তাদেরকে বিভূষিত করা বুঝায়। আর অসৎ চরিত্র তথা অহংকার, মিথ্যা, ধোঁকাবাজী, গীবত, চোগলখোরী, মূর্খতা, উদাসীনতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, ইত্যাদি থেকে দূরে রাখাকে বুঝায়। সাথে সাথে তাদের মধ্যে আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, আখেরাত, কুরআন, হাদীস ইত্যাদির প্রতি অগাধ বিশ্বাস সৃষ্টি করা। সততা, আমানতদারী, অঙ্গীকার রক্ষা করা, দানশীলতা, পিতা-মাতা এবং আত্মীয় স্বজনের সাথে সদাচার ইত্যাদি মহৎ গুণাবলী শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।

৭। মাতা-পিতা নিজে অপরাধমুক্ত থাকা

আধুনিক অপরাধবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান শিশু-কিশোরের অপরাধে জড়িয়ে পড়ার যে কারণগুলো চিহ্নিত করেছে তন্মধ্যে বংশগতি কারণ ও পারিবারিক কারণ অন্যতম। কোন পরিবারের পিতা-মাতা বা অভিভাবক সদস্য বা অন্য কেহ যদি অপরাধী হয় বা অহরহ অপরাধ করে থাকে। সেক্ষেত্রে সে পরিবারে শিশু-সন্তানরাও অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে। এছাড়া শিশুরা অনুকরণ প্রিয় হয়, সে পিতামাতা বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে অপরাধ দেখে দেখে নিজেও অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়। এজন্য পিতা-মাতার কর্তব্য হলো নিজেদেরকে কোন ধরনের অপরাধে না জড়ানো। সুদ, ঘুষ, অবৈধ ব্যবসায়-বাণিজ্য, দুর্নীতিসহ অন্যান্য অপরাধমুক্ত হয়ে সৎ উপার্জন করে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করা।

৮। মাতা-পিতার মনোমালিন্য থেকে সন্তানদেরকে দূরে রাখা

মাতা-পিতা হলো সন্তানের আদর্শ। পরিবারের প্রধান মা-বাবা থেকেই সন্তানেরা সামাজিকীকরণের শিক্ষা লাভ করে এবং তাদের মনোজাগতিক বিকাশ সাধিত হয়। পারিবারিক কলহ বিশেষ করে পিতা-মাতার মনোমালিন্য, ঝগড়া-ঝাটি কিংবা দ্বন্দ্ব সন্তানদের ওপর সরাসরি প্রভাব সৃষ্টি করে। এ জন্য পিতা-মাতার কর্তব্য হলো তাদের সাংসারিক ও ব্যক্তিগত বিভিন্ন অমিল শিশু সন্তানদের সামনে প্রকাশ না করা। কেননা এতে সন্তানের মনোজগতে প্রভাব ফেলে এবং সে বাবা-মা ও পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হারিয়ে ফেলে। সে পরিবারিক বন্ধনহারা হয়ে

১৬১. মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ), *বেহেশতী জেওর* (ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, তা.বি),খ. ৪, পৃ. ৫৯-৬৩; মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ), *তরবিয়তে আওলাদ* (ঢাকা: মোহাম্মাদী লাইব্রেরী,তা.বি), পৃ-৬৪-৬৮

সমাজ বিচ্যুত যুবকদের সাথে মেলা-মেশা করে। ফলে সে সহজে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে। তাই পারিবারিক সমস্যা, পিতা-মাতার ঝগড়া, কলহ ও দ্বন্দ্ব যেন সন্তানদেরকে স্পর্শ করতে না পারে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

৯। সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা

সুস্থ বিনোদন শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। পাশাপাশি অসুস্থ ও অশ্লীল বিনোদন তার সুস্থ বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং মানসিক বিকৃতি সৃষ্টি করে। তাই পরিবারের সদস্যদের উচিত শিশু-কিশোরদেরকে পারিবারিক গণ্ডিতে বিনোদনের চেষ্টা করা এবং নৈতিকতা ও সমাজিক মূল্যবোধ বিরোধী অশ্লীল বিনোদন থেকে দূরে রাখা। এজন্য পারিবারিক পর্যায়ে সুস্থ ও গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা। নিজের শিশু-সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া এবং তাদের সাথে বিভিন্ন খেলা-ধুলায় মেতে উঠা। যেমন- উপকারী খেলা-ধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আনন্দ ভ্রমণ, পারিবারিকভাবে একত্রে সময় কাটানো প্রভৃতি।

১০। বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করা

বন্ধু বর্তমান সময়ে কিশোর ও যুব সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অস্তিত্ব। বর্তমান সময়ের ছেলে-মেয়েরা বন্ধু ছাড়া তাদের জীবনকে কল্পনাই করতে পারে না। কিশোর-কিশোরীরা এই বয়সে পরিবারের প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলতে চায় এবং পাড়া-প্রতিবেশী, খেলার সাথী ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কিশোররা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিজের একটি নিজস্ব জগত তৈরি করে। এ ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে শিশু-কিশোররা অত্যন্ত সহজ ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে, যা পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজনের নিকট থেকে তা করতে পারে না।[১৬২] বন্ধুদের সাথের এ জগত এবং সময়টা হয় খুবই রোমাঞ্চকর এবং আকর্ষণীয়। সুতরাং সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে কেউ অসৎ প্রকৃতির বা অপরাধপ্রবণ থাকলে তাদের প্রভাবে অনেক সময় কিশোর-কিশোরীরা অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।[১৬৩]

গবেষণায় দেখা যায় যে, শিশু বা কিশোরের অপরাধ মূলত দলবদ্ধ কাজ। শিশু বা কিশোর প্রথমে তার সঙ্গীদের সাথেই ছোট ছোট অবাধ্য বিচ্যুত আচরণ করে থাকে। ধীরে ধীরে সে একজন কিশোর অপরাধী হিসেবে বেড়ে উঠে। তাই সন্তানদের নিত্যসঙ্গী, খেলা-ধুলার সাথী ও বন্ধু-বান্ধব যাতে সুনির্বাচিত হয় সে দিকে পিতা-মাতার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা বন্ধু-বান্ধব ভাল না হলে জীবন-জগৎ ও পরকাল সবই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ইসলাম বন্ধু নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনে গুরুত্বারোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) ব্যক্তি জীবনে বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীর প্রভাব উল্লেখ করে বলেন,

---

১৬২. ড. উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রাণী নাথ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫২

১৬৩. আদনান আদ-দূরী, *আসবাবুল জারীমা ওয়া তবীআতুস সুলূকিল ইজরামী* (কুয়েত: মানশুরাতু যাতিস সালাসিল, ১৯৮৪খ্রি.), পৃ. ৩০৬; আনোয়ার মুহাম্মাদ, *ইনহিরাফুল আহদাছ* (আল-কাহেরা: দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ১১৫-১১৬

الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ وَقَالَ مُؤَمَّلٌ مَنْ يُخَالِلُ– অর্থ: "মানুষ তার বন্ধুর স্বভাব চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা বন্ধু গ্রহণ করবে, তারা যেন পর্যবেক্ষণ করে তা গ্রহণ করে।"[১৬৪] এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন উপমার[১৬৫] মাধ্যমে সঙ্গী-সাথী বা বন্ধুদের প্রভাব তুলে ধরেছেন। যাতে মানুষ ভাল মানুষকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারে। এবং সন্তাদেরকেও তাদের ভাল বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করতে পারে। পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীস থেকে সঙ্গী-সাথীদের মাধ্যমে মানুষের চারিত্রিক দিক প্রভাবিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সাহচার্য লাভকারী যদি শিশু-কিশোর হয় তাহলে সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা আরো বেশি থাকে। তাই পিতা-মাতার কর্তব্য হলো তার শিশু বা কিশোর সন্তানের বন্ধু নির্বাচনে সহায়তা করা এবং কে তাদের সন্তানের বন্ধু বা সঙ্গী হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল রাখা।

১১। অগাধ ভালবাসায় অন্যায় প্রশ্রয় না দেওয়া

সন্তানদের ভালবাসা পিতামাতার কর্তব্য। পিতামাতা সদা-সর্বদা সন্তানকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ রাখবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এ ভালবাসায় অবশ্যই স্নেহ-মমতার পাশাপাশি শাসনও প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাতে এরূপ বিধৃত হয়েছে। সন্তান যদি ছোটখাট ভুল-ত্রুটি করে, বা কারো সাথে অন্যায় আচরণ করে তবে তা প্রশয় না দিয়ে তার ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং পুনরায় এ ভুল না করার জন্য শাসন করা পিতামাতার কর্তব্য। কারণ সন্তানের প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে যদি কার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে কিংবা এ ব্যাপারে তকে শাসন না করে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহলে এ শিশু এক সময় বখাটে হয়ে যেতে পারে এবং এ সন্তান এক সময় অবাধ্য হয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া ইসলামের নির্দেশ হলো শিশু-সন্তানের অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিতে শাসন করা প্রয়োজনে মৃদ্যু প্রহার করা। নবী করিম (সা.) এ ব্যাপারে অভিভাবকদের নির্দেশ এবং প্রয়োজনে প্রহারের অনুমতি দিয়েছেন।[১৬৬]

অর্থাৎ ইসলাম এখানে সন্তানের এই কৈশোর বয়সে নামাজ পরিত্যাগ করার জন্য সংস্কারমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে তাকে মৃদ্যু প্রহারের মাধ্যমে শাসন করার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই নির্দেশনা থেকে শিশু-কিশোরদেরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে সমাজের প্রত্যেক পরিবারের কর্তব্য হলো যখনি তাদের সন্তানের মধ্যে বিচ্যুত কোন আচরণ লক্ষ্য করে তখনি তাকে শাসন করা। তাকে অপরাধ বা অন্যায় ধরিয়ে দিয়ে এর ভাল-মন্দ বুঝিয়ে বলা এবং সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

---

১৬৪. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৮৩৩; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আহমাদ ইবন হাম্বল*, কিতাব: বাকী মুসনাদিল মুকাছছিরীন, অনুচ্ছেদ: মুসনাদু আবী হুরায়রাহ (বৈরুত: মাওসুসাতুলর রিসালাহ, ১৪১৬হি.) হাদীস নং-৭৬৮৫

১৬৫. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, অনুচ্ছেদ: মান ইয়ুমারু আন ইয়ুজালিসা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮২৯

১৬৬. বি.দ্র: ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুস সালাত, বাব: মাতা ইউমারুল গুলামু বিসসালাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৯৫

১২। শিশুদেরকে অযত্ন বা অবহেলা না করা

পিতামাতার কর্তব্য হলো শিশুদেরকে অযত্ন বা অবহেলা না করা। সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, কোনরূপ অবহেলা না করা। সন্তানের প্রত্যেকটা বিষয় গুরুত্বের সাথে দেখা। এককথায় উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা। আদর-স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে সবকিছু শিক্ষা দেওয়া। সামান্য কারণে সন্তানকে বকাঝকা বা গালমন্দ অথবা শারীরিক প্রহার না করে তাকে সে আচরণ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা। কারণ পিতামাতার নিষ্ঠুরতা ও অবহেলার কারণে সহজেই শিশুটি ভবিষ্যতে বিপদগামী হয়ে যেতে পারে। তাই কোন পিতামাতারই উচিৎ নয় তাদের সন্তানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পরে এমন কোন আচরণ করা। অযত্ন অবহেলা নয় বরং আদর-স্নেহ-ভালবাসায় পরিপূর্ণ হবে একটি পরিবার এমনিই ইসলামের শিক্ষা।

১৩। অধিক শাস্তি না দেওয়া

অধিক শাসন ও কঠোরতার ফল কখনও ভালো হয় না। যে সকল ছেলে-মেয়েকে প্রহার ও শাসনের মধ্যে রাখা হয় তাদের হায়া-শরম নষ্ট হয়ে যায় এবং পরে তারা আর কাউকে ভয় করে না। তাছাড়া লক্ষ্য করা যায় যে, অধিক মার-ধর করলে তা'লীম-তরবিয়াতের ক্ষেত্রেও বিশেষ কোন ফায়দা হয় না। বরং এর ফলাফল খারাপই হয়ে থাকে। অধিক প্রহার করলে প্রথমত, বাচ্চাদের অঙ্গ দুর্বল হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, বাচ্চারা আতঙ্ক ও ভয়ে মুখস্থ পড়াও ভুলে যায় এবং মার খেতে খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর লজ্জা-শরমও ভেঙ্গে যায়। অতঃপর কোন শাসনই তার উপর আর প্রভাব ফেলে না। এ পর্যায়ে নির্লজ্জতা তার পক্ষে এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পরিণত হয় এবং জীবনে আর কখনও তার স্বভাব হতে এ ব্যাধি দূর করা সম্ভব হয় না। সমাজে এক ধরনের মাতাপিতাকে শিশু-কিশোরদের সঙ্গে ভীষণ রাগ করতে দেখা যায়। বরং কোন কোন সময়তো এমনভাবে প্রহার করতে থাকে যেন কোন নির্দয় কসাই কোন প্রাণীকে প্রহার করছে। এভাবেই মাতাপিতারা বাচ্চাদের উপর যুলুম করে থাকে।[১৬৭] ইসলাম শিশু-কিশোরদের সুরক্ষা এবং অপরাধমুক্ত জীবনযাপনের জন্য শিশুদের কোমল ও নম্র ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলামের এ মহান শিক্ষায় শিশু-কিশোরকে প্রতিপালন করা সম্ভব হলে তার মধ্যে কোন ধরনের অভিমান তৈরি হবে না এবং এ থেকে কোন অপরাধ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।

১৪। পরিবারে নৈতিক মূল্যবোধ চর্চা

পরিবার থেকেই শিশু-কিশোররা মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা পেয়ে থাকে। পরিবারে যদি উপযুক্ত নীতি-নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের চর্চা হয় তাহলে উক্ত পরিবারের পরবর্তী বংশধর তথা শিশু-কিশোরও নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণ করবে। পিতা-মাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী শিশু-কিশোরের উপর প্রবাহিত হয়। বাবা-মায়ের আচার-আচরণ, মানবিক মূল্যবোধ ও শিক্ষাই নির্ণয় করে দেয় পরবর্তী জীবনে শিশু-কিশোরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেমন হবে। এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ

---

১৬৭. ১৬৭. মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ), *তরবিয়তে আওলাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

الْقَيِّمُ—অর্থ: “আল্লাহর দেওয়া ফিতরাতের অনুসরণ কর, যে ফিতরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন, এটাই সরল সুদৃঢ় দীন।”[১৬৮] প্রত্যেক মানব শিশুই ফিতরাত বা সরল-সত্য গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পিতা-মাতার নানামুখী আচার-আচরণ ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের কারণেই পরবর্তীতে সে সন্তান প্রভাবিত হয়। তাই পিতামাতা যদি নিজ পরিবারে সঠিক মূল্যবোধ ধারণ করে, তাহলে সন্তান-সন্ততির মধ্যেও নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিকশিত হবে।

১৫। শিশুসন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া

পিতামাতাই হচ্ছে সন্তানের সর্বোত্তম শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক। পিতামাতা কর্তব্য হলো সন্তানের প্রতি যথার্থ মনোযোগ দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় আদব-কায়দা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সামাজিক রীতি-নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাই অধিকাংশ সময়ই জীবন-জীবিকা উপার্জনের পেছনে ব্যয় না করে সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া। সন্তান যাতে পিতামাতার আদর-স্নেহ, ভালবাসা, নৈতিক মূল্যবোধ ও অনুশাসন থেকে বঞ্চিত না হয়। এজন্য পিতামাতা পরিবারের বাইরে দূরে কোথায় কাজ না করা ভাল। প্রয়োজন হলে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করা। যাতে সন্তানদেরকে পর্যাপ্ত স্নেহ-মমতা-ভালবাসা এবং প্রয়োজনীয় যত্ন ও সময় দেওয়া যায়। কারণ পিতামাতার সাহচর্যের ফলে শিশু-কিশোরের মন উৎফুল্ল থাকে। তার মানসিক ও শারীরিক বিকাশে কোন প্রকার বাধা সংঘটিত হয় না। ফলে এরূপ পরিবারের শিশু-কিশোর সমাজে অপরাধমুক্ত মনমানসিকতায় বেড়ে উঠে।

১৬। সংসারের অভাব-অনটন বুঝতে না দেওয়া

পারিবারিক কলহ, পিতা-মাতার মনোমালিন্য ও ঝগড়া-ঝাটি সন্তানদের উপর যেমন প্রভাব সৃষ্টি করে, তেমনি সাংসারিক অভাব-অনটনও তাদের মানসিক পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের দীর্ঘকালীন অভাব-অনটনের কারণে কিশোর-কিশোরী পিতা-মাতার প্রতি বিরক্ত ও অশ্রদ্ধাশীল হতে পারে। সে ভবিষ্যতে এ অভাব-অনটন দূর করতে অবৈধ পন্থায় উপার্জনের পথ বেছে নিয়ে অপরাধী হয়েও উঠতে পারে। তাই পিতা-মাতার উচিত যথাসম্ভব সন্তানকে অভাব-অনটন বুঝতে না দেওয়া। জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা.) দারিদ্র্যতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।”[১৬৯] তাই প্রত্যেক পিতামাতারই কর্তব্য হলো সন্তানের লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য উপার্জন করা এবং সন্তানের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা।

---

১৬৮. আল-কুরআন, ৩০: ৩০
১৬৯. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবু: মা ইয়াকুলু ইযা আছবাহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৯০; ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ ইবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (রহ.), *সুনানুন নাসাঈ*, কিতবুল ইসতি'আযা, বাব: আল-ইসতে'আযাতু মিনাল ফাকরে (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবি, তা.বি.), হাদীস নং- ৫৪৬৫

১৭। অপচয় বা অপব্যয়ে অভ্যস্ত না করা

দরিদ্রতা যেমন একদিকে শিশু-কিশোরের সঠিকভাবে বেড়ে উঠার অন্তরায় ঠিক বিপরীত দিকে অতি সম্পদ ও প্রাচুর্য শিশু-কিশোরের নষ্ট হওয়ার কারণ হতে পারে। তাই পিতামাতার কর্তব্য হলো শিশু-কিশোরকে অপচয় বা অপব্যয় অভ্যস্ত না করা। পিতা-মাতা যদি সন্তানের হাতে অঢেল টাকা-পয়সা ঢেলে দেয় তাহলে সে শৈশব-কৈশোরের অপচয় ও অপব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। একসময় যখন পিতা-মাতার থেকে অঢেল টাকা পয়সার সাপোর্ট পাবে না বা পিতা-মাতা অক্ষম হয়ে পড়বে তখন সে বাধ্য হয়েই অপরাধের পথ বেছে নিবে। সমাজে বিশেষ করে সামাজিক পুর্নবাসন কেন্দ্রে এরকম অসংখ্য উদাহরণ মিলে যে, বাব-মায়ের অঢেল ধন-সম্পত্তিই তাদের অপরাধ ও বিচ্যুতির প্রধান কারণ। তাই ইসলাম পিতা-মাতাকে তাদের সন্তানকে অপচয় ও অপব্যয়ে অভ্যস্ত না করার তাগিদ দেয় এবং কিশোর সন্তানের হাতে একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যতীত প্রচুর নগদ অর্থ প্রদান করতে নিষেধ করা হয়েছে।

১৮। শিশুসন্তানের চলাফেরার প্রতি লক্ষ্য রাখা

শিশু যখন শৈশব থেকে কৈশোরে উপনীত হয় তখন পিতামাতার কর্তব্য হলো সন্তানের চলাফেরা ও আচার-আচরণের প্রতি খেয়াল রাখা। তার আদরের সন্তান কার সাথে মিসছে, কোথায় যাচ্ছে, কখন বাড়ী ফিরছে, টাকা-পয়সা কম বা বেশি খরচ করছে কেন প্রভৃতি বিষয়ে নজর রাখে তাহলে সে কিশোর বিচ্যুত হতে পারে না। আর যদি কিশোরটি দেখে যে, তার কার্যকলাপ পিতামাতা লক্ষ্য করে না বা খোঁজ-খবর পিতামাতা রাখে না তবে সে কিশোরটি নিজেকে অপরাধী কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারে। তাই ইসলামি পরিবারের পিতামাতা তার সন্তানের চলা-ফেরা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকবেন। এমনকি পিতামাতা তাদের কিশোর সন্তানের বাহিরে অবস্থানের সময় ও কার্যকলাপ নির্ধারিত করে দেওয়া যাতে এর বাহিরে সে অপরাধপ্রবণ কোন কাজে বা আড্ডায় জড়াতে না পারে।

১৯। সন্তানদের সাথে পিতা-মাতা ও পরিবারের বয়স্কদের বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক রাখা

ইসলাম পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক সদস্যকে শিশু-কিশোরদের প্রতি বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। পিতামাতার কর্তব্য হলো কিশোর-কিশোরী সন্তানের আস্থা অর্জন করা এবং তাদেরকে বন্ধুরূপে গড়ে তোলা। যাতে শিশু-কিশোর একাকীত্ব অনুভব না করে এবং তাদের যে কোন সমস্যা ও প্রয়োজন পিতামাতা বা অভিভাবকদের সঙ্গে মন খুলে বলতে পারে। ফলে শিশু-কিশোরটি পরিবারেই তার মনের অভিপ্রায় জানানোর সঙ্গী পেয়ে নিজের মনের চাহিদাগুলো বলতে পারে। তাদের মনে কোন ধরনের জটিলতা বা মানসিক অসংলগ্নতা সৃষ্টি হয় না। ফলে এসব শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সুস্থ হয় এবং সে সমাজের ভাল-মন্দ, নীতি-আদর্শ ও মানবিক বিষয়গুলো অনুধাবন করতে শিখে। ফলে এসব কিশোর-কিশোরী অন্যায় ও অপরাধপ্রবণতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

২০। শিশুর নিরাপত্তা বিধান করা

ইসলামে সকলের ন্যায় শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারও স্বীকৃত ও সুরক্ষিত। শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলামর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট। শান্তি বা যুদ্ধ উভয় অবস্থায়ই শিশুর জীবনের নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। জাহেলি যুগে কন্যা সন্তানকে অপয়া মনে করে ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে হত্যা করা হতো। কখনও কখনও তাদেরকে জীবন্ত পুতে রাখা হতো। ইসলাম এ নিষ্ঠুর কাজকে চিরদিনের জন্য নিষিদ্ধ করেছে এবং এর জন্য চরম শাস্তির ঘোষণা করেছে। কাজেই পিতা-মাতা বা অভিভাবক কোন অবস্থাতেই সন্তান হত্যা করতে পারবে না। এমনকি চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হলেও নয়। ইসলাম ঘোষণা করেছে, وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا–অর্থ: "অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবিকা দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা ভয়ানক অপরাধ (অন্যায়)।"[১৭০] অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ– অর্থ: "তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা বোকামি ও মূর্খতার কারণে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে।"[১৭১]

ইসলামই সর্বপ্রথম শিশুর বেচেঁ থাকার অধিকার ঘোষণা করেছে। প্রাচীন সমাজ যেখানে কন্যা শিশু সন্তানকে অপাংতেয় মনে করা হতো সেখানে ইসলাম মেয়ে শিশুদের সম্মান ও অধিকার ঘোষণা করেছে। ইসলামি শরী'আতে শিশুর জীবন রক্ষায় পিতা-মাতার দায়িত্ব অপরিসীম। শিশু-সন্তান পিতা-মাতার নিকট এক পবিত্র আমানত। এ আমানত সম্পর্কে তারা অচিরেই জিজ্ঞাসিত হবে। যদি পিতা-মাতা শিশুদের প্রতিপালনে মনোযোগী না হয়, তবে অবশ্যই তাদের জবাবদিহী করতে হবে। পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াতসমূহ শিশুর জীবনের নিরাপত্তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। শিশুর নিরাপত্তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাতেও বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মোট কথা ইসলাম সর্বাবস্থায় মানব সন্তান হত্যা হারাম করে দিয়ে শিশু-সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

২১। সন্তানদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা

পরিবারে একাধিক সন্তান থাকলে স্নেহ-ভালবাসায় তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করা যাতে কোন সন্তান বুঝতে না পারে যে, তার পিতা-মাতা অপর ভাই বা বোনকে বেশি ভালবাসে বা স্নেহ করে। বিশেষ করে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোন রকমের পার্থক্য না করা। আমাদের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজে দেখা যায় যে, ছোটবেলা থেকে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের মধ্যে ছেলে সন্তানকে ভাল খাবার (যেমন, মাছের মাথা, ডিম, দুধ, কলা প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য) গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করে এবং মেয়ে সন্তানদেরকে এসকল খাবার থেকে নিরুৎসাহিত করে। একই পিতা-মাতার সন্তানদের মাঝে শিশুকাল থেকে গড়ে উঠা এসকল বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের মধ্যে

---

১৭০. আল-কুরআন, ১৭: ৩১
১৭১. আল-কুরআন, ৬: ১৪০

হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি করে। ফলে তাদের পরিমিত মানসিক বিকাশ সাধিত হয় না। সন্তান পুত্র হোক বা কন্যা হোক, আচরণের ক্ষেত্রে এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য করা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম তাই সন্তানদের মাঝে সমতার ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপরে দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ- অর্থ: "তোমরা সন্তানদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা কর, তোমাদের সন্তানদের মাঝে ইনসাফ কায়েম কর।"[১৭২]

এ সম্পর্কে প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থে নু'মান ইবনে বশীর (রা.) বর্ণিত হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে।[১৭৩] এই হাদীস থেকে দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) পরিবারের একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে বৈষম্যমূল দান বা বণ্টন প্রত্যাখান করেছেন এবং এ থেকে মুসলিম উম্মাকে বিরত থাকার জন্য বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে পার্থক্য করা এবং মেয়েদের উপর ছেলেদের অহেতুক প্রধান্যদানে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। যেমন, রাসূল্লাহ (সা.) বলেন, مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ-

অর্থ: "যার তত্ত্বাবধানে কোন শিশু বালিকা থাকে আর সে তাকে জীবিত দাফন না করে, তার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে এবং বালকেদের উপর কোনরূপ প্রাধান্য না দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।"[১৭৪] এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্তানদের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য না করার এবং কন্যা সন্তানের প্রতি আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং কন্যা সন্তান প্রতিপালনের অত্যধিক ফযিলত বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর উপরোক্ত বক্তব্য হতে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সুন্দর হোক বা অসুন্দর হোক অথবা সন্তান ছোট হোক বা বড় হোক, উভয়ের প্রতি সমতা বিধান এবং সুবিচার করা অবশ্য কর্তব্য। এ বিষয়ে অবহেলা অমার্জনীয় অপরাধ।

অতএব, বলা যায় যে, শিশু-কিশোরের আচরণ ও বাহ্যিক ব্যক্তিত্বের উন্নয়নে পরিবার সর্বাধিক অনুকূল পরিবেশ যোগায়। বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকা অপরিসীম। কেননা তারাই শিশু-কিশোরের সামনে বহির্বিশ্বের বাতায়ন প্রথম উন্মুক্ত করে দেয় এবং সন্তানের অনুপম চরিত্র গঠনের কার্যকর অবদান রাখতে পারেন। তাই সন্তানদের মাঝে বৈষম্যহীন আচরণ করে ছেলে-মেয়ে সবাই সমাভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

---

১৭২. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল হিবা, বাবুল হিবাতি লিল ওলিদ, প্রাগুক্ত

১৭৩. বি.দ্রঃ ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ), প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৮৭; ইমাম আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল হিবা, বাবঃ কারাহাতু তাফযিলি বা'দিল আওলাদি ফিল হিবা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬২৩

১৭৪. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবঃ ফিফাযলি মান 'আলা ইয়াতিমান, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৫১৪৬

২২। বয়ঃসন্ধিকালে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করা

বয়ঃসন্ধিকাল মানব জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। এসময় একজন কিশোর-কিশোরী শারীরিক, মানসিক ও জৈবিক বিভিন্ন প্রতিকূলতা ও জটিলতার মুখোমুখি হয়। তার মধ্যে আত্মচেতনা, অভিমান, ইগো, কল্পনা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া শারীরিক গড়নেও আসে নানা পরিবর্তন। হঠাৎ করে এসব পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে কিশোর-কিশোরীটি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। এ সময় পিতামাতার সঠিক তত্ত্বাবধায়ন থাকলে সন্তানকে সঠিকভাবে দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধায়ন করা সম্ভব হয়। তা নাহলে এ সময় কিশোরটি অসংযত আচরণ করতে পারে। যা তার মেধা ও মননে আঘাত হানতে পারে এবং সুস্থ বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই বয়ঃসন্ধিকালে কোন ধরনের জড়তা না রেখে সন্তানকে প্রত্যেকটা বিষয় পরিষ্কার করে বুঝিয়ে সন্তানের পাশে থেকে সঠিকভাবে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব।

২৩। অন্যায়ের জন্য শাসন বা শাস্তির মুখোমুখি করা

সন্তানকে সুন্দর আচার-আচরণ শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তার ভুল সংশোধন করে দেয়াও পিতামাতার কর্তব্য। সন্তান যদি একই ভুল বার বার করতে থাকে তাহলে তাকে তিরস্কার করা, শাস্তির ভয় দেখানো এবং প্রয়োজনে মৃদু শাস্তি প্রদান করা। যাতে সন্তানের মনে এই কাজের প্রতি অনাগ্রহ জাগে। পিতামাতা সন্তানকে যে শাস্তি প্রদান করে সে প্রকার শাস্তিকে তা'যীর বলে। তা'যীর ঐ শাস্তিকে বলা হয় যা ছেলেমেয়েরা অপরাধ করলে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং পরিমিত পর্যায়ে প্রদান করা হয়। এই শাস্তিরও বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি রয়েছে। যেমন- তিরস্কার করা, রাগ করা, কান মলিয়া দেওয়া, কড়া ভাষায় শাসিয়ে দেওয়া, আটক করে রাখা, অর্থদণ্ড দেওয়া এবং হাত বা বেত দ্বারা প্রহার করা। প্রখ্যাত ইসলামি দার্শনিক মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ), বলেন, "বাচ্চাদের জন্য আমি দুটি শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছি। একটি হলো কান ধরানো। অপরটি হলো কান ধরে ওঠা-বসা করা। এই শাস্তি দ্বারা চারিত্রিক এবং শারীরিক উভয়বিধ উপকার সাধন হয়।"[১৭৫]

আসলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য নয়। মূল উদ্দেশ্য হলো তার সংশোধন হওয়া। যখন জানা যাবে যে, কঠোরতা ও শাস্তি দ্বারা বিশেষ কোন উকার সাধন হচ্ছে না, তখন নরম ও কোমলতার মাধ্যমে সংশোধন করার চেষ্টা করিবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে, ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হয় তা সহজসাধ্য নয়। কারণ কাউকে অন্যায় করতে দেখে নীরবে তা সহ্য করা সহজ বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে বিনম্র ভাষায় তিরস্কার করা খুবই কঠিন। নিজেদের ঘরের ছেলে-মেয়েদের কথা সকলেরই জানা আছে যে, তাদের ক্ষেত্রে সংশোধন কঠোরতার মাধ্যমে হবে না, কোমলতার মাধ্যমে হবে। বার বার শুধু কঠোরতা আরোপ করতে থাকলে তা দ্বারা বিশেষ কোন ফায়দা অর্জিত হয় না।[১৭৬]

---

১৭৫. মওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ), *তরবিয়তে আওলাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
১৭৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

শিশু-কিশোরদের অপরাধমুক্ত রাখতে পরিবারের প্রতি ইসলামের নির্দেশনামূলক উল্লিখিত তথ্য ও দলীলাদি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইসলাম শিশু-কিশোরদের প্রতিপালনে এক বৈজ্ঞানিক পন্থা প্রবর্তন করেছে। এ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুশীলন করলে প্রতিটি পবিরারের শিশু-সন্তানরা এমনভাবে গড়ে উঠবে যে, কোন রকম বিচ্যুৎ বা অপরাধমূলক আচরণ তাদের স্বভাবে নেই। তারা হয়ে ওঠবে এক একজন আদর্শ মানব। সুতরাং শিশু-কিশোরদের অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম প্রবর্তিত শিশুদের প্রতিপালনে পারিবারিক দায়িত্ব-কর্তব্য হবে এক মহা ঔষধ।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সমাজের দায়িত্ব

ইসলাম শিশু-কিশোরদের অপরাধমুক্ত রাখার জন্য সমাজের প্রতি কিছু দায়িত্ব অর্পন করেছে। ইসলাম ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজে বাধা প্রদানের কর্মসূচী কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে। একজন শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে অনেকাংশে সমাজব্যবস্থার উপর। সমাজে যদি একজন শিশুর বেড়ে উঠার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করতে পারে তাহলে শিশুটির পরিপূর্ণ শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধিত হয়। আর সমাজে যদি অন্যায়-অনাচার অবাধে চলতে থাকে, সামাজিক ন্যায়বোধ ও ন্যায়বিচার না থাকে, তাহলে শিশু-কিশোররা তা অনুসরণ করে অপরাধপ্রবণ হতে পারে। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সমাজ থেকে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করতে হলে কেবলমাত্র শিশু-কিশোরকে উন্নত করলেই চলবে না, বরং সমগ্র সমাজের উন্নয়ন করতে হবে। সমাজের নৈতিক আদর্শ, পারস্পরিক আচরণ, কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতির মান্নোনয়ন হলে স্বাভাবিক ভাবেই তখন সমাজ অপরাধ মুক্ত হয়ে যাবে। তাই একজন শিশুকে অপরাধপ্রবণতা থেকে মুক্ত রাখতে সমাজের ভূমিকা অনেক বেশি। শিশু-কিশোরকে অপরাধমুক্ত রাখতে সমাজের কর্তব্যসমূহ নিম্নরূপ-

১। সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা

শিশু-কিশোরের মানসিক শারীরিক-বিকাশ ও সামাজীকিকরণ প্রক্রিয়ায় পিতামাতা ও পরিবারের পরেই সমাজের ভূমিকা। এখান থেকেই শিশু-কিশোর সামাজিক রীতি-নীতি, রছম-রেওয়াজ, আদব-কায়দা এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে জানতে পারে। ধীরে ধীরে এসকল সামাজিক রীতি-নীতিতে সে অভ্যস্ত হতে থাকে এবং একসময় এই শিশু-কিশোরটি সামাজিক মূল্যবোধকে নিজের মূল্যবোধ হিসেবে ধারণ করে। একটি সমাজ যদি নৈতিক মানদণ্ডে সঠিক মূল্যবোধের উপর দণ্ডায়মান থাকে বা সামাজিক মূল্যবোধ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় তাহলে সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রতি সুসংহত হয়। আর এসকল সামাজিক আচার ও মূল্যবোধ দেখেই শিশু-কিশোর বেড়ে উঠবে ফলে সেও সমাজিক মূল্যবোধ ধারণ করবে। ফলে শিশু-কিশোর নিজেকে অসামাজিক ও অনৈতিক

কার্যকলাপ এবং অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখে। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা

ইনসাফ বা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা মানব সমাজের মৌলিক দায়িত্ব। ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, হিন্দু-মুসলিম, খ্রিস্টান, বাঙালী, আদিবাসী প্রভৃতি নির্বিশেষে সমাজে বসবারত মানব গোষ্টিকে সামাজিক ন্যায়বিচারের আওতায় নিয়ে আসা সমাজপতিদের অন্যতম কর্তব্য। সমাজে সকল ভেদাভেদ ভুলে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হলে সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক ভেদাভেদহীন এমন সমাজের শিশু-কিশোর শৈশব ও কৈশোরে সমাজের এই ঐক্য, সম্প্রীতি ও ন্যায়বিচার দেখে বড় হয় এবং তার মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড জাগ্রত হয়। ফলে এ সমাজে বেড়ে উঠা কিশোর-কিশোরী কোন অন্যায়ের সাথে আপোষ করতে পারে না বা নিজেকে অন্যায়ের সাথে জড়াতে পারে না। তাই অপরাধমুক্ত কিশোর সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা জরুরী।

৩। অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিহত করা

সমাজ থেকেই শিশু-কিশোর প্রায়োগিক জ্ঞান লাভ করে। সমাজে অসামজিক কার্যকলাপ বিস্তার লাভ করলে শিশু-কিশোরদের মধ্যেও সে সমস্ত অসামাজিক কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিশোররা সাধারণত অনুকরণপ্রিয় হয়, ভাল-মন্দ বা হিতাহিত জ্ঞান তাদের থাকে না। সমাজের অসামাজিক কার্যকলাপ দেখতে দেখতে তাতে তারাও অংশগ্রহণ করতে পারে। আর যদি সমাজ থেকে অসামাজিক বিষয়গুলো দূরীভূত করা হয় এবং যেকোন অসামাজিক কাজকে সম্মলিতভাবে প্রতিহত করা হয়। তাহলে শৈশব থেকেই কিশোরের মনে অসামাজিক কাজের ব্যাপারে ঘৃণা জন্ম নিবে। ফলে সে আর অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হতে পারবে না এবং তার দ্বারা অন্যায় ও সমাজ বিচ্যুত আচরণ প্রকাশ পাবে না। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করা জরুরী।

৪। সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন করা

একটি সমাজের যেসব সামাজিক অনুষ্ঠান রয়েছে নিয়মিত সেসব অনুষ্ঠানদি বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এসব সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সমাজ কিশোরকূলকে ব্যস্ত রাখতে পারে এবং তাদের মানসিক চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করতে পারে। কিশোর সাধারণত আনন্দ-ফুর্তি, ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। তাছাড়া সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজিক অনুষ্ঠানসমূহ বাস্তবায়ন একান্ত জরুরী। কেননা শিশু-কিশোরদের মনে এখান থেকেই সামাজিকতার সেতুবন্ধন সৃষ্টি হয়।

৫। মানসিক বিকাশের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখা

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য কিশোরের মনোজাগতিক এবং শারীরিক বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। বয়স ও শরীরের সাথে কিশোর-কিশোরী যদি সঠিকভাবে মানসিকভাবে বিকশিত না হয় বা সঠিক মানসিকতা ধারণ করতে না পারে তাহলে তার মধ্যে নানারকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং অসামঞ্জস্যতা তৈরি হয়। সে এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব লালন করতে থাকে ফলে সে মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। এরূপ কিশোরের মনোজগতে সুস্থ চিন্তাভাবনার পরিবর্তে অসুস্থ মানসিকতা ভর করে। আর তাই সে এমন আচরণ করতে থাকে যা সমাজসঙ্গত নয়; যা কিশোরের বিচ্যুত আচরণ নামে পরিচিত। তাই কিশোরকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে হলে বা কিশোর অপরাধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে শিশুদের মানসিক বিকাশের সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৬। সামাজিক-প্রতিষ্ঠানসমূহ সচল রাখা

সামাজিক যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেমন- স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, মসজিদ, মন্দির, কমিউনিটি সেন্টার, সাংস্কৃতিক সেন্টার, খেলা-ধুলার মাঠ প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে সচল রাখা শিশুদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য জরুরী। এসকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কোন একটি অচল হলে বা সঠিকভাবে তার কাজ সম্পাদন না করলে সামাজিক ব্যত্যয় সাধিত হয় এবং সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়। আর ভারসাম্যহীন সমাজে নানা অসাম্য ও অন্যায় বাসা বাঁধে। যা শিশু-কিশোরদের মনোজগতের সুস্থ বিকাশের অন্তরায়। তাছাড়া শিশু-কিশোর এসকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই তার মনোদৈহিক বিকাশ এবং সামাজিক যোগাযোগ বিস্তার লাভ করে। তাই সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সচল রেখে কিশোরের অপরাধমুক্ত জীবনে সহায়তা করা যায়।

৭। অনাচার-অত্যাচার প্রতিরোধ করা

যে সমাজে অনাচার-অত্যাচার ছড়িয়ে পরে সেখনে সার্বিক অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। সমাজের অনাচার-অত্যাচার যদি প্রতিহত করা না যায় তাহলে সমাজে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায় এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। আর অনাচার ও অত্যাচারে ঘিরে থাকা সমাজে শিশু-কিশোর অপরাধমূলক আচরণ করবে না এটা প্রত্যাশা করা যায় না। বরং সমাজে যদি অত্যাচারের সঠিক বিচার না হয় বা অত্যচার প্রতিরোধ না করে তাহলে কিশোর এ সকল অনাচার ও অত্যাচারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। ফলে কিশোর অপরাধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সমাজের অনাচার-অত্যাচার প্রতিরোধ করা সমাজের একান্ত দায়িত্ব।

৮। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা

সামাজিক অত্যাচর, অনাচার ও বৈষম্য প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা ব্যাপকভাবে কার্যকর। বিশেষ করে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সামাজিক মহামারি বা ব্যাধির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা তৈরি করে এসব

অনাচার প্রতিহত করা যায়। সমাজে কিশোরদের মাঝে মদ, হিরোইন, গাঁজা, ইয়াবা, জুয়াসহ নানা রকমের নেশা জালের মত ছড়িয়ে পড়েছে এবং মহামারি হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিশোর ও যুব সমাজ নেশার ছোবলে বিপর্যস্ত। প্রশাসনের নানাবিধ প্রচেষ্টার পরেও তাদেরকে নেশার ছোবল থেকে মুক্ত করা যাচ্ছে না। দিনে দিনে এই মরণ নেশা যেনো আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যাপাকভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এছাড়াও সমাজে ইভটিজিং, ছিনতাই, নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসকল মহামারি থেকে কিশোর ও যুবসমাজকে রক্ষা করতে হলে প্রশাসনের একক চেষ্টা তেমন ফলপ্রসূ হবে না। এসকল মহামারি থেকে রক্ষার একটাই উপায় আর তাহলো সমাজের প্রত্যেককে এই মহামারি প্রতিরোধে এগিয়ে আসা, সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একত্রে তা প্রতিহত করা। সর্বোপরি সামাজিক সচেতনতাই পারে আমাদের কিশোর সমাজকে এসকল মহামারি থেকে দূরে রাখতে।

৯। সবার মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা

শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত হলো সমাজে জাত-পাত ভেদাভেদ ভুলে সবার মাঝে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা। সমাজে বসবাসরত বিভন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতি না থাকলে সমাজে অনৈক্য বৃদ্ধি পায়। আর সামাজে অনৈক্য থেকে পাস্পরিক দ্বন্দ্ব, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধপরায়ণতার সৃষ্টি হয়। সমাজের দ্বন্দ্ব, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ-পরায়ণতার শিকার হয় শিশু-কিশোর। সমাজের কিছু কিশোরকে এসব কাজে ব্যবহার করে এবং তাদের মাঝে প্রতিহিংসা ছড়িয়ে দেয়। ফলে একজন কিশোরের মনে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির পরিবর্তে প্রতিহিংসার মন-মানসিকতা তৈরি হয়। আর একজন প্রতিহিংসাপরায়ণ কিশোর কেবল অন্যায়-অনাচারই ছড়াতে পারে। যা তাকে বিচ্যুত কিশোর বা কিশোর অপরাধীরূপে পরিচিতি দান করে। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য সামাজে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করা দরকার। এজন্য ইসলাম মানব সমাজে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ

بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا–

অর্থ: “তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী–সাথী ও পথচারীদের সাথে এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস–দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ অহঙ্কারী ও দাম্ভিক ব্যক্তিকে ভালবাসেন না।”[১৭৭] পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে সমাজের সকলের সাথে সদ্ব্যবহার এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার নির্দেশনা রয়েছে। তাই অপরাধমুক্ত সমাজ বিশেষ করে কিশোর অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১৭৭. আল-কুরআন, ৪: ৩৬

১০। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সমাজের যেসব দায়িত্ব রয়েছে তন্মধ্যে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা অন্যতম। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা না থাকলে কোন কাজই সঠিকভাবে সম্পন্ন করা যায় না। সর্বক্ষেত্রে অস্থিরতা দেখা যায় এবং সমাজের সকল উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে যায়, সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি স্থবির হয়ে পড়ে। সামাজিক বিশঙ্খলার কারণে সমাজে অন্যায়-অনাচার বেড়ে যায়। কোমলমতি কিশোর-কিশোরী সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে, না বুঝে এসব সামাজিক অনাচারে যুক্ত হয়। ফলে কিশোরের আচরণে বিচ্যুতি ফুঠে উঠে। তাই কিশোরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখতে হলে যে কোন মূল্যে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে।

১১। সমাজের ভাল কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং খারাপ কাজ প্রতিহত করা

ইসলাম সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, অত্যাচার, অপকর্ম প্রতিরোধ করে সমাজকে স্থিতিশীল, শান্তিময় ও কল্যাণকর রাখার জন্য ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভাল কাজের আদেশ ও খারাপ কাজে বাধা প্রদানের কর্মসূচী কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছেন। এব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম সমাজকে লক্ষ্য করে বলেন, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ অর্থ: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন যারা মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে, অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে, এরাই সফলকাম।"[১৭৮] অর্থাৎ মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে ভালো কাজের প্রতি আদেশ প্রদানের কথা বলেছেন। পাশাপাশি সমস্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) সমাজে অন্যায়, অপকর্ম হতে দেখলে তা প্রতিরোধের নির্দেশনা প্রদান করে বলেন,

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ –

অর্থ: "তারিক ইবন শিহাব (আবূ বকর ইবন আবূ শাইবার হাদীসে) বলেন, মারওয়ান ঈদের দিন নামাযের পূর্বে খুৎবা দেওয়ার বেদআতী প্রথার প্রচলন করেন। এসময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, খুৎবার আগে নামায (সম্পন্ন করুন)। মারওয়ান বললেন এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো। সাথে সাথে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) উঠে বললেন, ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে কেউ অন্যায় ও গর্হিত কাজ করতে দেখলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে বলপ্রয়োগ করে প্রতিহত করে। এত

১৭৮. আল-কুরআন, ৩: ১০৪

সক্ষম না হলে সে যেন তার মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করে প্রতিহত করে। তাতেও সক্ষম না হলে সে যেন তার অন্তর দিয়ে ঘৃণা বা অপছন্দ করে প্রতিহত করার চেষ্টা করে। আর এটি হলো ঈমানের দুর্বলতম অবস্থা।”[১৭৯]

উপরোল্লিখিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের আলোকে দেখা যায় যে, সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মুমিনের দায়িত্ব হলো নিজে সৎকর্ম সম্পাদন করবে ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যকেও ভাল কাজে উৎসাহ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে নিজেরা বিরত থাকবে, কোথায়ও মন্দ কাজ হলে তা প্রতিহত করবে এবং প্রতিহত করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সমাজে যদি এরূপ ভালকাজে উৎসাহ এবং মন্দ কাজে বিরত থাকার প্রচলন থাকে তাহলে কিশোর এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং অন্যায় কাজ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে শিখবে।

১২। পরস্পরিক সহযোগিতা

পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজ গড়ে উঠে। সমাজের মূল উদ্দেশ্যই হলো একে অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা, বিপদ-আপদে পাশে থেকে সাহায্য করা। যে উদ্দেশ্যে সমাজ গঠিত হয়েছে তা বাস্তবায়নে সবাই মিলেমিশে চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর কৈশোরকালের সামাজিক সংগঠন ‘হাল্‌ফ-উল ফুযুল’ গঠন করেন, তাতেও পরস্পরের বিপদে-আপদে সাহায্য সহযোগিতার বিষয়ে গুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান মদীনা সনদেও[১৮০] মদীনায় বসবাসরত সকল নাগরিক দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মিলেমিশে থাকা এবং পরস্পর সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলেন, وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ– অর্থ: “তোমরা কল্যাণকর ও তাকওয়া অবলম্বনে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে না।”[১৮১] সুতরাং সমাজে যদি পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি হয় তাহলে সমাজ থেকে অনাচার ও অনৈতিকা দূর হবে। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। এরূপ সমাজে বেড়ে উঠে

১৭৯. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, অধ্যায়: আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ: বায়ানুন কাওনিন নাহী আনিল মুনকার মিনাল ঈমান ওয়া আন্নাল ঈমানা ইয়াযীদু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৭৮; ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ‘আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুস সালাত, বাব: সালাতুল ঈদাইন, খুতবাতু ইয়াওমাল ঈদ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১৪০

১৮০. রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনায় হিজরতের পর সেখানে বসবাসরত শতধাবিভক্ত জাতি, গোত্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে ‘The Charter of Medina’ বা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। এই মদীনার সনদের একটি বিশেষ দিক হল এ সনদে মদীনায় বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিক দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই মিলেমিশে থাকা এবং পরস্পর সহযোগিতা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সনদের ১২, ৩৭, ৩৯ ও ৪৪ নং ধারায় এ সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ করা হয়। সনদের ৩৭ নং ধারায় উল্লেখ করা হয়, “এই চুক্তিপত্রের পক্ষগুলোর বিরুদ্ধে কেউ লড়াই করলে পক্ষগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে এবং পক্ষগুলো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ও কল্যাণকামিতা বজায় রাখবে --- এবং মজলুমকে সবাই সাহায্য করবে।” সনদে ধারা ১৭, ১৮,৩৭ ও ৪৪ সহ আরো একাধিক ধারায় পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার বিষয় আলোকপাত করা হয়। সনদে উল্লিখিত এ ধারায় রাসূলুল্লাহ (সা.) মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীকে একই মর্যাদা দিয়ে সকলের জান, মাল ইজ্জত-আব্রু ও জীবনের নিরাপত্তার কথা বলেছেন। সনদের এ ধারার ফলশ্রুতিতে মদীনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরী হয়েছিল। ফলে তারা এক অপরের সুখে-দুখে পাশাপাশি থেকেছে। নিজের সুখ-দুখকে তার প্রতিবেশী ভাইয়ের সাথে ভাগ করে নিতে পেরেছে। এ সনদের মাধ্যমে মদীনাবাসী এতটাই উজ্জীবিত হয়েছিল যে, তারা জাত-ধর্ম ভুলে গিয়ে মুহাজির মুসলমানকে তাদের বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ এমনকি যার একাধিক স্ত্রী ছিল সে একজন স্ত্রীকে মুহাজির ভাইকে দান করে দেন। এ উদার সহযোগী মানসিকতার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মদীনাবাসী পাস্পরিক রেষা-রেষি ও সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করে একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। (বি. দ্রঃ আব্দুল মালেক ইব্‌নে হিশাম, *আ- সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, বৈরুত: দারুল কিতাবুল আরাবি, ১৯৯০, খ. ২, পৃ. ১৪৩-১৪৫; সনদের ধারা বিন্যাস: *মদীনা সনদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০১৩)

১৮১. আল-কুরআন, ৫ : ২

কিশোরের মননেও সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব তৈরি হবে। ফলে কিশোর-কিশোরী পরোক্ষভাবে নিজেকে অন্যায়, অপরাধ থেকে মুক্ত রাখতে পারবে। তাই সমাজে পরস্পরের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করতে হবে।

উপরোক্ত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিশু-কিশোরের বেড়ে উঠা, তাদের মনন-মানসিকতা ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং যোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পরিবারের মতই সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমাজ যদি সার্বিকভাবে নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এবং অনাচার-অত্যাচার প্রতিরোধ করে সামাজিক সকল দায়-দায়িত্ব কর্তব্যনিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে তাহলে একটি শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ উপহার দেওয়া সম্ভব। আর এমন সমাজে কিশোর-কিশোরীদের বিচ্যুৎ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

মানব জীবনে শিক্ষা একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের পরিচয় লাভের জন্য শিক্ষাগ্রহণ আবশ্যক। আল্লাহকে চিনতে হলে এবং তাকে সঠিকভাবে মানতে হলে শিক্ষা লাভের বিকল্প নেই। এছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমেই শিশু-কিশোরদের মানবিক বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়। তাদের মেধা, মনন ও রুচি উৎকর্ষ লাভ করে এবং আচার-আচরণ হয় পরিশীলিত ও মার্জিত। পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে শিশু-কিশোররা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে এবং এখানেই তাদের শিক্ষার মূলভিত্তি রচিত হয়। পরিবার, মক্তব ও প্রাথমিক শিক্ষায়তনে শিশু যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, পরবর্তী জীবনে তার চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণে তারই পরিস্ফুটন ঘটে। কিশোর-কিশোরী তার শিক্ষক ও সহপাঠীদের কাছ থেকে যা শিখে তাই তার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। পারিবারিক পরিবেশে যদি এর সমর্থন মিলে তাহলে তা তার চরিত্রে গ্রোথিত হয়ে যায়। কিশোর-কিশোরীরেকে অপরাধমুক্ত রাখতে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যেসব করণীয় গবেষণায় উঠে এসেছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। শিশু-কিশোর উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা

শিশু-কিশোরদের আদর্শবানরূপে গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষাব্যবস্থা যদি শিশু-কিশোর উপযোগী না হয় তাহলে সে শিক্ষা তাদের মনে গ্রথিত হয় না, প্রকৃত উপকারে আসে না। এজন্য সর্বপ্রথম শিশু-কিশোর উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা জরুরী। অভিভাবক যদি মনে করেন যে, নৈতিকতা সম্পন্ন করে তিনি তার সন্তানকে গড়ে তুলবেন তাহলে তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, নিয়ম-শৃঙ্খলা, সহপাঠী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার আচরণ, তাদের জীবনাদর্শ, তাদের সাথে সম্পর্ক, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কেননা এগুলো শিক্ষার্থীর আচরণ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এপ্রসঙ্গে বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ

ইবন সীরীন (রহ) বলেন, إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ– অর্থ: "নিশ্চয়ই এই ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং কার নিকট থেকে দীন গ্রহণ করছ তা সতর্কতার সাথে দেখে নিবে।"[১৮২]

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেখানে-সেখান এবং যার-তার নিকট হতে শিক্ষা গ্রহণ সমীচীন নয়। প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিক্ষকের মান কাঙ্ক্ষিত না হলে কিশোর-কিশোরী তথা শিক্ষার্থীরা বিপদগামী হতে পারে। ইসলাম জ্ঞানার্জনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং শিক্ষালাভকে সকলের মৌলিক ও অনিবার্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছে। উত্তম শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আল-কুরআনের অনেক আয়াতে শিক্ষার বিষয়, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও শিখন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ–

অর্থ: "যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব (আল-কুরআন) ও হিকামাত (সুন্নাহ) এবং তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় সে সকল বিষয়, যা তোমরা জানতে না।"[১৮৩] এই আয়াতে মহান আল্লাহ মানব জাতির প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য যুগে যুগে নবী-রাসূলের প্রেরণের কথা স্মরণ করে দিয়ে আমাদের সামনে জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ–

অর্থ: "মুমিনদের সকলের এক সাথে অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। বরং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একটি দল কেন বের হয় না, যাতে অবশিষ্ট লোকেরা দীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং দলটি সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট ফিরে আসে যাতে তারা তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (অন্যায় কাজ হতে) সতর্ক হয়।"[১৮৪] এই আয়াতটিকে ইমাম কুরতুবী (রহ) জ্ঞান শিক্ষার মৌলিক দলীল হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১৮৫] আলোচ্য আয়াতে 'ইলম শিক্ষার প্রকৃতি, পাঠ্যসূচী এবং শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব কী হবে তা বলে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে মানবতার জন্য কল্যাণকর ও উপকারী জ্ঞান শিক্ষা প্রদানের নির্দেশনা রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبَعٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرَضِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا–

---

১৮২. ইমাম হাফেজ আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, অধ্যায়: আল-মুকাদ্দিমাত, বাব: বায়ানু আন্নাল ইসনাদা মিনাদ্ দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১৮৩. আল-কুরআন, ২ : ১৫১

১৮৪. আল-কুরআন, ৯ : ১২২

১৮৫. মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আল-কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১১, পৃ. ৬০৪

অর্থ: "মানুষেরা তোমাদের অনুসরণ করবে এবং দীনের মর্মজ্ঞান উপলব্দি করার জন্য বিশ্বের দিক-দিগন্ত থেকে তোমাদের কাছে ছুটে আসবে। তারা যখন তোমাদের কাছে আসবে, তখন তাদের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকার জন্য তোমরা ওসিয়ত গ্রহণ কর।"[১৮৬] অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত দিকনির্দেশনা অনুযায়ী শিশু-কিশোরদের উপযোগী কারিকুলাম বা পাঠ্যসূচী, উন্নত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ এবং পর্যাপ্ত শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে পারলে কিশোর-কিশোরীদের অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখা যাবে এবং তারা নৈতিক মানসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হবে।

২। শিক্ষক আদর্শবান হওয়া

উন্নত নৈতিকতা ও মানবিকতা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বেশি প্রয়োজন তাহলো একজন আদর্শবান শিক্ষক। একজন মানুষ তার শৈশব-কৈশোরের শিক্ষাগ্রহণের পুরো সময়টাই শিক্ষকের নৈকট্যে অবস্থান করে। এ ক্ষেত্রে একজন শিশু-কিশোর তার পিতা-মাতার চেয়েও শিক্ষকের সাহচর্যে অনেকটা বেশি সময় ব্যয় করে। ফলে একজন শিশু-কিশোরের মননে তার শিক্ষকের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, রীতি-নীতি ও ধরন ব্যাপকভাবে রেখাপাত করে। যেহেতু শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত সময় শৈশব ও কৈশোর, আর এ সময়টা শিশু-কিশোর শিক্ষকের সাহচর্যে ও তত্ত্বাবধানে থাকে তাই শিশু-কিশোর সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় তার শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা। স্কুল-কলেজের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই কোন না কোন শিক্ষককে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই আমাদের কিশোর ও যুব সমাজকে অপরাধপ্রবণতা হতে দূরে রাখতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষককে আদর্শবান ও সমাজের মডেল রূপে পরিগণিত হতে হবে।

৩। নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখা

সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ একজন শিশু-কিশোর তার পরিবার এবং শিক্ষকের নিকট থেকেই লাভ করে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সামগ্রিক আদর্শ, নিয়ম-কানুন, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব, পরোপকারিতা, সহমর্মিতাই সর্বোপরি মানবিকতা শিক্ষালাভ করে। তাই একজন শিক্ষককে সর্বদা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নীতি-নৈতিকতা অবলম্বন করেই চলতে হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও হতে হয় আদর্শিক মডেল। এজন্যই সমাজ আজও অন্যান্য শ্রেণি পেশার লোকদের নৈতিক অবক্ষয় মেনে নিলেও শিক্ষক সমাজের অবক্ষয় কোন ক্রমেই মেনে নিতে পারে না। তাই কিশোর অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতি-নৈতিকতার উন্নয়ন একান্ত জরুরী। আজকাল দেখা যায়, অনেক টাকা ঘুষের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিশু বা শিক্ষার্থীকে স্কুল-কলেজে ভর্তি করানো হচ্ছে। এতে শুরুতেই শিক্ষার্থীর মনে অন্যায় ও অনৈতিকতা স্থান পেয়ে যায়। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়মের কথা প্রায়শই সংবাদপত্রের

---

১৮৬. ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, অধ্যায়: আল-ইলম, বাব: মা জাআ ফীল ইসতীসাই বিমান ইয়াত্বলুবুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬৫০

শিরোনাম হয়। যার নেতিবাচক প্রভাব কিশোর মনকে প্রভাবিত করে। সুতরাং অপরাধমুক্ত শিশু-কিশোর তথা ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নীতি-নৈতিকতা বজায় রাখতে হবে।

৪। নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া

একজন শিক্ষার্থী তথা শিশু-কিশোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষালাভ করে থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি ও শৃঙ্খলা কঠোর এবং উন্নতমানের সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা বেশি তৈরি হয়। যেমন, বিশেষায়িত কিছু কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভিন্নতর বিধায় এখানের শিক্ষার্থীদের সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ উন্নতর হয়। আবার যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সঠিক সময়ে নিয়মিত ক্লাসউপস্থিতি, লেখা-পড়া, শৃঙ্খলা অনুসরণ করা হয় না, সেসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ কম জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। কারণ নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে বেড়ে উঠা একজন শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হওয়ার সুযোগ পায় না বা সে অপরাধপ্রবণ হতে পারে না।

৫। সততা ও সত্যবাদিতার প্রতি গুরুত্বারোপ

সততা ও সত্যবাদিতা মানুষের মহৎগুণ। প্রত্যেক ধর্মে সততা ও সত্যবাদিতার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا-

অর্থ: "সত্য পূণ্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে এবং পূণ্য বেহেশতের দিকে পথপ্রদর্শন করে। আর কোন ব্যক্তি সত্য বলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত তার নাম আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লেখা হয়ে যায়। আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায় এবং পাপাচার জাহান্নামের পথ দেখায়। আর মানুষ মিথ্যা বলতে বলতে আল্লাহর কাছে শেষ পর্যন্ত মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হয়ে যায়।"[১৮৭] যেহেতু পরিবারের পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিশু-কিশোর শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সময় পার করে তাই শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের উচিৎ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব অনুধাবন করানো। তাছাড়া শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করে তাহলে ছাত্রদের মধ্যেও

১৮৭. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আননিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল বিররু ওয়াসসিলাতু ওয়াল আদাব, বাব: কুবহুল কিজবে ওহুসনেসসিদকে ওয়া ফাদলুহু, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৬০৭; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী (রহ.), *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুলবিররি ওয়াসসিলাতি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বাবঃ মা যায়া ফিস সিদকি ওয়াল কিযব, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৭১

সততার গুণ ছড়িয়ে পড়ে। আর যেসব শিশু-কিশোর সততা ও সত্যবাদিতা চর্চা করে তাদের পক্ষে সমাজবিরোধী অন্যায় ও বিচ্যুত আচরণ এবং অপরাধ করা সম্ভব হয় না।

৬। ন্যায় কাজের প্রতি উৎসাহ দান এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান

ন্যায় কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। এ কর্তব্যকে ইসলামের ভাষায় 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার' বলা হয়। মুসলিম উম্মাতকে লক্ষ্য করে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার -এর গুরুত্ব বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন, وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ-অর্থ: "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা প্রয়োজন যারা (মানুষকে) কল্যাণের পথে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এরাই সফলকাম।"[১৮৮] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ -অর্থ: "তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ।"[১৮৯] আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়িদায় এরশাদ করেন, وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ – "ভাল কাজ করা ও তাকওয়া অবলম্বনে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।"[১৯০]

ইসলামের ইতিহাসে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে 'বায়'আতে আকাবা'।[১৯১] তাতেও 'ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ'- এর উপর অকাট্য দলীলের উল্লেখ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, على السمع والطاعة في النشاطِ والكسَل وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر- অর্থ: "তোমরা আমার হাতে বায়'আত করবে শ্রবন ও আনুগত্য করার জন্য, খুশি ও অখুশি সকল অবস্থায়ই। এবং ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ নিষেধ করণের বিষয়ে।"[১৯২] চরিত্র ও মান-সম্মান সংরক্ষণ পর্যায়ে 'আমর বিল মা'রূপ ও নাহি আনিল মুনকার' -এর বড় কাজ হচ্ছে, মূলতই কোন অপরাধ যেন সংঘটিত হতে না পারে, অপরাধ হওয়ার কারণসমূহই যেন নির্মূল হয়ে যায়

---

১৮৮. আল-কুরআন, ৩: ১০৪
১৮৯. আল-কুরআন, ৩ : ১১০
১৯০. আল-কুরআন, ৫: ২
১৯১. আউস ও খাযরায ইয়াছরিবের (মদীনার পূর্ব নাম) বিখ্যাত দুটি পৌত্তলিক গোত্র। এই গোত্র দুটি ইয়াহুদীদের কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়। দীর্ঘদিন ধরে তারা পরস্পরের শত্রুতায় ব্যস্ত থেকে দুর্বল গোত্রে পরিণত হয়। তারা অনেক দিন পর্যন্ত 'বুয়াছ' নামক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ৬২১ খ্রি. আউস ও খাযরায বংশের ১২ জন লোক হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় এসে আকাবা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে দীন ইসলাম কবুলের জন্য বায়'আত গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনা 'আকাবায় প্রথম বা'আত' নামে পরিচিত। পরবর্তী হজ্জ মওসুমে অর্থাৎ ৬২২ খ্রি. ৭২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাফেলা যাদের মধ্যে ২ জন মহিলা সদস্যও ছিলেন, মক্কায় এসে উক্ত আকাবা নামক স্থানে দ্বিতীয় বারের মত বা'আত গ্রহণ করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই ঘটনা 'আকাবায় দ্বিতীয় বা'আত' নামে পরিচিত। (বি.দ্র: ড. মুহাম্মাদ হোসাইন হায়কল, *মহানবীর সা. জীবন চরিত*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৪, পৃ. ২৬৭-৬৯)
১৯২. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আহমাদ ইবন হাম্বল*, মুসনাদু জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪৪৫৬, ১৪৬৫৩, ২২৭৬৯

এবং তার ফলে যেন মান-মর্যাদা বিনষ্ট হওয়ার মত ঘটনাও সংঘটিত না হয়। মূলত 'আমর বিল মা'রূপ ও নাহি আনিল মুনকার' -এর কাজটি একটি ঢাল বিশেষ। তা বড় বড় অপরাধ সংঘটনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক ও প্রতিরোধক।

পবিত্র কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসসমূহ হতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের একটা শ্রেণি থাকা প্রয়োজন যারা সর্বদা মানুষকে উত্তম কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করবে। ভালকাজসমূহ সমাজে ছড়িয়ে দিবে। আর মন্দ ও ক্ষতিকর কাজসমূহ প্রতিরোধ করবে। সমাজ থেকে তা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। একাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন শিক্ষকমণ্ডলী। যারা প্রতিনিয়ত জাতিগঠনে শিক্ষাদানে রত আছেন। তাই শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদেরকে ন্যায় কাজে সহযোগিতা ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার শিক্ষা প্রদান করবে।

৭। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত খেলা-ধুলা ও শারীরিক কসরতের ব্যবস্থা করা

নিয়মিত খেলা-ধুলা ও শারীরিক কসরত একদিকে যেমনি শরীর ও মনকে প্রফুল্ল রাখে এবং মানসিক ও শারীরিক বিকাশে যথার্থ ভূমিকা পালন করে, তেমনি অন্যদিকে শিশু-কিশোরকে অপরাধ ও বিচ্যুত আচরণ হতেও দূরে রাখে। কিশোর অপরাধপ্রবণতার কারণ গবেষণায় দেখা যায় যে, কিশোরদের অপরাধপ্রবণ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো অবসর সময়ে তারা খেলা-ধুলা ও শরীর চর্চা করার মত উপযুক্ত খেলার মাঠ ও পরিবেশ পায় না ফলে তারা উক্ত সময়টা রাস্তায় দলবেধেঁ ঘুরে বেড়ায় হৈ-হুল্লা করে। তাই কিশোরকে অপরাধমুক্ত পরিবেশে প্রদানের জন্য স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাসহ সকল প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত খেলা-ধুলা ও শারীরিক কসরতের আয়োজন করা জরুরী।

৮। দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা

আজকের যারা শিশু-কিশোর বা শিক্ষার্থী তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তারাই দেশ পরিচালনার নেতৃত্বে আসবে, দেশকে নানা আবিষ্কার ও গৌরব উপহার দিবে, বিশ্বের দরবারে দেশের ভাবমুর্তি ও মর্যাদা উচুঁ করবে। শিশু-কিশোরকে দেশাত্মবোধ তথা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। ইসলাম দেশ প্রেমকে গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছে, একে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। মাতৃভূমিকে মায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মা যেমন স্নেহ-আদর-ভালবাসার পরশে যাবতীয় ঝড়-ঝঞ্জার মধ্যেও সন্তানকে আগলে রাখে, নিজে না খেয়ে সন্তানকে আহার করায়, নিজের শত কষ্ট সহ্য করেও সন্তানের উপর কোনরূপ কষ্ট আসতে দেয় না। তদ্রুপ এই দেশ তার আলো, বাতাস, খাদ্য-পাণীয়, দিগন্তজোরা ফসলের মাঠ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আমাদের শৈশব-কৈশোর উপহার দিয়েছে, রক্ষা করেছে যাবতীয় বিপদ-আপদ থেকে। তাই দেশের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ ও ভালবাসা সৃষ্টির জন্য শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত এসেমব্লিতে দেশাত্মবোধক শপথ পড়ানো বা প্রতিজ্ঞা করানো প্রয়োজন। পাশাপাশি ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার্থীদেরকে দেশকে ভালবাসার কথা, দেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধে তরুণ ও কিশোরদের অবদান এবং আত্মত্যাগের কথা

স্মরণ করে দেওয়া উচিৎ। তাহলে কিশোর-কিশোরীদের মনে দেশাত্মবোধ ও দেশ প্রেম জাগ্রত হবে। আর এ দেশপ্রেম তাদেরকে অপরাধমূলক কাজ-কর্ম হতে বিরত রাখবে।

৯। বন্ধুত্বসুলভ আচরণ করা

শিশু-কিশোর তথা শিক্ষার্থীরা পিতামাতা ও পরিবারের পরে শিক্ষকদের সাহচর্যে সবচেয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করে থাকে। শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ঘিরে তার মনোজগত গড়ে উঠে। যেহেতু কৈশোর সময় এক বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময়। এসময় তার নানাবিধ শারীরিক, মানসিক ও জৈবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এসব পরিবর্তনের সাথে কিশোর ইতোপূর্বে অভ্যস্ত না থাকার কারণে প্রত্যেকটি পরিবর্তনে তার মধ্যে নানা কৌতূহল ও আগ্রহ জন্ম নেয়। এসময় যদি তাদেরকে সঠিক পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা না যায় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিশোর-কিশোর এই কৌতূহল ও আগ্রহ তাকে বিপদগামী এমনকি শারীরিক ও মানসিক নানা ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে। যা তাদেরকে সমাজবিচ্যুত আচরণেও ধাবিত করতে পারে। তাছাড়া কিশোর-কিশোরী এরকম নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা থাকে যা সে নিজ পরিবারের সদস্য এমনকি বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করতে পারে না। যা তাকে মানসিক কষ্টপ্রদান করতে থাকে এবং এক সময় মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজ ও মাদরাসাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষক যদি শিক্ষার্থী বান্ধব হয় এবং ভয়-ভীতি না দেখিয়ে বরং তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে; তাদেরকে আশ্বস্ত করে যে, তাদের সমস্ত সুখ-দুঃখে তারা শিক্ষককে কাছে পাবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য পাবে; তাহলে শিক্ষার্থীরা সে শিক্ষককে বন্ধু ভাবতে শুরু করবে এবং নিজের সমস্ত সমস্যাও কৌতূহল শিক্ষকের সাথে শেয়ার করবে। এভাবেই শিক্ষকবৃন্দ শিক্ষার্থীকে সঠিক পরামর্শ ও তত্ত্বাবধায়ন করে অপরাধমুক্ত জীবন উপহার দিতে পারবে।

১০। কিশোর-কিশোরীদের (শিক্ষার্থীদের) সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য করা

কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিক্ষণের নানা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন তার মনে বিভিন্নভাবে রেখাপাত করে। এসময়ে সে তার করণীয় বুঝতে পারে না। কিশোরদের এমনি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে একজন শিক্ষকই পারেন একজন বন্ধু ও অভিভাবকের ভূমিকায় এগিয়ে এসে তার সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়ে সঠিক পরামর্শ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। যদি সম্ভব হয় শিক্ষক নিজে তার সমস্যা দূরীকরণে পদক্ষেপ নিবেন। তাছাড়া স্কুল-কলেজে অবস্থানরত অবস্থায় সহপাঠীরা পরস্পরের সাথে বিভিন্ন সমস্যা জড়াতে পারে সেক্ষেত্রেও একজন শিক্ষক আদর্শ ভূমিকা পালন করে তাদের সমস্যা দূর করতে পারেন। এর ফলে কিশোর-কিশোরী তথা শিক্ষার্থীদের অপরাধপ্রবণ হওয়ার সুযোগ অনেকাংশেই কমে যায়।

১১। ছাত্রদের আদর্শ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সন্তানতুল্য। একজন শিক্ষার্থী মেধা বিকাশ ও মননের অধিকাংশ সময়ে শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকে। পিতা-মাতা ও পরিবারিক অনুশাসনে সে লালিত-পালিত হলেও সে অনেক ক্ষেত্রে কাজে-কর্মে শিক্ষককে অনুসরণ ও অনুকরণ করে থাকে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া একজন শিক্ষকের আচার-আচরণ ও কৃষ্টি-কালচার ছাত্র-ছাত্রীরা মনের অজান্তেই গ্রহণ করে থাকে। তাই শিশু-কিশোরদের প্রতি একজন শিক্ষকের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। বিশেষ করে ছাত্র সমাজের কাছে নিজেকে আচার-আচরণ ও নীতি-নৈতিকতায় এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে তারা তাকে সমাজের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারে।

উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় যে, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হলে শিক্ষকগণ হলেন সে জাতি গঠনের প্রধান কারিগর। শিক্ষকদের হাতেই একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্মিত হয়। শিক্ষকগণ যদি স্কুলে শিক্ষার্থীদেরকে সুশিক্ষা প্রদান করতে না পারেন তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্রে অযোগ্যতা ভর করে। ফলে সে সমাজে উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও প্রগতি কল্পনা করা যায় না। বরং নানা কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকে গ্রাস করে। তাই শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হলো শিশু-কিশোর উপযোগী সিলেবাসে পাঠদান করা। কারণ শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষাব্যবস্থা শিশু-কিশোর উপযোগী হলে সে শিক্ষা তাদের মনে গ্রথিত হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীকে নীতি-নৈতিকতা, নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা, সততা ও সত্যবাদিতার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা, ন্যায় কাজের প্রতি নির্দেশ প্রদান এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পাশাপাশি নিয়মিত খেলা-ধুলা ও শারীর চর্চা করানো, ছাত্র-ছাত্রীদের মনে দেশ প্রেমে জাগ্রত করা, শিক্ষার্থীদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে তাদের সমস্যা দূরীকরণে সাহায্য-সহযোগিতা করা। সর্বোপরি ছাত্রদের আদর্শ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য

রাষ্ট্র সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের অধিবাসীরা তাদের সামাজিক জীবনে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার উন্নয়ন এবং সুখী-সমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্য একটি নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। সরকার বিভিন্ন রকম বিধি-বিধান ও আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রে বসবাসরত নাগরিকদের আচরণকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা চালায়। ফলে সমাজের অন্যান্য সকলের ন্যায় শিশু-কিশোরদের সামাজিক বিকাশ রাষ্ট্র দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। দৈহিক ও মানসিকভাবে সুস্থ শিশু-কিশোর একটি রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আজকের শিশু আগামী দিনে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশকে সমদ্ধ করবে এবং দেশের সুনাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিবে। তাদের একটি অংশ অবক্ষয়ের শিকার হয়ে অপরাধে লিপ্ত হোক বা

সমাজকে কলুষিত করুক এটা রাষ্ট্রের কাম্য নয়। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে বা অপরাধপ্রণতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র দু'ভাবে তার কর্তব্য পালন করতে পারে।

(এক) শিশু-কিশোরদেরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখতে বা তারা যাতে অপরাধের সংশ্লিষ্টতার মুখোমুখী না হয় বা অপরাধ করতে না পারে এমন পরিবেশ প্রদান করা।

(দুই) অপরাধী শিশু-কিশোর বা অপরাধপ্রবণতায় সংশ্লিষ্ট শিশু-কিশোরদের সংশোধন, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই ধাপে সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন কর্মসুচী, সংশোধন, শিশু আইন এবং এসম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম রয়েছে। অত্র অভিসন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত বিবরণ ও পর্যবেক্ষণ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রাষ্ট্র শিশু-কিশোরের দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। যেমন সব শিশু-কিশোরের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অবারিত করা, পাঠ্যসূচীতে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা। শিশু-কিশোরদের চিত্তবিনোদনের জন্য শিশুপার্ক, শিশু সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার এবং পর্যাপ্ত খেলার মাঠ গড়ে তোলা। অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও শিশু-কিশোরদের লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়াও রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে ভাল কাজের প্রসার ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অন্যায়-অপকর্ম প্রতিরোধ করা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। নিম্নে কিশোরের সার্বিক উন্নয়ন ও অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখতে রাষ্ট্রের করণীয় উল্লেখ করা হলো-

১। শিশু-কিশোর ও কিশোরীর জন্য সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থাগ্রহণ করা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কোন জাতি কতটা উন্নত তা নির্ভর করে তাদের শিক্ষার উপর। যে জাতি যতটা শিক্ষিত তারা ততটা উন্নত। শিক্ষা জাতিকে সভ্য করে গড়ে তোলে। শিক্ষিত সমাজ জাতির কর্ণধার। অপরদিকে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশ ও জাতির বোঝা। তাছাড়া অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বেশি দেখা যায়। গবেষণায় দেখা যায় যে, অশিক্ষিত বস্তি ও গিঞ্জি এলাকার কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি। পূর্বে উল্লিখিত সারণী-১২ -তে এ দেখা যায় যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অপরাধী নিবাসীদের প্রায় ৪৯% নিবাসী শ্রমিক ও বেকার আর অবশিষ্ট ৫১% নিবাসী শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ বিশ্বের জনসংখ্যাবহুল দেশসমূহের অন্যতম। ছোট এই দেশে প্রায় ১৫৮.৯ মিলিয়ন লোক বসবাস করে।[১৯৩] বিশাল এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে না পারলে কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। পূর্বোল্লিখিত

১৯৩.*Statistical Pocket Book Bangladesh 2016* (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics,Statistics and Information Devision, Ministry of Planning,March-2017), p. 3

সারণী-১৪ -তে এ দেখা যায় যে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে অপরাধী নিবাসীদের প্রায় ৬৪% নিবাসী শহরের গিঞ্জি বস্তি, ফুটপাতে বসবাস করে।

এসব নিরক্ষর কিশোর-কিশোরীরা অধিকাংশই বেকার ও তাদের নেই কোন প্রশিক্ষণ। ফলে তাদের অনেকেরই জীবনে ভবিষ্যতের কোন দিক নির্দেশনা নেই। দেশে স্থায়ী ও সর্বব্যাপী দরিদ্র্য অবস্থার পেক্ষাপটে এ সব শিশু-কিশোরদের অনেকেই জীবনে কোন সম্মানজনক জীবিকা বেছে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর উপর বর্তমানে অধুনিক সমাজে এসব সংকটক্লিস্ট শিশু-তরুণ আরও বহুমুখী সমস্যা ও দুর্ভোগের মুখোমুখী। এর ফলে তারা কখনও কখনও এমন আচরণ বা কার্যকলাপ প্রদর্শন করে যা প্রায়শঃই বিসদৃশ মনে হয়, মনে হয় সমাজ বিরোধী কাজ। তাই এসকল শিশু-কিশোরকে অপরাধমুক্ত রাখতে হলে সকলকে সর্বজনীন শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সরকারের সর্বজনীন শিক্ষার অধিকারকে সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন এবং একটি দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হলে শতভাগ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। শিশু-কিশোর যাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ-মাধ্যমিক কোন পর্যায়েই ঝড়ে না পরে সে জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। পাঠ্যসূচীতে নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা

পাঠ্যসূচী ও কারিকুলাম ফলপ্রসূ শিক্ষাব্যস্থার জন্য খুবই জরুরী। যদি কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে সে শিক্ষা ভবষ্যিতে তেমন কোন কাজে আসে না। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে জিনিসটি গুরুত্বের সাথে দেখা উচিত তাহলো আগামী ২৫ বছর বা ৫০ বছর পরে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম তথা আজকের শিশু-কিশোরকে আমরা কোন অবস্থানে দেখতে চাই, সে অনুযায়ী পাঠ্যসূচী ও কারিকুলাম তৈরি করা। যেমন, আমরা যদি চাই যে আগামী ৫০বছর পরে আমাদের দেশ পারমানবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হবে, অথবা আমরা ৫০ জন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী দেখতে চাই, তাহলে এখন থেকেই সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যসূচী ও শিক্ষার্থী বাচাই করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তবে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বর্তমানে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি জরুরী তাহলো জনগণের নৈতিক উন্নয়ন। দেশের প্রত্যেক শ্রেণির নাগরিকের নৈতিক স্খলনজনিত নানা খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছে প্রত্যহ। বর্তমান সময়ে দেশের কোন পেশা বা শ্রেণিই এর আওতামুক্ত নয়। তাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এ নৈতিক স্খলন থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের মানবিকতা ও মূল্যবোধের ভিত্তি আরো শক্তভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাদের নীতি-নৈতিকতা আরো সুদৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার পাশাপাশি ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩। শিশু-কিশোরদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা

শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের চিত্তবিনোদন একান্ত জরুরী। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় বাবা-মা উভয়ই পেশাজীবি। ফলে পিতামাতা কেউই তাদের সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। পরিবারের সঙ্গে থেকে শিশু যে মানসিক সন্তুষ্টি পেত বা বিনোদনের চাহিদা পূরণ হতো, তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বর্তমান সময়ের শিশু-কিশোর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একাকীত্ব অনুভব করছে। এই নিসঙ্গতা তার মানসিক ও শারীরিক বৃদ্ধির জন্য মোটেই শুভ নয়। বরং অনেক সময় তার এ নিসঙ্গতা মানসিক ব্যধিতে রূপান্তরিত হয়। তাই শিশু-কিশোরের সঠিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য পর্যাপ্ত বিনোদনমূলক ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ জন্য সরকার স্কুল, কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সমাজের কমিউনিটি স্থানসমূহে পর্যাপ্ত বিনোদনমূলক ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। যাতে করে প্রত্যেক শিশু-কিশোর একটি সুস্থ বিনোদন পেতে পারে। তা নাহলে এই কিশোররা অসুস্থ কোন বিনোদন জগতের সাথে জড়িয়ে যেতে পরে। যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৪। শিশু-কিশোরের জন্য সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা

সুস্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মধ্যদিয়ে শিশুর মনন তৈরি হয়। শিশু-কিশোরের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ এবং মনোজাগতিক উন্নয়নের জন্য সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চার বিকল্প নেই। দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ করে দেওয়া। সপ্তাহে কমপক্ষে একটি দিন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য নির্ধারণ করা। বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে আরো গঠনমূলক ও আকর্ষণীয় করা এবং বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পরিধি আরো বৃদ্ধি করা। দেশে হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুট, কানামাছি, বৌচি, ফুটবল ও ক্রিকেটসহ প্রতিটি দেশীয় খেলা-ধুলার পরিধি বৃদ্ধি করা। দেশীয় খেলা-ধুলাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জেলা পর্যায়, বিভাগীয় পর্যায় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। এছাড়া দেশীয় যেসব সংস্কৃতি ইতোমধ্যে আর্ন্তজাতিক বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবে হারিয়ে যেতে বসেছে সেসব সংস্কৃতিকে স্বরূপে ফিরিয়ে আনতে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্কুল-কলেজ-মাদ্রসাসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় এগিয়ে আসা। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সকল মিডিয়াতে দেশীয় সংস্কৃতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। দৈনিক জাতীয় ও লোকাল পত্রিকাসমূহে কমপক্ষে দৈনিক একটি পৃষ্টা সাহিত্য ও সংস্কৃতির জন্য নির্ধারণ করে পত্রিকা ছাপানো। এছাড়া দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহর ছাড়াও প্রত্যেক উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও শিক্ষা-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫। পর্যাপ্ত খেলার মাঠ গড়ে তোলা

বর্তমানে দেশে শিক্ষার হার, শিক্ষা অবকাঠামো এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় শিশু-কিশোর তথা ছাত্র-ছাত্রীদের খেলা-ধুলার জন্য মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। বরং বিপরীতক্রমে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সময়ে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের অধিকাংশই নির্দিষ্ট কোন ভবন ভাড়া করে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এদের নেই কোন খেলার মাঠ, নেই কোন প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থা কিংবা বিনোদনের প্রকৃত ব্যবস্থা। আবার অন্যদিকে একটা সময় যে সব প্রতিষ্ঠানের খেলা-ধুলার মাঠ ছিল আজ তা নামে-বেনামে দখল হয়ে যাচ্ছে অথবা নতুন নতুন ভবন বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে সেসব মাঠ নষ্ট করা হচ্ছে। ফলে শিশু-কিশোরদের খেলা-ধুলার ব্যবস্থা দিনে দিনে সংকুচিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা তাদের অবসর সময়টাতে খেলা-ধুলা করতে না পেরে অন্যান্য কার্যক্রমে জড়িত হচ্ছে বিশেষকরে রাস্তা-ঘাটে কিংবা হাটে-বাজারে দলবেধেঁ হৈ-হুল্লা করছে। অনেক সময় গ্যাং কার্যক্রমের সাথে জড়িত হচ্ছে। যা থেকে তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ছড়িয়ে পড়ছে। তাই ভবিষ্যত প্রজন্মকে অপরাধপ্রবণতা হতে দূরে রাখতে হলে দেশের প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং সামাজিক কমিউনিটি স্থানসমূহে খেলা-ধুলার জন্য পর্যাপ্ত মাঠের ব্যবস্থা করা। এছাড়া দেশের বিভাগীয় ও জেলা শহর ছাড়াও প্রত্যেক উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়েও শিশুপার্কের ব্যবস্থা করা এবং যেসমস্ত পার্কসমূহ ইতোমধ্যে দখল হয়ে গিয়েছে সেগুলো দখলমুক্ত করে শিশুদের খেলা-ধুলার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া।

৬। অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের লালনপালন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের লালনপালন করে পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা, তাদেরকে মানব সম্পদে পরিণত করা এবং ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশু। যাদের মধ্যে নিম্নবিত্ত, দুস্থ ও পিতৃ-মাতৃহীন এতিম শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। তাই দেশ ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে উল্লিখিত এতিম ও দুস্থ শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। যদিও বাংলাদেশ সরকার এ ব্যাপারে কিছু কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন, শিশুদের প্রতি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সমাজ ও মানব কল্যাণ দর্শনের আদর্শে ব্রতী হয়ে বাংলাদেশ সরকার পিতৃহীন কিংবা পিতৃ-মাতৃহীন এতিম ও দুস্থ শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নে লালনপালনসহ তাদের অভিভাবকত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদন এবং পুনর্বাসনের জন্য 'সরকারি শিশু সদন', 'শিশু পরিবার' পরিচালনা করছে। পারিবারিক পরিবেশে এতিম শিশুদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ন ও সাহচর্য প্রদানের মাধ্যমে প্রতিপালনের জন্য শিশু সদনসমূহকে 'শিশু পরিবারে' রূপান্তর করা হয়েছে। ১৯৪৪ সালের এতিমখানা এবং বিধবা সনদ আইন, ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান মোতাবেক পিতৃ-মাতৃহীন এতিম ও দুস্থ শিশুদের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান, তাদের

অধিকার এবং স্বার্থ সংরক্ষণ করছে।[১৯৪] সরকারের এসকল কার্যক্রমের পরিধি ও মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আরো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭। যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশু-কিশোর। এই শিশু-কিশোরদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ মানবসম্পদে রূপান্তর করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি শিশু-কিশোরদেরকে যথাযথ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তাহলে এ সকল কিশোর যেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্ম হতে নিজেদেরকে দূরে রাখবে ঠিক তেমনিভাবে বিশ্বের দরবারে দেশের সুনাম ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে।

৮। রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা

সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য। রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলার উপর দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকলে নাগরিক কাজকর্মে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না, সকল কাজকর্মই স্বাচ্ছন্দ্যে সম্পাদন করতে পারে। ফলে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসহ যাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পাঠদান কার্যক্রম স্বাচ্ছন্দ্যে সম্পাদন করা যায়। এছাড়া দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না থাকলে এর সরাসরি প্রভাব পরে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিশু-কিশোরের উপর। ক্লাসে পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ, রেজাল্ট প্রণয়নসহ সামগ্রিক শিক্ষাকার্যক্রম ব্যহত হয়। তাছাড়া দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো না থাকলে কিশোর ও তরুণরা এর সুবিধা নিয়ে নানা রকম রাষ্ট্র, সমাজ, ও আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড সংঘটিত করে। তাই কিশোর অপরাধমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের জন্য রাষ্ট্রের সার্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা একান্ত জরুরী।

৯। সৎকাজের বিস্তার এবং অন্যায় কাজ প্রতিহত করা

সৎকাজের বিস্তার এবং অন্যায় কাজ প্রতিহত করা যেমন ব্যক্তি ও সমাজের দায়িত্ব, তদ্রুপ রাষ্ট্রেরও অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি সমাজের ভাল কাজগুলোর পরিচর্চা ও পরিপালন করে এবং মন্দ ও অকল্যাণকর কাজগুলো প্রতিহত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে তাহলে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে সমস্ত অকল্যাণ, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম সমাজকে স্থিতিশীল, শান্তিময় ও কল্যাণকর রাখার জন্য যাবতীয় ভাল কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

১০। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা

আইনের শাসন রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। রাষ্ট্রে আইনের শাসন না থাকলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকার জনগণের আস্থা হারায়। সমাজে নানারকম বৈষম্য ও আনাচার ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্র রাহাজানি,

---

১৯৪. *সরকারি শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা* (ঢাকা : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেপ্টম্বর ২০০২ খ্রি.), পৃ. ০১

সন্ত্রাস ও ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করে। অন্যায়কারী তার কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করে দেয়। অনেক সময় জনগণ সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে নিজেরাই আইন হাতে তুলে নেয়। ফলে পরিস্থিতি আরো নাজুক আকার ধারণ করে। দেশের এমন পরিস্থিতিতে কিশোররা বিভিন্নভাবে অপরাধপ্রবণতার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং তারা আইন-শৃঙ্খলা সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিহত করতে হলে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা একান্ত জরুরী।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে রাষ্ট্র কিশোর অপরাধপ্রবণতার সামগ্রিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করে মানব কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণ করতে পারে। সমাজকে রক্ষা করতে পারে যাবতীয় বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার হাত থেকে। তাতে কিশোর অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারে। এ জন্যই ইসলাম রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য কিছু মৌলিক কর্মসূচী নির্ধারণ করে দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে রাষ্ট্রের এসকল মৌলিক কর্মসূচীর উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ-অর্থ: "আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে (রাষ্ট্র ক্ষমতায়) প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে তারা সালাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর সকল কাজের প্রতিদান নিশ্চয় আল্লাহরই অধিকারে।"[১৯৫]

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা চারটি ভিন্ন প্রকৃতির কাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সামগ্রিক দায়িত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে (১) সালাত কায়েমের নির্দেশের মাধ্যমে সমস্ত শারীরিক 'ইবাদাতের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, সরকার রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য শারীরিক 'ইবাদাত পালনের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করবে, যাতে করে শিশু-কিশোরসহ প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তা পালন করতে পারে। অনৈতিক সকল পন্থা পরিত্যাগ করে শারীরিক পরিত্রতার মাধ্যমে ইবাদাত পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (২) যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে অনাথ, অসহায়, প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরসহ রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি অন্যায়, অবৈধ ও অনৈতিকভাবে উপার্জনের সকল পন্থা রুদ্ধ করে যাকাত ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে আর্থিক সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে। (৩) সকল প্রকার ন্যায় ও কল্যাণকর কাজের নির্দেশ প্রদান ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে সমাজে ন্যায়-নীতি, নৈতিক মূল্যবোধ, মানবিকতা সর্বোপরি ইনসানিয়াত প্রতিষ্ঠা করা। (৪) সকল প্রকারের অত্যাচার, অনাচার, বৈষম্য, সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি প্রতিহত করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। সমস্ত অন্যায় ও অকল্যাণকর কাজ প্রতিহত করে তা সমূলে উৎপাটন করে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। রাষ্ট্র যদি এই চারটি ভিন্ন প্রকৃতির কাজের বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে কিশোর অপরাধমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব।

---

১৯৫. আল-কুরআন, ২২: ৪১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে শরী'আতের শাস্তি বিধান

ইসলামি শরী'আতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি। যা মানব জীবনের সকল দিককে সুবিন্যস্ত করে, মানুষের সকল কাজের যথাযথ নির্দেশনা প্রদান করেছে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মানুষকে যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি ও অন্যায়-অনাচার থেকে মুক্ত রেখে জীবনকে আরো সুন্দর ও সুখময় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে জীবন পরিচালনার পথ-পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। পৃথিবীতে রহমত[১৯৬] প্রতিষ্ঠাই রাসূল প্রেরণের একমাত্র উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ও সুন্দরের নির্দেশনা থাকার পরেও সামাজে একদল মানুষের মধ্যে দুর্বলতা থেকে যায়। ইসলামের কল্যাণের পথ তাদের জন্য ফলদায়ক হয় না। তারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে নানা ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়। অন্যের উপর যুলম করে ও তাদেও মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে। মানব সমাজের বিপর্যয় ও শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টকারী এসকল অপরাধের লাগাম টেনে ধরার জন্য এবং জনগণের মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি সংশোধনের বিভিন্ন উপায় অবলম্বন জরুরী হয়ে পড়ে। সে উপায় হিসেবেই ইসলামে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। অপরাধভেদে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। ইহকালীন শাস্তির পাশাপাশি পরকালীন অনন্ত শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। এই শাস্তি বিধানে আল্লাহর কোন ধরনের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পায় না, আবার তাঁর কথা পৃথিবীর কেউ না শুনলেও মহান সত্তার মর্যাদার কোন কমতি হয় না। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সংশোধন ও মানুষের কল্যাণের জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।[১৯৭] নিম্নে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের শাস্তি বিধানের উপযোগিতা পর্যালোচনা করা হলো:

শাস্তির পরিচয়

শাস্তিকে আরবি ভাষায় আল-'উকুবাত (العقوبة) বলে। (عقوبة) শব্দটি একবচন এর বহুবচনে (عقوبات) ব্যবহৃত হয়। العقوبة বা শাস্তির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ইসলামি আইনজ্ঞগণ বলেন,

هو الجزاء المقرر المصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع–

অর্থাৎ-শরী'আহ প্রবর্তক এর নির্দেশ অমান্য করার জন্য জনগণের কল্যাণে বিধিবদ্ধ প্রতিফল[১৯৮] বা অপরাধের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিফলকে 'শাস্তি বলা হয়।[১৯৯] কারো কারো মতে – الجزاء ينال الانسان على فعل الشر

১৯৬. বিস্তারিত দেখুন: আল-কুরআন, ২১: ১০৭

১৯৭. আবদুল কাদের আওদাহ, *আত-তাশরী আল-জিনাঈ* (লেবানন: মুসসারাতুর রিসালাহ, ১৪১৯ হি.), খ. ১, পৃ. ১০৯

১৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯

অর্থ: "অপরাধকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে অপরাধীকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয় তাকে শাস্তি বলা হয়।"[২০০] লিসানুল আরাব আরবি অভিধান গ্রন্থে বলা হয়েছে, –العقاب والمعاقبةُ انَّ تجزيَ الرجُلَ بما فعلَ سُوءاً অর্থ: "মানুষ যে খারাপ কাজ করে তার প্রতিদানকে শাস্তি বলা হয়।"[২০১] কাওয়াইদুল ফিকহ গ্রন্থে শাস্তির পরিচয়ে বলা হয়েছে, الجزاء بالشر او ما يلحق الانسان بعد الذنب من المحنة فى الاخرة او ما يلحق من المحنة بعد الذنب فى الدنيا فيسمى عقوبة– অর্থ: "অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীকে প্রতিদান হিসেবে দুনিয়া বা আখেরাতে যে কষ্ট ভোগ করতে হবে তাকে শাস্তি বলা হয়।"[২০২] অতএব, বলা যায় যে, অপরাধ হলো শরী'আহ প্রণেতা কর্তৃক মানব সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকারক ও অকল্যাণকর কার্যসম্পাদনকারী ব্যক্তির সংশোধনের নিমিত্তে প্রদত্ত প্রতিদানই হলো শাস্তি।

শাস্তির শ্রেণিবিভাগ

ইসলামি শরী'আহ বিশেষ বিশেষ অপরাধের জন্য বিশেষ বিশেষ শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। তাই শরী'আতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আল-'উকুবাত (العقوبة) বা শাস্তিকে ভাগ করা হয়। যেমন:

(ক) প্রথম প্রকার: শাস্তির মৌলিকত্ব বিবেচনায় প্রকারভেদ। এ দিক দিয়ে শাস্তি চার প্রকার। মৌলিক শাস্তি, বিকল্পশাস্তি, আনুষাঙ্গিক শাস্তি ও সম্পূরক শাস্তি।[২০৩]

১। মৌলিক বা প্রকৃত শাস্তি (العقوبات الاصلية): কোন নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য শরী'আহ প্রবর্তকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তিকে মৌলিক শাস্তি (العقوبات الاصلية) বলে। যেমন, হত্যার জন্য কিসাস, চুরির জন্য হস্ত কর্তন, জিনার জন্য বেত্রাঘাত ও রজম ইত্যাদি।

২। বিকল্প শাস্তি (العقوبات البدلية): শর'ঈ কোন কারণে শরী'আহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি বা মৌলিক শাস্তি প্রয়োগ করা সম্ভব না হয় বা মৌলিক শাস্তি প্রয়োগে শর'ঈ বাধা থাকলে মূল শাস্তির পরিবর্তে যে শাস্তি প্রদান করা হয় তাকে বিকল্প শাস্তি (العقوبات البدلية) বলে। যেমন, কিসাস এর বিকল্প দিয়াত; চুরির শাস্তি হাত কর্তনের শর্ত পূরণ না করায় তা'যিরী শাস্তি দেওয়া।

৩। অনুগামী শাস্তি (العقوبات التبعية): এমন শাস্তি যার জন্য কোন ধরনের নির্দেশনা বিচারকের পক্ষ থেকে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বিচারক অপরাধ সাব্যস্ত হলে শরী'আহ নির্ধারিত মৌলিক শাস্তি নির্ধারণ করলেই তার অনুগামী

---

১৯৯. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ,২০০১খ্রি.), খ. ১, পৃ.২৬০

২০০. ড. মুহাম্মদ রাওস কালতা'জী (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৬

২০১. ইমাম আবুল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মানযুর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩০২৭

২০২. মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩

২০৩. ড. আব্দুল করীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮; সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ, ২০১১খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১২৯

হিসেবে যে শাস্তি অপরাধীর উপর এসে পড়ে সেগুলোকে আনুষঙ্গিক বা অনুগামী শাস্তি (العقوبات التبعية) বলে। যেমন, কেউ যদি নিজ পিতামাতা বা এমন কাউকে হত্যা করে যার সে উত্তরাধিকারী, এক্ষেত্রে হত্যাকারীর উপর মৃত্যুদণ্ডের হুকম জারি হলে সে মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ কোন হত্যাকারীর হত্যা প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক এই মর্মে রায় দিলেন যে, তারশাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তিনি রায়ে এ কথা উল্লেখ করেননি যে, হত্যাকারী মিরাস থেকে বঞ্চিত হবে। এমতাবস্থায়ও হত্যাকারী মীরাস থেকে বঞ্চিত হবে। কারণ এটা মূল শাস্তির অনুগামী শাস্তি।

৪। পরিপূরক শাস্তি (العقوبات التكميلية): বিচারক কোন অপরাধীর জন্য নির্ধারিত মূল শাস্তির পরিপূরক হিসেবে যে শাস্তির নির্দেশ দেন, তাহলো পরিপূরক শাস্তি। যেমন, বিচারক কোন চোরের চুরি সাব্যস্ত হওয়ায় তার হাত কর্তনের রায়ের সাথে আরো নির্দেশ দিলেন যে, হাত কর্তনের পর তা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত গলায় ঝুলিয়ে রাখতে হবে। গলায় ঝুলিয়ে রাখা কাজটি মূল শাস্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। মূল শাস্তি বাস্তবায়নের পূর্বে এককভাবে এটি করার সুযোগ নেই।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার: শাস্তির পরিমাণ বিবেচনায় প্রকারভেদ। অর্থাৎ বিচারকের শাস্তির পরিমাণ নিধার্রণ করার এখতিয়ার থাকা না থাকার দিক থেকে শাস্তি দু'ধরনের।[২০৪] যথা- নির্ধারিত ও অনির্ধারিত শাস্তি।

১। নির্ধারিত শাস্তি (عقوبات مقدرة): নির্ধারিত শাস্তির ধরন ও পরিমাণ শরী'আহ প্রণেতা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর তিনি বিচারককে তাতে কম-বেশি করা ছাড়াই প্রয়োগের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন, যার কোন বিকল্প বিধান করার সুযোগ নেই। এক কথায় যাতে বিচারকের কম বা বেশি করার কোন এখতিয়ার নেই এবং যা ক্ষমা করার অধিকার রাষ্ট্রপ্রধানকেও দেওয়া হয়নি। যেমন ব্যভিচারের শাস্তিতে 'হদ' হিসাবে নির্ধারিত বেত্রাঘাত।

২। অনির্ধারিত শাস্তি (عقوبات غير مقدرة): এমন শাস্তি যার ন্যূনতম ও সর্বোচ্চ দু'টি সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিচারককে সে ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে যে, তিনি অবস্থার প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ শাস্তির যে কোন একটি কিংবা তার মাঝামাঝি কোন শাস্তির রায় ঘোষণা করতে পারবেন। যেমন, জেল, জরিমানা, তা'যীর হিসাবে বেত্রাঘাত ইত্যাদি।

(গ) তৃতীয় প্রকার: শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনায় প্রকারভেদ। অপরাধীর যে স্থানে শাস্তি প্রয়োগ করা হয় বা পতিত হয় তা বিবেচনায় শাস্তি তিন প্রকার।[২০৫] যেমন-শারীরিক শাস্তি, মানসিক শাস্তি ও আর্থিক শাস্তি

১। শারীরিক শাস্তি (عقوبات بدنية): এমন শাস্তি যা অপরাধীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, মৃত্যুদণ্ড, বেত্রাঘাত ও জেল ইত্যাদি।

২০৪. ড. আব্দুল করীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮; *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

২০৫. *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান* (সম্পাদিত), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

২। মানসিক শাস্তি (عقوبات نفسية): এমন শাস্তি যা মানুষের অন্তরে পীড়া ও যাতনা সৃষ্টি করে বা দাগ কাটে, শরীরের উপর বর্তায় না। যেমন, উপদেশ, ধমক, তিরস্কার বা ভর্ৎসনা, ভীতি প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

৩। অর্থনৈতিক শাস্তি (عقوبات مالية): এমন শাস্তি যা অপরাধীর অর্থ-সম্পদের উপর আরোপ করা হয়, ফলে সে কষ্ট পায়। যেমন, দিয়াত, জরিমানা ইত্যাদি।

(ঘ) চতুর্থ প্রকার: শাস্তির ধরন বিবেচনায় প্রকারভেদ

ইসলামি আইনে দু'ধরনের বৈষয়িক শাস্তি দেখা যায়। একটি হচ্ছে সেই সুনির্দিষ্ট অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তি, যার প্রতিক্রিয়া সমাজ-সমষ্টির ক্ষেত্রে কঠিন ও মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। যেমন হুদুদ, কিসাস ও দিয়াত। এটি আবার দু'ধরনের (১) হদ্দ, যেসব অপরাধের শাস্তি আল্লাহর পক্ষ হতে পূর্ব নির্ধারিত, যা ক্ষামা করা যায় না। যেমন, ব্যভিচার, চুরি ইত্যাদি। (২) যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হলেও যেখানে দিয়াত ও ক্ষমা করার সুযোগ থাকে। যেমন হত্যা ও যখম ইত্যাদি। আর **দ্বিতীয়টি** হচ্ছে, তা'যীর অপরাধের জন্য প্রবর্তিত। যা নির্ধারণ করার দায়িত্ব শরী'আতদাতাই অর্পন করেছেন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কাযী, বিচারক বা রাষ্ট্রের উপর। যেন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরিবেশের প্রেক্ষিতে অপরাধের ভয়াবহতা মূল্যায়ন করে নির্ধারণ করা যায়। যেমন সুদ খাওয়া, ধোঁকা ও প্রতারণা করা ইত্যাদি। অপরাধের ক্ষেত্রে এই শ্রেণিই অধিক ও সাধারণ। শরীয়তের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন বহু অপরাধও এর আওতায় পড়ে। এই পর্যায়ের শাস্তিকে তা'যীর নাম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, ইসলামি আইনে শাস্তি তিন (৩) প্রকার।[২০৬]

১। হদ্দ (الحد)

২। কিসাস ও দিয়াত (قصاص , الديات) এবং

৩। তা'যীর (التعزير)

১। হদ্দ (الحد)

হদ্দ (الحد) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ বাধা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, প্রতিরোধ করা ও বিরত রাখা (المنع)।[২০৭] এ জন্যে দারোয়ানকে হাদ্দাদ বলা হয়। কারণ সে আগন্তুককে ঘরের ভিতরে অবাধে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখে। শাস্তিকে হদ্দ বলার কারণ হচ্ছে, শাস্তি মানুষকে বিভিন্ন প্রকার অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।[২০৮] ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় অপরাধের যে সব শাস্তি শরী'আহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেসব শাস্তিকে হদ্দ বলা হয়। এ শাস্তি ধার্য করা আল্লাহর হক বা অধিকার (الحد عقوبة مقدرة من قبل الشرع واجبة حقا لله تعالى)।[২০৯]

২০৬.গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬০

২০৭.ড. আব্দুল করীম যায়দান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০; গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, খ.১, পৃ. ২৬১

২০৮. *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

বাদাই'উস সানাই প্রণেতা ইমাম আলাউদ্দিন আবূ বকর আল-কাসানী বলেন, "হদ্দ হলে নির্ধারিত শাস্তি, এ শাস্তি ধার্য করা আল্লাহর হক বা অধিকার (الحد عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى عز شانه)।"[২১০] কারণ জনগণের কল্যাণ ও দুর্ভোগ প্রতিহত করার লক্ষ্যে আল্লাহ এ শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং যেসব অপরাধের ক্ষতি ও বিপর্যয় জনগণের উপর বর্তায় এবং অপরাধীর শাস্তির উপকার জনগণ ভোগ করে সেসব শাস্তি আল্লাহর হক হিসেবে বিবেচিত। জনগণের হককেই বলা হয় আল্লাহর হক। এ শাস্তির সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হওয়ায় এর গুরুত্ব যেমন অধিক, তেমন একে রহিত করার ক্ষমতা কারো নেই। এই পরিভাষা অনুযায়ী কিসাস হদ্দের আওতায় আসে না। কারণ কিসাস কুরআন দ্বারা নির্ধারিত হলেও ইহা মানুষের অধিকারের আওতাভুক্ত বিধায় হদ্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ কিসাসের মধ্যে বান্দার হক থাকে প্রবল।

হদ্দ এজন্য কার্যকর করা হয় যে, মানুষ শাস্তির কথা বিবেচনা করে অপরাধকর্ম হতে বিরত থাকবে। সমাজের সার্বিক নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করে যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো আল্লাহর অধিকার হিসেবে গণ্য হয়। হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধের দ্বারা সামগ্রিকভাবে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শাস্তি কার্যকর করলে সমাজ উপকৃত হয়। এজন্য হদ্দকে আল্লাহর অধিকার বলা হয়েছে।[২১১] যেসব অপরাধের শাস্তি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত কেবল সেগুলোই হদ্দের আওতাভুক্ত হবে। নিম্নোক্ত অপরাধকর্মসমূহ হদ্দের আওতাভুক্ত-

(ক) যিনা বা ব্যভিচার;

(খ) চুরি;

(গ) ডাকাতি (রাহাজানী);

(ঘ) মদ্যপান;

(ঙ) ব্যভিচারের অপবাদ

(চ) বিদ্রোহ ও

(ছ) ধর্ম ত্যাগ।

যেমন যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি হলো বেত্রাঘাত, নির্বাসন ও রজম। পবিত্র কুরআনে ব্যভিচারের নির্ধারিত শাস্তি উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ অর্থ: "ব্যভিচারী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে।"[২১২] আল্লাহর রাসূল (সা.) নির্বাসন দেওয়া প্রসঙ্গে

২০৯. আবুল হাসান আলী আল-মাওয়ার্দী, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ওয়াল-ওয়ালাত* (বৈরুত: দারুল কুতু আল ইসলামিয়্যাহ, তাবি.), পৃ. ২১২

২১০. ইমাম আলাউদ্দিন আবূ বকর ইবন মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী, *বাদাইউস সানাঈ* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইসলামিয়্যা, ১৪০৬হি.), খ. ৭, পৃ. ৩৩; ওয়াহাব যুহাইলী, *আল-ফিকহুল ইসলামি ওয়া আদিল্লাতুহু* (দামেস্ক: দারুল ফিকর, ২০০৯), খ. ৬, পৃ. ১২

২১১. ড. আব্দুল আযীয 'আমির, *আত-তা'যীরু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ* (আল-কাহেরা: দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৪২৮ হি.), পৃ. ১৭-১৮

২১২. আল-কুরআন, ২৪: ২

বলেন, "অবিবাহিত নারী পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার হলে তার শাস্তি একশত বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন।"[২১৩] আর রজম অর্থ ব্যভিচারীকে প্রস্তর বা অনুরূপ বস্তু নিক্ষেপে হত্যা করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) মা'যিয় ইবন মালিক আসলামীকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলন। এভাবে অন্যান্য হদ্দের আওতাভুক্ত অপরাধের শাস্তিও পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাতে বিধৃত হয়েছে।

২। কিসাস ও দিয়াত (الديات , قصاص)

আরবি قص শব্দ (অর্থ কর্তন করা) হতে কিসাস (قصاص) পরিভাষা গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ (المماثلة بين العقوبة والجناية) অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বা সাদৃশ্য বিধান করা।[২১৪] হত্যা, যখম ও অঙ্গচ্ছেদ -এ অপরাধগুলো কেউ ইচ্ছাকৃত ও পরিকল্পিতভাবে ঘটালে তার শাস্তি হয় কিসাস (অপরাধী যা করেছে তাই করে তাকে শাস্তি দেওয়া)। আবূল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মানযুর বলেন, القصاص هو ان يفعلَ به مثل فعلِهِ من قَتلٍ او قَطعٍ او ضربٍ او جرحٍ অর্থাৎ-কোন ব্যক্তিকে হত্যা বা আহত করার দায়ে হত্যাকারীকে বা আহতকারীকে অনুরূপভাবে হত্যা বা আহত করাকে কিসাস বলা হয়।"[২১৫]

অপরাধী কোন ব্যক্তির যে পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি সাধন করেছে তারও সে পরিমাণ ক্ষতি সাধনই হচ্ছে কিসাস। অপরাধী কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলে শাস্তিস্বরূপ সেও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হবে এবং যখম করলে শাস্তিস্বরূপ তাকেও অনুরূপ যখম করা হবে, এটাই কিসাস। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ- অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর হত্যার ব্যাপারে কিসাসের হুকুম ফরয করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস এবং নারীর বদলে নারী। তবে তার উত্তরাধিকারীর পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হলে ন্যায়সঙ্গত হুকুম অনুসরণ করতে হবে এবং ইহসানের সাথে রক্তঋণ আদায় করতে হবে। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটা হল সহজতর বিধান এবং বিশেষ দয়া। এরপরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি।"[২১৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ

২১৩. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল হুদুদ, বাবঃ হাদ্দুয-যিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৯০; আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুল হুদুদ, বাবঃ হাদ্দুয-যিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৫০

২১৪. ড. মুহাম্মদ রাওস কালতা'জী (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৬৪

২১৫. ইমাম আবূল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন মানযুর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৫২

২১৬. আল-কুরআন, ২: ১৭৮

–بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ: "আমি তাদের জন্য তাওরাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে সমান যখম। এরপর কেউ যদি তা ক্ষমা করে তাহলে ক্ষমাকারীর পাপ মোচন হবে। অল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই যালিম।"[২১৭] কিসাস সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي أَلَا وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ–

অর্থ: আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর খুযা'আ গোত্রের লোকেরা স্বগোত্রীয় নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ হিসেবে বনী লায়স গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়ালেন এবং বললেন, আল্লাহ মক্কা থেকে হস্তী দলকে প্রতিহত করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে আপন রাসূল ও মুমিনদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জেনে রেখো! আমার পূর্বে মক্কা কারো জন্য হালাল করা হয়নি, আর আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। জেনে রেখো! আমার বেলায় তা দিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। সাবধান! তা আমার এ সময়ে এমন সম্মানিত, তার কাঁটা উপড়ানো যাবে না, তার গাছ কাটা যাবে না, তাতে পড়ে থাকা বস্তু মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া তুলে নেওয়া যাবে না। আর যার কাউকে হত্যা করা হয়, যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হলো, তার পরিবার-পরিজন দু'প্রকার বিধানের যে কোন একটি গ্রহণ করতে পারে। হয়তো দিয়াত বা রক্তপণ গ্রহণ করবে কিংবা তার কিসাস গ্রহণ করা হবে। এ সময় ইয়ামানবাসী এক লোক দাঁড়ালো, যাকে আবূ শাহ বলা হয়। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা আবূ শাহকে লিখে দাও।"[২১৮]

ইসলামি শরী'আতে মানব সমাজের জন্য কিসাস বিধিবদ্ধ করার তাৎপর্যপূর্ণ যৌক্তিকতা রয়েছে। কিসাস সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ একটি বিধান। এতে হত্যার পরিবর্তে হত্যা এবং আঘাতের পরিবর্তে সমপরিমাণ আঘাত দেওয়ার

২১৭. আল-কুরআন, ৫: ৪৫

২১৮. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুদ-দিয়াত, বাব: মান কুতিলা লাহু কাতিলু ফাহুয়া বিখাইরিন-নাজারাইন, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬৮৮০; আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুদ-দিয়াত, বাব: ওয়াল আমদে ইয়ারদা বিদ-দিয়াত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৫০৫

অধিকার বিচারককে প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজে অধিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব। কারণ, পাশবিক শক্তি দ্বারা তাড়িত হয়ে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলের জন্য কাউকে খুন করলে কিংবা আহত করলে তার উপর কিছুটা দেরীতে হলেও সমপরিমাণ শাস্তি আরোপিত হবে, এ মর্মে জানতে পারলে, তখন সে আর হত্যা বা আহত করার পথে পা বাড়াবে না। যদি কিসাসের বিধান না থাকত, তবে অপরাধী আরো বেপরোয়া হয়ে ব্যাপকভাবে অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ত। কিসাসের বিধানের ফলে সমাজে হত্যা, খুন, আহত করার মত ঘটনা হ্রাস পায়। এধরনের বিচারের ফলে কিছু হত্যাকারীর প্রাণ সংহার হলেও এর মাধ্যমে নিরীহ ও সাধারণ মানুষের জীবন বেঁচে যাচ্ছে। তাই কিসাসকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছুটা কঠোর মনে হলেও প্রকৃত অর্থে এবং ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে অত্যন্ত উপযোগী ও সমাজের কল্যাণকর একটি বিচার। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও মত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে।[২১৯]

অপরদিকে দিয়াত (الديات) আরবি শব্দ। (الديات) শব্দটি বহুবচন এর একবচন হলো (الدية), এর আভিধানিক অর্থ হলো, রক্তমূল্য, হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ।[২২০] নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ এবং আহত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে রক্তপণ (দিয়াত) গ্রহণ করে অথবা রক্তপণ ব্যতীতই অপরাধীকে ক্ষমা করে দিতে পারে। এটাকেই দিয়াত বলা হয়। পরিভাষায় দিয়াত হলো, "মানুষের জীবন বা জীবনের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের জন্য আর্থিক দণ্ড (الدية في الشرع اسم للمال الذى هو بدل للنفس-)।"[২২১] ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায়, মানুষ হত্যার ক্ষেত্রে আদালতের মাধ্যমে শরী'আহ মোতাবেক পক্ষবৃন্দের আপোস রফার ভিত্তিতে যে অর্থ প্রদান করা হয় তাকে 'দিয়াত' বলা হয়।[২২২] নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ আদালতের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে হত্যাকারীর সঙ্গে আপোস রক্ষা করতে পারে। আপোস রক্ষার এই অর্থই দিয়াত হিসেবে গণ্য। পবিত্র কুরআন মজীদে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি উল্লেখের পরপরই দিয়াত সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ–অর্থ: "তবে তার উত্তরাধিকারীর পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা করা হলে ন্যায়সঙ্গত হুকুম অনুসরণ করতে হবে এবং ইহসানের সাথে রক্তঋণ আদায় করতে হবে। তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এটা হল সহজতর বিধান এবং বিশেষ দয়া।"[২২৩] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا– অর্থ: "কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়। তবে ভুলক্রমে হত্যা করা হলে তার কথা আলাদা। যে মুমিন কোন মুমিনকে ভুলক্রমে হত্যা

---

২১৯. *বাংলাদেশ দণ্ডবিধি*, ধারা: ৩০২

২২০.ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫খ্রি.), পৃ. ৪৮১

২২১. আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান আল-হাসকাফী, *আদ-দুররুল মুখতার* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি.), খ. ৫, পৃ. ৪০৬

২২২.গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৫

২২৩.আল-কুরআন, ২: ১৭৮

করে সে মুমিন একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে এবং হত্যাকৃতের স্বজনরা যদি ক্ষমা না করে তাহলে তাদেরকে রক্তপণ প্রদান করবে।”[২২৪] অপরদিকে মানবদেহের কোন অঙ্গের ক্ষতি সাধনের কারণে যে অর্থ প্রদান বা ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক হয় তাকে আল-আরশ বলে। যেসব ক্ষেত্রে ‘দিয়াত’ আরোপ করা সম্ভব হয় না, সেসব ক্ষেত্রে ‘আরশ’ কার্যকর হয়।

৩। তা'যীর (التعزير)

তা'যীর শব্দের অর্থ প্রতিরোধ, ভর্ৎসনা, নিন্দা, তিরস্কার ইত্যাদি। এই শাস্তি অপরাধীকে পুর্নবার অপরাধকর্মে লিপ্ত হতে বাধাদানকারী প্রতিরোধস্বরূপ। শরী‘আতে যেসব অপরাধের শাস্তি পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়নি সেসব অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তিকে তা'যীর বলে।[২২৫] অর্থাৎ কোন ব্যক্তি হদ্দের আওতাবর্হিভূত কোন অপরাধকর্মে লিপ্ত হলে, তা আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘন হউক, যেমন, নামাজ ত্যাগ করা, রোযা না রাখা, অথবা বান্দার অধিকারে হস্তক্ষেপ হোক যেমন, কাউকে মদখোর, চোর, যেনাকারী, কাফির ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া, তাকে যে শাস্তি ভোগ করতে হয় এটাই তা'যীর।[২২৬]

ইসলামি শরী‘আতের পরিভাষায়, “যেসব অপরাধের জন্য হদ্দ নির্ধারণ করা হয়নি, সেসব অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তিকে তা'যীর বলে।[২২৭] আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তা'যীরের সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, (التعزيرُ مشروعٌ فى كل معصية ليس فيها حدٌ يحسب الجناية فى العظام والصغر و حسب الجانى فى الشر وعدمه) “যে অপাধের বা গুনাহের কাজে অপরাধের বড়ত্ব বা ছোটত্বের অনুপাতে এবং অন্যায়ে অপরাধীর ভূমিকার দৃষ্টিতে কোন হদ্দ নির্দিষ্ট হয়নি, সেসব ক্ষেত্রেই তা'যীর বিধিবদ্ধ।” তিনি আরো বলেন, التعزير يتغيرُ بحسب اقتضاً المصلحة له زماناً و مكانا و حالاً– অর্থাৎ “স্থান-কাল-অবস্থার দৃষ্টিতে কল্যাণের দাবি অনুপাতে তা'যীর পরিবর্তিত হয়ে থাকে।”[২২৮]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়া তা'যীরি পর্যায়ের অপরাধের কয়েক শ্রেণির উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, যে সমস্ত অপরাধের হদ্দ নেই সেগুলোরও শাস্তি রয়েছে, তার কোন বিকল্প নেই। আমানতের খেয়ানত, ধোঁকা-প্রতারণা, ওযনে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া, ঘুষ-রিশওয়াত ইত্যাদি এই পর্যায়ের অপরাধের মধ্যে গণ্য।[২২৯]

---

২২৪. আল-কুরআন, ৪: ৯২

২২৫.কাযী আবূ ইয়ালী মুহাম্মদ ইবন হাসান আল-ফারাহ, *আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২১ হি.), পৃ. ২০৫

২২৬.ইমাম আলাউদ্দিন আবূ বকর ইবন মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৬৩

২২৭. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, খ, ১, পৃ. ২৬৫; *আহকামুস সুলতানিয়া*, পৃ. ২০৫

২২৮.মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২২৯.*প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

তা'যীর বিশেষ কোন শাস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নবী করিম (সা.) স্থানীয়ভাবে সামাজিক বয়কট বা সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারাও তা'যীর করেছেন। সূরা তওবায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা তিনজন সাহাবীর প্রতি এই শাস্তিই প্রয়োগ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে,

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ– অর্থ: "তিনজনকেও ক্ষমা করলেন, যতক্ষণ না পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল, তাদের জীবনযাপন অসহ্য হয়ে উঠল এবং তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন ছাড়া আশ্রয় লাভের কোন উপায় নেই। এরপর তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন যেন তারা তওবা করতে পারে। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবূলকারী, অসীম করুণাময়।"[২৩০]

নির্বাসন ও জেল উভয় দণ্ডও তা'যীর হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর সাহাবীগণ আগুন জ্বালানো ও বিপর্যয় সৃষ্টির সরঞ্জামাদি বিনষ্ট করার শাস্তিও দিয়েছেন এই তা'যীর হিসেবেই এবং হযরত উমর (রা.) তা'যীর হিসেবেই জরিমানা বাবদ মাল গ্রহণ করেছিলেন। অতএব দেখা যাচ্ছে, তা'যীর শাস্তি হিসেবে উপদেশ-নসিহত, মৃদু তিরস্কার, কঠোর ভর্ৎসনা, আর্থিক দণ্ড এবং কারারুদ্ধকরণ প্রভৃতি প্রয়োগ ও কার্যকর করা হয়েছিল। দোররা মারা এবং হত্যা করাও তা'যীরি শাস্তি হতে পারে। একই ব্যক্তির পৌনপুনিক অপরাধের দরুন তা'যীর হিসেবে তাকে হত্যা করাও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের জন্য জায়েয। নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম, বালেগ-নাবালেগ নির্বিশেষে যে কোন বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন অপরাধীর উপর তা'যীর কার্যকর হবে। অবশ্য নাবালেগের শাস্তি শাস্তি হিসেবে গণ্য না হয়ে তা প্রশিক্ষণ বা তাদীব হিসেবে গণ্য হবে। তাকে ভদ্র, সভ্য, অধ্যবসায়ী, কর্মঠ, নিয়মানুবর্তী ও ধর্মানুরাগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার উপর তা'যীর তাদীব হিসেবে কার্যকর হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ইসলামি শরী'আহ অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে কেবল বিশেষ বিশেষ অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে হদ্দ বা শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর সেগুলো ছাড়া অন্যান্য সব অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি নির্ধারণের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও বিচারকের উপর অর্পণ করা হয়েছে। আর তা অপরাধের ধরন অনুসারে সামান্য মাত্রাও নির্ধারণ হতে পারে, হতে পারে উচ্চ মাত্রাও।

২৩০.আল-কুরআন, ৯:১১৮

ইসলামে শাস্তি বিধানের মূলনীতি

শাস্তির মূল উদ্দেশ্য হলো অপরাধী ব্যক্তিকে সংশোধন করা, সমাজের অন্যান্য মানুষকে অপরাধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশনা দান করা, সাধারণ জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার বিধান করা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। তাই এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ইসলাম অপরাধীর শাস্তি বিধানে কতগুলো মূলনীতি অনুসরণের প্রতি নির্দেশ করেছে। নিম্নে এসকল মূলনীতির কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো-

১। অন্যায় ও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সাধারণ মানুষকে তা থেকে বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে। এরপরও যদি অপরাধ সংঘটিত হয়, তবে অপরাধীকে এমনভাবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যাতে সে ভবিষ্যতে আর কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে না পারে। আর অন্যান্য সাধারণ মানুষকে অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তোলে।

২। জনগণের কল্যাণ ও প্রয়োজনেই শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। তাই শাস্তি কঠিন করলেও যদি জনগণের অধিক কল্যাণ হয় তবে অপরাধীকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। আর যদি শাস্তি সহজ ও হালকা করলেও জনগণের কল্যাণ ও মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করতে অসুবিধা না হয়, তবে তা সহজ ও হালকা করা যেতে পারে।[২৩১]

৩। অপরাধীর অপরাধের মাত্রা যদি এতটা বেড়ে যায় যে, তাকে সমাজ থেকে সরিয়ে না দিলে কিংবা দূরে না রাখলে সমাজের মানুষের শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব নয়, তবে শান্তি রক্ষার্থে তাকে বিচারের মাধ্যমে হত্যা করা কিংবা আমৃত্যু জেলে রাখা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।[২৩২]

৪। যেসব শাস্তি ব্যক্তিকে সংশোধন করার জন্য এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য প্রদান করা হয়, তা সবই শরী'আত সম্মত। অতএব শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত ও নির্ধারিত শাস্তিকে শাস্তি মনে করার কোন কারণ নেই। এর বাইরেও শাস্তি হতে পারে।[২৩৩]

৫। অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার অর্থ তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা নয়। শাস্তি দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকে সংশোধন করা। সে যেন পুনরায় অপরাধে লিপ্ত না হয়, সে জন্য ব্যবস্থা নেওয়া। একজন পিতা যেমন তার সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানোর জন্য শাস্তি দেন কিংবা একজন ডাক্তার রোগীকে আরোগ্য করার উদ্দেশ্যে কষ্ট দেন, তেমনি একজন বিচারক অপরাধীকে সংশোধনের উদ্দেশ্যেই শাস্তির নির্দেশ করবেন।[২৩৪] তাই যে বিচারক অপরাধীকে শাস্তির নির্দেশ দিবেন তার উচিত তাদের প্রতি ইহসান ও দয়া করা। সংশোধনের অবকাশ রেখে শাস্তির নির্দেশ দেওয়া।

---

২৩১. আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬

২৩২. ইবনু আবেদীন, *হাশিয়াতু ইবন আবেদীন* (বৈরুত: মাতআবা মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, ১৯৯৫খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৪৮০

২৩৩. ইবনু আবেদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৪৮০

২৩৪. শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দিন আহমদ ইবন আব্দুল হালীম ইবন তায়মিয়া, *আল-ইখবার আল-ইলমিয়্যাহ মিনাল ইখতিয়ারাতিল ফিকহিয়্যাহ*, কিতাবুল জিনায়াত (বৈরুত: দারুল 'আসিমাত, ১৩৬৯হি.), পৃ. ৪১৬

৬। ইসলামি শরী'আতের দৃষ্টিতে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাধীকে পূর্ণবয়স্ক ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। কেননা সুস্থ-বিবেক-বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সুস্থ অনুভূতি সম্পন্ন নয়। তার ইচ্ছা-ক্ষমতা আছে বলেও মনে করা যায় না। নাবালেক ব্যক্তিও তারই মত। কেননা পূর্ণবয়স্কতা সেই বিবেক-বুদ্ধির ধারক, যা শরী'আহ পালনে বাধ্য হওয়ার জন্য জরুরী। আল্লাহ নিজেই বলেন,

واذا بلغ الاطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُم فلْيسْتاْذِنُوْا كما اسْتاْذن الَّذِيْن مِنْ قبْلِهِمْ ط كذلِك يُبِينُ اللهُ لكُمْ اياتِهِ واللهُ علِيْم حكِيْم–

অর্থ: "আর তোমাদের সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বড়রা। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[২৩৫] এই আয়াত থেকে দেখা যায় যে, ইসলামি শরী'আতের অন্যতম মূলনীতি পর্দার বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ সন্তানরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত রুখসাত দিয়েছেন। প্রাপ্তবয়স্ক হলেই তাকে অনুমতি প্রার্থনা করে গৃহে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বুঝা যায় যে, অপরাধের ক্ষেত্রেও অপরাধ বিবেচনার জন্য তাকে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে, অন্যথায় নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) শরী'আতের বিধান আরোপের ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াকে অন্যতম শর্ত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।"[২৩৬]

আল্লামা আমদী বলেন, "বিবেকবান লোকেরা সম্পূর্ণ একমত যে, শরীয়ত পালনে বাধ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, তাকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে, শরীয়ত পালনের দায়িত্ব অনুভবকারী হতে হবে। সচেতন বালক হয়ত তা বুঝে যা বুঝে অ-সচেতন বালক কিন্তু তার বোধশক্তি সংকীর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ। শরী'আহদাতা পূর্ণবয়স্কতাকে তার বুঝ-সমঝে পূর্ণত্বের মানদণ্ড বানিয়েছেন।"[২৩৭] তাই বালক বা কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে শরী'আতের আইন অনুযায়ী শাস্তি বাস্তবায়নে ইসলাম তাকে রুখসত দিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামি শরী'আতে অপরাধের দায়িত্বশীলতা দু'টি ভিত্তির উপর স্থাপিত- **প্রথম,** অপরধের শাস্তি একটা সামষ্টিক প্রয়োজন, সমাজ সংরক্ষণের লক্ষ্যেই তা ফরয করা হয়েছে এবং **দ্বিতীয়**, বস্তুগত শাস্তিগ্রহণের উপযুক্ত বিবেচিত হবে কেবল সে ব্যক্তি, যার অনুভূতি আছে, যে ইচ্ছা প্রয়োগে সক্ষম। এজন্যই শরী'আতে অপরাধের দায়িত্ব চাপানোর ক্ষেত্র হচ্ছে সেই সুস্থ মানুষ, যার অনুভূতি ও ইচ্ছা-ক্ষমতা রয়েছে।

২৩৫.আল-কুরআন, ২৪: ৫৯

২৩৬. বি.দ্রঃ আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল হুদুদ, বাবু ফীল মাজনুনি ইয়ুসরিকা আও ইউসিবু হদ্দান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৩৯৮, ৪৪০১, ৪৪০২, ৪৪০৩; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা তিরমীযী, *জামে' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল হুদুদ, বাবু মা যায়া ফীমান লা ইয়াজেবু আলাইহিল হাদ্দু, রিয়াদঃ মাকতাবাতল মা'আরিফ, ১৪১৭ হি, হাদীস নং ১৪২৩; আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুত ত্বালাক, বাবু ত্বালাকু মু'তাওহি ওয়াছচাগিরি ওয়ান নায়িমি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২০৪১, ২০৪২; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, মসনাদু আলি ইবন্ আবি তালিব রা. (লাহোরঃ মাকতাবাতে রাহমানিয়া, ২০০৪), খ. ২, হাদীস নং- ৯৪০, ৯৫৬, ১১৮৩, ১৩২৮, ১৩৬২; ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আদ-দারেমী, *মুসনাদু আদ-দারেমি*, কিতাবুল হুদুদ, বাবঃ রুফিয়াল কালামু আনিস-সালাসাতি (রিয়াদঃ দারুল মাগনি, ১৪২০ হি.), খ. ৩, হাদীস নং- ২৩৪২

২৩৭. আল্লামা ইমাম আলী ইবন মোহাম্মদ আমদী, *আহকাম ফি উসূলিল আহকাম* (রিয়াদঃ দারুস সামি'ঈ, ১৪২৪ হি. ২০০৩খ্রি.), খ. ২, পৃ. ২১৫; মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

ইসলামে শাস্তিদানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

আল্লাহ তা'আলা অপরাধপ্রবণতা, হীনতা-নীচতা ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধ, সমাজকে সকল প্রকার বিপর্যয় গুনাহ-নাফরমানী থেকে রক্ষা এবং মানুষের মৌলিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অপরাধের শাস্তিদানের চূড়ান্ত বিধান করেছেন। আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ সর্ব কালের সকল শরীয়াতে যে পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণে সম্পূর্ণ একমত, ইসলামি শরী'আতের লক্ষ্যও সে পাঁচটি জিনিসের সংরক্ষণ ও নিরপত্তা বিধান। সে পাঁচটি বিষয় হচ্ছে- দীন, বংশ সংরক্ষণ, বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণ, ধন-মাল সংরক্ষণ ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষণ। এই পাঁচটি মানুষের মৌলিক প্রয়োজনরূপেও চিহ্নিত। কেননা এই কয়টি বিষয় যাতে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকে, এর কোন একটি ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন না হয়, যে তার সীমালঙ্ঘন করতে উদ্যত হবে বা স্পর্শ করবে, কাউকে একবিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত করবে তাকে অবশ্যই শাস্তি দিতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে আর এমন কাজ না করে। আল্লাহ তা'আলা এই পর্যায়ে অপরাধের শাস্তির বিধান করেছেন প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসেবে। যিনার হদ্দ করা হয়েছে মানুষের বংশ বিকৃত বা বিনষ্ট করার পদক্ষেপ থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে, চুরি ও ডাকাতি অপরাধের শাস্তি বিধান করা হয়েছে জনগণের জান-মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে। মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জত আবরু সংরক্ষণের জন্য কযফের হদ্দ ঘোষিত হয়েছে এবং মানুষের বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা রক্ষার লক্ষ্যে মদ্যপান অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে ইমাম গাযালীর ভাষ্য হলো, কল্যাণ আহরণ ও ক্ষতির প্রতিরোধই গোটা সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য। সৃষ্টিকর্মের কল্যাণ নিহিত রয়েছে তার উদ্দেশ্য পরিপূরণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কিন্তু আমরা কল্যাণ বলতে বুঝি শরী'আতের উদ্দেশ্য সংরক্ষণ। আর সৃষ্টিকর্মে শরী'আতের লক্ষ্য হচ্ছে পাঁচটি: মানুষের দীন রক্ষা, তাদের জান-প্রাণ রক্ষা, তাদের বিবেক-বুদ্ধি রক্ষা, তাদের বংশ ও ধন-মাল রক্ষা। অতএব এ পাঁচটি বিষয়ের সংরক্ষণে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তাই হচ্ছে প্রকৃত কল্যাণ। আর এই পাঁচটি মৌল জিনিস যে কারণেই বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাই হচ্ছে বিপর্যয়কারী। এ বিপর্যয় রোধ করা কল্যাণের জন্য অপরিহার্য।[২৩৮]

শাস্তি সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে- বিদ্রোহী মন-মানসিকতায় যে বিদ্রোহ প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে তা সংশ্লিষ্ট অপরাধের শাস্তিটা দেখে যেন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করে। ইরেজি পরিভাষায় এই শাস্তিকে Ratterent বলা হয়। ইতিহাস সাক্ষী যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দৃষ্টান্তমূলক বা শিক্ষা কিংবা উপদেশমূলক শাস্তিসমূহ চিরদিন অপরাধের সংখ্যাহ্রাস করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যখনই কঠিন শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে, সমাজে অপরাধের সংখ্যা দ্রুততার সহিত শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। আবার যখনই শাস্তির কঠোরতার মাত্রা কম করা হয়েছে, অপরাধের সংখ্যা তখনই হু-হু করে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকে এ মূলনীতি পাওয়া যায় যে, শাস্তির কঠোরতা-নমনীয়তার সহিত অপরাধের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। এই মৌলনীতিটি সর্বাবস্থায়

---

২৩৮. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

এবং সকল দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই অনুধাবনীয়। এজন্যই ইসলাম শাস্তি দানের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে উৎসাহিত করে, যেন তা থেকে সমাজ শিক্ষা নিতে পারে। যেমন যিনার শাস্তি, অপবাদের শাস্তি প্রদানের সময় একটি দল উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছে, কারণ এ থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে অপরাধ থেকে বিরত থাকবে।

ইসলামে অপরাধ প্রতিরোধ কৌশল

সমাজে কিশোর-কিশোরীরা যাতে অপরাধের সংস্পর্শে আসতে না পারে সে জন্য ইসলাম পূর্ব সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রতি জোর দিয়েছে। সামষ্টিকভাবে অপরাধের মুকাবিলা করা, অপরাধীর মন-মানসিকতার পরিশুদ্ধি বিধান এবং তা থেকে অপরাধপ্রবণতার মূলৎপাটন ইসলামি শরী'আতের অন্যতম লক্ষ্য। এলক্ষ্য অর্জনে ইসলাম অপরাধীর মনস্তাত্তিক সংশোধন, অপরাধ সংঘটনের পূর্বে অপরাধ প্রতিরোধ, মানুষকে ইবাদাতে অভ্যস্তকরণ, ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিস্তার এবং সর্বশেষ কৃত অপরাধের জন্য শরী'আহ নির্দেশিত শাস্তি বাস্তবায়ন করে অপরাধ প্রতিরোধ কৌশল গ্রহণ করেছে। নিম্নে সংক্ষেপে এ সম্পর্কে বর্ণনা উপস্থাপন করা হল-

(ক) অপরাধীর সংশোধন

ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই নৈতিক শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যম্যে তার মুকাবিলা করার পক্ষপাতী এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যেই ইসলাম সর্বাগ্রে ব্যক্তিকে শরী'আহ পালনে অভ্যস্ত করতে চায়। ব্যক্তি পর্যায়ে নৈকিত চরিত্র উত্তম হলে বা উত্তম বানানো সম্ভবপর হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অধিকতর অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। যেমন ব্যক্তি জীবনে ভদ্রতা ও নম্রতার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, – عن عائشة ، أن النبي ﷺ قال إنَّ الرفقَ لايَكُونُ في شيءٍ إلا زَانَهُ ، ولايُنزَعُ من شيءٍ إلا شَانَهُ অর্থ: উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে বস্তুর মধ্যে নম্রতা থাকে তা সৌন্দর্যময় ও শোভনীয় হয়। আর যখন এ নম্রতার বৈশিষ্ট্য বিলোপ হয় তখন সে বস্তুটি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে।"[২৩৯] عن عائشة ، أنَّ

الرسُولَ اللهِ ﷺ قال يا عائِشةُ إنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِفقَ ويُعطِي على الرِفقِ ما لا يُعطِي عَلى العُنفِ وما لا يُعطِي عَلى ما سِوَاهُ –

অর্থ: উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, " হে আয়েশা! আল্লাহ নম্রতার বৈশিষ্ট্যে মহিয়ান এবং নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারকে পছন্দ করেন। আর নম্রতার উপর যেরূপ দান করেন কঠোরতা বা

২৩৯.ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল বিররু ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব, বা: ফাদলুর রিফক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৯৪; আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল জিহাদ, বাব: মায়া ফিল হিজরাতি ওয়া সুকনাল বাদও, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪৭৮; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, মসনদে আনাস বিন মালিক রা., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৫৩১

অন্য কিছুর উপর তেমনটি করেন না।[২৪০] এ কারণেই শরী'আহ প্রণেতা অপরাধ ও আদর্শ বিচ্যুতির প্রতিরোধ এবং সংশোধন চিকিৎসার পন্থা হিসেবে নম্রতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।[২৪১] তাই ইসলাম অপরাধীর মনস্তাত্তিক সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম তিনটি পন্থায় অপরাধীর মনস্তাত্ত্বিক সংশোধন ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের পন্থা গ্রহণ করেছে।[২৪২] পন্থা তিনটি হলো-

১। অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গঠন

সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে সচেতনা বৃদ্ধি করা। অপরাধের ভয়াবহ পরিণত এবং এর ক্ষতিকারক দিকসমসূহ জনসম্মুখে তুলে ধরা। যাতে অপরাধ সম্পর্কে সকলের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ইসলামে এ কারণেই 'আমর বিল মারুফ ওয়ান-নাহি আনিল মুনকার' এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভালোকে মন্দের জন্য দায়ী করা হয়েছে, যদি সে বাঁকা পথের পথিককে উত্তম পন্থায় সোজা ও সরল করতে অসমর্থ থাকে। এভাবে সমাজের ব্যক্তিগণ যদি পারস্পরিক নসীহত, উপদেশ, কল্যাণলময় ও পরামর্শের ফলে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠে তাহলে তারা অন্যায় ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধে সক্ষম হবে এবং কল্যাণ ও শুভ চরিত্রের প্রতিষ্ঠা কার্যকর হবে।

২। ব্যক্তির মনে লজ্জাশীলতা প্রতিষ্ঠা করা

ইসলাম ব্যক্তি হতে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা রোধ করে লজ্জাশীলতা গ্রহণের দাওয়াত এবং তাকে মন-মানসিকতায় দৃঢ়স্থিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কেননা লজ্জা-শরম সর্বতোভাবে কল্যাণের উৎস। অপরাধপ্রবণতার রোগে আক্রান্ত মন-মানসিকতায় লজ্জাশীলতার পুনর্জাগরণ এক সফল চিকিৎসা। কেননা তা অপরাধ করার পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। অপরাধের লজ্জা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ পূর্ব থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই মনোবৃত্তি দৃঢ়ভাবে জাগ্রত করে যে, আমি এমন কাজ কখনই করব না, যার দরুন শেষ পর্যন্ত আমাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। এই জন্যই নবী করিম (সা.) বলেছেন, مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ- অর্থ: পূর্ববতী নবীদের দাওয়াতের যে কথা মানুষের স্মরণ আছে তা হলো, যখন তোমার লজ্জা না থাকে, তখন তুমি যা ইচ্ছা হয়, তা করতে পার।[২৪৩] তাই ইসলাম এ ক্ষেত্রে মানুষের মনে লজ্জাশীলতার পুনর্জাগরণ করার কথা বলে। কারণ এ বিষয়ে সবাই একমত হবেন যে, আমাদের সমাজের এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই যে, লজ্জা-শরম কমে যাওয়ার কারণেই সমাজে অপরাধপ্রবণতা হু-হু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে চারিত্রিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন বিষয়ে লজ্জা শরমের অভাবে মুসলিম সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হারানোর পথে।

---

২৪০. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২৫৯৩

২৪১. বি.দ্রঃ ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২৫৯১, ২৫৯২

২৪২. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯-৪০

২৪৩. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবঃ' ফিল হায়াউ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৭৯৭; আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি (রহ.), *সুনানু ইবন মাজাহ*, কিতাবুল যুহদ, বাবঃ হায়াউ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪১৮৩; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, মাসনদে শামিয়্যিন,বাকিয়্যাতুল হাদীস আবি মাসউদ আল বাদরি আল আনসারি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭০৯৮

তাই সমাজের কিশোর-কিশোরীকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখতে ইসলাম কিশোর মনে লজ্জাশীলতা জাগরণ এক সফল চিকিৎসা হিসেবে উল্লেখ করেছে।

লজ্জা ঈমানের ভূষণ এবং খোদাভীতি বা তাকওয়ার অপর নাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর পবিত্র বাণীতে লজ্জাশীলতার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ-

অর্থ: "ঈমানের সত্তুরটিরও অধিক শাখাপ্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে উত্তম শাখা হলো আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এ সাক্ষ্য দেওয়া, আর সর্বনিম্ন শাখা হলো রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা-শরমও ঈমানের একটি (বিশেষ) শাখা।"[২৪৪] মানব জীবনে লজ্জার বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ তা হাদীস থেকে সহজেই অনুমেয়। হাদীসে ব্যবহৃত হায়া (الحَيَاءُ) শব্দটি আরবি ভাষায় একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আরবি অভিধানে হায়ার অর্থে বলা হয়েছে, স্বভাবের দিক থেকে অথবা শরী'আতের দিক থেকে যে কাজটি গর্হিত তার স্পর্শ থেকে নিজের প্রবৃত্তিকে দূরে রাখার নাম হায়া। শরী'আতের পরিভাষায় যা কিছু গর্হিত তা পরিত্যাগ করার মনোভাবকে হায়া বলা হয়। লজ্জার অনুভূতিই মানুষকে অবৈধ ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে। লজ্জাশীলতা এমন গুণ, যা মানুষকে খোদার নাফরমানি ও গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে। লজ্জার পরিচয় দিতে গিয়ে ইমাম নববী বলেন, লজ্জা এমন এক জিনিস যা মানুষকে খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। লজ্জাশীলতা মানুষকে পূণ্যবান ও সুশীল মানুষ করে গড়ে তোলে। এটি মানুষকে ভালো কাজের ও মন্দ কাজ থেক বিরত রাখে। আমাদের সমাজের লজ্জাশীলতার অভাবে যুব সমাজ যে কোন ধরনের অন্যায় কাজে বা অপরাধপ্রবণতায় যুক্ত পারে।

লজ্জাহীনতা শয়তানের কাজ। শয়তান মানুষকে বেহায়াপনার দিকে প্রলুব্ধ করে। কুরআনের ভাষায় যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সে তাকে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজের আদেশ দেয়। বর্তমান মুসলিম সমাজে লজ্জার অভাব প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা আমাদের লজ্জা-শরম হারিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে নানা ধরনের বেহায়া আচরণ করে যাচ্ছি,। আবার ছোটদের সামনে এমন অশ্লীল আচরণ করে যাচ্ছি যা বন্য ও অসভ্য মানুষের জন্য শোভা পায়। পথে ঘাটে চলাফেরা, সৌন্দর্য প্রদর্শন প্রতিযোগিতা, সিনেমা টিভির পর্দায় অশ্লীলতার সয়লাভ যুবসমাজকে অতি দ্রুততার সাথে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দিচ্ছে। একজন নির্লজ্জ ব্যক্তি যে কোন ধরনের অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করে না। তাই ইসলাম সমস্ত নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, চাই তা প্রকাশ্য হোক, কিংবা গোপনে হোক। মহান আল্লাহ মানব জাতিকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা থেকে দূরে

২৪৪. ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ আবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (রহ.), *সুনানুন নাসাঈ*, কিতাবুল ঈমান ও শারায়ি'হি, বাবি: যিকরু শু'আবিল ঈমান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০০৬

থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ-অর্থ: "তোমরা নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা, নগ্নতা, অশীল কাজের নিকটেও যাবে না, তা প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয়।"[২৪৫]

যে কাজ বা কথা জঘন্য, কুৎসিত, নির্লজ্জতাময় কুরআনের ভাষায় তাই ফাহেশা আর এর বহুবচনে ফাওয়াহিশ। সমাজকে এ নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করার তাকিদ রয়েছে ইসলামে। সমাজের লোকদের চক্ষু ও কর্ণ যাতে করে নির্লজ্জতার শব্দ ও দৃশ্য থেকে রক্ষা পায়, সে জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন ইসলামে কাম্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللهِ- অর্থ: "আপনি বলুন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, সকল পাপাচার, সমস্ত অন্যায় বিদ্রোহ এবং কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা।"[২৪৬] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ অর্থ: "তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ বর্জন কর। যারা পাপকাজ করে নিশ্চয় তাদেরকে তাদের পাপকাজের জন্য শীঘ্রই শাস্তি দেয়া হবে।"[২৪৭]

উপরোল্লিখিত পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, লজ্জাশীলতা মানুষের এমন গুণ যা তাকে সমস্ত অন্যায়-অপরাধ ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে এবং খোদাভীতি ও তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হয়ে আদর্শ মানুষে পরিণত করে। বিরপরীত দিকে লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা সমস্ত পাপ কাজকে উন্মুক্ত করে দেয়। তাই ইসলাম অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা একেবারেই রুদ্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যাতে সমাজে নির্লজ্জতা ছড়িয়ে না পড়ে।

৩। নির্লজ্জ কার্যাবলী গোপন রাখা

নির্লজ্জতার কার্যাবলী প্রকাশ ও প্রচার হতে না দেওয়া। কারণ সমাজে এটা যত প্রকাশ পাবে ততই নির্লজ্জতার প্রসার ঘটবে। এজন্য ইসলাম নির্লজ্জতার বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষার তাকিদ প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ايُّها الناسُ من ارتكب سيئاً من هذه القاذُورات واستتر فهو فى ستر الله ومن إبدى لنا فضحته اقمنا عليه الحدَّ- অর্থ: "হে মানুষ! যে লোক এইসব অন্যায় ও জঘন্যতম কার্যাবলীর কোন একটা করবে ও তা গোপন করে ফেলবে, সে আল্লাহর আবরণ লাভ করবে। আর যে লোক তার লজ্জাজনক কাজ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত করবে, আমরা তার উপর সুনির্দিষ্ট হদ্দ অবশ্যই কার্যকর করব।"[২৪৮] এই কথাটি সুস্পষ্টভাবে এই তত্ত্বের দিকে ইঙ্গিত করে যে, অপরাধ গোপন করা হলে তার গুরুত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং তা এড়িয়ে চলতে লোকদের উদ্বুদ্ধ

---

২৪৫. আল-কুরআন, ৬: ১৫১
২৪৬. আল-কুরআন, ৭: ৩৩
২৪৭. আল-কুরআন, ৬: ১২০
২৪৮. ইমাম মালেক ইবন আনাস, *আল-মুয়াত্ত্বা*, কিতাবুল হুদুদ, মা যাই ফিমানি তারাফা আলা নাফসিহি বিযযানি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৩৮৬

করে। অপরাধ গোপন করার উপর গুরুত্ব এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ প্রচারিত ও প্রকাশিত হওয়ায় একসাথে দু'টি অপরাধ সংঘটিত হয়। একটি হচ্ছে অপরাধ করা; আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রচার করা। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই প্রসঙ্গে বলেন, "যদি কোন ভুল বা মন্দ কাজ লুকিয়ে ফেল, তখন তা যে করল কেবল তারই ক্ষতি করতে পারে। আর তা যদি প্রকাশিত হয়ে যায় তাহলে খুবই সম্ভব হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তার আযাবে সর্বসাধারণকে পরিবেষ্টিত করে ফেলবেন। মহান আল্লাহ বলেন, اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ امَنُوْا لَهُمْ عذاب اَلِيْم لا فِيْ الدُّنْيا و الاخِرَة-অর্থ: "যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়ঙ্কর শাস্তি রয়েছে।"[২৪৯]

আমরা যদি বর্তমান সমাজের সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে পবিত্র কুরআনের উক্ত বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসের বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে। অপরাধবিজ্ঞানীরা একথা দৃঢ়তার সাথে স্বীকার করেন যে, বর্তমান বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় অধিকাংশ অপরাধই চেইন অপরাধ। অর্থাৎ কোন একটি সমাজে কোন নতুন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হলে, তথ্য-প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে সেই অপরাধটি সম্পর্কে অতি অল্প সময়ে সারা বিশ্ব জেনে যায়। এর ফলে অপরাধী এবং অপরাধী নয় দু'শ্রেণির লোকজনই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্য সমাজ বা এলাকার অপরাধীরা একই ধারা অনুসরণ করে উক্তরূপ অপরাধ সংঘটিত করতে থাকে। অপরপক্ষে কিশোর ও যুবক শ্রেণি অপরাধের টেকনিক ও ধরনে আকৃষ্ট হয়। তাছাড়া এরূপ অপরাধী অনেক সময়ই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। ফলে কিশোর ও যুবক শ্রেণি, যারা এখনও অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বা অপরাধী নয়, তারাও উক্ত রোমাঞ্চকর অপরাধ কর্মটির প্রতি আকর্ষিত হয় এবং এরূপ রোমাঞ্চকর অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে সমাজে অপরাধের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়। এজন্যই ইসলাম অপরাধের প্রসার প্রতিরোধে নির্লজ্জতার কার্যাবলী প্রকাশ ও প্রচার হতে না দেওয়ার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

অপরাধীর মনস্তাত্তিক সংশোধনের জন্য তাকে তাকে তার ঘৃণ্য অপরাধের জন্য সামাজিকভাবে বয়কট করা কিংবা তার অপরাধের জন্য লজ্জিত ও লাঞ্ছিত না করে তাকে স্বাভাবিকভাবে সমাজে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। যেন সে অপরাধ সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা পোষণ না করে এবং সে কারণে অপরাধে নিমজ্জিত থাকাকেই স্থায়ী নীতি হিসেবে গ্রহণ করে না বসে। স্বয়ং নবী করিম (সা.) অপরাধী বা গুনাহগার ব্যক্তিকে তার অপরাধ বা গুনাহের কারণে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করতে উৎসাহিত করেছেন। অন্যথায় তার মন-মানসিকতায় অপরাধ ও পাপের দিকে একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে তা স্থায়ী ও দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে পারে। সে যদি বুঝতে পারে যে, লোকেরা তাকে ঘৃণা করে, তখন সে লজ্জায় মুখ ঢাকতে ও সমাজের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণ অসামাজিক হয়েও দিনাতিপাত করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। এই তিনটি মৌলিক ব্যবস্থা অন্যায়, পাপ ও অপরাধের বিরুদ্ধে

২৪৯. আল-কুরআন, ২৪: ১৯

একটা তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করার ও তার অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার সুষ্ঠু ব্যবস্থা। মুসলিম মন-মানসিকতাকে ইসলামি শিক্ষা-প্রশিক্ষণে প্রস্তুত ও উন্নত করে তোলার জন্য তা খুবই কার্যকর। প্রত্যেক ব্যক্তির মনে পবিত্র চিন্তা ও নির্মল ভাবধারা জাগ্রত করে গোটা সমাজ-সমষ্টিকে এক মহাকল্যাণের দিকে পরিচালিত করা এভাবেই সম্ভব।

(খ) অপরাধ সংঘটনের পূর্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা মুকাবিলা বা প্রতিরোধ করা ইসলামের অপরাধ প্রতিরোধের অন্যতম প্রধান কৌশল। ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজকে অপরাধমুক্ত করার জন্য শুধুমাত্র বৈষয়িক ও পরকালীন শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। বরং ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই ব্যক্তি যাতে অপরাধের সংস্পর্শে আসতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। একারণে ইসলাম মুসলিম ব্যক্তির চতুর্দিকে এক সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে, যা তাকে পাপের দিকে আকর্ষণ ও পদস্খলন থেকে রক্ষা করে। ইসলামের এ ব্যবস্থাকে অপরাধে সংঘটনের পূর্বে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা ককরা হয়। নিম্নে ইসলামের অপরাধ পূর্ব প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১। মানুষের হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করা

ইসলাম মানুষকে পূর্ণ ঈমান গ্রহণে প্রস্তুত করে তাকে মুমিন হিসেবে গড়ে তুলতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কেননা এ ঈমান-ই তাকে বিকৃতি ও আদর্শ-বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে। তার হৃদয়ে ঈমানের বীজ বপন করে তাকে কল্যাণমুখী বানিয়ে তার মধ্যে অপরাধ ও বিপর্যয় বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা। আর প্রকৃত ঈমান ও একনিষ্ঠ দৃঢ় প্রত্যয়ই হচ্ছে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ, নির্লজ্জতা ও হারাম কাজ অবলম্বনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ। কেননা, একজন মুমিন নিঃসন্দেহে জানে ও বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু করে, আল্লাহ সে বিষয়ে পুরোপুরি অবহিত। করো অপরাধ লোকজনের কাছে অজানা থাকলেও আল্লাহর নিকট তো কিছুই গোপন থাকে না এবং কেউ যদি অপরাধ করে দুনিয়ার শাস্তি থেকে নিস্তার পেয়েও যায়, তবুও পালৌকিক শাস্তি থেকে সে কিছুতেই রেহাই পাবে না। এ বিশ্বাসই যে বড় বড় অপরাধ প্রতিরোধক, তা মহানবী (সা.) -এর বাণী হতে বুঝা যায়। তিনি বলেছেন,

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ–

অর্থ: “যিনাকারী যখন যিনা করে তখন সে ঈমানদার থাকে না, শরাব পানকালেও পানকারী ঈমানদার থাকে না এবং চোর চুরি করার সময় ঈমানদার থাকে না।”[২৫০] এতে বুঝা যায় যে, যার নিকট ঈমান জীবনের চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সে এসব অপরাধের কাজ থেকে অবশ্যই দূরে সরে থাকবে।

২৫০.ইমাম আবূ ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা‘ঈল আল-বুখারী আল-জু‘ফী (রহ.), *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবঃ কাওলুল্লাহি তা‘আলা ‘ইন্নামাল খামরু ওয়াল মাইসিরু ওয়াল আনসাব, প্রাগুক্ত, হাদী সনং- ৫৫৭৮; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল ঈমান, বাবঃ বায়ানু নুকছানিল ঈমানি বিলমা‘আছি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৭

ইসলামে ঈমানের স্থান সর্বাগ্রে। মহান আল্লাহ সাধারণত বান্দাদের জন্য যে কর্মের বিধান পেশ করেছেন, " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" 'হে বিশ্বাসীরা, হে ঈমানদার লোকেরা বলে। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর প্রতি যার ঈমান রয়েছে, সেই আল্লাহর আদেশ পালন করতে এবং তার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রস্তুত হতে পারে। আর যার ঈমান নেই সে তা পালন করবে না এমনটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া ঈমানের জন্য আখেরাত বা পরকালের প্রতি দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করা একান্তই অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ- অর্থ: "তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।"[২৫১] এ কারণেই পবিত্র কুরআনের যেখানেই ঈমানের কথা বলা হয়েছে সেখানেই আমলে সালেহ বা নেক আমলের কথা বলা হয়েছে। আমলে সালেহ পালন করলে কেউ আর অপরাধপ্রবণতায় জড়াতে পারে না। মোট কথা ঈমানের পরে পরেই তদানুযায়ী আমল করা একান্ত জরুরী। আর ঈমান অনুযায়ী আমল হচ্ছে, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন বা হারাম করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা এবং তিনি যে সব কাজ ফরয বা কর্তব্যরূপে ঘোষণা করেছেন, সে সব কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

يايها الَّذِيْن امنُوْا لاتتَّبِعُوْا خُطُواتِ الشَّيْطانِ – ومنْ يَّتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فاِنَّهُ يامُرُ بِالْفحْشاءِ والْمُنْكرِ– ولوْلا فضْلُ اللهِ عليْكُمْ ورحْمتُهُ مازكى مِنْكُمْ مِنْ احدٍ ابدًا لا ولكِنَّ الله يُزكِيْ منْ يَّشاءُ – واللهُ سمِيْع علِيْم–

অর্থ: "হে মুমিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তানতো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[২৫২]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বুঝানো হয়েছে যে, মুমিনরা কখনো ইসলাম অসমর্থিত কাজে যুক্ত হতে পারে না। অপরাধ পাপ থেকে তারা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে- এটিই ঈমানের দাবী। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ঈমানের ভিত্তিতে যে ইসলামি সমাজ গঠন করেছিলেন, সে ঈমান হচ্ছে অপরাধ পরিপন্থী একটি অতুলনীয় শক্তি। এ শক্তি চির নতুন, শাশ্বত- সে ঈমানের ভিত্তিতে আজও ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র - এক কথায় পূর্ণাঙ্গ সমাজ গঠন করা হলে তাও একটি আদর্শ সমাজ হবে এবং তাতে অপরাধ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে না গেলেও তার মাত্রা, সংখ্যা ও প্রকোপ অনেক অনেক কম হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর একজন কিশোর-কিশোরীর মনে যদি ঈমানের বীজ বপন করা যায় তাহলে সে মহান আল্লাহর

২৫১. আল-কুরআন, ৪৯: ১৫
২৫২. আল-কুরআন, ২৪: ২১

ভালবাসায় অপরাধকর্মসমূহ হতে বিরত থাকবে। সুতরাং কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম সর্বপ্রথম সকল শিশু-কিশোরকে ঈমান গ্রহণের জন্য বলেছে।

২। আমর বিল মা'রুফ ও নাহি আনিল মুনকার কার্যকর করা

'আমর বিল মারুফ' ও নাহী আনিল মুনকার' ভালো কাজের আদেশ ও বাস্তবায়ন এবং মন্দ কাজসমূহ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে কার্যকর করা। এই সমাজকে সম্বোধন করেই মহান আল্লাহ বলেন, كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ – অর্থ: "তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখ।"[২৫৩] ইসলাম মানব সমাজকে সর্বপ্রকার ভাল ও পূণ্যময় কাজে পাস্পরিক সহযোগিতা, পারস্পরিক কল্যাণ কামনা, সত্যের উপদেশ, ধৈর্য ধারনের উপদেশ এবং সকল পাপ, সীমালঙ্ঘনমূলক কাজ, অন্যায়, অত্যাচার ও বিপর্যয় প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالْعَصْرِ– إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ– إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ–

অর্থ: "কালের শপথ! নিশ্চয়ই সমস্ত মানুষ ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত নেই যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[২৫৪] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ–অর্থ: "তোমরা পরস্পরে ভাল কাজ ও তাকওয়া অবলম্বনে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘমূলক কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয়ইই আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।"[২৫৫]

কুরআন ও হাদীসের এসকল নির্দেশনার কারণে ইসলামি সমাজে অন্যায় বিরোধী চেষ্টা সাধনায় পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ব্যাপকরূপ পরিগ্রহ করে। সবাই তার প্রতিরোধে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয় থাকে। ফলে অন্যায়-অপরাধকারী কোথায়ও আশ্রয় পায় না। কেউ তাকে বিন্দুমাত্র সাহায্য বা সহযোগিতা করে না। ফলে ইসলামি সমাজে অন্যায়, অত্যাচার বা পাপ বলিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে না, দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে থাকে, প্রচ্ছন্ন ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং ন্যায়, কল্যাণময় ও ভাল ভাল কাজ ব্যাপকতা লাভ করে।

৩। অপরাধের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেওয়া

ইসলাম যখন কোন কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, তখন যে পথে নিষিদ্ধ ঘোষিত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে - এমন সব পথ সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ করে দেয়। যেমন, ব্যভিচার ইসলামে হারাম ঘোষিত হয়েছে। ফলে যেসব কাজ

২৫৩.আল-কুরআন, ৩: ১১০
২৫৪.আল-কুরআন, ১০৩: ১-৩
২৫৫.আল-কুরআন, ৫: ২

মানুষের মধ্যে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, নারী-পুরুষের যৌন মিলন ঘটায় বা ঘটানোকে সহজ করে দেয়, তাও হারাম ঘোষিত হয়েছে। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, এক জোড়া যুবক-যুবতীর নিভৃতে-নির্জনে একত্রিত হওয়া হারাম করা হয়েছে। কেননা, এসব কাজের পরিণামে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়া অনিবার্য ও অবধারিত ব্যাপার। আল-কুরআনে বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যায়, স্বভাব প্রকৃতিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠান বন্ধ করার স্থায়ী বিধান ঘোষিত হয়েছে। এজন্য নারী-পুরুষ উভয়কেই পরস্পর থেকে দৃষ্টি বিরত ও নত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুহাররাম সঙ্গী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একদিন এক রাত্রির দূরত্বের পথে সফরে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা, এসব পরিস্থিতিই অবৈধ যৌন মিলনের পথ উন্মুক্ত করে, যৌন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে। সে সাথে মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছে পুরুষের সাথে কথোপকথনে মিষ্ট, বিনম্র ও লালিত্যময় সুর মিশ্রিত না করতে। তা করা অসুস্থ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মনে কামনা জেগে উঠে ও তার বাস্তবায়ন সহজ ও সম্ভব বলে মনে করতে শুরু করে।

ইসলাম মদপান নিষিদ্ধ করেছে। সে সাথে নিষিদ্ধ করেছে তার উৎপাদন ও ব্যবসা। কারণ মদের উৎপাদন ও ব্যবসা সাথে মদ্য পানের একটা নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। তাই তার উৎপাদনকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী, তার বহনকারী এবং আমদানীকারীর উপরও লানত প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কেননা, এসব কাজের মাধ্যমে মদ্য পানের মত একটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হারাম কাজের সাথে সহযোগিতাই করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন, لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ– "আল্লাহর লানত শরাবের উপর, তা পানকারীর উপর, যে পান করায় তার উপর, যে বিক্রি করে তার উপর, যে খরিদ করে তার উপর, যে তা নিংড়ায় এবং যার নির্দেশে নিংড়ায় তার উপর, আর যে ব্যক্তি তা বহন করে এবং যার জন্য বহন করে সকলের উপর।"[২৫৬]

ইসলাম অপরাধ প্রতিরোধে সর্বাত্মকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চৈন্তিক, আধ্যাত্মিক যে ছিদ্র পথে অপরাধ অনুপ্রবেশ করতে পারে ও করার সুযোগ পায়, তার প্রত্যেকটিই বন্ধ করে দিতে ইসলাম সচেষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে চুরি অপরাধের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলাম চুরির কার্য থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য এর শাস্তিস্বরূপ হাত কাটার দণ্ড ঘোষণা করেছে। কিন্তু ইসলামে হাত কাটার দণ্ড একমাত্র বা সূচনাকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নয়, তা হচ্ছে চরম ব্যবস্থা। এই পর্যায়ে সূচনাকালীন প্রতিরোধ ব্যবস্থা হচ্ছে, ইসলাম সর্বপ্রথম মানুষকে ইসলামি জীবন-বিধানে বিশ্বাসী ও তার বাস্তব অনুসরণকারী বানাতে চায়, যেন চৌর্য কর্মটিকে মুসলিম মাত্রই অন্তর থেকে ঘৃণা করে। সেই সাথে ইসলাম যে অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, তার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হিসেবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা

২৫৬. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আশরিবাহ, বাবঃ আল-এনাবু ইউ'ছারু লিল-খামর, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৩৬৭৪

পাওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।[২৫৭] এজন্য ইসলাম দু'টি পন্থা গ্রহণ করেছে। প্রথমত, সমাজের প্রত্যেকটি কর্মক্ষম পুরুষের জন্য হালাল পবিত্র রিয্ক উপার্জন করার সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে সর্বশ্রেণির মানুষের জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এ দু'টি ব্যবস্থা কার্যকর হলে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষেও চৌর্যবৃত্তিতে নিযুক্ত হওয়ার কোন যৌক্তিকতা বা কারণই থাকতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন লোক যদি চারিত্রিক দোষের কারণে বা লোভের বশবর্তী হয়ে চুরির কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে অপরাধের শাস্তি হিসেবে শরী'আতের নির্ধারিত দণ্ড অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। কেননা নাগরিক জীবনের সাথে ধন-সম্পদের নিরাপত্তা দানও ইসলামি রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এক কথায়, ইসলাম অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সম্ভাব্য অপরাধের দ্বার রুদ্ধ করে দিতে বদ্ধ পরিকর।

৪। অবৈধ বা হারামের পরিবর্তে বৈধ কাজের ব্যবস্থা রাখা

তাছাড়া আল্লাহ যখন কোন কাজ বা বিষয়কে হারাম করে দেন তখন তদস্থলে একটা হালাল কাজের পন্থা বৈধ করে দেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ হারাম কাজটি পরিহার করে হালাল কাজটি দ্বারা তার প্রয়োজন পূরণ করবে। যেমন, ইসলামে যিনা হারাম করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বিয়ে বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ– অর্থ:"হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যে লোকই বিয়ের বোঝা বহনে সক্ষম, সে যেন অবশ্যই বিয়ে করে। এই বিয়ে দৃষ্টিকে অবনত রাখবে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করবে। আর যে তা করতে সক্ষম হবে না, তার উচিত রোযা রাখা। এই রোযা তার জন্য ঢাল হয়ে দেখা দিবে।"[২৫৮]

ইসলামে চুরি হারাম ঘোষিত হয়েছে; কিন্তু অভাব অনটন ও দারিদ্র চুরির কাজে প্রলুব্ধ করে। তাই ইসলামি সমাজে যাকাত ফরয করা হয়েছে। সে সাথে ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব-মিসকীনদের ন্যায্য প্রাপ্যতা ও অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ–অর্থ: "যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে; গরীব ও বঞ্চিতদের হক।"[২৫৯] এ যাকাতের বণ্টনের খাতও স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ–"অর্থ: নিশ্চয় যাকাত নিঃস্বদের জন্য, অভাবগ্রস্তদের জন্য, যাকাতের কর্মচারীদের জন্য, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের

২৫৭. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

২৫৮. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুন-নিকাহ, বাব: কাওলি নাবীয়্যি মানিসতাত্বা'আ মিনকুমুল বায়াত ফালইয়াতাযাওয়াজ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৬৫; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুন-নিকাহ, বাব: ইসতিহবাবুননিকাহ লিমান তাকাত নাফসুহু ইলাইহি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪০০

২৫৯. আল-কুরআন, ৭০: ২৪-২৫

জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য এবং নিঃস্ব পথচারীর জন্য। এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।"[২৬০]

ইসলামে সূদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এর বিপরীতে ইসলাম ব্যবসায় বাণিজ্য হালাল করে দিয়েছে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا– অর্থ: তারা বলত, নিশ্চয় ব্যবসায়-বাণিজ্য তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।[২৬১] এছাড়া ইসলাম পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জনকে শুদ্ধতম ঘোষণা করেছে, শ্রমিকের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের উপর জোর দিয়েছেন।

৫। অপরাধের ভয়াবহ পরিণাম উল্লেখ করা

ইসলামে নিষিদ্ধ কাজ করা থেকে মানুষকে দূরে রাখার জন্য অত্যন্ত খরাপ ও ভয়াবহ পরিণতির ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। যে খারাপ পরিণতি মানুষের সম্মুখে ভয়াবহরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে সে পরিণতি স্বভাবতই মানব মনে এমন তীব্র ভীতির সঞ্চার করে যে, সে কিছুতেই সেই খারাপ কাজের দিকে পা বাড়াতে সাহস পেতে পারে না। পবিত্র কুরআনে বহু ধরনের অপরাধকে হারাম ঘোষণা করা করেছে। যেমন, মুরতাদ বা ঈমানগ্রহণের পর পুনরায় ঈমান ত্যাগ করা ও সেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা, ইচ্ছা ও সংকল্প করে মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করা, যিনা করা বা যিনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা বা যিনা সহায়ক বস্তু উদ্ভাবন করা, শিরক করা এবং কারও উপর যিনার মিথ্যা দোষারোপ করা ও মুসলিম সমাজে নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও জঘন্য চরিত্রের কাজকর্মের ব্যাপক বিস্তার করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। এসব কাজ করলে সংশ্লিষ্ট লোকটি ইহকালে যেমন কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হবে তেমনি পরকালেও ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করবে।

৬। নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন

ইসলাম ব্যক্তির সংশোধন, ব্যক্তির মন পবিত্র ও পরিশুদ্ধকরণ এবং তাকে সুন্দর ও নির্মল ও প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসলামের উন্নত মহান চরিত্রে বিভূষিত করতে সচেষ্ট। মহান আল্লাহ যে সকল ইবাদাত ফরয করেছেন, সেগুলো মানুষের মন পবিত্রকরণ, আত্মা বিশুদ্ধকরণ এবং তাদের পাপ ও নাফরমানীর কাজে জড়িত হওয়া থেকে রক্ষা করায় ব্যাপক প্রভাবশালী। নামায মুমিনকে সকল প্রকার নির্লজ্জতা ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। তবে এ নামায একজন মুমিনকে তখনই সকল অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে, যখন সে হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জন করে পবিত্র খাদ্য খেয়ে গভীর মনোযোগ, ভয়-শংকা মিশ্রিত আনুগত্য ও সজাগ মনে নিয়ম-নীতি মেনে আদায় করবে। আর নামায ত্যাগ করা হলে পরিণতি সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। রোযাও রোযাদারকে সকল প্রকার লালসা ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ থেকে সুষ্ঠুরূপে রক্ষা করে।

---

২৬০. আল-কুরআন, ৯: ৬০
২৬১. আল-কুরআন, ২: ২৭৫

ইসলাম মূলত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের মৌল ভাবধারা ঈমান, আকীদা, মূল্যমান ও জীবন বিধানের ব্যাপক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সে অনুযায়ী সমাজ ও ব্যক্তি তৈরি করা ইসলামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। তখন কুরআন ও সুন্নাহতে উপস্থাপিত জীবন বিধানই হয় তাদের জীবনের অনুসরণীয় একমাত্র বিধান। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যা সত্য, যা কল্যাণকর, তাই হয় তাদের নিজ নিজ জীবনে একমাত্র সত্য ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে যা মিথ্যা, বাতিল, অন্যায় ও পাপ তাদের মন-মানসিকতা ও জীবনের কর্মতৎপরতায় তাই হয় সম্পূর্ণরূপে বর্জিত ও প্রত্যাখাত। এভাবে তৈরি করা লোকেরা প্রথমোক্ত জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে এবং শেষোক্ত কার্যাবলী গ্রহণ ও অবলম্বন করতে কখনই কোন অবস্থায়ই প্রস্তুত হয় না। এভাবেই ইসলাম তার যাবতীয় মূল্যমান ও নিয়ম-বিধান উক্ত ব্যক্তিদের জীবনে এবং সেই ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সমাজে পুরোপুরিভাবে বাস্তবায়ন করে। বস্তুত ইসলামের এ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় কেবল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। এ জন্য ইসলামে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত না হওয়া বা সংঘটিত হতে না দেওয়ার উপর এবং অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পথকে সংকীর্ণতর করে দেওয়ার উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অপরাধ প্রতিরোধে ইবাদাতে অভ্যস্তকরণ

ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চারটি ইবাদাত হচ্ছে- সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ। এই ইবাদাতসমূহের প্রত্যেকটিই মানুষকে অপরাধমুক্ত থাকার লক্ষ্যে প্রস্তুত করে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

(ক) সালাত : সালাতে মানবদেহের প্রায় সবকয়টি অঙ্গপ্রতঙ্গ নিয়োজিত হয়। দিন-রাত্রির চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবার সালাত প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের উপর ফরয করা হয়েছে। এরই মধ্যে বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দুনিয়ার কোন ফিতনাই সে সম্পর্ককে দুর্বল বা ছিন্ন করতে পারে না। সালাতে বান্দাহ তার শরীর ও হৃদয় স্বচ্ছ ও পবিত্র করে এবং এভাবে সারাদিন সকল প্রকার অপরাধ ও পাপাচার থেকে পবিত্র থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। সারাদিন কোন মুহূর্তেও মহান আল্লাহকে ভুলে না যাওয়াই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বড় সুফল, মহামূল্য প্রাপ্তি। এরূপ অবস্থায় কোনরূপ অপরাধজনক কাজে অংশগ্রহণ করা তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। আল-কুরআনে সালাতকে অশালীন ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বারণকারী ঘোষণা করা হয়েছে।[২৬২]

নবী করিম (সা.) একটি উদাহরণের মাধ্যমে সালাতের উক্ত শুভ ফলের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেন, أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ ذَاكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا- অর্থ: "তোমাদের কেউ যদি ঘরের সম্মুখে প্রবাহিত ঝর্ণায় প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার দেহে কোনরূপ মলিনতা অবশিষ্ট থাকবে বলে কি তোমরা ধারণা করতে পার?

২৬২.আল-কুরআন, ২৯: ৪৫

সাহাবীগণ উত্তর দিলেন না। তিনি বললেন, ঠিক এমনিভাবেই পাঁচ বারের সালাত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর যাবতীয় ভুলভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটি নিশ্চিহ্ন করে দিতে থাকেন।"[২৬৩] তাছাড়া প্রতিদিন পাঁচবার জামাতে সালাত আদায়কালে পরস্পরের খোঁজ-খবর ও অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হতে পারে। কোন নামায আদায়কারী প্রতিবেশি সমস্যায় পরলে তার বিষয়ে জানার আগ্রহ জাগে। এভাবেই মুসল্লিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সামষ্টিকতার উদ্রেক ঘটে। তখন প্রত্যেক মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। আল্লাহকে সে ভয় করতে থাকে গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাই তার পক্ষে কোন অপরাধ করা সম্ভব হয় না। কেননা তার অকৃত্রিম বিশ্বাস রয়েছে অপরাধ বা নাফরমানি করলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

(খ) সিয়াম (রোযা) : মানব জীবনে রমযানের মাসব্যাপী সিয়ামের প্রশিক্ষণমূলক অবদান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ব্যাপক ও গভীর। সিয়াম মানব মনের যাবতীয় কুপ্রবৃত্তির উপর শক্ত লাগাম লাগিয়ে দেয় এবং রোযাদারকে যাবতীয় নাফরমানীর কাজ-কর্ম থেকে বিরত রাখে। অপরাধ যে ধরনের বা প্রকৃতিরই হোক, তা নফসের খাহেশ, কামনা, বাসনা, লোভ-লালসা থেকেই উৎসারিত হয়। আর তার গোড়াতে তিনটি প্রবল শক্তি-উৎস নিহিত থাকে। প্রথম লোভ-লালসার শক্তি; দ্বিতীয় যৌন স্পৃহা ও কুপ্রবৃত্তি এবং তৃতীয় হচ্ছে অহমিকা-দাম্ভিকতা বোধ। সিয়ামের প্রবল প্রশিক্ষণমূলক প্রভাব রয়েছে এই তিনটি শক্তি উৎসের উপর। মানুষ সাধারণত দিন-রাতে তিনবার পানাহারে অভ্যস্ত- সকাল, দুপুর এবং রাতে। আর যখনই পিপাসা লাগে পান করে এবং যখনই ইচ্ছা হয় আহার করে। কিন্তু রমযান মাসে এই পানাহারের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তা সবই বন্ধ থাকে। এই সময় ক্ষুধা তাকে যন্ত্রণা দেয়, পিপাসা তার বক্ষদেশ জ্বালায়-যদিও তার সম্মুখে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু আহার্য সবই বর্তমান থাকে। কিন্তু সিয়ামের এই সময় সে সেইসব কিছু পানাহার থেকে বিরত থাকে। তার অর্থ যে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যে পানাহারকে হালাল করে দিয়েছেন সে খাদ্যই আল্লাহর হুক্ম পালনের জন্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। যা একথাই প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কিছু করে না।

ওমযান মাসের এই প্রশিক্ষণ ও অভ্যাস পরবর্তী এগারটি মাস সে আল্লাহর নিষিদ্ধ পানাহার ও ধন-মাল থেকে নিজেকে বিরত রাখতে খুবই সাফল্য সহকারে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্য রাতের বেলায় পানাহার যেমন বৈধ করেছেন, তেমনি এ সময়ে স্ত্রী সঙ্গম হালাল করেছেন।[২৬৪] আল্লাহ তা'আলার বান্দার জন্য বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী সম্ভোগ দিনে-রাতে সর্বসময়ের জন্য হালাল রেখেছেন। তারপরেও একজন মুসলিম রমযানের একমাস দিনের বেলা স্বীয় যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হচ্ছে, তখন স্বভাবতই আশা করা যায় যে, বছরের পরবর্তী মাসগুলোতে নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সে সক্ষম হবে।

---

২৬৩. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, মসনদে আবূ হুরায়রা (রা.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৮৯২৪
২৬৪.বি.দ্র: আল-কুরআন, ২: ১৮৭

এছাড়া সিয়াম সাধনা রোযাদারকে অশ্লীল, অনর্থক-অর্থহীন কথা ও কাজ থেকেও বিরত রাখে। রাসূলে করীম (সা.) ইরশাদ করেন, مَن لم يَدَع قولَ الزُّورِ والعملَ به فليسَ اللهِ حاجَةٌ فى ان يَدَعَ طَعامَهُ و شرابَهُ– অর্থ: "যে লোক মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আমল ত্যাগ করল না, তার খাদ্য-পানীয় পরিত্যাগ করে চলায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[২৬৫] অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, كَم مِن صَائِمٍ ليسَ من صِيامِه الا الجُوعُ والعطس –অর্থ: "বেশ সংখ্যক রোযাদার এমন হয়ে থাকে, যাদের রোযায় ক্ষুধা, পিপাসার কষ্ট সহ্য করা ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না।"[২৬৬] রোযাদারকে এক্ষেত্রে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ মেনে চলতে হয়। কেহ কারো উপর অন্যায় করলে সেও তার জওয়াবে অন্যায় করবে, কেউ তাকে গাল-মন্দ বললেও সে তাকে অনুরূপ গাল-মন্দ শুনিয়ে দিবে, তা রোযাদারের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। এরূপ অবস্থা দেখা দিলে সিয়ামই তাকে ঢাল স্বরূপ আড়াল করে রাখবে। হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণিত আছে,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ–

অর্থ: আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তার নিজের জন্য কিন্তু রোযা বিশেষ করে আমার জন্যই রাখা হয়। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব। সওম ঢাল বিশেষ। রোযার দিনে কারুরই স্ত্রীসঙ্গম করা উচিত নয়, উচিত নয় হল্লা চিৎকার ও হাসাহসি করা। সুতরাং যখন তোমাদের কারো রোযার দিন আসে সে যেন ঐ দিন অশ্লীল কথা-বার্তা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয়, অথবা তার সাথে বিবাদ করতে চায়, সে যেন বলে আমি একজন রোযাদার। সেই মহান সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে কস্তুরীর সুগন্ধির চেয়েও উত্তম হবে।"[২৬৭]

এভাবে একজন লোক যদি সারা মাস ধরে অন্যায়, অশ্লীলতা, পাপাচার, কাম- ক্রোধ পরিহার করে চলার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে, অন্যদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ ও বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে এক মাসের এ প্রশিক্ষণ শেষে পরবর্তী এগার মাস এই অভ্যাসের শক্তি দিয়ে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা, পাপাচার থেকে মুক্ত হয়ে চলতে সক্ষম হবে।

২৬৫.ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল-বুখারী*, কিতাব: আস-সাওম, বাব: মান লাম ইদা' কাওলায যূরি ওয়াল আমালি বিহি ফীস সাওমে, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯০৩; কিতাব: আল-আদাব, হাদীস নং-৬০৫৭; ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাব: আস-সাওম, বাব: আল-গিবাতু লিস সায়িমি, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-২৩৬২; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা তিরমীযী, *জামে' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবু সাওমি আন রাসূলুল্লাহ সা., বাব: আত-তাশদীদু ফীল গিবাতে লিছ ছায়িমি, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭০৭

২৬৬. ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, মসনদে আবূ হুরায়রাতা (রা.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৬৮৫; ইমাম দারেমি, *সুনানে দারেমি*, কিতাবির-রিকাক, বাব: ফিল মুহাফাযাতে আলাস-সাওম, হাদীস নং-২৭৬২

২৬৭.ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাব: আস-সিয়াম, বাব: ফাযলুস সিয়াম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১৫১; ইমাম আবূ আবদির রহমান আহমদ আবন শু'আয়ব আন-নাসাঈ (রহ.), *সুনানুন নাসাঈ*, কিতাব: আস-সাওম, বাব: জিকরুল ইখতিলাফি 'আলা আবি সালেহ ফী হাজাল হাদীস, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২১৭

(গ) যাকাত: পৃথিবীতে অসম বন্টন ব্যবস্থা চালু থাকায় দিনে দিনে অর্থনৈতিক অসাম্য বেড়ে যাচ্ছে। ধনশালীরা আরো ধনী এবং গরীব আরো গরীব হচ্ছে। ফলে শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যাচ্ছে। এ থেকে সমাজে অন্যায় অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া নিজের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ রাখা, খাদ্য মওজুদ করাও এক ধরনের অপরাধ। তাই ইসলাম সুষম বন্টন ব্যবস্থার জন্য, ধনীদের সম্পদে গরীব, অসহায়, মিসকীনের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যার নাম হলো যাকাত। ইসলামের দৃষ্টিতে এই যাকাত কোন রকমের দান বা সাহায্য নয়; এ হলো ধনীদের নিকট আমানত রাখা গরীব-অসহায়ের অংশ। তাই এই যাকাত ব্যবস্থা সমাজে বাস্তবায়িত হলে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, বিশেষ করে অর্থনৈতিক অপরাধ থেকে সমাজ মুক্ত হবে। আর শিশু-কিশোরদের অপরাধে জড়িয়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক সকল কারণ থেকে সমাজ পরিত্রাণ পাবে।

যাকাত মুসলমানদের একটি সামষ্টিক-অর্থনৈতিক ইবাদাত। লোভ-লালসা, কার্পণ্য, সংকীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ, ধন-সম্পদের প্রেম-মায়া ইত্যাদি থেকে মানব মনকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে এই যাকাত। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ- অর্থ: "যারা মনের কৃপণতা থেকে মুক্ত বস্তুত তারাই হল প্রকৃত কল্যাণ লাভকারী।"[২৬৮] সমাজের মানুষ শুধু ধন-সম্পদের লোভে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সমাজের এক শ্রেণি অন্য শ্রেণির প্রাপ্য হক (ব্যবসায়-বাণিজ্য, পারিশ্রমিক, ন্যায্য বেতন-ভাতা) প্রদান না করে তাদের ধন-সম্পদ কেড়ে নেয়। ফলে সমাজ বিত্তশালী অর্থাৎ উঁচু শ্রেণি ও সম্পদহীন বা নিম্ন শ্রেণি এই দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইসলামের অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ যাকাত এসব বিভাজন ও বৈষম্য শুরুতেই প্রতিরোধ করে দেয়। এজন্য ইসলাম উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং ন্যায্য বেতন-ভাতার পাশাপাশি বিত্তবানদের সম্পদে গরীব-অসহায়ের অধিকার প্রদান করে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করার কার্যকর বস্থা গ্রহণ করেছে। ফলে যে মুসলিম যথারীতি যাকাত আদায় করে এবং এ যাকাতের সাহায্যে দারিদ্র্য পীড়িত জনগণকে দারিদ্র্য ও অভাবমুক্ত করেছে, সে কখনও অন্য লোকের ধন-সম্পদকে অন্যায়ভাবে হরণ করতে পারে না।

অন্যদিকে সমাজের অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তি যদি শান্তিপূর্ণভাবে ও সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে ধন-সম্পদ থেকে নিজের ন্যায্য অংশ লাভ করে, তখন তার মনে কোন হিংসা-দ্বেষ থাকতে পারে না, পাশাপাশি ধনীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার চিরকালের শত্রুতা যাকাত নির্মুল করে দেয়, ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার দূরত্ব, বিভেদ-পার্থক্য চিরতরে শেষ করে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব তৈরি করে দেয়। এমন শোষণ ও জুলুমহীন সমাজ গঠনের তাগিদ দিয়ে যাকাত আদায় করে তা গরীবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে

২৬৮. আল-কুরআন, ৬৪: ১৬

ঘোষণা করা হয়েছে, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا–অর্থ: "তাদের অর্থ–সম্পদ থেকে সাদাকা গ্রহণ করুন। এর মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন ও পরিশোধিত করবেন।"[২৬৯]

যাকাতের প্রকৃত হকদার হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত, নিঃস্ব ও দরিদ্র মানুষ। ইসলাম যাকাত প্রদানকে দান হিসেবে উল্লেখ না করে ধনীদের সম্পদে গরীবের অধিকার বলে উল্লেখ করেছে। ইসলাম এ অধিকারের প্রাপ্য হকদারদেরকে নাম সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছে। যাকাতের অর্থের হকদারগণের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ– অর্থ: "নিশ্চয় যাকাত নিঃস্বদের জন্য, অভাবগ্রস্তদের জন্য, যাকাতের কর্মচারীদের জন্য, যাদের মন আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণমুক্তির জন্য, আল্লাহর পথে ব্যয়ের জন্য এবং নিঃস্ব পথচারীর জন্য এটা আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।"[২৭০]

বস্তুত ধনীদের ধন-সম্পদে গরীব-মিসকীনদের হক রয়েছে। এই চেতনাই সামষ্টিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের প্রাণশক্তি। এই চেতনা মুসলমানদের অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ন ও যুলুম-সীমালঙ্ঘনের জ্বালায় জর্জরিতকরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ফলে ইসলামি সমাজে অর্থের অভাবে কোন অপরাধ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

(ঘ) হজ্জ : মুসলিম ব্যক্তি তার দেহ-আত্মা-হৃদয়-মন সর্বস্ব মহান আল্লাহর দরবারে সমর্পণের মাধ্যম হজ্জ পালন করে থাকে। একজন মুসলিম হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে তার দেহ ও মন উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ করে নেয়। এভাবে হজ্জ পালন করে সে গুনাহ মুক্ত হয়ে যায় মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার দিনের মতই। হজ্জের সমগ্র সফরে তালবিয়া পাঠ করতে হয়। তা পাঠ করে হজ্জকারী ঘোষণা করে, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ–অর্থ: "হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার ডাকে হাজির হয়েছি। আমি আপনার নিকট হাজির হয়ে আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই, আমি আপনার ডাকে হাজির হয়েছি। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও সকল নি'আমাত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোন অংশীদার নেই।"[২৭১] এভাবে হজ্জ পালনকারী ব্যক্তি এক আত্মিক শক্তি অর্জন করে এবং সেই পাথেয় নিয়ে সে নিজের দেশে ফিরে আসে। এই শক্তিই তার পরবর্তী সমগ্র জীবনে সর্বপ্রকারের

২৬৯.আল-কুরআন, ৯: ১০৩

২৭০. আল-কুরআন, ৯: ৬০

২৭১. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল-বুখারী*, কিতাবঃ অল-হাজ্জ, বাবঃ আত তালবিয়াত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৫৪৯; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবঃ আল-হাজ্জ, বাবঃ আততালবিয়াতু ওয়া সিফাতুহা ওয়া ওয়আকতুহা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১১৮৪; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা তিরমীযী, *জামি 'আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল হাজ্জ, বাবঃ মা যায়া ফীত তালবিয়াত, হাদীস নং- ৮২৬; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, মসনাদে আব্দুল্লাহ ইবন ওমর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫০৮৬

পাপ ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকার জন্য ঢালের কাজ করে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه- অর্থ: যে হজ্জ করল এবং তাতে সে স্ত্রী-সম্ভোগ করল না, কোনরূপ পাপের কাজও করল না, সে ফিরে এলো মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মতই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে।”[২৭২]

এভাবে ইসলামের ইবাদাতসমূহ অনুশীলনের মাধ্যম্যে বান্দাহ তথা মানব জাতি পাপমুক্ত থেকে অন্যায়-যুলুম ও অনৈতিকতামুক্ত সমাজ গঠনে সক্ষম হয়। বিশেষ করে সমাজের কিশোর-কিশোরী ও যুব শ্রেণির মধ্যে ইবাদাতের অনুশীলন বৃদ্ধি করতে পারলে সমাজ থেকে অপরাধের মাত্রা একেবারেই কমে আসবে। তাই কিশোরদেরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখতে ইসলামের ইবাদাতসমূহের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন।

অপরাধ দমনে ইসলামি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিস্তার

পৃথিবীতে প্রচলিত বিধি-বিধান গুলোর মধ্যে ইসলামই একক ও অতুলনীয় জীবন বিধান, যা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার শাস্তি বিধান করেই ক্ষান্ত হয় না বরং যা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অবশ্য দুনিয়ার অপরাপর মানবীয় বিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার শাস্তির ব্যবস্থা করা মাত্র। এই কারণেই কুরআনে অপরাপর বিধানসমূহের নামকরণ করা হয়েছে 'জাহিলিয়াত'- অজ্ঞতা ও বর্বরতাই তার আসল পরিচিতি। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ- অর্থ: “তাহলে কি তারা জাহিলী যুগের বিচার–ফায়সালা কামনা করে? অথচ দৃঢ় বিশ্বাসী লোকদের জন্য হুকুম–আহকাম দেয়ার জন্য অল্লাহর চেয়ে উত্তম আর কে হতে পারে?”[২৭৩]

এ আয়াতের আলোকে বলা যায় যে, আইন/বিধান ও প্রশাসন দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে আল্লাহর বিধান ও প্রশাসন এবং দ্বিতীয় হচ্ছে জাহিলিয়াতের বিধান ও প্রশাসন। মানুষ আল্লাহর নাযিল করা বিধান বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে যে সব আইন-বিধান ও প্রশাসন পদ্ধতি রচনা করে, কুরআনে তার নামকরণ হয়েছে জাহেলিয়াতের বিধান বা প্রশাসন সংস্থা। এই প্রশাসন সংস্থা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে যত না প্রতিরোধ ও নিষেধমূলক বিধি-ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তার চাইতে অনেক বেশি করে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর তার জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হিসেবে। ইসলামও শাস্তির ব্যবস্থা করেছে বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে অপরাধ

২৭২. ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাব: আল-হাজ্জ, অনুচ্ছেদ: ফী ফাদলিল হাজ্জ ওয়াল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩৫০; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা তিরমীযী, *জামি' আত-তিরমিযী*, আবওয়াবুল হাজ্জ, বাব: মা যায়া ফী ছাওয়াবিল হাজ্জ ওয়াল 'উমরাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮১১; ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (রহ), *মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল*, মসনাদে আবি হুরাইরা (রা.), প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৭১৩৬

২৭৩. আল-কুরআন, ৫: ৫০

সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা প্রতিরোধের উপর; কিংবা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণতর করে দেওয়ার উপর। আর সেজন্য ইসলাম বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করেছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যাপকতরকরণ ইসলাম অবলম্বিত উপায়-পন্থাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রাধান্যের অধিকারী।[২৭৪] এজন্যই ইসলাম শিশু-কিশোরদের পারিবারিক ও সামাজিক শিক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম একজন শিশু ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে শরী'আতের মুকাল্লাফ হওয়ার আগ পর্যন্ত পরিবারের সদস্যগণের উপর উক্ত শিশুর আদব-ভদ্রতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দানের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। একজন শিশু যাতে সঠিক কৃষ্টি-কালচারে অভ্যস্ত হয়ে মেধা ও মননের বিকাশ ঘটাতে পারে তা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমাজকে নির্দেশ প্রদান করেছে।

ইসলাম মূলত একটি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক জীবনব্যবস্থা। ইসলামের মৌল ভাবধারা- ঈমান, আকীদা ও জীবন-বিধানের ব্যাপক শিক্ষাদানের মাধ্যমে সেই অনুযায়ী সমাজ ও ব্যক্তিদের তৈরি করা ইসলামের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদেরকে আদর্শ-চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ইসলাম। ফলে শিশু-কিশোর এবং তাদের পরিবার কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত জীবনবিধান অবলম্বন করে অপরাধমূলক ভাবধারা ও কর্মকাণ্ড হতে একেবারেই বিরত থাকে। তাদের জীবনে অনুসরণীয় একমাত্র বিধান হয় রাসূলের প্রদর্শিত জীবনাদর্শ।

এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টাও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য ছিল আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি গড়ে তোলা, সেই আদর্শ শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রশিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে আদর্শ সমাজ গঠন করা। তাই ইসলাম আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি গড়ে তোলার জন্য শিশু-কিশোরদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদান করেছে। অন্য কথায়, দুনিয়ার অপরাপর ধর্ম ও জীবন দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে 'আদর্শ নাগরিক' তৈরি করা। কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে 'আদর্শ মানুষ' গড়ে তোলা। সৎকাজ মানুষকে তার আসল রূপে ও গুণে বিভূষিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, যাতে মহান আল্লাহ তা'আলা তাকে মূলত সৃষ্টি করেছেন। আর তাই হচ্ছে আদর্শ মানুষ, শুভ মানুষ-'ইনসানে সালেহ'। এই আদর্শ মানুষ গড়াই ইসলামের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের লক্ষ্য। ইসলাম যে 'ইনসালে সালেহ' -আদর্শ উন্নত মানুষ তৈরি করে, তা কোন কৃত্রিম মানুষ নয়, নয় বিশেষ বিন্দুতে ও নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী বা আদর্শ মানুষ। সে তো পৃথিবীর সর্বত্র- যেখানেই তার পদধূলি পড়বে, মুসলিম সমাজের মধ্যে কিংবা তার বাইরে- সকল ক্ষেত্রেই তার উন্নত মানবিক চরিত্রের সংরক্ষক। তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ কেবল মুসলিমদের সাথেই নয়, অমুসলিম যিম্মীদের সাথে তার যোগাযোগ থাকবে।[২৭৫] ইসলামের এ আদর্শের কারণেই সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

---

২৭৪. মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫
২৭৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২

ইসলামি সমাজের প্রথম বীজ হবে মুসলিম পরিবার। এই পরিবারে সন্তানদের প্রথম শিক্ষা হবে বাস্তব আদর্শের আলাকে। পিতামাতা ও অভিভাবকের আদর্শই হবে বাস্তব আদর্শের ভিত্তি। তাই পরিবারের অভিভাবকগণকে ইসলামি আদর্শের উপর অবিচল থাকতে হবে। এর পর সন্তানদের নানা বিষয়ে উপদেশ-নসীহত প্রদান করে উন্নত নৈতিক চরিত্রে অভ্যস্ত করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, শিশু-সন্তানরা মৌখিক উপদেশ-নসীহতের পরিবর্তে বাস্তব আদর্শে বেশি করে অনুপ্রাণিত হয়। বিশেষ করে পিতা-মাতার নিকট সন্তানরা বাস্তবে যা দেখতে পায়, তারা তারই অনুসরণ করে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সন্তানদের উপর পিতা-মাতার একটা স্বাভাবিক কর্তৃত্বও থাকে। ফলে তাদের চারিত্রিক আদর্শ সন্তানদের মন-মগজে বেশি করে প্রতিফলিত হয়। অনুরূপভাবে শিক্ষকদের চরিত্রেরও প্রবল প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের উপর। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চতর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষদের নিকট থেকে বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীরা যা কিছুই শিখে, তা তাদের মন ও মগজে বদ্ধমূল হয়ে থকে। কাজেই পরিবারের প্রাথমিক ও সীমিত পরিসর থেকে শুরু করে শিক্ষাঙ্গণের শুরু থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের যদি প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও লালনে ভূষিত করা যায়, তাহলে মুসলিম সমাজে শিশু অপরাধের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে।

কিশোর অপরাধের বিচারে মহানবী (সা.) -এর গৃহীত পদক্ষেপের দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর যুগে সংঘটিত কিশোর অপরাধের বিচার সংক্রান্ত নিম্নোক্ত ঘটনাটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযেগ্য। ঘটনাটি হচ্ছে বনূ কুরায়যা মদীনা সনদের সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে মদীনা রষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তাদের এই রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধের বিচার সংক্রান্ত ঘটনায় তাদের এক সময়ের নেতা সা'দ ইবন মুয়াজকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়। সা'দ ইবন মুয়াজের বিচার ফয়সালায় তারা যুদ্ধঅপরাধী সাব্যস্ত হয় এবং যোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। নারী ও শিশু-কিশোরদের হত্যার নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়া হয়।[২৭৬] রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর উপস্থিতিতে এ বিচার কার্য সম্পন্ন হয় এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এ বিচারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ বিচার সংক্রান্ত একাধিক হাদীস বিভিন্ন সূত্রে সিহাহ সিত্তার হাদীসগ্রন্থসমূহে স্থান পেয়েছে। অধিকাংশ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে উক্ত বিচারে বেঁচে যাওয়া কিশোরদের (পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছেন) বর্ণনা সূত্রধরে। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আতিয়া কুরাযী (রা.)। তিনি সে সময় কিশোর থাকার কারণে হত্যার রায় থেকে বেঁচে যান। তার এক বর্ণনা এসেছে,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ قَالَ كُنْتُ مِنْ سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ–

অর্থ: মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র) আতিয়া কুরাযী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ও কুরায়যা গোত্রের বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। সে সময় লোকেরা তদন্ত করে দেখছিল এবং যাদের নাভীর নিচে চুল উঠেছিল, তাদের

---

২৭৬. ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, *মহানবীর (সা.) জীবন চরিত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৯-৪৩৩

হত্যা করা হচ্ছিল। আর আমি তাদের দলভুক্ত ছিলাম, যাদের তখনো নাভীর নিচে পশম উঠেনি। ফলে আমাকে হত্যা করা হয়নি।[২৭৭] অপর এক বর্ণনায় এসেছে (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَكَشَفُوا عَانَتِي فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ فَجَعَلُونِي مِنَ السَّبْيِ) অর্থ: মুসাদ্দাদ (র) ইবন উমায়র (রা.) হতে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। রাবী আরো বলেন, "এরপর তারা আমার লজ্জাস্থান উলংগ করে দেখে যে, সেখানে কোন পশম গজায়নি। ফলে তারা আমাকে হত্যা না করে বন্দী করে রাখে।"[২৭৮] এ সব বর্ণনায় দেখা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কিশোর হওয়ার কারণে যুদ্ধ অপরাধের মত অপরাধের ক্ষেত্রেও শিশু-কিশোরদের দায়মুক্তি দিয়েছেন এবং তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ করে দিয়েছেন। যার ফলে মৃত্যুদণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া অনেক শিশু-কিশোর পরবর্তীতে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিম্নোক্ত বিচারের ঘটনা থেকেও কিশোর অপরাধের দায়মুক্তি এবং তাদের সংশোধনের বিষয়টি শিক্ষা পাওয়া যায়। ঘটনাটি হলো-

মদীনায় ছিল বহু খেজুরের বাগান। অন্যান্য ফলও বেশ কিছু হতো। সাহাবীদের কারো বাগানে সর্বপ্রথম ফল তোলা হলে অনেকে নতুন ফল রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর খেদমতে নিয়ে আসতেন। শিশুরা মজলিসে উপস্থিত থাকলে তিনি তাদেরকে কাছে ডাকতেন এবং সবচেয়ে ছোট শিশুটির হাতে প্রথমে একটি ফল তুলে দিয়ে ফল খাওয়ার উদ্বোধন অনুষ্ঠান করতেন। একজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি ছোট বেলায় আনসারদের খেজুর বাগানে যেতেন। খেজুর পাড়ার জন্য ঢিল ছুড়তেন। একদিন বাগানের মালিক এবং কিছু লোক তাকে দৌড়িয়ে ধরে ফেলে। তারা তাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কাছে নিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ঢিল ছুড়েছো কেন? আমি বললাম খেজুর খাওয়ার জন্য। সোজা উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটু চুপ করে রইলেন। আমাকে কোন বকাবকি বা তিরষ্কার করলেন না। শাস্তি না দিয়ে বললেন, যে ফল নিজে গাছ থেকে তলায় পড়ে, সেগুলো কুড়িয়ে খাবে। ঢিল ছুড়বে না। এর পর রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন।[২৭৯]

এই ঘটনাটি থেকে শিক্ষণীয় হলে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বালকটির এ কর্মকে চুরি হিসেবে বিবেচনা করেননি এবং কোন রকম শাস্তি প্রদানও করেননি বরং তাকে সুন্দর উপায়ে সংশোধন করে দিয়েছেন। অতএব, উপরোক্ত ঘটনা দু'টি থেকে শিশু-কিশোরদের সব রকমের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করে তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়।

২৭৭. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০৪
২৭৮. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০৫
২৭৯. এ. জেড, এম. শামসুল আলম, *মহানবী ও শিশু* (চট্টগ্রাম-ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.), পৃ. ২৩

শরী'আহ নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা

ইসলামের নির্দেশিত ও প্রদর্শিত প্রতিরোধ, সংশোধন ও পবিত্রকরণ প্রক্রিয়ার পূর্ণ প্রয়োগ ও কার্যকারিতা সত্ত্বেও মানুষ যদি সংশোধিত না হয়, কুরআনের উপদেশ নসীহতের অনুপম শিক্ষার সুফলতা গ্রহণে যদি ব্যর্থ হয়, কারও আকীদা বিশ্বাস যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, মনে আল্লাহর ভয় না থাকে এবং সে কারণে নির্লজ্জতা ও পাপের কাজে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তাহলে তার অপরাধের যথাযথ শাস্তি অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। সে এক বিন্দু দয়া, অনুগ্রহ বা ক্ষমা পাওয়ার অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে। এরূপ অবস্থায় অপরাধের শাস্তি একান্তভাবেই অপরিহার্য। আল্লামা মাওয়ার্দী লিখেছেন, "নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ অপরাধ প্রতিরোধক (Restraint)। আল্লাহ তা'আলা তা বিধিবদ্ধ করেছেন আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ করা ও আদিষ্ট কাজ না করা থেকে মানুষকে বিরত রাখার লক্ষ্যে। অর্থাৎ শুধুমাত্র কল্যাণকর কাযসমূহ সম্পাদন করা এবং অকল্যাণকর কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যই আল্লাহ তা'আলা কিছু অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

১। কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সংশোধনমূলক শাস্তির ব্যবস্থা

কিশোর অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ও সাময়িক পদক্ষেপ হলো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা। যে সকল শিশু-কিশোর-কিশোরী অল্প বয়সে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার শিকার হয়ে অপরাধকর্মে লিপ্ত হচ্ছে, তাদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। কিশোর অপরাধের বিচারকাজ অত্যন্ত সংবেদনশীল বিধায় বয়স্কদের মত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা না করে সহানুভূতিশীল ও সংশোধনমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিশোর আদালতে বিচার পরিচালনা করাই শ্রেয়। শিশু-কিশোরদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশনা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর সুন্নাতেও পরিলক্ষিত হয়।[২৮০] রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর হাদীসে যে তিন শ্রেণির ব্যক্তিকে শরী'আতের বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা।[২৮১] এই বিষয়টি আরো পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে নিম্নোক্ত হাদীস থেকে:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَاسْتَشَارَ فِيهَا أُنَاسًا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ مُرَّ بِهَا عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا مَجْنُونَةُ بَنِي فُلَانٍ زَنَتْ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَقَالَ ارْجِعُوا بِهَا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَالُ هَذِهِ تُرْجَمُ قَالَ لَا شَيْءَ قَالَ فَأَرْسِلْهَا قَالَ فَأَرْسَلَهَا قَالَ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ–

---

২৮০. বি.দ্রঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, কিতাবুল আদাব, বাবঃ ফি রাহমাতি, প্রাগুক্ত,হাদীস নং-৪৯৪৩; ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা আত-তিরমিযী, *জামি' আত-তিরমিযী*,আবওয়াবুল বিররি ওসসিলাতি আন রাসূলল্লাহ (সা.), বাবঃ মা যায়া ফি রাহমাতিস সিবইয়ান, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯১৯; আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম আন-নিসাপুরী, *আল-মুসতাদরাক* (বৈরুতঃ দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.), হাদীস নং- ৭২৫৩

২৮১. বি.দ্রঃ ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, অধ্যায়ঃ আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদঃ আল মাজনূন ইয়াসরিকু আও ইউসিবু হাদ্দা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৪০৩, ৩৯৯৮, ৪৩৪৬

অর্থ: হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা উমার (রা.) এর নিকট একজন পাগলীকে উপস্থিত করা হয়, যে যিনা করেছিল। তিনি (রা.) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। এসময় আলী (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে সে মহিলা সম্পর্কে জানতে চান। তখন তাকে বলা হয়, সে অমুক গোত্রের একজন পাগল মহিলা। সে যিনা করায়, তাকে পাথর মেরে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তখন আলী (রা.) বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনো। উক্ত মহিলাকে ফিরিয়ে আনা হলে, আলী (রা.) উমার (রা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আমীরুল মুমিনিন! আপনি কি অবগত নন যে, তিন ধরনের ব্যক্তি হতে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে? তারা হলো- (১) পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ না সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন হয় (২) নিদ্রিত ব্যক্তি যতক্ষণ না জাগ্রত হয় এবং (৩) নাবালক ছেলে-মেয়ে যতক্ষণ না প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। তখন উমার (রা.) বলেন, হ্যাঁ। আলী (রা.) জনতে চান তবে কেন এই পাগলীকে পাথর মেরে হত্যা করা হচ্ছে? তখন উমার (রা.) বলেন, এখন আর এরূপ করা হবে না। আলী (রা.) বলেন, আপনি তাকে ছেড়ে দিন। তখন উমার (রা.) তাকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন এবং তাকবীর পাঠ করতে থাকেন।[২৮২]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম পাগল ও ঘুমন্ত ব্যক্তির সাথে শিশু-কিশোরদের দায়মুক্তি নীতি গ্রহণ করেছে। তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার স্বার্থে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের জন্য তা'যীরী বা শিষ্টচার শিক্ষামূলক শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ইসলামে রয়েছে।[২৮৩] যাতে করে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে পেশাদার অপরাধীতে পরিণত না হয় এবং তাদেরকে দেখে সমাজের অন্য শিশু-কিশোররাও অপরাধকর্মে জড়িয়ে না পড়ে।[২৮৪] শিশু সন্তানদের অন্যায় ও অপরাধপ্রবণ আচরণের সংশোধন এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্যায় আচরণ হতে ফিরিয়ে রাখার জন্য তাদেরকে তা'যিরী শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। শিশু-কিশোরের বেলায় সে বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংশোধনমূলক শাস্তি প্রযোজ্য। কেননা নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম, বালেগ-নাবালেগ নির্বিশেষে যে কোন বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন অপরাধীর উপর তা'যীর কার্যকর হবে।[২৮৫] তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, শাস্তি যেন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে না হয় এবং এর পরিমাণ যেন সংশোধনের মাত্রায় থাকে।

২। হুদূদ ও কিসাস সংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি

হুদূদ ও কিসাস পর্যায়ের কোন অপরাধ কিশোর-কিশোরীরা সংঘটন করলে তাদেরকে ইসলামি শরী'আর নির্ধারিত দণ্ড প্রদান করা প্রসঙ্গে ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান বর্ণনা করেছে। এপ্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনা হলো কিশোর-কিশোরী যদি এ পর্যায়ের অপরাধ সংঘটন করে, তারপরেও ইসলামি শরী'আতের নির্ধারিত দণ্ড (হুদুদ ও কিসাস) প্রদান

---

২৮২. ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী (রহ.), *সুনানু আবি দাউদ*, অধ্যায়: আল-হুদুদ, অনুচ্ছেদ: আল মাজনূন ইয়াসরিকু আও ইউসিবু হাদ্দা, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং-৪৪০২, ৪৩৪৭

২৮৩. ইমাম আলাউদ্দিন আবূ বকর ইবন মাসউদ আল-কাসানী আল-হানাফী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ. ৬৩-৬৪

২৮৪. ড. আব্দুল আযীয় 'আমির, *আত-তা'যীরু ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২৮৫. গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ২৬৬

করা যাবে না। কেননা তারা শরী'আতের দায়-দায়িত্বমুক্ত হওয়ায় শাস্তিযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত,

عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب أنه لاقود ولا قصاص في جراح ولا قتل ، ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم ، حتى يعلم ما له في الاسلام وما عليه–

অর্থ: আব্দুর রাযযাক বর্ণনা করেছেন, ইবন জুরায়জ বলেছেন, আমাকে আব্দুল আযিয ইবন উমর বলেছেন, উমর ইবন আব্দুল আযিযের চিঠিতে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা), এর সূত্রে বর্ণিত ছিল, "অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামে তার জন্য এবং তার উপরে আরোপিত দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে না জানবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর হদ্দ, কিসাস ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা যাবে না।[২৮৬]

উপরোক্ত হাদীসে দেখা যায় যে, কিশোর-কিশোরী তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকা যদি অপরাধ করে এবং অপরাধ যদি হুদুদ ও কিসাস পর্যায়েরও হয় তারপরেও তাদেরকে শাস্তি প্রদান না করা বরং তাদেরকে শাস্তি হতে অব্যাহতি প্রদান করা। বিশেষ করে তা যদি হদ সংক্রান্ত বা কিসাস বিষয়ক কোন বিধান হয়ে থাকে। এপ্রসঙ্গে হযরত আয়শা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) এর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা যায়। হাদীস দুটিতে স্পষ্টভাবে নাবালেক শিশু-কিশোরের অপরাধের দায়মুক্তি বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে আব্দুর রাযযাক সুফিয়ান থেকে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন,.لا تقام الحدود إلا على من بلغ الحلم ، جاءت به الاحاديث অর্থ: "প্রাপ্ত বয়স্ক ছাড়া কারও উপর হদ্দ জারি করা যাবে না। এ বিষয়ে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।"[২৮৭] সুতরাং শিশু-কিশোররা হদ্দ ও কিসাসসের শাস্তির আওতামুক্ত থাকবে।

উপরোক্ত হাদীসমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, যদি কিশোর-কিশোরী অপরাধ করে তাহলে তাদেরকে সংশোধনের জন্য তা'যিরী শাস্তি প্রদান করা যেতে পারে। তবে এ শাস্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হবে তাদের সংশোধন ও শিক্ষা এবং পরবর্তীতে যেন এ ধরনের অপরাধ বা বিচ্যুতি না ঘটে তার জন্য। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন এ ধরনের শাস্তি প্রদান করতে যেয়ে শাস্তির মাত্রা যেন বাড়াবাড়ি রকমের না হয়। আর যদি শিশু-কিশোর হদ্দ পর্যায়ের কোন অপরাধ করে থাকে তাহলে তাদেরকে এ ধরনের অপরাধ থেকে মুক্তি প্রদান করা। তবে জান ও মালের ক্ষতির ক্ষেত্রে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। এব্যাপারে ইসলামি আইনজ্ঞদের অভিমত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

---

২৮৬. হাফেজ আবূ বকর আব্দুর রাযযাক ইবন হাম্মাম, *আল-মুসান্নাফ*, কিতাবুল 'উকূল, বাবুল কাওদু মিম্মান লাম ইউবলেগাল হুলম (জোহানেসবার্গ, করাচী, গুজরাট : মাসলিস 'ইলমি, ১৩৯২হি.), ১ম সংস্করণ, খ. ৯, হাদীস নং- ১৭০৬৪, পৃ. ৪৭৪
২৮৭. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৭০৬৪, পৃ. ৪৭৪

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন নাবালেগ-

ক। সাত বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পূর্বপর্যন্ত যাবতীয় অপরাধ কর্মের শাস্তি হতে রেহাই পাবে কিন্তু জান-মালের ক্ষতির ক্ষেত্রে তাহার মাল দ্বারা ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধ্যকর হবে।

খ। সাত বৎসর বয়স হতে বালেগ হওয়ার মধ্যবর্তী বয়স পর্যন্ত হদ্দ হতে রেহাই পেলেও তাযীর ও সংশোধনমূলক শাস্তি হতে রেহাই পাবে না এবং জান-মালের ক্ষতির ক্ষেত্রে তার মাল দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ বাধ্যকর হবে।[২৮৮]

ইসলামি আইনে কোন কর্মের জন্য দায়ী করার ভিত্তি হলো দু'টি: বোধশক্তি ও স্বাধীন এখতিয়ার। এ দিক লক্ষ্য রেখে ইসলামি শরী'আহ শিশুর জন্ম হতে বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বোধশক্তি ও স্বাধীন এখতিয়ারের ক্রমোন্নতি ও পরিপূর্ণতার পর্যায়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইন প্রণয়ন করেছে। বোধ শক্তিহীন অবস্থায় কার্য জবাবদিহীতা হতে মুক্ত। দুর্বল বোধশক্তির স্তরে শিশু সংশোধনমূলক শাস্তির আওতায় আসে। পূর্ণ বোধশক্তি সম্পন্ন শিশু সংশোধনমূলক শাস্তি ও তা'যীরের আওতায় আসে।

শিশু প্রথম স্তরে ফকীহগণের ঐক্যমত অনুযায়ী সাত বৎসর নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে শিশুকে 'ছগীর গায়র মুমায়্যিয' (অবিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী) বলা হয়। বোধ শক্তির উন্মেষ ঘটার মূলত সুনির্দিষ্ট কোন বয়সসীমা নেই। পরিবেশের পার্থক্য, দৈহিক বর্ধন ও মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্যের কারণে সাত বৎসরের পূর্বে বা পরেও বোধশক্তি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ফকীহগণ অধিকাংশ শিশুর দৈহিক ও মানসিক গড়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই সীমা সাত বৎসর নির্ধারণ করেছেন, যাতে ফয়সালাদানের ক্ষেত্রে একটি ঐক্য বজায় থাকতে পারে। মোটকথা যে শিশু সাত বৎসরে পদার্পণ করে নাই তাকে 'গায়র ছগীর মুমায়্যিয' বলা হবে যদিও তার চেতনা শক্তি উক্ত বয়সের শিশুর চেয়েও অধিক হয়। সুতরাং এ বয়সসীমার মধ্যকার কোন শিশু অপরাধ করলে তাকে সংশোধনমূলক শাস্তিও প্রদান করা যাবে না এবং তাযীরের আওতায়ও না। উদাহরণস্বরূপ সে যদি হদ্দের আওতাভুক্ত কোন অপরাধ করে, যেমন অপরের মাল চুরি করে, তবে তার উপর চুরির শাস্তি কার্যকর হবে না। যদি সে কাহাকেও হত্যা করে তবে এর জন্যও সে কিসাসের দণ্ডে দণ্ডিত হবে না এবং তাযীরের আওতায় তাকে দৈহিক শাস্তি প্রদান করা যাবে না। তবে তার মাল হতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা বাধ্যকর হবে। সে ক্ষতিপূরণ শাস্তিস্বরূপ নয়, ক্ষতি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে। শিশু তার সম্পত্তি থেকে তার স্ত্রী ও আত্মীয় স্বজনকে ন্যায্যমত খরচ দিতে বাধ্য। এক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য যে আইন প্রযোজ্য হয়, শিশুর জন্যও সে আইন প্রযোজ্য। কিন্তু যে দায়িত্ব শাস্তিমূলক, শিশু সে দায়িত্ব প্রতিপালনে বাধ্য নয়।[২৮৯] কারণ শরী'আহ আইনে মানবদেহ, মানবজীবন ও তার সম্পদ সর্বাবস্থায় নিরাপদ। তাই এর ক্ষতিপূরণও বাধ্যকর।

---

২৮৮. গাজী শামসুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১১৯
২৮৯.*ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ.১২০

নাবালেগ বয়সের দ্বিতীয় স্তর হল সাত বৎসর হতে বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। শিশুর এ সময়কে সগীর মুমায়্যিয (পরিণামদর্শী, বুদ্ধিমান সম্পন্ন) হিসেবে গণ্য হয়। এ পর্যায়ে সে হদ্দ, কিসাস বা তাযীরাধীন কোন অপরাধকর্ম করলে তার উপর অপরাধকর্মের শ্রেণি অনুসারে হদ্দ বা কিসাসের শাস্তি প্রদান করা যাবে না। তবে সংশোধনমূলক শাস্তি (তাদীব)[২৯০] এবং উপদেশ, সতর্কীকরণ ও তিরস্কার পর্যায়ের তাযীরাধীন শাস্তি প্রদান করা যাবে। এ স্তরে কোন শিশু মানবদেহ, মানব জীবন ও মাল সম্পর্কিত কোন অপরাধ করলে তার মাল দ্বারা উহার ক্ষতিপূরণ প্রদাান বাধ্যকর হবে।[২৯১] অতএব দেখা যায় যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বা কিশোর-কিশোরী হদ্দ, কিসাস পর্যায়ের অপরাধ করলেও তার উপর অপরাধকর্মের শ্রেণি অনুসারে হদ্দ বা কিসাসের শাস্তি প্রদান করা যাবে না। তবে সংশোধনমূলক শাস্তি বা তা'যীরি শাস্তি উপদেশ, সতর্কীকরণ ও তিরস্কার ইত্যাদি শাস্তি প্রদান করা যাবে।

শিশু-কিশোর কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার বিধান

কোন শিশু-কিশোর বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে কিংবা কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যাকারী শিশু-কিশোরের মৃত্যুদণ্ড হবে না; তার মাল হতে দিয়াত প্রদান বাধ্যতামূলক হবে। কেননা নাবালেগের ইচ্ছাকৃত হত্যা এবং অনিচ্ছাকৃত হত্যা (কতলে আমদ ও কতলে খাতা) উভয়ই সমান। এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : عمد الصبي خطأ. অর্থ: আব্দুর রাযযাক মামার থেকে এবং তিনি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের ইচ্ছাকৃত অপরাধও ভুল হিসেবে গণ্য।[২৯২] অপর বর্ণনায় বলা হয়,.عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : مضت السنة أن عمد الصبي خطأ. অর্থ: চিরাচরিত নিয়ম হলো বালকের ইচ্ছাকৃত অপরাধও ভুল হিসেবে গণ্য।[২৯৩]

আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক ও অপাপ্তবয়স্ক দু'জন মিলে হদ্দ পর্যায়ের অপরাধ সংঘটিত করে তাহলেও কিশোরকে হদ্দের শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে হবে এজন্য তাকে দিয়াত বা অনুরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিতে হয়েছে যে,

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا ، قال : يقتل القاتل ، وتكون الدية على أهل الصبي ، إن عمد الصبي خطأ ، قال الحسن : دية ولا قتل-

অর্থ: আব্দুর রাযযাক মামার থেকে, তিনি কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন, একটি লোককে ইচ্ছা করে একজন বালক ও একজন পুর্ণবয়স্ক লোক হত্যা করেছিল। তখন কাতাদা বলেছিলেন খুনী লোকটিকে হত্যা করা হবে এবং

২৯০.নাবালেগের শাস্তি হিসেবে গণ্য না হয়ে প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য হবে। তাকে ভদ্র, সভ্য, অধ্যবসায়ী, কর্মঠ, নিয়মানুবর্তী ও ধর্মানুরাগী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার উপর তা'যীর তাদীব হিসেবে কার্যকর হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের সন্তান সাতবৎসর পদার্পণ করতেই তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও। আর তার বয়স দশ বৎসর পদার্পণ করলে এর জন্য তাকে মৃদ্যু প্রহার কর। (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৬)

২৯১. গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৬০৪-৫

২৯২. হাফেজ আবূ বকর আব্দুর রাযযাক ইবন হাম্মাম, *আল-মুসান্নাফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭০৬৫, পৃ. ৪৭৪

২৯৩. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৭০৬৪, পৃ. ৪৭৪

বালকটির পরিবারকে দিয়্যত বা রক্তপণ দিতে হবে। কারণ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক স্বেচ্ছায় কিছু করলেও সেটা ভুল হিসেবে গণ্য। তবে হাসান বসরি বলেছেন, শুধু দিয়্যত দিতে হবে, মৃত্যুদণ্ড হবে না।[২৯৪] আব্দুর রাযযাক আরো বর্ণনা করেন যে,

عن ابن جريج قال : قال كثير من الناس لا يقتل به ، من أجل أنه لا يدرى لعل الصبي هو الذي قتله ، كما لو أرسلنا كلبا معلما على صيد فعرض للصيد مع هذا الكلب كلب غير معلم ، فاجتمعا في قتله لم يؤكل. অর্থ: ইবন জুরায়জ বলেছেন, অনেক লোকের অভিমত হলো, এজন্য হত্যা করা যাবে না। কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে না কে খুনটা করেছে? হতে পারে ঐ বালকই খুন করেছে। যেমন আমরা যদি একটি প্রশিক্ষিত কুকুর শিকারের জন্য পাঠাই এবং তখন আরেকটি প্রশিক্ষণহীন কুকুর এই কুকুরটির সাথে শিকারটির দিকে ধাবমান হয় এবং একসাথে শিকারটিকে হত্যা করে, তবে সেটা আর খাওয়া যাবে না।[২৯৫] অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, في كبير وصغير قتلا رجلا ، قال : لا يقتل واحد منهما ، لانه لا يدرى أيهما الذي أجاز عليه، وعليهما الدية ، حصة الصغير على العاقلة ، وحصة الاخر في ما له.
অর্থ: ছোট ও বড় দুজন মানুষ মিলে কাউকে হত্যার ব্যাপারে ইবরাহিম নাখঈ বলেছেন, 'দুজনের কাউকেই হত্যা করা যাবে না। কারণ তাদের মধ্যে কে যে নিহতকে হত্যা করেছে, জানা যায় না। দুজনের উপরই রক্তপণ ওয়াজিব হবে। বালকের অংশ পরিশোধ করবে তার পুরুষ নিকটাত্মীয়রা (আকিলাহ) এবং অন্যজনের অংশ তার সম্পদ থেকে পরিশোধিত হবে।[২৯৬]

ইমাম কুদুরী উল্লেখ করেন যে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে করা অপরাধ একই। আর এ ক্ষেত্রে আকিলাহদের উপার দিয়াত ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ যে কোন অপরাধের বিধান হলো ৫০০ দিরহাম বা তার বেশি যেটা আকিলাহদের উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাকৃত অপরাধ ইচ্ছাকৃত বলেই গণ্য হবে। এ কারণে তারা নিজেদের মাল থেকে দিয়াত আদায় করবে। কেননা প্রকৃতপক্ষে তো সেটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ। পার্থক্য শুধু এই যে, ইচ্ছাকৃত অপরাধের দু'টি বিধানের একটি অর্থাৎ কিসাস, তার থেকে সরে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয়টি তার দিকে সরে আসবে। অর্থাৎ তার নিজের মাল থেকে দিয়াত ওয়াজিব হবে।[২৯৭]

এ প্রসঙ্গে ড. আব্দুল আযীয 'আমির এর অভিমতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু-কিশোর ব্যভিচার অথবা চুরি অথবা ডাকাতির মতো অপরাধ করলে সামাজিকভাবে তাকে অপরাধী বলে

---

২৯৪. হাফেজ আবূ বকর আব্দুর রাযযাক ইবন হাম্মাম, *আল-মুসান্নাফ*, কিতাবুল 'উকূল, বাব: প্রাপ্তবয়স্ক ও অপাপ্তবয়স্ক দু'জন মিলে হত্যা করলে, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮১২৬

২৯৫. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৮১২৭

২৯৬. *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং- ১৮১২৮

২৯৭. শাইখুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আল-ফারগানী আল-মারগীনানী, *আল-হিদায়া* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৭ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৪১৫

গণ্যই করা হবে না- এমনটি মনে করা সঠিক নয়, কেননা তা হবে আইনের অপব্যাখ্যা মাত্র। বরং উত্তম হলো যে, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অপরাধের ন্যায় শিশু-কিশোরের অপরাধও আইনের দৃষ্টিতে অপরাধ। শুধুমাত্র পার্থক্য হলো- শর্তপূরণ না হওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের উপর সুনির্দিষ্ট শাস্তি যেমন-হুদূদ, কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। তবে কোন শিশু-কিশোর যদি শরী'আতের সুনির্দিষ্ট শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে অথবা তা'যীরী অপরাধসমূহের মধ্যে কোন একটি অপরাধ সংঘটন করে তাহলে তার অপরাধের মাত্রা ও বয়সের উপযুক্ততা বিচার করে সংশোধনমূলক শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে ইসলামি আইনে কোন বাধা-নিষেধ নেই।[২৯৮]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, এ মহা জগতের সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামিন। তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন খলীফা হিসেবে একমাত্র তাঁরই প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র বিধান ইসলাম। ইসলাম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিধান হওয়ায় এটি একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের সমস্ত প্রয়োজনের সঠিক সমাধান ও মূলনীতি বিধৃত হয়েছে। শিশু-কিশোর সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তাদের জন্যও রয়েছে ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধানমালা। বিশেষ করে তাদের প্রতিপালন, পরিচর্যা, শিক্ষা-দীক্ষা ও সামাজিকীকরণে ইসলাম বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ বিশেষ ব্যবস্থায় ইসলাম শিশু-কিশোরদের জন্য পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কর্তব্য সমন্বয় করে দিয়েছে। যাতে শিশু-কিশোর সমাজের একজন আদর্শ মানব হিসেবে বেড়ে উঠে। ইসলাম মূলত প্রতিপালনের মাধ্যমেই তাদেরকে অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এরপরেও কারো মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিলে বা অপরাধ সংঘটিত করলে 'গায়রে মুকাল্লাফ' হিসেবে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার সংশোধনের জন্যও সুন্দরতম ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। সর্বোপরি বলা যায় যে, ইসলাম শিশু-কিশোরদের প্রতি পারিবার, সামাজ ও রাষ্ট্রকে যে সকল দায়-দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করেছে, তা যথাযথভাবে পালনের মাধ্যম্যে শিশু-কিশোরের অপরাধপ্রবণতা ও অপরাধ মানসিকতাকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল ও প্রতিরোধ করা সম্ভব।

---

২৯৮. ড. আব্দুল আযীয 'আমির, *আত-তা'যীরু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

গবেষণার সার্বিক মূল্যায়ন

গবেষণার সার্বিক মূল্যায়ন

কিশোর অপরাধ তথা অপরাধ মানব সমাজের ন্যায় আদি ও অবিচ্ছেদ্য মানবীয় প্রবৃত্তি। বর্তমান সময়ে কিশোর অপরাধ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক সমস্যা। এ সমস্যার নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য এখনই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক হুমকী হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। এ উপলব্ধি থেকেই কিশোর অপরাধ বিষয়ক সমস্যা ও সমাধানের একটি সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ চিত্র অর্জনের নিমিত্তে "কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা: বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রেসমূহের উপর একটি সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পাদন করা হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ইসলামি নির্দেশনা, এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, বিধি-বিধান, তথ্য-উপাত্ত, বিশেষজ্ঞগণের মতামত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বই, রিপোর্ট, গবেষণা জার্নাল, পত্র-পত্রিকা, গেজেট এবং অন্যান্য লিখিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে এবং সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিশোর অপরাধ সমস্যার কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এর সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা শুধুমাত্র কিশোর অপরাধের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং সমাজের নানাবিধ বিষয়ের সাথে ওৎপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। এ গবেষণায় এমন কিছু নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে, যা দ্বারা দেশের এ সমস্যার ভয়াবহতা আরো অধিকতর সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এখানে শুধুমাত্র গবেষণায়প্রাপ্ত সমস্যার উল্লেখযোগ্য চিত্রসমূহ দৃষ্টিগোচর করা এবং কিছু অন্তর্নিহিত উপাদানকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এ সম্পর্কে আরো নতুন নতুন গবেষণার দ্বার উম্মোচিত করবে।

গবেষণার ফলাফলে প্রতিভাত হয় যে, অপরাধ ও অপরাধমূলক কার্যকলাপ মানুষ ও সমাজের ন্যায় অতি প্রাচীন একটি মানবীয় আচরণ। সাধারণত ব্যক্তি বা সমষ্টি কর্তৃক সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মীয় আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আইন বিরোধী কর্মকাণ্ডকেই অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্য কথায় ধর্ম, পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র সমর্থন করে না, ব্যক্তি বা সমষ্টির এমন আচরণ প্রদর্শন করাই সমাজে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। এ অপরাধ ও অপরাধপ্রবণতার জন্য ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উদ্বিগ্নতা, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। তাই মানুষ সভ্যতার শুরু থেকেই এটি প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছে। মানুষ তার মেধাকে কাজে লাগিয়ে নানা পন্থায় অপরাধ দমনের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

শিশু-কিশোররা মানব জাতির রক্ষাকবচ এবং সমাজ, রাষ্ট্র ও আগামী বিশ্ব বিনির্মাণের একমাত্র উত্তরসূরী। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের এ কৈশোরকালেই নির্ধারিত হয় ভবিষ্যৎ সমাজ বিনির্মাণে পৃথিবীতে তার ভূমিকা কী হবে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কতটুকু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে, তা কিশোর

বয়সের বেড়ে উঠার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় কিশোরের এই সময়টাকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনের ভিত্তি তৈরির সময় ধরে নিয়ে তাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সমাজ ও রাষ্ট্র কিশোরদের মানসিক জগতের পরিপূর্ণ প্রসারতাকে আদর্শ বিনিয়োগ হিসেবে মনে করে।

একজন শিশু বা কিশোর অপরাধপ্রবণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। পিতামাতা, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পারা-প্রতিবেশি, বন্ধু-সহপাঠী, সহকর্মী, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্বিক পরিক্রমায় অস্তে আস্তে একজন শিশু-কিশোর অপরাধের সাথে পরিচিত হয় এবং তার মনে অপরাধপ্রবণতা জাগতে শুরু করে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে অপরাধ আচরণ শিখে ধীরে ধীরে সে অপরাধমূলক আচরণে অভ্যস্ত হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নিকট একজন অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) যথার্থই বলেছেন, "প্রত্যেক মানব সন্তানই ফিতরাত তথা ইসলামের উপর জন্ম গ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নি উপাসকরূপে রূপান্তরিত করে।"[১] অর্থাৎ প্রত্যেক মানব সন্তানই সত্য, সুন্দর ও সহজাত ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতপর পিতামাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠে।

গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, পিতামাতা বা অভিভাবকের উপযুক্তভাবে সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থতা, তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অক্ষমতা এবং পরিবারের সদস্যদের অনৈতিক চর্চাই তাদেরকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে। এছাড়া পিতামাতার দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্য, কলহ-বিবাদ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের প্রতি অযত্ন, পারিবারিক শৃঙ্খলার অভাব প্রভৃতি সন্তানের মন-মানসিকতার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। আবার পরিবারের অগ্রজ সদস্যের অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড দেখে দেখে সে এই কাজে অভ্যস্ত হয়। এছাড়া পিতামাতার অযৌক্তিক শাসন, যথাযথ অভিভাবকত্ব ও পরিবারিক মূল্যবোধের অভাবে শিশুর মনোজগত সঠিকভাবে বিকশিত হয় না। অধিকন্তু অভাবী পরিবারের একজন শিশুকে পরিবার ও সমাজের ব্যর্থতার কারণে বাল্যকাল হতে মৌলিক অভাব পূরণের জন্য উপার্জনের প্রতি ঝুঁকতে হয়। অল্প বয়সে অর্থ উপার্জনের চাপে তার ভিতরে অন্য জগত গড়ে উঠে। আবার কোন কোন পরিবারে কিশোর ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি বা মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় না। ফলে তার মধ্যে বঞ্চিত মনোভাব তৈরি হয় এবং সে নিজেকে পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বিপরীত দিকে কিছু পরিবারের অবাধ স্বাধীনতা এবং অঢেল টাকা-পয়সা এবং প্রাথমিক বিচ্যুত আচরণকে আড়াল করে রাখার প্রচেষ্টা কিশোরকে আরো বেপড়োয়া করে তোলে। এছাড়া পরিবারের নিকটতম সদস্যের দ্বারা যৌন নির্যাতনের কারণেও অনেক সময় শিশু ও কিশোরীর মনের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যায়। সর্বোপরি সমাজে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারে রূপান্তর ও পিতামাতার কর্মমুখীতার

১. ইমাম আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (রহ.), *সহীহুল বুখারী*, কিতাবুল জানাযিয, বাবঃ মা কিইলা ফি আওলাদিল মুশরিকিনা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১০৮৫; ইমাম হাফেজ আবূল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.), *আস-সহীহু লিমুসলিম*, কিতাবুল কাদর, বাবঃ মা'আনা কুল্লি মাওলুদি ইউলাদু আলাল ফিতরাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৬৫৮

কারণে শিশু-কিশোর ভীষণ একাকীত্ব ও অবসাদগ্রস্ততা অনুভব করে। এসময় কিশোরের মনে নানা কৌতূহল উঁকি দেয় এবং বন্ধুদের সাহচর্যে এসে তা পূরণ করার চেষ্টা করে। এসকল সার্বিক কারণে তার মনে অপরাধপ্রবণতা বাসা বাঁধতে থাকে। তাই বলা যায় যে, প্রতিকূল পারিবারিক পরিমণ্ডল হচ্ছে কিশোর অপরাধের সূতিকাগার।

এরপরেই শিশু-কিশোরের অপরাধের কারণ হিসেবে সমাজ, সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র ফুটে উঠেছে। কিশোর অপরাধের জন্য সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠদের অনৈতিক আচার-আচরণ ও সমাজপতিদের সমাজ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। সামাজিক বৈষম্য, শোষণ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ ও আচরণগত পার্থক্য প্রভৃতি কিশোরদের মনে প্রতিহিংসার জন্ম দেয় এবং তাদেরকে অপরাধী করে তোলে। সর্বোপরি সামাজিকভাবে বৈধ-অবৈধ ও ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ উঠে যাওয়ায় এবং অবৈধ সুযোগ সুবিধার সহজলভ্যতা ও প্রলোভন বৈধ পন্থার চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় হওয়ায় কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রতিপালনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়।

গবেষণায় প্রতিভাত হয় যে, এক সময় কিশোররা যে সমস্ত অপরাধ বা অপরাধমূলক আচরণে অভ্যস্ত ছিল, এখন সেসব আচরণের পরিবর্তে প্রাপ্তবয়স্কের অপরাধসমূহ যেমন- চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড, চোরাকারবারি, মাদকগ্রহণ ও মাদক ব্যবসা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণে প্রবেশ করছে। কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণের এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে শান্তি ও কল্যাণময় সমাজ এবং রাষ্ট্রের জন্য হুমকির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমীক্ষায় দেখা যায় যে, পকেট মারা, ছিনতাই ও ডাকাতি করা, নেশাগ্রস্ত হওয়া, মদ্যপান করা, মেয়েদের টিজ করা প্রভৃতি অপরাধ দলীয়ভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে করে থাকে। অধিকাংশ কিশোর তাদের গ্রুপের বন্ধু বা অগ্রজ কোন সদস্যের মাধ্যমে ধুমপান, নেশাগ্রস্ত হওয়া বা যৌন অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য অপরাধে প্রবেশ করে। এ ছাড়াও ইঙ্গিতপূর্ণ নিষিদ্ধ বই, পর্ণগ্রাফি প্রভৃতিও দলীয় অভিজ্ঞতার ফল। অধিকন্তু মদ, জুয়া, বাজি, নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াত, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং আযাচার যৌনস্বাদ উপভোগ (যেমন, হস্তমৈথুন, সমকামীতা প্রভৃতি) স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, এসব আপরাধমূলক আচরণ মূলত খারাপ সঙ্গী-সাথী ও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অনৈতিক ও খারাপ প্রচার-প্রচারণার প্রভাবে সৃষ্টি হচ্ছে। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে মাদকাসক্ত হওয়ার প্রবণতা আশঙ্কজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের সাক্ষাৎকার থেকে পাওয়া যায় যে, তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ভিন্নতার সাথে নেশাদ্রব্যেরও পার্থক্য রয়েছে। লোকাল মদ ও তারী পান, ইনজেকশনের মাধ্যম ড্রাগ গ্রহণ, জুতার পেস্টিংয়ের গন্ধ শুকা প্রভৃতি পদ্ধতিতে মাদকাসক্ত হওয়ার মাত্রা নিম্নশ্রেণির মধ্যে বেশি। বিপরীতদিকে হিরোইন, বিদেশী মদ, ইয়াবা প্রভৃতি গ্রহণের মাত্রা অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবারের সন্তানদের মধ্যে বেশি। কিন্তু তাদের সকলের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মিল

রয়েছে-তাহলো তারা প্রথমে বন্ধুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নেশাগ্রস্ত হয়েছে এবং এ ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত হয়েছে। এছাড়া গবেষণায় প্রতিফলিত হয় যে, কিশোর অপরাধ সমস্যা বা তাদের বিচ্যুত আচরণ তুলনামূলকভাবে নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানদের উপর বেশি প্রভাব বিস্তার করে।

গবেষণায় আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে যে, শিশু-কিশোরদের সকল অন্যায় কাজই তাদের দলের অগ্রজ সদস্য, বড় ভাই বা স্থানীয় প্রভাবশালী কোন অসৎ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক প্রভাবশালী কোন খারাপ ব্যক্তির ছত্র-ছায়ায় গড়ে উঠছে। এক্ষেত্রে ছোট-খাট কোন সমস্যা হলে বড় ভাই বা ঐ প্রভাবশালী ব্যক্তিই দেখভাল করে। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, কিশোর অপরাধ আচরণ বা বিচ্যুতি শুধু কিশোরদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই বরং এসব অপরাধের সাথে বয়স্করাও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে।

একজন কিশোর সমাজের নিন্দনীয় কাজে জড়িয়ে পড়ার ধরন ও মাত্রার সাথে সমাজের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন পরিবর্তনীয় উপাদান যেমন, কিশোরের বয়স, পরিবারের আকার, পরিবারের উপার্জন, পিতামাতার অভিভাবকত্ব, তাদের পেশা ও সামাজিক অবস্থার সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। যেসব পরিবারের আকার বড় কিন্তু উপার্জন অপেক্ষাকৃত কম, সেসব পরিবারের কিশোরের মধ্যে বয়স বৃদ্ধির সাথে অপরাধ আচরণের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু যেসব কিশোরের অভিভাবক পিতামাতা নয় বা মিশ্রিত অভিভাকত্ব আছে তাদেরও অপরাধে জড়িত হওয়ার হার বেশি। যে সমস্ত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা করুণ বা যে সমস্ত পরিবার পিতামাতার মৃত্যু, বিবাহ বিচ্ছেদসহ অন্যান্য কারণে ভেঙ্গে গেছে সে সমস্ত পরিবারের কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার সবচেয়ে বেশি। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রায় ৪৮% অপরাধী নিবাসী ভগ্ন পরিবার থেকে এসেছে।

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকাংশ কিশোরদের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তাদের কোন ভবিষ্যত পরিকল্পনা নেই। তাদের বা তাদের অভিভাবকদের কারোই সুন্দর জীবন সম্পর্কে বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আগ্রহ নেই। এসব কারণে তাদের অনেকেরই কিশোর বয়স হলেও লেখা-পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ নেই।

সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের সন্তানদের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। কিছু বালকের সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম (যেমন, পিকেটিং, মিটিংয়ে অংশগ্রহণ, মিছিল, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ, ভিন্ন গ্রুপ বা দলের মিছিল বা মিটিং পন্ড করা) বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় যে, নিম্ন আয়ের পরিবারের সন্তানদের সহজেই ধর্মঘট, হরতাল, ভাঙ্গচুর, আগুন দেওয়া প্রভৃতি বিচ্যুত কাজকর্মে ডেকে নেওয়া যায়, যা সরাসরি কিশোরদের মনে উন্মত্ত আবেদন সৃষ্টি করে।

যেহেতু পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কর্ণধার শিশু-কিশোর, তাই তাদের উক্ত অপরাধ ও অপরাধমূলক আচরণের জন্য শাস্তি নয়; বরং সংশোধন ও উন্নয়নই একমাত্র পথ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায়

কিশোর অপরাধের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সবচেয়ে জরুরি। তাই শিশু-কিশোরদের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে শিশু আইন ও শিশু নীতির আলোকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে শিশু উন্নয়ন ও সংশোধন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ গবেষণাকর্মে সরকারি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে মাঠপর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম থেকে যে সব তথ্য-উপাত্ত উঠে এসেছে তাতে দেখা যায় যে, এসকল কার্যক্রম কাগজে কলমে সঠিকভাবে চলছে মনে হলেও বাস্তব অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়। সেখানকার শিশু-কিশোরদের অবস্থা অনেকটাই নাজুক। তাদের খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসাসেবা, বিনোদনসহ প্রায় সব মৌলিক অধিকারই ক্ষুণ্ন হচ্ছে। টঙ্গী ও যশোর উন্নয়ন কেন্দ্র দু'টিতে নিবাসীদের আবাসিক অবস্থার চরম সংকট বিরাজ করছে। ডাক্তারের অভাবে কোন কেন্দ্রেই উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায় না। কারিগরি প্রশিক্ষণও চলছে ঢিলেঢালাভাবে। সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রম নামে মাত্র রয়েছে। কারণ এখানে আগত নিবাসীদের শতকরা ৯৫ ভাগের বেশি নিবাসীর বয়স ১২ বছরের উপরে। অথচ এখানে পঞ্চম শ্রেণির পরে সাধারণ শিক্ষার আর সুযোগ নেই। এছাড়াও প্রয়োজনের তুলনায় কিশোর আদালতের সংখ্যা একেবারেই কম হওয়ায় শিশু-কিশোরের বিচারকার্য ফৌজদারি আদালতে সম্পন্ন হচ্ছে। যা মোটেও কাম্য নয়। ফলে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের যথাযথ সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন সম্ভব হচ্ছে না বরং কিছু ক্ষেত্রে নিবাসীদের মনে আরো বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

ইসলাম একটি শ্বাশত যুগোপযোগী কল্যাণকর সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা। এর মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর বাণী আল-কুরআন এবং পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর জীবনাদর্শ তথা সুন্নাহ। এই দু'টি উৎসে পৃথিবীর ধ্বংস অবদি মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্যার সমাধান রয়েছে। মানুষ সমাজের প্রয়োজনে এবং সকল সমস্যার সমাধানের জন্য আল-কুরআন ও রাসূল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাহ গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে মানব কল্যাণকর ব্যবস্থা উপস্থাপন করবে- এটাই ইসলামের দাবী। এই অভিসন্দর্ভে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনে মহান আল্লাহর বাণী এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর সুন্নাহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইসলামি জীবনাদর্শে শিশু-কিশোরদের অপরাধমুক্ত মানসিকতা গঠনে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে করে একজন শিশু বা কিশোরকে অপরাধ করার পূর্বেই অপরাধমুক্ত মানসিকতায় গড়ে তোলা যায়। এই প্রসঙ্গে ইসলাম সন্তান লালন-পালন ও শিক্ষাদানে পরিবারের প্রতি যে কর্তব্য নির্ধারণ করেছে, তা বর্তমান সময়ে খুবই ফলপ্রসূ ও কার্যকর। এছাড়া ইসলাম সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি যে দায়িত্ব-কর্তব্য অর্পণ করেছে, তা শিশু-কিশোরকে অপরাধে প্রবেশের যাবতীয় পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

ইসলাম পরিবার পরিচালনায় একজন শিশুর জন্য তার জন্মপূর্ব পরিচর্যা থেকে তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। বিশেষ করে অনৈতিক উপায়ে সম্পদ অর্জন ও সে সম্পদ দ্বারা শিশু সন্তানের প্রয়োজন পূরণ নিষিদ্ধ করেছে। অনৈতিক বা মূল্যবোধের অবক্ষয় হতে পারে এমন আচরণ থেকে

পরিবারের সদস্যদেরকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আর সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে এবং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে।

অনুরূপভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র যেন কোন অন্যায়-অনিয়ম, অনাচার ও অত্যাচারমূলক আচরণ না করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি মানবিক মূল্যবোধের চর্চা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন কার্যকর করা, শ্রমিকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান, ন্যায় বিচার নিশ্চিত করাসহ সকল অসাম্য দূরীভূত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রকে বদ্ধপরিকর থাকার নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামের এসকল সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটি সমাজে যেসব কারণে কিশোর অপরাধ বিস্তার লাভ করে, তার প্রতিটি উৎসমূল এখানে রুদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে শিশু-কিশোরের জন্য এমন এক সমাজ উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে অপরাধের সাথে তার পরিচয় না ঘটে বা তার মনে অপরাধপ্রবণতা বাসা বাঁধার সুযোগ না পায়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, পথপ্রদর্শক ও সমাজ ব্যবস্থাপক। তাঁর জীবন চরিত থেকেও শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণতা প্রতিরোধের উজ্জ্বল আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি শৈশব-কৈশোরে নিজে সমস্ত অন্যায়-অপরাধমুক্ত ছিলেন, ছিলেন ন্যায় বিচারক এবং সমাজ থেকে অন্যায়-অনাচার দূর করার চেষ্টায় নিমগ্ন। আমরা দেখতে পাই যে, জন্মের পর শিশু হযরত মুহাম্মদ (সা.) দুধ মাতা হালিমার গৃহে থাকা কালে কখনও তাঁর দুধ মায়ের উভয় স্তন হতে দুধ পান করেননি। সব সময় তিনি একটি স্তন থেকেই দুধ পান করতেন। অপরটি তাঁর দুধ ভাই আব্দুল্লাহ ইবন হারিছের জন্য রেখে দিতেন। ন্যায় বোধের এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। এছাড়া শৈশব-কৈশোরে বালকরা সবাই যখন হেসে খেলে কাটায়, হৈ-হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়ায়, মুহাম্মদ (সা.) তখন সেসব কাজ থেকে দূরে থাকতেন। খেলতে খেলতে ছেলেরা যখন ঝগড়া করত, তখন তিনি এসে তা থামিয়ে দিতেন। সুযোগ পেলেই মহানবী (সা.) মানুষের উপকার করতেন, মানুষকে ভালো উপদেশ দিতেন।[২]

জাহেলী যুগে মক্কার অধিকাংশ মানুষ ছিল খুব খারাপ আচরণে অভ্যস্ত। তারা মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানি করত। ঝগড়া ও খুন-খারাবি ছিল তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। তারা মদ খেয়ে মাতলামি করতো। তাই কারও মনে শান্তি ছিল না। এসব অনাচার ও অশান্তির কারণে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের এ অবস্থা দেখে মনে খুব কষ্ট পান। ইতোমধ্যে ‘হরবুল ফুজ্জারের’ ভয়াবহতা তাঁকে আরো ব্যথিত করে তুললো। তিনি ভাবেন-কীভাবে সমাজের এসব অসঙ্গতি ও দুর্দশা দূর করা যায় এবং কীভাবে পথহারা মানুষগুলোকে আবার ভালো করা যায়। তিনি অবশেষে ঠিক করলেন, সবাই মিলে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ জন্য তিনি যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করে ভালো কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ তিনি জানতেন যুবকরাই হলো আসল শক্তি। তিনি যুবকদের নিয়ে গঠন করলেন ‘হালফুল ফুযুল’ নামে এক শান্তি সংঘ। এই শান্তি সংঘে

২. ইকবাল কবীর মোহন, *ছোটদের মহানবী (সা.)* (ঢাকা: শিশু কানন, ২০১১খ্রি.), পৃ. ১৪

যেসব কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তাহলো, (ক) যারা অনাথ-অসহায় সকলে মিলে তাদের সেবা করবে। (খ) যারা যুলুম করবে সকলে মিলে তাদের বাধা দিবে। (গ) যার উপর যুলুম করা হয়েছে সকলে মিলে তাকে সাহায্য করবে। (ঘ) কেউ ঝগড়া-বিবাদ করবে না। (ঙ) সবাই মিলেমিশে থাকবে।[৩]

মহানবী (সা.) ছিলেন অত্যন্ত শিশু বান্ধব, সর্বদা শিশুদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতেন, আদর-স্নেহ ও ভালবাসা দিতেন। কোন শিশু-কিশোর অন্যায় করলে তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান না করে সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে তা বুঝিয়ে দিতেন। যেমন আমরা দেখতে পাই যে, একটি বালক খেজুর চুরির অপরাধে ধৃত হয়ে বিচারের মুখোমুখী হলে, আল্লাহর রাসূল (সা.) বালকটিকে হাস্যোজ্জ্বলভাবে জানতে চান, তুমি এভাবে ফল পেরেছো কেনো? বালকটি বলল, আমার খেতে ইচ্ছে করে, তাই। তখন নবী (সা.) তাকে শাস্তি না দিয়ে বললেন, যে ফল নিজে গাছ থেকে তলায় পড়ে, সেগুলো কুড়িয়ে খাবে। ঢিল ছুড়বে না। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) বালকটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর এতো সুন্দর ফয়সালার পর মালিক যেমন সন্তুষ্ট হয়েছে, তেমনি বালকটির মধ্য থেকেও চুরি করে খাওয়ার প্রবণতা দূর হয়েছে।

এ ঘটনায় শিক্ষণীয় হলো আল্লাহর রাসূল (সা.) বালকের কর্মকে চুরি হিসেবে আখ্যায়িত করেননি, যাতে তার মধ্যে চুরি সম্পর্কে কোন বোধ না জাগে। তিনি বালকটিকে শাস্তির আওতায় না এনে সুন্দর উপায়ে সংশোধনের ব্যবস্থা করলেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ-ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে বনূ কুরায়যার বিচারের ঘটনায় দেখা যায় যে, যুদ্ধ অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়ার পরেও যে সমস্ত কিশোর প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, রাসূল (সা.) তাদের মুক্ত করে দিয়েছেন। এই ঘটনা থেকেও কিশোরদের অপরাধপ্রবণতাকে আমরা সংশোধনমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রেরণা পাই। একই সাথে তাদের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজে পুনঃএকত্রীকরণে সুযোগ করে দেওয়ার বিষয়টিও চলে আসে। তাই একমাত্র ইসলামের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে সামগ্রিকভাবে অপরাধের উৎসমূল বিনাশ করে দিয়ে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

---

৩. ইকবাল কবীর মোহন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬; Majid Ali Khan, *Muhammad The Final Messenger* (India: Islamic Book Service,1998), p.332

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সুপারিশমালা

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে সুপারিশমালা

কিশোর অপরাধ বহুমাত্রিক একটি সমস্যা। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে উদ্ভূত কিশোর অপরাধের মত সমস্যা আজকে নানাবিধ কারণে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এখনই কিশোর ও তরুণ সমাজকে অপরাধপ্রবণতা থেকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। কিশোর অপরাধ সমস্যা নির্ধারিত কোন বিধিমালা বা সুপারিশের আলোকে এর সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। যতদিন সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক নীতিমালায় নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত না হবে; ততদিন পর্যন্ত এ সমস্যার শতভাগ সমাধান সম্ভব নয়। মানব সমাজ যতদিন থাকবে, ততদিনই সমাজের সাথে অপরাধপ্রবণতা বিরাজ করবে। তাই যতটা সম্ভব অপরাধকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা যায়, সে আকাঙ্ক্ষা থেকেই "কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা" শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনার মাধ্যমে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়েছে। গবেষণায় যে সমস্ত বিষয় কিশোরকে অপরাধপ্রবণ হতে সহায়তা করে বা তাকে অপরাধী করে তোলে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, সেসব বিষয় প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার কিছু পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণায়প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও কিশোরের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত বিষয়ে গুরুত্বারোপ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং যে সমস্ত বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার সে বিষয়ে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১। পরিবারকে একটি উত্তম আশ্রয়স্থল ও শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে তুলতে হবে। শৈশব থেকেই যেন শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি, ব্যক্তিত্ব গঠন ও বিকাশ সাধিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। পরিবারেই শিশু-কিশোরকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর দীক্ষা দিতে হবে এবং সমস্ত মন্দ গুণাবলী থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে। মোদ্দাকথা শিশু-কিশোরের অপরাধপ্রবণতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে হলে প্রথমেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে অভিভাবকগণের সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিকতার চর্চা করে সমস্ত অনৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চর্চা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই শিশু-কিশোরের অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পাবে।

২। প্রকৃত অর্থে কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও সংশোধন করে কিশোরের উন্নয়ন করতে হলে সর্বপ্রথম সমাজের সকল অন্যায়, অনাচার ও অনৈতিকতা দূর করতে হবে। সামাজিক আচার-আচরণ ও সামাজিক জীবনে বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে অপরের প্রতি সহমর্মিতা, ভালবাসা, একে অপরের দুঃখে এগিয়ে আসা, অন্যের ক্ষতি না করা প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক বৈষম্য ও আনাচার প্রতিরোধ করতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করে

পুরো সমাজকে নৈতিক মূল্যবোধে জাগ্রত করতে হবে। সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক শিক্ষণীয় আচারগুলো ফিরিয়ে আনতে হবে। মোদ্দাকথা শিশু-কিশোরের নিকট এমনভাবে সমাজকে উপস্থাপন করতে হবে যে, এখান থেকেই সে তার পবিত্র চিত্তের বিকাশ, পরিচ্ছন্ন মনের ক্ষুধা মিটানোর যাবতীয় উপকরণ পেয়ে যায়।

৩। সমাজের মুখোশধারী ভদ্রবেশী অপরাধীকে আইনের মুখোমুখি করতে হবে। এসকল ভদ্রবেশি ও মুখোশধারী অপরাধীদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে শিশু-কিশোরদের মনে তাদের ক্ষমতা ও চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যার প্রভাবে তাদের মনে অপরাধপ্রবণতা দানা বাঁধে। তাই শিশু-কিশোরের অপরাধ প্রতিরোধ করতে হলে সমাজের এসকল ভদ্রবেশি অপরাধীদের মুখোশ উন্মোচন করে তাদেরকে দমন করতে হবে।

৪। জনসংখ্যা সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ। কিন্তু বেকারত্ব ও কর্মহীন জনসংখ্যা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যার অন্যতম উৎস। এটি কিশোর অপরাধ সমস্যারও অন্যতম কারণ। স্বল্প আয়তনের এ দেশে বেকারত্ব দূর করা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে সত্যিই দুরূহ কাজ। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে না পারলে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য খুবই কষ্টকর হবে। তাই জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তর করার জন্য কর্মমুখী বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

৫। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বহুবিধ প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার উত্তরণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে অনুপম আদর্শ উপস্থাপন করতে হবে। এমন আদর্শিকতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যেন এর শিক্ষা-দীক্ষা শিশু-কিশোরের মনে স্থায়ী রেখাপাত করে। সর্বোপরি প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত অর্থে আদর্শিক ও শিশু-কিশোর বান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে।

৬। শিক্ষক হচ্ছেন ছাত্রের কাছে একটি আদর্শের নাম। পিতামাতার পরে শিশু-কিশোর শিক্ষক দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে জন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিকট অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হবে।

৭। বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা নষ্ট করে দিয়ে বস্তুজাগতিক স্বার্থলাভ ও সম্পদ অর্জনের প্রতি আর্কষণ সৃষ্টি করছে। যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করছে এবং শিক্ষার্থীর নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করছে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন শিক্ষার বিষয় বেশি বেশি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষার বস্তুবাদী ও পুঁজিবাদী ধারণা থেকে বের হয়ে শিক্ষার মানবিক দিকগুলোতে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তাই আমাদের শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা

বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার কোর্স আবশ্যিক করা একান্ত প্রয়োজন।

৮। বেকারত্ব সমাজের অন্যতম সমস্যা। গবেষণায় দেখা যায় যে, সমাজে বেকারত্ব থেকেও শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হয়ে কিশোর বেপড়োয়া হয়ে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। তাই দেশে কর্মসংস্থানের পরিধির আরো বিস্তার ঘটিয়ে সমাজ থেকে বেকারত্ব হ্রাস করে প্রত্যেকের মন থেকে আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর করতে হবে।

৯। ধনী-দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য হ্রাস ও বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিহত করতে হবে। অসম অর্থ বণ্টন পদ্ধতির কারণে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দিনে দিনে আরো প্রকট হচ্ছে। ফলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-প্রতিহিংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিশোর মনে সমাজের এ বৈষম্য আরো গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং যে কোন উপায়ে এ বৈষম্য রোধকল্পে সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করে। তাই কিশোর অপরাধ প্রতিরোধের জন্য বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্টা করতে হবে।

১০। অভাব অনটন থেকে অপরাধের জন্ম হয়। সমাজে কিছু লোকের হাতে সম্পদের পাহাড় জমে উঠছে, আবার বিপরীতে কিছু লোক অনাহারে, অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছে। সমাজের নিম্নশ্রেণি টাকার অভাবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভাবের কারণে এসকল পরিবার তাদের সন্তানদেরও সঠিকভাবে লেখাপড়া ও পরিচর্যা করতে পারে না। এক্ষেত্রে সঠিক পন্থায় যাকাত প্রদান হতে পারে অভাবীদের অভাব মোচনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যাকাত ব্যবস্থা সম্পদের এমন একটি সুষম বণ্টন প্রক্রিয়া যাতে ধনীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার প্রদান করা হয়েছে। এটি আদায় করে তা প্রাপ্য হকদারের নিকট পৌঁছে দিয়ে সমাজের অভাব অনেকটা রোধ করা সম্ভব। তাই যাকাত ব্যবস্থা কার্যকর করে যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে।

১১। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সম্প্রীতির বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিশোর অপরাধমুক্ত তথা অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে দেশের স্বার্থে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দলীয় কাজে শিক্ষার্থীদের তথা শিশু-কিশোরের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যবহার রোধ ও রাজনৈতিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষক, সমাজপতি, রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দসহ সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজে অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাস্তবায়নে কাজ করতে হবে। সমাজে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন

ধর্মীয় কারণে কেউ লাঞ্ছিত বা নির্যাতিত না হয়। কেউ যেন কারো ধর্মের বিরুদ্ধে কটুক্তি বা উপহাস করে বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে অসহনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে। তাহলে কিশোরদের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা সৃষ্টি হবে।

১৩। বাংলাদেশে কিশোর সংশোধ ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাসমূহ উত্তরণ করতে হবে। বিশেষ করে তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ১৮ কেটি জনসংখ্যার দেশে শিশু ও কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাই প্রতি বিভাগে কমপক্ষে একটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

১৪। শিশু আইনের যে সমস্ত এ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তা দূর করে শিশু-কিশোরদের বিচার শুধুমাত্র শিশু আদালতেই সম্পন্ন করার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৫। শিশু-কিশোদের সংশোধন ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আশানুরূপ সফলতার জন্য শিশু আইনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক জেলায় ও মেট্রোপলিটন এলাকায় শিশু আদালত স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

১৬। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে জনবল কাঠামো পরিবর্তন করে তাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, মনোবিজ্ঞানীসহ অন্যান্য স্থায়ী পদ সৃষ্টি করে সকল পদে নিয়োগ দান করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া জনবল কাঠামো অনুযায়ী কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের শূন্যপদে আশু নিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১৭। অপরাধপ্রবণ বা অপরাধী শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সহায়ক ব্যক্তিবর্গকে মানবিক ও মায়া-মমতাপূর্ণ হতে হবে। পিতৃ-মাতৃত্বপূর্ণ এমন উত্তম আচরণ করতে হবে, যেন অপরাধী শিশু-কিশোরের মনে মাতাপিতার অভাব অনুভূত না হয় এবং অপরাধপ্রবণতা ত্যাগ করে তার মধ্যে একটি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়।

১৮। উন্নয়ন ও সংশোধন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের জন্য বরাদ্দকৃত স্বল্প টাকায় একজন শিশু-কিশোরের বেড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা মানসম্মতভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য নিবাসীদের মাথাপিছু বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১৯। প্রত্যেকটি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে, বিশেষ করে টঙ্গী ও যশোর কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের জন্য আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ ও পুরাতন ভবনসমূহের অবকাঠামোগত সংস্কার করে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২০। প্রবেশন কার্যক্রম শিশু-কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও উন্নয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এখনও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি হয়নি। তাই শিশু আইন,২০১৩-এর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রবেশন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার। তাছাড়া কিশোর অপরাধীদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রবেশন অফিসার নিয়োগ দান করা জরুরী।

২১। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকাংশ নিবাসীর বয়স ১২ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে হওয়ায় তাদের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত জরুরী।

২২। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক সেকেলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবর্তন করে আধুনিক কোর্সসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এছাড়া সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষে কারিগরি বোর্ডের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে এসব সার্টিফিকেট চাকুরীর ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়।

২৩। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের নিবাসীদের খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, সুস্বাস্থ্য-চিকিৎসা, সেনিটেসন ও বিনোদনসহ সকল ক্ষেত্রের অসুবিধা দূর করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২৪। কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অপরাধী নিবাসীদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সংশোধন পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রম বা আফটার কেয়ার সার্ভিস আরো জোরদার করতে হবে। তা নাহলে এসকল অপরাধপ্রবণ শিশুরা সমাজে ফিরে গিয়ে আবারও অপরাধে জড়িয়ে পড়তে পারে।

২৫। দেশের একমাত্র কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে একজন মহিলা মনোরোগবিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রের অধিকাংশ নিবাসী কিশোরী বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির থাকে।

২৬। আইনে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে নিবাসীদের বয়সভেদে রাখার কথা থাকলেও তা পালন করা হচ্ছে না। ফলে কম বয়সী শিশু-কিশোর বেশি বয়সী শিশু-কিশোরদের কাছ থেকে অপরাধমূলক বিভিন্ন আচরণ শিক্ষাগ্রহণ করে আরো বেশি অপরাধপ্রবণ হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিষয়টি আশু সমাধান করা প্রয়োজন।

২৭। রাষ্ট্রকে সামগ্রিক দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সকল প্রকার দুর্নীতি, অত্যাচার-অনাচার প্রতিরোধ করে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য ও ভেদাভেদ হ্রাস করতে হবে। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বৃদ্ধি করে তাদের উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আইন-

শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটিয়ে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এছাড়া জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সাংবিধানিক সকল অধিকার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। অধিকন্তু শিশু-কিশোরের উন্নয়ন, সংশোধন ও পুনর্বাসনের জন্য যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন আইন প্রণয়ন, নীতিমালা গঠন, আলাদা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কিশোর আদালত পরিচালনা প্রভৃতি উদ্যোগ ও কার্যক্রমকে আরো বেগবান করা একান্ত প্রয়োজন।

২৮। ইসলাম একটি যুগোপযোগী সর্বাধুনিক শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। এতে মানব জাতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের উত্তম এবং স্থায়ী সমাধান রয়েছে। শিশু-কিশোরের অপরাধপ্রবণতা প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য ইসলাম মূলত শিশুদের প্রতিপালন ও পরিচর্যার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি শিশুদের প্রতিপালন ও পরিচর্যার জন্য বিশেষ কর্তব্য আরোপ করেছে। ইসলাম নির্দেশিত এসকল কর্তব্য পালন এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে ইসলামের শতভাগ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সমাজের নীতি-নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তন সাধন করে একটি আদর্শ মূল্যবোধসম্পন্ন কাঙ্ক্ষিত সমাজ উপহার দেওয়া সম্ভব। তাহলেই শিশু-কিশোর অপরাধমুক্ত মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠবে।

সর্বোপরি শিশু-কিশোরের প্রতিপালন ও পরিচর্যায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে হবে। সমাজের আপামর জনগণকে তাদের নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা করে অনুজ শিশু-কিশোরদের সামনে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার, যুলুম-নির্যাতন ও দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ সমাজ উপস্থাপন করতে হবে। পরিবারের সর্বত্র ন্যায়-নীতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন করতে হবে। শিশু-কিশোরদের সাথে সদাচরণ ও সদ্ভাব রাখতে হবে। পরিবার, সমাজ ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে এবং সর্বোপরি তাদেরকে পরিবার ও সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। এছাড়া তাদেরকে বিভিন্ন মানবিক ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। শিশু-কিশোরের বিচ্যুত আচরণ বা তাদের ভুল-ত্রুটিগুলো ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে সংশোধন করে দিয়ে তাদের মধ্যে গঠনমূলক কাজের স্পৃহা জাগাতে হবে। মা, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা তথা দেশাত্মবোধক মানসিকতা গড়ে তুলতে সহায়তা করতে হবে। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। সর্বোপরি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে ইসলামের অনুপম সর্বজনীন ও শাশ্বত বিধানের অনুশীলন করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ উপহার দিয়ে শিশু-কিশোরদেরকে অপরাধমুক্ত জীবন গঠনে সহায়তা করতে হবে।

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

শিশু-কিশোররা সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য কিন্তু তারাই আবার সমাজে সবচেয়ে অসহায় ও অরক্ষিত। তারা শারীরিকভাবে যেমন দুর্বল তেমনি মানসিকভাবেও কোমল। তাই এ সময়ে তাদের প্রতি পরিবার ও সমাজের বিশেষ নজরদারি ও যত্নের প্রয়োজন রয়েছে। শিশু-কিশোরদের প্রতি বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যা তাদের মানসিক দৃঢ়তা সৃষ্টিতে এবং মনোজগতের বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে পরিবার ও সমাজের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। পরিবার ও সমাজেই একজন শিশুর শৈশব ও কৈশোর অহিবাহিত হয় এবং পরবর্তী জীবনের প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষা-দীক্ষা এ সময়ের মধ্যে লাভ করে থাকে। শিশু-কিশোরের বিচ্যুত আচরণ, অপরাধপ্রবণতা বা অপরাধ সমাজ থেকেই পাওয়া একটি প্রবৃত্তি। তাই তাদের অপরাধপ্রবণতাকে অপরাধের দৃষ্টিতে না দেখে সংশোধনের জন্য সর্বোতি চেষ্টা করাই পরিবার ও সমাজের মৌলিক দায়িত্ব। এছাড়া শিশু-কিশোর অপরাধপ্রবণ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কোন শিশুই জন্মগতভাবে অপরাধী হয়ে জন্ম নেয় না বরং পরিবার ও সমাজ থেকেই তার অপরাধের হাতেখড়ি হয়। তাই মূলত শিশু-কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ বা অপরাধের জন্য তারা নয় বরং পরিবার ও সমাজই প্রকৃতপক্ষে দায়ী। এ কারণে শিশু-কিশোরের কোন অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করার নৈতিক অবস্থান পরিবার ও সমাজের নেই বরং তাদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের চেষ্টা করে তাদের অপরাধমুক্ত জীবন উপহার দেওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

সমাজে কিশোরের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করে তাদের অপরাধ মানসিকতার উৎসমূল চিহ্নিত করে অপরাধমুক্ত জীবনযাপনের পদ্ধতি উদঘাটনের মানসে **“কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা”** শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে অত্র অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। এ অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, প্রচলিত রীতি-নীতি ও ইসলামের দৃষ্টিতে কিশোরের পরিচয়, কিশোরের বয়সসীমা এবং কিশোরের অপরাধমূলক দায়-দায়িত্বের বয়স সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক লক্ষণ, কৈশোর ধারণার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বিধৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রচলিত আইন ও অপরাধবিজ্ঞান এবং ইসলামি শরী‘আর আলোকে অপরাধ ও অপরাধের শ্রেণিবিন্যাস পরিস্ফুটিত হয়েছে এবং কিশোর অপরাধের পরিচয় ও কিশোর অপরাধী ধারণা স্পষ্ট করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়ে** কিশোর অপরাধের কারণ নির্ণয়ে প্রচলিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনার পাশাপাশি কিশোরের অপরাধপ্রবণতার জন্য পারিবারিক ত্রুটি-বিচ্যুতি, সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সুষম বণ্টনের অভাব ও সাংস্কৃতিক কতিপয় কারণ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। **চতুর্থ অধ্যায়ে** দেশীয় ও আন্তর্জার্তিক পরিমণ্ডলের

বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা এবং ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিশু-কিশোরের অধিকারসমূহ গ্রন্থিত হয়েছে। এছাড়া পিতামাতা, শিক্ষক, বয়োজ্যেষ্ঠ, পাড়া-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সহপাঠী, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কিশোরের দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়টিও ফুঠে উঠেছে। **পঞ্চম অধ্যায়ে** বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র ও এর সামগ্রিক কার্যক্রমের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে। **ষষ্ঠ অধ্যায়ে** বাংলাদেশে শিশু-কিশোরের উন্নয়ন ও সংশোধনের জন্য জাতীয় পরিকল্পনা ও আইনী কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ **৭ম অধ্যায়ে** ইসলাম ও ইসলামি শরী'আতের পরিচয় এবং ইসলামে শিশু-কিশোরের অবস্থান ও মর্যাদগত দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া শিশু-কিশোরের অপরাধমুক্ত জীবনযাপনে পরিবার, সমাজ, শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্য বিধৃত হয়েছে। অধিকন্তু কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের শাস্তি বিধানের ভূমিকা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে।

এ গবেষণায় দেখা যায় যে, মানুষের অপরাধপ্রবণতা মানুষের মতই আদি এবং মানুষের অন্যতম সহজাত কুপ্রবৃত্তি। মানুষ তার এ কদর্য বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও দমন করেই সমাজে কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে আসছে। গবেষণায় কিশোর অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে এর সাথে সংশ্লিষ্ট এমন কিছু উপাদান পাওয়া গিয়েছে যা শুধুমাত্র কিশোর অপরাধের সাথেই সম্পৃক্ত নয় বরং সমাজের নানাবিধ বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এছাড়া এমন কিছু নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে, যা দ্বারা কিশোর অপরাধ সমস্যাকে আরো সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে এবং এ সম্পর্কে আরো নতুন নতুন গবেষণার দ্বার উম্মোচিত হবে।

শিশু-কিশোর সংক্রান্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশেই ১৮ বছরের নিচের বয়সের মানব সন্তানকে শিশু-কিশোর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিচ্যুতি, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন আচরণ কিংবা আইনের সাথে সাংঘর্ষিক আচরণকে কিশোর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তবে শিশুর ৯ বছর বয়স পর্যন্ত (ক্ষেত্র বিশেষ ১২ বছর বয়স পর্যন্ত) কোন আচরণকেই অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। তাই কিশোর অপরাধের সংশোধন কার্যক্রম মূলত ৯ বছর থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

গবেষণায় আরো প্রতিভাত হয় যে, একজন শিশু বা কিশোর জন্ম থেকেই অপরাধপ্রবণ হয় না বরং পরিবার ও সমাজ থেকেই কুপ্রবৃত্তি লাভ করে থাকে। পিতামাতা, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-সহপাঠী, সহকর্মী, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সার্বিক পরিক্রমায় অস্তে আস্তে শিশু-কিশোররা অপরাধের সাথে পরিচিত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে অপরাধমূলক আচরণ আয়ত্ত্ব করে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীসের আলোকে বলা যায় যে, প্রত্যেক মানব সন্তানই সত্য, সুন্দর ও সহজাত ধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর

Dhaka University Institutional Repository

পিতামাতা, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে সে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। তাই তাদের এ মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য পরিবার ও সমাজকেই মূখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়।

পরিবার, সমাজ, বন্ধু-সহপাঠী, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সৃষ্ট বিভিন্ন কারণে শিশু-কিশোররা অপরাধপ্রবণ হতে পারে। কোন একটি সর্বজনীন নির্দিষ্ট কারণেই একজন শিশু-কিশোর অপরাধী হয় না বরং পরিবার ও সমাজের এক বা একাধিক কারণে একটি শিশু বা কিশোর অপরাধী হয়ে ওঠে। গবেষণায় দেখা যায় যে, শিশু-কিশোরের অপরাধী হওয়ার পেছনে পরিবার সবচেয়ে বেশি দায়ী। বিশেষ করে ভগ্ন পরিবার, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কলহ, পিতামাতার মনোমালিন্য, উপযুক্ত অভিভাবকত্বের অভাব, যথাযথ আদর্শ ও মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থতা, সর্বোপরি পরিবারে নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা না থাকায় একজন কিশোর মানবীয় গুণাবলী ধারণে অক্ষম হয় এবং তার মধ্যে অপরাধপ্রবণতা গড়ে ওঠে। এর পরেই সমাজের অনিয়ম, অনাচার, সমাজ কাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা কিশোর অপরাধের জন্য দায়ী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিশেষ করে সমাজপতিদের অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও আদর্শহীনতা, সামাজিক কৃষ্টি-কালচারের স্বকীয়তা হ্রাস এবং অপ-সংস্কৃতিতে অভ্যস্ততা এর জন্য বিশেষভাবে দায়ী। এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের যথাযথ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতায় একজন কিশোরের ভিত্তিমূলেই গলদ তৈরি হয়। এর পরে রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা। সামগ্রিকভাবে বৈষম্যহীন দৃষ্টিতে সকল শিশুর প্রয়োজনীয় সেবা দানে সমাজ ও রাষ্ট্র পুরোপুরি সফল নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, শিশু আইন, জাতীয় শিশু নীতিসহ অন্যান্য সকল আইন ও নীতিমালায় শিশু অধিকারের কথা ব্যক্ত করা হলেও এর সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে। শিশু নীতি ও শিশু আইনের অনেক বিষয় বাস্তবায়নে এখনও কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। সামগ্রিকভাবে সরকার শিশুদের উন্নয়ন ও কল্যাণে কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। কিন্তু দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু কিশোর হওয়ায় এ কার্যক্রম মোটেও যথেষ্ট নয়।

সরকারের সমাজ কল্যাণমন্ত্রলায়ের সমাজসেবা অধিদফতর এ ব্যাপারে সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত। বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমনি নিবাস, দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রসহ অন্যান্য আরো কিছু প্রতিষ্ঠান শিশু কল্যাণে কাজ করছে। তবে শিশু-কিশোরদের বিশেষ করে অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন ও সংশোধনের জন্য দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে 'কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র', যার বর্তমান সংশোধিত নাম 'শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র'। একটি বালিকা উন্নয়ন কেন্দ্রসহ মোট তিনটি উন্নয়ন কেন্দ্র শিশু-কিশোরদের সংশোধন ও উন্নয়নে কাজ করছে। এক্ষেত্রে বলাবাহুল্য এ তিনটি কেন্দ্র সমাজের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, বাজেট স্বল্পতা, জনবল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। ফলে শিশু-কিশোরদের উন্নয়ন ও সংশোধন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। এছাড়া এত বেশি জনসংখ্যার দেশে মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোটেই যথেষ্ঠ নয়। অধিকন্তু শিশু আইনে প্রত্যেক জেলায় ও মেট্রোলিটন এলাকায় শিশু আদালত স্থাপনের কথা থাকলেও দেশের ৬৪ জেলার জন্য মোট ৩টি শিশু আদালত রয়েছে। এগুলো হলো যশোর, টঙ্গী ও কোনাবাড়ীতে। ৬৪ জেলার জন্য তিনটি আদালত কতটা অপ্রতুল তা বলাই বাহুল্য। এছাড়া শিশু আইনে সংশোধনমূলক কার্যক্রমের জন্য প্রবেশনের কথা বলা হলেও এ সম্পর্কে কোন নীতিমালা তৈরি না হওয়ায় এবং প্রবেশন কর্মীর স্বল্পতার কারণে শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। তাই আশু শিশু আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় কিশোর আদালত স্থাপন, প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য প্রবেশন অফিসার নিয়োগ, জনবল কাঠামো সংশোধন, প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করে উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

ইসলাম পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সর্বজনীন জীবনাদর্শ। ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব প্রভৃতি ভেদাভেদ ভুলে, সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি-সহমমির্তা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে একটি সাম্য ও কল্যাণকর বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ পরিকর। ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণ ও রাষ্ট্রীয় সম্পদে অভাবীদের হক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে বৈষম্যহীন অর্থব্যবস্থা উপস্থাপন করেছে। তাই একমাত্র ইসলামেই রয়েছে সর্বজনীন ও শান্তিময় সমাজের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা। ইসলামের সর্বজনীন এ রূপরেখা বাস্তবায়ন করে সমাজ থেকে শিশু-কিশোরের অপরাধ প্রবণতাসহ যে কোন ধরনের অপরাধ, অত্যাচার-আনাচার ও শোষণ-বঞ্চনা দূরীভূত করে কল্যাণকর সমাজ উপহার দেওয়া সম্ভব।

ইসলাম শিশু-কিশোরকে সমাজের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ কল্যাণকর সমাজ বিনির্মাণের প্রধান কারিগর মনে করে। ইসলাম পরিবার ও সমাজে শিশু-কিশোরের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছে, পুত্র-কন্যাদের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীভূত করে সমাজে নারী শিশুর অবস্থান সুসংহত করেছে। এভাবে ইসলাম শিশু-কিশোরের অধিকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ইসলাম শিশু-কিশোরের সহজাত সুকুমার প্রবৃত্তির বিকাশ ও অপরাধপ্রবণতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য প্রতিপালন ও পরিচর্যার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এক্ষেত্রে পরিবারকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায়তন বিবেচনা করে এখানে শিশু-কিশোরের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষায় নীতি-নৈতিকতা, মানবীয় মূল্যবোধ চর্চা এবং অনৈতিকতা থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এজন্য পিতামাতা ও অভিভাবককে পরিবারের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা এবং সমস্ত অন্যায়-অনৈতিকতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কৈশোর বয়স থেকেই সন্তানদের বিচ্যুত আচরণ সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে। যাতে করে তার মনে অপরাধপ্রবণতা বাসা বাঁধতে না পারে। ইসলাম শিশু-কিশোরকে শরী'আতের 'গায়রে মুকাল্লাফ' অর্থাৎ দায়ভার

ও জবাবদিহীতা থেকে মুক্ত বিবেচনা করে তাদের অপরাধ আচরণের শাস্তি প্রদানের পরিবর্তে সংশোধন ও উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেছে। সর্বদা তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়া ইসলাম শিশু-কিশোরদের অপরাধমুক্ত জীবনযাপনের জন্য সমাজের উপর আইনগত ও নৈতিক কর্তব্য প্রদান করেছে। অত্যাচার-অনাচার দূর করে, অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ করে একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজপতিদের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। সমাজে যেন কোন অন্যায়ের চর্চা না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করে শিশু-কিশোরের সামনে একটি আদর্শ সমাজ উপস্থাপন করেছে। অধিকন্তু রাষ্ট্রকে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন, শ্রমিকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান, সমস্ত যুলুম-নির্যাতন প্রতিহত করে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করাসহ সকল অসাম্য দূরীভূত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। সর্বোপরি শিশু-কিশোরের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তাকরণে তাদের মৌলিক অধিকারসহ প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব প্রদান করেছে। এভাবে ইসলাম পিতামাতা, অভিভাবক, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য বণ্টন করেছে এবং শিশু-কিশোরের উপযুক্ত প্রতিপালন নিশ্চিত করে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেছে। ফলে ইসলামিক সমাজে শিশু-কিশোরের অপরাধপ্রবণ হওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম প্রদর্শিত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরোল্লিখিত দায়িত্ব পালন এবং প্রয়োজনীয় সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, সমাজকে অপরাধমুক্ত করে একটি শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণকর সমাজ উপহার দিলেই শিশু-কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দানা বাঁধতে পারবে না। এক্ষেত্রে সার্বিকভাবে অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এবং শিশু-কিশোরদের উপযুক্তভাবে প্রতিপালনের জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর বাস্তবায়িত ইসলামিক আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করলে সহজেই সমাজ থেকে কিশোর অপরাধসহ সকল ধরনের অপরাধ, অত্যাচার-অনাচার প্রতিহত করে একটি কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে- একথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলা যায়।

সর্বশেষে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে- ইনশাআল্লাহ। আর এর প্রতিপাদ্য বিষয় ও সুপারিশমালা বাস্তবায়ন হলে তৈরি হবে শিশু-কিশোর অপরাধবিহীন অনাবিল শান্তিতে পূর্ণ আলোকিত সমাজ। যে সমাজের স্বপ্ন দেখি আমরা ও জাতির আদর্শ মানুষেরা।

মহান আল্লাহ আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ ও পরিশ্রম কবুল করুন এবং আমাকে ও এর পাঠককুলকে দুনিয়ার জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং পরকালীন জীবনে মুক্তি ও জান্নাত দান করুন। আমীন!

الحمد لله رب العالمين،الصلواة والسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين-

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআন		
আল-কুরআনুল কারীম, অনূদিত ও সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০১৩ খ্রি.		
আজ-জিযানী, মুহাম্মদ ইবন হুসাইন	:	*মা'আলিমু উসূলিল ফিক্হ ইনদা আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত*, রিয়াদ: দারু ইবনুল জাওযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.
আত-তাফতাযানী, আল্লামা সা'দুদ্দীন	:	*শরহুল আকাইদ লিন-নাসাফিয়্যা*, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৪২৮ হি.
আত-তাবারানী, সুলাইমান ইবন আহমদ ইবন আইয়্যুব	:	*আল-মু'জামুল কাবীর*, বৈরুত: মাকতাবাতু ইবন তায়মিয়া, ১৪০৪ হি.
আত-তিরমিযী, ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা ইবন মূসা (রহ.)	:	*জামে' আত-তিরমিযী*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৭ হি.
আতিকুর রহমান, মো.	:	*সামাজিক সমস্যা এবং সমস্যা বিশ্লেষণ কৌশল*, ঢাকা: অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০১২খ্রি.
আদ-দারাকুতনী, আলী ইবন উমর আবুল হাসান	:	*সুনান আদ-দারাকুতনী*, বৈরুত: দারুল মা'রিফাহ, ১৯৬৬ খ্রি.
আদ-দারেমি, ইমাম হাফেজ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান ফযল	:	*মুসনাদু আদ-দারেমি*, রিয়াদ: দারুল মাগনি, ১৪২০ হি.
আদনান আদ-দূরী	:	*আসবাবুল জারীমা ওয়া তবী'আতুস সুলূকিল ইজরামী*, কুয়েত: মানশুরাতু যাতিস সালাসিল, ১৯৮৪খ্রি.
আন-নাসাঈ, আবূ আবদুর রহমান আহমদ আবন শু'আয়ব (রহ.)	:	*সুনানুন নাসাঈ*, বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবি, ১৯৯১ খ্রি.
আন-নিসাপুরী, আবূ আব্দুল্লাহ হাকিম	:	*আল-মুসতাদরাক*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, তা.বি.
আনোয়ার মুহাম্মদ	:	*ইনহিরাফুল আহদাছ*, আল-কাহেরা: দারুছ ছাকাফাহ, ১৯৭৭খ্রি.
আন-নববী, মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া	:	*রিয়াদুস সালেহীন*, রিয়াদ: দারুস সালাম, ২০০৩খ্রি.
আবুল হাসান আলী ইবন ইসমাইল, মুহাম্মদ মুহীউদ্দিন আব্দুল হামিদ সম্পাদিত	:	*মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ওয়া ইখতিলাফুল মুসাল্লীন*, আল কাহেরা: মাকতাবাতু আন-নাহদাতু আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৯খ্রি.
আবূ ইয়ালা, আহমদ ইবন আলী আল-মওসিলী	:	*আল-মুসনাদু আবি ইয়া'লা আল-মাওসিলী*, দামেশক: দারুল মামুন লিত্-তুরাছ, ১৯৮৪খ্রি.
আবূ দাউদ, সুলায়মান আশ'আস আস-সিজিস্তানী রহ.	:	*সুনানু আবি দাউদ*, রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৪১৯হি.
আবূ জীব, সা'দী	:	*আল-কামূসুল ফিকহী*, করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামী, ১৩৯৭ হি.
আবূ মনছুর, আছ-ছা'লাবী	:	*ফিকহুল লুগাহ*, বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল আরাবিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.

আবূ হাসান, আলী ইবন ইসমাইল নাহবী	:	*আল-মুখাস্সাস*, বৈরুত: দারুল কুতুবুল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৭ হি.
আব্দুর রশীদ, ড. মুহাম্মদ; হক, মুহাম্মদ ছাইদুল ও রহমান, মোঃ আতীকুর	:	*ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, খ. ১, ২০১১ খ্রি.
আব্দুর রহীম, মওলানা মুহাম্মদ	:	*পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, জুলাই, ১৯৯৬খ্রি.
	:	*অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৯খ্রি.
	:	*ইসলামী শরী'আতের উৎস*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬খ্রি.
আব্দুল কাদের আওদাহ	:	*আত-তাশরী আল-জিনাঈ*, লেবানন: মুআসসাতুর রিসালাহ, ১৪১৯হি.
আব্দুল বাকী, মুহাম্মাদ ফুয়াদ	:	*আল-মু'জামুল মুফাহারাস লিআলফাযিল কুরআন*, কাহেরা: দারুল হাদীস, ১৩৬৪ হি.
আব্দুল হামিদ আশ-শাওয়ারাবী	:	*জারাঈমুল আহদাছ*, আল-ইস্কান্দারীয়া: দারুল মাতবা'আতিল জামি'য়্যাহ, ১৯৮৬খ্রি.
আমিনুল ইসলাম, ড.	:	*মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: নওরোজ কিতাব বিতান, ১৯৮৪খ্রি.
আমিনুল হক, মো.	:	*বিকাশ মনোবিজ্ঞান*, ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০১২ খ্রি.
'আমির, ড.আব্দুল আযীয	:	*আত-তাযীরু ফিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, আল-কাহেরা: দারুল ফিকর আল-আরাবী, ১৪২৮ হি.
আমীমুল ইহসান, মুহাম্মদ	:	*ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০
	:	*কাওয়াইদুল ফিকহ*, ঢাকা: বই পল্লী, ২০১১খ্রি.
আমীর আলী, সৈয়দ	:	*দ্য স্পিরিট অব ইসলাম*, কলিকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৭খ্রি.
আয-যারকানী, মুহাম্মদ আব্দুল আযীম	:	*মানাহিলুল ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন*, কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রি.
আল-আমাদী, আলী ইবন মোহাম্মদ	:	*আল-ইহকাম ফি উসূলিল আহকাম*, রিয়াদ: দারুস সামি'ঈ, ১৪২৪ হি.
আল-'আলিম, ড. ইউসূফ হামিদ,	:	*আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদ: আদ-দারুল 'আলামিয়াহ লিল-কিতাবিল ইসলামী, ১৪১৫হি.
আল-ইস্পাহানী, রাগিব আবুল কাসিম	:	*আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, তা.বি.
আল-কাত্তান, মান্না খলীল	:	*তারীখুত তাশরীইল ইসলামী*, কায়রো: মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ৫ম প্রকাশ, ২০০১২ খ্রি.
আল-কায়যাভী, ইউসুফ আব্দুল্লাহ	:	*আল-ফাতওয়া বাইনাল ইনদিবাত ওয়াল তাসাইয়ুব*, কুয়েত: দারুল কালাম, ২০১৫ খ্রি.
আল-কাসানী, আলা উদ্দিন আবূ বকর ইবন মাসউদ	:	*বাদা'ইউস সানাঈ'*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬হি.
আল-কুরতুবী, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ	:	*আল-জামি' লি-আহকামিল-কুরআন*, কায়রো: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৩৭ খ্রি.

আল-গাযালী, আবূ হামিদ মুহাম্মদ	:	*মুকাশাফাতুল-কুলূব*, অনুবাদ: মুফতি মুহাম্মদ উবাইদুল্লা, ঢাকা: দারুল ইফতা প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.
	:	*সৌভাগ্যের পরশমণি*, অনুবাদ: আব্দুল খালেক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ষষ্ঠ প্রকাশ, ২০০৪ খ্রি.
	:	*এহ্‌ইয়াউল 'উলুমিদ্দীন*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফা, তা.বি. খ. ৩
আলতাফ হোসেন, মো:	:	*অপরাধ বিজ্ঞান*, ঢাকা: মুহিত পাবলিকেশন, ২০১০খ্রি.
আল-ফাওযান, সালেহ ইবন ফাওযান	:	*যুব সমাজের অবক্ষয় ও তার প্রতিকার*, ঢাকা: ইসলাম হাউজ,২০১৩ খ্রি.
আল-ফারাহ, কাযী আবূ ইয়ালী মুহাম্মদ ইবন হাসান	:	*আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ*, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ১৪২১ হি.
আল-বাগাবী, ইমাম মুহিউস-সুন্নাহ আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবন মাসউদ	:	*মা'আলিমুত তানযীল*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০৯ হি.
আল-বায়যাভী, কাযী নাসির উদ্দিন (রহ.)	:	*আত-তাফসীরু লিল-বায়যাভী* (আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল), মিশর: মাকতাবাতুত তাওফীকীয়্যাহ, ২০০৩খ্রি.
আল-বায়হাকী, ইমাম হাফেজ আবূ বকর ইবন হুসাঈন	:	*আল-জামি' লি-শু'আবুল ঈমান*, রিয়াদ: মাকতাবাতুর রূশদ, ২০০৩ খ্রি.
	:	*শু'আবুল ঈমান*, বৈরুত: দারুল ফিকর লিত-ত্ববাআতে ওয়ান নুশুর ওয়াত তাওযী', ১৪২৪হি./২০০৪ খ্রি.
	:	*আস-সুনান আল-কুবরা*, হায়দ্রাবাদ: মাজলিসুদ দারিয়াতিল মা'আরিফিল নিজামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি.
আল-বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল	:	*সহীহুল বুখারী*, রিয়াদ: আল-কুতুবুস সিত্তাহ, ২০০০ খ্রি.
	:	*আল-আদাবুল মুফরাদ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৯ হি.
আল-মাওয়ার্দী, আবুল হাসান আলী	:	*আদাবুল কাযী*, বাগদাদ: মাতবাআতুল ইরশাদ, ১৯৭১ খ্রি.
	:	*আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ ওয়াল-ওয়ালাত*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যাহ, তাবি.
আল-মাতুরিদী, ইমাম আবূ মনসূর (র)	:	*মিনহাজুল মাতুরিদী ফিল আকিদাতি*, রিয়াদ: দারুল ওত্বান, ১৪১৩ হি.
আল-মারগিনানী, বুরহান উদ্দিন	:	*আল-হিদায়া*, লাক্ষ্ণৌ: তা.বি.
আল-রাযী, আহমদ ইবন আলী আবু বকর আল হানাফী	:	*আহকামুল কুরআন*, বৈরুত: দারু ইহয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫হি.
আল-হাসকাফী, আলাউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান	:	*আদ-দুররুল মুখতার*, বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪২৩ হি.
আলাউদ্দিন আল মুত্তাকি আল হিন্দী	:	*কানযুল উম্মাল*, বৈরুত: মুয়াসসাসাতু রিসালাহ, ১৯৮৯খ্রি.
আলী মুহাম্মদ জা'ফর	:	*আল-আহদাছ আল-মুনাহারিফুন*, বৈরুত: আল-মু'য়াসসাতুল জামি'য়্যাহ, ১৪০৫হি.
আশরাফ আলী থানভী, মওলানা	:	*বেহেশতী জেওর*, ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ২০০১খ্রি.
	:	*তরবিয়াতে আওলাদ* (ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের প্রতিপালন), ঢাকা: মোহাম্মাদী লাইব্রেরী, ২০০৯ খ্রি.

আশ-শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন মুহাম্মাদ	:	*ফাতহুল কাদির*, বৈরুত: দারুল ওফাই, ১৯৯৪ খ্রি.
আশ-শাফি‘ঈ, মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস	:	*আর-রিসালাহ*, মিসরঃ শরিকাতুত তিবা‘আতিল ফান্নিয়াতিল মুত্তাহাদাহ, ১৯৬২ খ্রি.
আশ-শুরফাবী, ইবরাহীম আব্দুহু	:	*জারাইমুস সিগার ফী মীযানিশ শার‘ঈ*, আল-কাহেরা: দারু আহলিল কুরআন, ১৪২৩হি.
আস-সারাখসী, শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইবন আহম্মদ	:	*আল-মাবসূত*, বৈরুত: দারুল মা‘আরিফাহ, ১৩২৬হি.
আস-সিবাঈ, মুস্তাফা	:	*আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফীত-তাশরী‘ঈল আল-ইসলামী*, কায়রো: মাকতাবাতু দারি উরুবাহ, ১৯৬১ খ্রি.
আস-সুয়ূতী, আল্লামা জালাল উদ্দিন	:	*আল-ইতকান ফি ‘উলূমিল কুরআন*, কায়রো: মাকতাবাতুল তাওফিকিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি.
আহমদ, মুহাম্মদ কুরাইয	:	*আর-রিয়া‘আতুল ইজতিমা‘ইয়াহ লিল-আহদাছিল জানিহাইন*, দামিশক: মাতবা‘আতুল ইনশা, ১৪০০হি.
আহমদ ইবন হাম্বল (রহ.)	:	*মুসনাদু আল-ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল*, বৈরুত: মাওসুসাতুর রিসালাহ, ১৪১৬হি.
আহমদ তাবারানী, হাফেজ আবুল কাসেম সুলাইমান ইবন	:	*আল-মু‘জামুল কাবীর*, মাকতাবাতু ইবন তায়মিয়া, তা.বি.
আহমদ মোল্লাজিউন, আব্দুল্লাহ ইবন সাঈদ	:	*নূরুল আনওয়ার*, ঢাকা: মাকতাবাতুল কাসিমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি.
ইবন কাছির, হাফেয ইমাদ উদ্দিন আশ-শাফিঈ (রহ.)	:	*আল-মিসবাহুল মুনীর ফিতাহযীবি তাফসীর ইবন কাছীর*, বৈরুত: দারুস সালাম, ১৪২০১১ খ্রি.
	:	*তাফসীরুল কুরআনিল আযিম*, রিয়াদ: দারুত তায়্যিবাহ, ১৯৯৯খ্রি.
	:	*জামিউল বায়ান ফী তাবীলিল কুরআন*, মিশর: মুয়াচ্ছাসাতুর রিসালাহ, ২০০০খ্রি.
ইবন খালদুন, আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ	:	*আল-মুকাদ্দিমা*, বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪১৯ হি.
ইবন তায়মিয়া, শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দিন আহমদ ইবন আব্দুল হালীম	:	*আল-কাওয়াশিফুল মুধিয়াতু লি রিসালাতিল উবূদিয়্যাত*, বৈরুত: দারুল ঈমান, ২০০৪ খ্রি.
	:	*আল-ইখবার আল-ইলমিয়্যাহ মিনাল ইখতিয়ারাতিল ফিকহিয়্যাহ*, বৈরুত: দারুল ‘আসিমাত, ১৩৬৯হি.
ইবন নুযাইম, যইন উদ্দিন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম	:	*আল-বাহরুর রায়েক শরহি কানযুদ দাকাইক*, বৈরুত: দারু ইয়াহইয়াত-তুরাসিল ‘আরাবি, ১৪২২ হি.
ইবন মাজাহ, আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ, আল-কাযবীনি	:	*সুনানু ইবন মাজাহ*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৩১৩হি.
ইবন হাজর, ইমাম হাফেজ আহমদ ইবন আলী আসকালানী	:	*ফাতহুল বারী বিশারহি সহীহিল বুখারী*, বৈরুত: দারুল মা‘আরিফাহ, ১৩৭৯হি.
ইবন হিশাম	:	*সীরাতে ইবনে হিশাম*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৮৮ খ্রি.

ইবনু আবেদীন	:	*হাশিয়াতু ইবন আবেদীন*, বৈরুতঃ মাতআবা মুস্তফা আল-বাবী আল-হালবী, সংখ্যা-১, ১৯৯৫খ্রি.
উত্তম কুমার দাশ ও অনিমা রানী নাথ	:	*মানবীয় বিকাশ আচরণ ও সামাজিক পরিবেশ*, ঢাকা: ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ২০০৩খ্রি.
উবূদুস সিরাজ	:	*ইলমুল ইৎরাম ওয়া ইলমুল ইশাব*, কুয়েতঃ কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, ২য় সংস্করণ, ১৪০৩হি.
ওলিউদ্দিন আবূ আব্দুল্লাহ আল-খতীব আত-তাবরিযী (রহ.)	:	*মিশকাতুল মাসাবীহ*, বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫হি.
ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী, শাহ	:	*হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা*, মাকতাবাতু থানভী, ১৯৮৬খ্রি.
করিম, সিরাজুল	:	*মহানবীর শিশু প্রীতি*, ঢাকা : রুমা প্রকাশনী, ১৯৯০ খ্রি.
কালতা'জী, ড. মুহাম্মদ রাওস	:	*মু'জামুল লুগাতিল ফুকাহা*, বৈরুতঃ দারুন নাসায়িস, ১৪৩১হি.
গোলাম মোস্তফা	:	*কাব্য সংকলন*, সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পাদিত, ঢাকা: খোশরোজ কিবতাব মহল, ১৯৬০ খ্রি.
তাবারী, ইবন জারীর	:	*তারিখুর রাসূল ওয়াল মুলুক*, মিশরঃ দারুল মা'রিফ, ১৩৫৭হি.
দাস, বি.এল	:	*অপরাধবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকাঃ কামরুল বুক হাউস, ২০০১খ্রি.
নুরুল ইসলাম, ড. মো.	:	*বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা*, ঢাকাঃ তাসমিয়া পাবলিকেশনস, ২০১১ খ্রি.
নুরুল ইসলাম ভূইয়া, মোঃ ও অন্যান্য সম্পাদিত	:	*বাংলাদেশে কিশোরদের বিচার ব্যবস্থা ও সংশোধনী কার্যক্রম*, ঢাকাঃ সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০০০ খ্রি.
নূরুল মুমেন	:	*মুসলিম আইন*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪খ্রি.
পান্না রানী রায়	:	*অপরাধ বিজ্ঞান*, ঢাকাঃ উপমা প্রকাশন, ২০১৩খ্রি.
বোরহান উদ্দিন খান	:	*অপরাধ বিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা, চট্রগ্রামঃ কামরুল বুক হাউজ, ২০১৪খ্রি.
মঞ্জুর আহমদ	:	*অস্বভাবী মনোবিজ্ঞান*, ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ২০১৩খ্রি.
মঞ্জুরুল ইসলাম, ড. সৈয়দ (সম্পাদিত)	:	*বাংলাদেশের শিশু ও তার অধিকার*, ঢাকাঃ ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ১৯৭৭ খ্রি.
মতিউল ইসলাম, মোঃ	:	*শিশু কিশোরদের শিষ্টাচার শিক্ষা ও শিশু অধিকারের আইন কানুন*, ঢাকাঃ জামিন প্রকাশনা, ২০০৬ খ্রি.
মালিক ইবন আনাস, ইবন মালিক ইবন আমর আল মাদানী (রহ.)	:	*আল-মুয়াত্ত্বা*, বৈরুতঃ দারুল এহইয়াউল তুরাসিল আরাব, ১৪০৬হি.
মিজানুর রহমান, মোঃ	:	*পারিবারিক আইনঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকাঃ সুফি প্রকাশনী, ২০১৬খ্রি.
মুজাহিদ, ইমাম আবু হাজ্জাজ বিন জাবির	:	*তাফসীরু আল-ইমাম মুজাহিদ*, তাহকীক: ড. মুহাম্মদ আব্দুস সালাম, ইসলামাবাদঃ মুজমাউল বাহুছিল ইসলামিয়াহ, ১৯২১খ্রি.
মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, আবূল হোসাইন আল-কুশাইরী আন্‌নিশাপুরী (রহ.)	:	*আস-সহীহু লিমুসলিম*, বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৪১৯হি.
মুস্তফা মান্না	:	*বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা
মুহাম্মাদ আলূসী, আবুল ফযল শাহাবুদ্দিন সাইয়্যেদ, বাগদাদী	:	*রুহুল মা'আনী*, বৈরুতঃ দারু এহইয়াউল তুরাসিল আরাবি, তা.বি.

মুহাম্মাদ শফী, মুফতী	:	*তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১১খ্রি.
	:	*তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন*, অনুবাদ: মওলানা মুহিউদ্দিন খান, মদীনা মোনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রন প্রকল্প, ১৪১৩হি.
	:	*খতমে নবূওয়াত*, ঢাকা: মাকতাবাতুল হেরা, ২০১৮ খ্রি.
মূসা, মুহাম্মদ ও মোজাম্মেল হক, মাওলানা মোঃ (সংকলিত)	:	*বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৮ খ্রি.
মোস্তাফিজুর রহমান, এ. এইচ. এম.	:	*সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা: লেখা-পড়া, ২০১১খ্রি.
ম্যাথিউ এ কিং এ্যান্ড রায়ান	:	*বাংলাদেশে কর্মজীবি শিশু*, সেভ দি চিলড্রেন, ১৯৯৬খ্রি.
শামসুর রহমান, গাজী	:	*কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারী আইনের সংশোধন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পত্রিকা, জুলাই, ১৯৯২ খ্রি.
শামসুল আলম, এ. জেড, এম.	:	*মহানবী ও শিশু*, চট্টগ্রাম-ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	:	*দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০১০খ্রি.
	:	*ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন গবেষণা বিভাগ, ২০১১খ্রি.
	:	*ফতওয়ায়ে আলমগীরি*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, তা.বি
সম্পাদনা পরিষদ	:	*আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ*, কুয়েত: ওয়ারাতুল-আওকাফ ওয়াশ-শুয়ুনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪০৪৫ হি.
সাইফুল আলম, মোহাম্মদ	:	*প্রবেশন নির্দেশিকা*, ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ২০০৮খ্রি.
সাধন কুমার বিশ্বাস ও সুনীতা বিশ্বাস	:	*শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা*, ঢাকা : প্রভাতী লাইব্রেরী, ২০০৫ খ্রি.
সিরাজুল ইসলাম, এ.এম.এম	:	*ইসলামে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৪হি.
	:	*ইসলামে সন্তান গঠন পদ্ধতি*, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০১০খ্রি.
সুবহি সালিহ, ড.	:	*মাবাহিস ফি উলূমিল কুরআন*, বৈরুত: দারুল ইলম, ১৯৮৫খ্রি.
যায়দান, ড. আব্দুল করীম	:	*আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, আলেকজান্দ্রিয়া: দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯ খ্রি.
হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ	:	*ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্স ও মুসলিম আইন*, ঢাকা: আমিন ল' বুক সেন্টার ২০০৮ খ্রি.
হায়কল, ড. মুহাম্মাদ হোসাইন	:	*মহানবীর (সা.) জীবন চরিত*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৪খ্রি.
হোসেন, হামজা	:	*অপরাধবিজ্ঞান*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৯৫খ্রি.

Abdul Hakim Sarker	:	*Juvenile Delinquency: Dhaka City Experience*, Dhaka: Human Nursery for Development, 2001
Abul Hashim	:	*The Creed of Islam*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh,1985
Afsar Uddin, Mohammad	:	*Juvenile Delinduency in Bangladesh*, Dhaka: University of Dhaka,1993
Albert, K. Cohen , Alfred and Schussler	:	*The Southerland Papers*, Bloomington: Indian University Press,1955
Amzad Hossain	:	*"Correctional Service for the juvenile Delinquents in Bangladesh: A Study of NICS Tongi",* Unpublished Ph.D Dissertation, University of Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies,2002
Ariès, Philippe	:	*Centuries of Childhood: A Social History of Family Life*. New York: Knopf, 1962, First published as L'enfant et la vie familiale sous I'ancien regime.
Bahadur, Ram Pratap	:	*Problems of Unemployment, Social Problem and Social Disorganization in India,* Allahabad, 2nd ed, 1962
Barker, Robert L. (Editor)	:	*The Social Work Dictionary,*Washington D.C: NASW Press, 1995
Barness, H.E.Teeters N.K.	:	*New Horizons in Criminology*, New Delhi: Prentice Hall of India (pvt.) ltd, 1966
Barry, John V. and Maconochie, Alexander	:	*Australian Dictionary of Biography*, National Centre of Biography, Australian National University, Accessed 4 April, 2013
Borhan Uddin Khan and Mahbubur Rahman, Muhammad	:	*Protection of Children in Conflict with the Law in Bangladesh*, Dhaka: Save the Children, 2008
Caldwell, Robert G.	:	*Criminology*, NewYork: The Ronald Press Company, 1956
Cavan, Ruth Shonle and Fredin and Theodore, N.	:	*Juvenile Delinquency and urban areas*,Chicago: University of Chicago Press, 1975
Chung Mo, Hang	:	*Sociological Study of Juvenile Offfenders in Taiwan*, Taiwan:1964
Clavin S. Hall and Lindzey, Gradner	:	*Theories of Personality*, New York: Jehon Willeyssons,1966

Clifford, R Shaw and Donald Mckay, Henry	:	*Juvenile Delinquency in Urban Areas*, Chicago: Chicago University Press, 1949
Cloward, Richard and Lloyd, E. Ohlin	:	*Delinquency and Opportunity,* New York: Free Press, 1960
	:	*Deviance and Control,* New Delhi: Prentice Hall of India,N.D
Clyde B.Vedder	:	*Juvenile Offenders: Perspective and Reading*, New York: Charls C. Thomas Publisher, 1954
Devasia, V.V. & Devasia, Leelamma	:	*Criminology Victimology and Corrections*, New Delhi: Ashis Publishing House,1992
Durkheim, David Emile	:	*The Devision of Labor in Societ*y, Trns. George Simpson, New York: The Free Press of Glencoe, 4th printing, 1960
	:	*Suicide:A Study in Sociology*, Trns. Johan A. Spoulding and George Simpson, New York: The Free Press, 1951
Elliot, Mabel Agnes and Francis, E. Merrial	:	*Social Disorganisation*, New York: Harper and Brothers,1941
Enamul Hoque, M.	:	*Under-Aged Prison Inmates in Bangladesh: A Sample Situation of Youth Offenders in Freater Dhaka,* Dhaka: Action Aid Bangladesh and Bangladesh Retired Police Officers Welfare Association, 2008
Ford, Clellan Stearns and Ambrose Beach , Frank	:	*Patterns of Sexual Behavior,* New York: Harper,1951
Freud, Sigmund	:	*Three Essays on the Theory of Sexuality, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*,New York: Macmillan; London: Hogarth, 1905, Volume 7
Friedlander	:	*Introduction to Social Welfare,* 2nd Edition
F.B.I	:	Criminal Justice Information Service Division, ucr.fbi.gov
Gesell, Arnold Lucius and Ames, Louis Bates	:	*Youth The Years From Ten to Sixteen*, New York: Harper,1956
Gillin, John Lawis	:	*Criminology and Penology*,USA: Green Wood Press,

		1977
Hafizur Rahman Karzon, Shekh	:	*Theoritical and Applied Criminology*, Dhaka: Palal Prokashoni and Empowerment Through Law of the Common People (ELCOP), 2008
Hall, C.S and Lindzey, G.	:	*Theories of Personality*, New York: Jehon Willeyssons Inc.1966
Hall, G. Stanley	:	*The Moral and Religious Training of Children*, New York: Princeton Review New Series-9, 1882
Haskell, M.R	:	*Crime and Delinquency*, USA: Rand McNally College Publishing Company, 1974
Holt, Lewis Bernard , Lambton, Ann Katherein Swynford	:	*The Cambrodge History of Islam*, England: Cambridge University Press,1997
Juilliard, Carr Lowell	:	*Delinquency Control*, New York: Harper and Brother's, 1950
Kamal Siddiqui	:	*Better Days Better Lives: Towards a Strategy for Implementation on the Rights of the Child in Bangladesh*, Dhaka: The University Press Limited, 2001
Kog, Nords	:	*Analysing Social Problems*, New York: The Dryden Press, 1950
Marx, Karl Henrich and Engels, Friedrich	:	*Communist Manifesato*, London:1948
Mccord, Joan (Edited)	:	*Juvenile Crime Juvenile Justice*,Washington D.C: The National Academy Press, 2001
Merton, Rovert K and Giallombards, Rosde (Ed)	:	*Social Structure and Anomie, Juvenile Delinquency:A Book of Rating*, New York: Wiley a Inc, 1938
Miller, Walter B.	:	"Lower Class Culture as a Generating Milieu of Gang Delinquency", *The Journal of Social Issue*,14, 1958
Muhammad Ali, Maulana	:	*The Religion of Islam*, New Delhi: Chand and Co,1950
Muhammad Hamidullah	:	*Introduction to Islam*, Iran: Ansarian Publication,1982
Nahid Ferdousi, Dr.	:	*Juvenile Justice System in Bngladesh*, Dhaka:

		Academic Press and Publishers Library,2012
Paranjape, Dr.N.V.	:	*Criminology and Penology*,Alahbad: Central Law Publication, 2005
Petersilia, Joan	:	*When Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry*, Oxford: Oxford University Press, 2003
Power, Edlin and Helin Winter	:	*"An Experiment in the Prevention of Delinquency*", New Yourk: Colombia University Press, The Cambridge Sumervile Youth Study, , 1951
Rabb, Earl and Selznick, Gertrude J.	:	*Major Social Problems*, New Yourk: Herper and Row Publishers,1964, 2nd ed.
Raffele, Garofalo	:	*Criminology*, Boston: Little Brother and Company,1914
Reckless, Walter C.	:	*The Prevention of Juvenile Delinquency,* Ohio: Ohio State University Press, 1972
Rubin, Sol	:	*Crime and Juvenile Delinquency*, NewYork: Oceana Publications,1958
Samaha, Joel	:	*Criminal Justice*, Belmont, CA: Thomson / Wadsworth, 2006, ISBN 978053465571
Samul, Koening	:	*Sociology,* New York: Barnes and Noble,1969
San Mateo, County of	:	*Redwood City,* San Francisco,USA,1992
Schafer, Stephen	:	*Theoretical Criminology*, New York: American Book, Straford Press, 1969
Scott, Joseph W. and Edmund W. Vaz	:	*"A Perspective on Middle Class Delinquency",* Canadian Journal of Economics and Political Science, Vol. 29,1963
Senafel,Stephen	:	*Theoretical Criminology*, New York: American Book, Straford Press 1969
Shahnaz Huda	:	*A Child of One's Own* , Dhaka: Bangladesh Shishu Adhikar Forum, 2008
Shankar Rao, C.N.	:	*Sociology: Primary Principles of Sociology,* Delhi: S. Chand Limited, 2006
Sharma, Rajendra K.	:	*Criminology and Penology* , Delhi: Atlantic Publishers and Distributors,1998
Shireman, Charles	:	*Rehabilitating Juvenile Justice,* Chicago: Chicago University press,1986

Shulman, M. Harry	:	*Juvenile Delinquency*, New York: Harper and Row, 1961
Sonia Zaman Khan	:	*Herds and Shepherds: The issue of Safe Custody of Children in Bangladesh*, Dhaka: BLAST and Save the Children UK, 2002
Sophia Moses, Robinson	:	*White House Conference* , 1997
Sorokin, P.	:	*Contemporary Sociological Theories*, New York: Harper and Row,1724
Sutherland, Edwin Hardin and Cressey, Donald Ray	:	*Pinciples of Criminology*, New York: Lippincott Company, 1955
Taft, Donald R.	:	*Criminology: A Cultural interpretation*, New York: Macmillan Company, 1950, Chapter-15
Tappan, Pawl W, Hearth	:	*Delinquency is Normal Behavior*, 1947, Focus Vol.29
Trojanowicz, Robert C.	:	*Juvenile Delinquency Concepts and Control*, New Jersey: Prentice Hall, Inc. 1978
Travis, Warner Hirschi	:	*Causes of Delinnquency*, 1969
Toyenbee, Arnold Joseph	:	*Civilization on Trail*, London: Oxford University Press, 1st edition,1948
Trade, Gabriel	:	*Penal Philosophy,* Trans:Rapelje Howell, New Brunswick: Transaction Publicshers,2001
UN	:	*Comparative Survey on Juvenile Delinquency*, Part-iv, New York,1953
Vold,George B.	:	*Theocratical Criminology*, USA: Oxford University Press
Wilson, Sir Ronal Knyvet	:	*An Introduction to the Study of Ango-Muhammadan Law*, Machigan: W.Thacker/The University of Machigan,1894
World Health Organization (WHO)	:	*Handout New Modules: Oriental Programme on Adolescence Health for Health-Care Providers*, Geneva: Department of Child and Adolescent Health and Development

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতিমালার প্রজ্ঞাপনসমূহ (Acts and Ordinances)	
১.	*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইনবিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.
২.	*শিশু আইন*, ২০১৩, ২০১৩ সনের ২৪ নং আইন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণমন্ত্রণালয়, ১৮ আগষ্ট, ২০১৩ খ্রি.
৩.	*জাতীয় শিশু নীতি* ২০১১, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ফেব্রুয়ারী, ২০১১ খ্রি.
৪.	*নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন*, ২০০০; ২০০০ সনের ৮ নং আইন, ১৪ ফ্রেব্রুয়ারী,২০০০খ্রি.
৫.	*বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন*, ১৯২৯ (সংশোধিত ১১ ,মার্চ-২০১৭), Act no.xixof 1929
৬.	*সাবালকত্ব আইন*, ১৮৭৫ (Act No.x of 1875)
৭.	*প্রবেশন অপরাধী অধ্যাদেশ*, ১৯৬০ (অধ্যাদেশ নং- XLV,1960)
৮.	*Convention on the Rights of the Child ,CRC, 1989,* Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989
৯.	*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),* Resolation40/33 of 29 November,1985
১০.	*Reformatory School Act, 189,* Act No.008 of 1897, 11 March,1897
১১.	*The Probation of Offenders Ordinance*, 1960 (Ordinance No. xlv of 1960)
১২.	*The Children Rules 1976*, Rules No. S.R.O.103-L76
১৩.	*The Penal Code (Amended),2004* (Act No.XLV of 1860), 2004
১৪.	*Children Act, 2013*, Legislative and Parliamentary Affairs Division Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs
১৫.	*The children Act 1974* (Act no.xxxix of 1974)
১৬.	*The Bengal Children Act, 1922* (The Bengle Act No.11 of 1922). Now repealed by the section 74 of The Children Act, 1974.
১৭.	*The Bangladesh Labour Code,2006* (Code no.xxxxii of 2006)
১৮.	*The Child Marriage Restraint Act, 1929* (Act No.Xix of 1929)
১৯.	*The Penal Code,1860* (Act No.XLV of 1860)
২০.	*The Vagrancy Act ,194* (Bengal Act No.V11 of 1943)
২১.	*The Majority Act 1875* (Act No.x of 1875)

National Plan of Bangladesh		
The Frist Five Years Plan 1955-1960	:	The planing Board, Government of Pakistan
The Second Five Years Plan 1960-65	:	Government of Pakistan, The planing Commission
Frist periodic report of the Government of Bangladesh under the Convention of the Rights of Tthe Child (Draft)	:	Ministry of Women and Children Affairs, Dhaka, November-2000
Third and Fourth Periodic Report of the Government of Bangladesh under the Convention on the Rights of the Child,	:	Ministry of Women and Children Affairs, Dhaka, 2007
The 6th Five Years Plan 2010- 2015	:	The planing Commission,Government of Bangladesh
The 7th Five Years Plan 2016- 2020	:	The planing Commission,Government of Bangladesh

Honourable High Court`s Orders of Bangladesh (বাংলাদেশের মহামান্য হাইকোর্টের অর্ডার)	
1.	Suo Moto Order no. 248, 2003; 11 BLT 2003 HCD 281
2.	Suo Moto Order no. 2480 of 2003, 11 BLT 2003 HCD 281
3.	49 Dhaka Law Reports, High Court Devision, HDC 53
4.	7 Bangladesh Law Chronicles, High Court Devision, HDC 409

বিশ্বকোষ/Encyclopedia		
ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ	:	*হযরত রাসূলে করীম (সা.) জীবন ও শিক্ষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	:	*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ১, ৫ম সংস্করণ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.
	:	*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, খ. ২, ৩য় সংস্করণ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.
	:	*সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (খ. ৫ ,৬ ,৭ ও ১৪) ৫ম সংস্করণ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭ খ্রি.
অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত	:	*বাংলাপিডিয়া বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ*, ২য় সংস্করণ, ঢাকা: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২খ্রি.
Encyclopedia Americana	:	USA: American Corporation, 1924, vol-12
Encyclopedia of Religion and Ethics	:	James Hastings (Edited),Vol.5,2001
Encyclopedia of islam	:	E.J Brill, 2nd edition,1971
The Colombia Encyclopeadia	:	William Bridgwater (edited), Colombia: Colombia University Press, 2nd Edition, 1950
The Encyclopeadia of Christianity	:	John Stephen Bowden (edited), 'Islam and Christianity' Oxford: Oxford University Press, 2005

অভিধান গ্রন্থ/ Dictionary		
ইব্রাহীম মাদুকর ও অন্যান্য সম্পাদিত	:	*আল-মু'জামুল ওসীত*, মিসর: মাকতাবাতুল শুরুকিদ-দৌলাহ, ১৪২৫ হি.
ইবন মানযুর, ইমাম আবূল ফযল জামালুদ্দিন মুহাম্মদ	:	*লিসানুল আরাব*, বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৪১১হি.
এনামুল হক, ডক্টর মুহম্মদ, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী ও স্বরোচিষ সরকার সম্পাদিত	:	*বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ৭ম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫খ্রি.
ফজলুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ	:	*আল-মু'জামুল ওয়াফী*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৫খ্রি.
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস	:	*সংসদ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২৪তম সংস্করণ, ২০০০খ্রি.
Oxford Advanced Learner`s Dictionary	:	Uk: Oxford University Press, 5th Edition, 1999
Siddiqui, Zillur Rahman (edited)	:	*Bangla Academy English-Bangla Dictionary*, Dhaka: Bangla Academy, 1993

জার্নাল/গবেষণা পত্রিকা/গবেষণা প্রতিবেদন		
ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০১৫ খ্রি.
ইসলামী আইন ও বিচার (ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা)	:	বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিচার্স এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা, বর্ষ: ৫, সংখ্যা-১৮, এপ্রিল-জুন, ২০০৯ খ্রি.
	:	বর্ষ: ৭, সংখ্যা: ২৭, ২০১১খ্রি.
	:	বর্ষ: ১১, সংখ্যা: ৪১, ২০১৫খ্রি.
কলা অনুষদ পত্রিকা	:	কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, খ. ৯, সংখ্যা ১২-১৩, জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮
জাতীয় সমাজসেবা দিবস স্মরণিকা ২০১৩	:	সমাজসেবা অধিদফতর, ঢাকা, জানুয়ারী ২০১৩ খ্রি.
জাতীয় সমাজসেবা দিবস স্মরণিকা ২০১৫	:	সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জানুয়ারী ২০১৫ খ্রি.
দর্শন ও প্রগতি	:	গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ: ২১, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বও, ২০০৪ খ্রি.
দি ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালি অব ইসলামিক স্টাডিজ	:	ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ: ১, জানুয়ারী-জুন, ২০০৭
পাঁচ বছরের সাফল্য চিত্র (২০০৯ - ২০১৩)	:	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.
বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, শিশু বাজেট ২০১৭-২০১৮	:	শিশু বাজেট মডিউল, অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সরকারি শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা	:	ঢাকা : সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেপ্টম্বর ২০০২ খ্রি.
সাহিত্য পত্রিকা	:	বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ষ: ৫২, সংখ্যা-২, ফাল্গুন ১৪২১
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/১৬-২০১৯/২০	:	সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অক্টোবর-২০১৬,
Bangladesh Economic Review,2019	:	Finance Division, Ministry of Finance Government of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka: Bangladesh Government Press, June 2019
Canadian Journal of Economics and Political	:	Journal of Economics and Political Science, Vol. 29, Canada,1963

Science		
Humanitarian Situation Report No. 16	:	(Rohingya influx), UNICEF Bangladesh, 24 December, 2017; Source: Calculated based on Needs and Population Monitoring, IOM, September, 2017
Journal of the Faculty of Law	:	The Dhaka University Studies, Part- F, vol. 16, 2005
Journal of the Asiatic Society of Bangladesh	:	Asiatic Society of Bangladesh, Vol-44, Number-1, June,1999
American Journal of Sociology	:	American Journal of Sociology, vol. 42, 1950
Juvenile Justice Probation Officer Best Prctices and Procedures Manual	:	Bangladesh Legal Reform Project,Part-B, Prepared By Department of Social Services(DSS) with Canadian Juvenile Justice Specialist, 2008
Juvenilwe Courts Statistics, 1971	:	Education and Welfare DHEN Publication No. (SRS) 73-03452, U.S Department of Health, Washington, D.C. 1972
New Forms of Juvenile Delinquency: Their Origin, Prevention and Treatment,	:	Dept. of Economic and Social Affairs, New York, United Nations,1960
State of Child Rights in Bangladesh	:	Bangladesh Shishu Adhikar Forum, (BSAF), Dhaka, April 2019
Statistical Pocket Book Bangladesh, 2018	:	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Information Devision (SID), Ministry of Planning, 2019
Statistical Pocket Book Bangladesh, 2016	:	Bangladesh Bureau of Statistics (BBS),Statistics and Information Devision (SID), Ministry of Planning, Dhaka, March-2017
'*Age of PenalResponsibility'*	:	Paper of Save the Children UK , 2007
Report on Bangladesh Sample Vital Statistics, 2018	:	Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division (Sid), Ministry of Planning Government of The People'S Republic of Bangladesh, Dhaka, May 2019
World Youth Report, 2003	:	Dept. of Economic and Social Affairs, New York, United Nations,2004

দৈনিক পত্র-পত্রিকা	
১.	*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ আগষ্ট ২০১৫ খ্রি.
২.	*দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২৪ অক্টেবর, ২০১৯ খ্রি.
৩.	*দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ আগস্ট, ২০১৩ খ্রি.
৪.	*দৈনিক প্রথম আলো*, ৩১ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রি.
৫.	*দৈনিক প্রথম আলো*, ০১ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.
৬.	*দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি.
৭.	*দ্য ডেইলি স্টার* (স্টার অনলাইন), ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি.

Website	
1.	Bangladesh Unemployment Rate 1991-2020, www.macrotrends.net
2.	Parole-Wikipedia, http://en.m.eikipedia.org
3.	*Pew Research Center Demographic Projection*, religiouspopulation.com
4.	muslimpopulation.com
5.	www.wikipedia.com
6.	http://study.com>academy>anomie
7. 8.	“Adolescence” International Encyclopedia of Social Science, http://www.encyclopedia.com
9.	http://www.mof.gov.bd
10.	https://www.marriam-webstar.com

পরিশিষ্ট

শিশু আইন, ২০১৩ ও মাঠ জরিপকর্মের প্রশ্নমালা

পরিশিষ্ট-১

শিশু আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ২৪ নং আইন, ২০ জুন, ২০১৩)

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান শিশু আইন রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি নূতন আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে; এবং
যেহেতু উক্ত সনদ এর বিধানাবলী বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিদ্যমান শিশু আইন রহিতপূর্বক উহা পুনঃপ্রণয়ন ও সংহত করিবার লক্ষ্যে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন| - (১) এই আইন শিশু আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।
* এস, আর, ও নং ২৭৫-আইন/২০১৩, তারিখঃ ১৮ আগস্ট, ২০১৩ ইং দ্বারা সরকার ৬ ভাদ্র, ১৪২০ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২১ আগস্ট খ্রিস্টাব্দ তারিখ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) অধিদপ্তর অর্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর;

(২) আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি Guardian and Wards Act, 1890 (Act No. VIII of 1890) এর section 7 এর অধীনে, শিশুর কল্যাণার্থে, আদালত কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা ঘোষিত অভিভাবক (Guar di an);

(৩) 'আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু ((Children in Conflict with the Law)' অর্থ এমন কোন শিশু যে, দণ্ডবিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত;

(৪) 'আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (Children in Contact with the Law)' অর্থ এমন কোন শিশু, যে বিদ্যমান কোন আইনের অধীনে কোন অপরাধের শিকার বা সাক্ষী;

(৫) 'দণ্ডবিধি' অর্থ Penal Code, 1860 (Act No. LV of 1860);

(৬) 'ধারা' অর্থ এই আইনের কোন ধারা;

(৭) 'নিরাপদ স্থান (Safe Home)' অর্থ কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা এমন কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান যাহার কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীন শিশু-আদালত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা,

প্রবেশন কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, অন্য কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখিবার দায়িত্ব পালন করে;

(৮) 'প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান' অর্থ ধারা ৫৯ ও ৬০ এ উল্লিখিত কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান;

(৯) 'প্রবেশন কর্মকর্তা (Probation Officer)' অর্থ ধারা ৫ এ উল্লিখিত কোন প্রবেশন কর্মকর্তা;

(১০) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(১১) 'বর্ধিত পরিবার (extended family)' অর্থ দাদা, দাদী, নানা, নানী, চাচা, চাচী, ফুফা, ফুফু, মামা, মামী, খালা, খালু, ভাই, ভাবী, ভগ্নি, ভগ্নিপতি বা এইরূপ রক্তসম্পর্কীয় অথবা আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ কোন আত্মীয়ের পরিবার;

(১২) 'বিকল্প পরিচর্যা (alternative care)' অর্থ ধারা ৮৪ এর অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা;

(১৩) 'বিকল্পপন্থা (diversion)' অর্থ ধারা ৪৮ এর অধীন গৃহীত কোন ব্যবস্থা;

(১৪) 'ব্যক্তি' অর্থে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কোন কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৫) 'বোর্ড' বা 'শিশুকল্যাণ বোর্ড' অর্থ ধারা ৭, ৮ ও ৯ এর অধীন গঠিত, ক্ষেত্রমত, জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড বা উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড;

(১৬) 'ভিক্ষা' অর্থ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ, অন্ন, বস্ত্র বা অন্য কোন দ্রব্যাদি প্রাপ্তি বা আদায়ের উদ্দেশ্যে-

(ক) কোন শিশুকে প্রদর্শন বা ব্যবহার করিয়া প্রকাশ্য স্থানে নাচ, গান, ভাগ্য গণনা, পবিত্র স্তবক পাঠ অথবা ভিন্ন কোন কলা-কৌশল গ্রহণ করা, ভান করিয়া হউক বা না হউক; বা

(খ) কোন শিশুর দেহে অনৈতিক প্রক্রিয়ায় ঘা, ক্ষত, আঘাত সৃষ্টি করা বা শিশুকে বিকলাঙ্গতায় পরিণত করা এবং অনুরূপ ঘা, ক্ষত, আঘাত বা বিকলাঙ্গতা প্রদর্শন করা বা প্রদর্শনের জন্য অনাবৃত রাখা; বা

(গ) মাদকদ্রব্য বা ঔষধ সেবনের মাধ্যমে কোন শিশুকে নিস্তেজ বা নির্জীব করিয়া রাখা বা ভিন্ন কোন উপায়ে মৃত হিসাবে সাজাইয়া রাখা;

(১৭) 'শিশু' অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত শিশু হিসাবে নির্ধারিত কোন ব্যক্তি;

(১৮) 'শিশু-আদালত' অর্থ ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত কোন আদালত;

(১৯) 'শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র' অর্থ ধারা ৫৯ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র;

(২০) 'শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা' অর্থ ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত শিশুবিষয়ক ডেস্ক এর দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা;

(২১) 'সমাজকর্মী' অর্থ অধিদপ্তরে বা উহার অধীনে কর্মরত ইউনিয়ন সমাজকর্মী বা পৌর সমাজকর্মী অথবা খালাম্মা, বড়ভাইয়া বা উক্তরূপ সমমানের কোন কর্মী, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, যিনি শিশুদের সেবাদানের সহিত সংশ্লিষ্ট;

(২২) 'সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন' অর্থ ধারা ৩১ এ উল্লিখিত সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন;

(২৩) 'সুবিধাবঞ্চিত শিশু' অর্থ ধারা ৮৯ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন শিশু;

(২৪) 'সভাপতি' অর্থ, ক্ষেত্রমত, জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড বা উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর সভাপতি।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

শিশু

৪। বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রবেশন কর্মকর্তা

৫। (১) এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার, ক্ষেত্রমত, প্রত্যেক জেলা, উপজেলা এবং মেট্রোপলিটন এলাকায় এক বা একাধিক প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে, বিদ্যমান অন্য কোন আইনের অধীন কোন ব্যক্তিকে প্রবেশন কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হইলে, তিনি, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, এই আইনের অধীন প্রবেশন কর্মকর্তা হিসাবে এমনভাবে দায়িত্ব পালন করিবেন যেন তিনি উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৩) কোন এলাকায় প্রবেশন কর্মকর্তা নিয়োগ না করা পর্যন্ত সরকার, প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনের জন্য, অধিদপ্তরে এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কর্মরত সমাজসেবা কর্মকর্তা বা সমমানের অন্য কোন কর্মকর্তাকে প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য

৬। প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা :-

(ক) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে থানায় আনয়ন করা হইলে অথবা অন্য কোনভাবে থানায় আগত হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,-

(অ) আনয়ন বা আগমনের কারণ অবগত হওয়া;

(আ) সংশ্লিষ্ট শিশুর সহিত সাক্ষাৎ করা এবং সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে তাহাকে আশ্বস্ত করা;

(ই) সংশ্লিষ্ট অভিযোগ বা মামলা চিহ্নিত করিতে পুলিশের সহিত যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা;

(ঈ) সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা-পিতার সন্ধান করা এবং তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিতে পুলিশকে সহায়তা করা;

(উ) শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সহিত শিশুর জামিনের সম্ভাব্যতা যাচাই বা, ক্ষেত্রমত, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট মামলার প্রেক্ষপট মূল্যায়নপূর্বক বিকল্পপন্থা গ্রহণ করা;

(ঊ) বিকল্পপন্থা অবলম্বন বা যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার মাধ্যমে, নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা; এবং

(ঋ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(খ) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু-আদালতে উপস্থিত করা হইলে-

(অ) আদালতে অবস্থান বা বিচারকালীন আদালতে উপস্থিত থাকা এবং, যখনই প্রয়োজন হইবে, সংশ্লিষ্ট শিশুকে, যতদূর সম্ভব, সঙ্গ প্রদান করা;

(আ) সরেজমিনে অনুসন্ধানপূর্বক সংশ্লিষ্ট শিশু ও তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনাক্রমে, সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন প্রসত্তত এবং আদালতে দাখিল করা;

(ই) শিশুকে, প্রয়োজনে, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির মাধ্যমে আইনগত সহায়তা

প্রদানসহ শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;

(ঈ) শিশুর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করিবার নিমিত্ত, উপ-দফা (ই) এর উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, প্রয়োজনে, বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত আইনগত সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার সহিত যোগাযোগ করা এবং শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা; এবং

(উ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(গ) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,-

(অ) প্রত্যেক শিশুর জন্য পৃথক নথি প্রসত্তত ও সংরক্ষণ করা;

(আ) ধারা ৮৪ তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ ও যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করা;

(ই) নিয়মিত বিরতিতে শিশুর সহিত সাক্ষাৎ করা বা শিশুর ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার যাচিত সময়ে তাহাকে সাক্ষাৎ প্রদান করা;

(ঈ) মাতা-পিতা, বর্ধিত পরিবার বা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক সংশ্লিষ্ট শিশুর তত্ত্বাবধানের শর্তাবলী সঠিকভাবে পালন করিতেছেন কি না তাহা, যতদূর সম্ভব, পর্যবেক্ষণ বা মনিটর করা;

(উ) শিশুর আনুষ্ঠানিক ও কারিগরী শিক্ষা সঠিকভাবে প্রদত্ত হইতেছে কি না তাহা সরেজমিনে তদারকি করা;

(ঊ) নিয়মিত বিরতিতে, শিশুর আচরণ এবং শিশুর জন্য গৃহীত ব্যবস্থার যথার্থতা সম্পর্কে, আদালতকে অবহিত করা এবং আদালত কর্তৃক তলবকৃত প্রতিবেদন দাখিল করা;

(ঋ) শিশুকে সৎ উপদেশ প্রদান করা, যথাসম্ভব বন্ধুভাবাপন্ন করিয়া তোলা এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা; এবং

(এ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ঘ) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে,

(অ) বিকল্পপন্থা বা বিকল্প পরিচর্যার শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ করা; এবং

(আ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

তৃতীয় অধ্যায়
শিশুকল্যাণ বোর্ড এবং উহার কার্যাবলি

জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড ও উহার কার্যাবলি

৭। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড' নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, পদাধিকারবলে;

(গ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন মহিলা সংসদ সদস্য, যাহাদের মধ্যে ১ (এক) জন সরকার দলীয় এবং ১ (এক) জন বিরোধী দলীয় হইবেন;

(ঘ) মহাপুলিশ পরিদর্শক বা তদকর্তৃক মনোনীত অন্যূন উপমহাপুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, পদাধিকারবলে;

(চ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ছ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(জ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ট) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঠ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ড) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার, অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার, একজন কর্মকর্তা;

(ঢ) মহা-কারা পরিদর্শক;

(ণ) ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার, পদাধিকারবলে;

(ত) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালক;

(থ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(দ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ধ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ন) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে;

(প) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ফ) বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উহার কার্যনির্বাহী কমিটির ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ব) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউণ্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদাধিকারবলে;

(ভ) বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর পরিচালক,পদাধিকারবলে;

(ম) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি;

(য) সরকার কর্তৃক মনোনীত, জেলা পর্যায়ে কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি সেচ্ছাসেবী শিশুবিষয়ক সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(র) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(২) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :-

(ক) শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুদের-

(অ) পরিবার ও সমাজ জীবনে পুনঃএকীকরণ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান;

(আ) কল্যাণ ও উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে তাহাদের লিঙ্গভিত্তিক সংখ্যা নিরূপণ এবং তাহাদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহপূর্বক এতদ্‌বিষয়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(ই) জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় বিকল্পপন্থা বা বিকল্প পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ এবং উক্তরূপ পন্থা বা পরিচর্যার আওতাধীন শিশুর তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনা;

(গ) জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর সুপারিশ অনুমোদন;

(ঘ) জেলা এবং উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর-

(অ) নীতিমালা প্রণয়ন এবং, প্রয়োজনে, সুপারিশ ও দিক নির্দেশনা প্রদান;
(আ) কার্যক্রম সম্পর্কে, সময় সময়, তাহাদের নিকট হইতে প্রতিবেদন আহবান এবং তাহাদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্ত:বোর্ড সমন্বয় সভার আয়োজন;
(ঙ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড ও উহার কার্যাবলি

৮। (১) প্রত্যেক জেলায়, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে, 'জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড' নামে একটি করিয়া বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-
(ক) জেলা প্রশাসক, পদাধিকারবলে, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, পদাধিকারবলে;
(গ) জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;
(ঘ) সিভিল সার্জন, পদাধিকারবলে;
(ঙ) জেলা'র জেল সুপারিনটেনডেন্ট;
(চ) জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;
(ছ) জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা,পদাধিকারবলে;
(জ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা,পদাধিকারবলে;
(ঝ) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন প্রবেশন কর্মকর্তা;
(ঞ) জেলা তথ্য কর্মকর্তা, পদাধিকারবলে;
(ট) জাতীয় মহিলা সংস্থার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান;
(ঠ) জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি;
(ড) জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর;
(ঢ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি;
(ণ) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট জেলার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ২ (দুই) জন প্রতিনিধি, যদি থাকে;
(ত) জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
(২) জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবে, যথা :-
(ক) সংশ্লিষ্ট জেলায় বিদ্যমান শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, শিশুদের জন্য অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, যদি থাকে, এবং কারাগার পরিদর্শন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;
(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ, ক্ষেত্রমত, তাহাদিগকে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণ এবং উক্তরূপ পরিচর্যার আওতাধীন শিশুর তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা;
(গ) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড এর নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
(ঘ) উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর সুপারিশ অনুমোদন বা, প্রয়োজনে, অনুমোদনের লক্ষ্যে জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড-এ প্রেরণ;
(ঙ) উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে, সময় সময়, প্রতিবেদন আহবান করা এবং উক্ত বোর্ড এর কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য, প্রয়োজনে, আন্ত:বোর্ড সভার আয়োজন;
(চ) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান বা, ক্ষেত্রমত, জেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা ও শিশুর কল্যাণার্থে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বা উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
(ছ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড ও উহার কার্যাবলি

৯। (১) প্রত্যেক উপজেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে 'উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড' নামে একটি করিয়া বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :-
(ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;
(খ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা;
(গ) উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা;
(ঘ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা;
(ঙ) থানা'র ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা;
(চ) প্রবেশন কর্মকর্তা;
(ছ) উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির সভাপতি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি, যদি থাকে;
(জ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট উপজেলার ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি;
(ঝ) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত শিশুবিষয়ক কার্যাবলির সহিত জড়িত সংশ্লিষ্ট উপজেলার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ (এক) জন প্রতিনিধি;
(ঞ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।
(২) 'উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :-
(ক) সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বিদ্যমান প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কার্যক্রম তদারকি, সমন্বয় সাধন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন;
(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য প্রয়োজনীয় বিকল্প পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ, ক্ষেত্রমত, তাহাদিগকে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণ এবং উক্তরূপ পরিচর্যার আওতাধীন শিশুর তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা;
(গ) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, প্রণীত নীতিমালা ও প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং যাচিত প্রতিবেদন প্রেরণ;
(ঘ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন; এবং
(ঙ) উপরি-উক্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

বোর্ডের মনোনীত কর্মকর্তার মেয়াদ, ইত্যাদি

১০। (১) জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড ও উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসরের জন্য স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে মনোনীত কোন সদস্য, ইচ্ছা করিলে, যেকোন সময়, সংশ্লিষ্ট সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং সভাপতি কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
(২) মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন বাতিল করিয়া তদস্থলে উপযুক্ত নূতন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।
(৩) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

বোর্ডের সভা

১১। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) বোর্ড এর সভা, উহার সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।
(৩) প্রতি ৬(ছয়) মাসে জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড, প্রতি ৪(চার) মাসে জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এবং প্রতি ৩(তিন) মাসে উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
(৪) সভাপতি বোর্ড এর সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে, তদ্‌কর্তৃক নির্দেশিত কোন সদস্য বা এইরূপ কোন নির্দেশনা না থাকিলে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।
(৫) মোট সংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের উপস্থিতিতে বোর্ডের সভার কোরাম গঠিত হইবে।
(৬) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বোর্ড এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৭) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ড এর কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এবং উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর উপদেষ্টা

১২। (১) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলা'র একজন সংসদ সদস্য জেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর উপদেষ্টা হইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট জেলায় কোন মহিলা সংসদ সদস্য থাকিলে, মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে, উক্ত মহিলা সংসদ সদস্যকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর উপদেষ্টা হইবেন।

(৩) জেলা ও উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড এর উপদেষ্টার দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
শিশুবিষয়ক ডেস্ক, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, ইত্যাদি

শিশুবিষয়ক ডেস্ক

১৩। (১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রত্যেক থানায়, সাব-ইন্সপেক্টর এর নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানক্রমে, একটি শিশুবিষয়ক ডেস্ক গঠন করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন থানায় মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর কর্মরত থাকিলে উক্ত ডেস্ক'এর দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তাহাকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশুবিষয়ক ডেস্ক' এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে অভিহিত হইবেন।

শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কার্যাবলি

১৪। শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:
(ক) শিশুবিষয়ক মামলার জন্য পৃথক নথি ও রেজিস্টার সংরক্ষণ করা;
(খ) কোন শিশু থানায় আসিলে বা শিশুকে থানায় আনয়ন করা হইল-
(অ) প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিত করা;
(আ) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করা এবং বিস্তারিত তথ্যসহ আদালতে হাজির করিবার তারিখ জ্ঞাত করা;
(ই) তাৎক্ষণিক মানসিক পরিসেবা প্রদান করা;
(ঈ) প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং, প্রয়োজনে, ক্লিনিক বা হাসপাতালে প্রেরণ করা;
(উ) শিশুর মৌলিক চাহিদা পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(গ) সঠিকভাবে শিশুর বয়স নির্ধারণ করা হইতেছে কি না বা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদ বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিশ্বাসযোগ্য দলিলাদি পর্যালোচনা করা হইতেছে কি না তদ্‌বিষয়ে লক্ষ্য রাখা;
(ঘ) প্রবেশন কর্মকর্তার সহিত যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্পপন্থা অবলম্বন এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক জামিনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
(ঙ) বিকল্পপন্থা অবলম্বন বা কোন কারণে জামিনে মুক্তি প্রদান করা সম্ভবপর না হইলে আদালতে প্রথম হাজিরার পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করা;
(চ) প্রতি মাসে শিশুদের মামলার সকল তথ্য প্রতিবেদন আকারে থানা হইতে নির্ধারিত ছকে প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট এবং পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এর কার্যালয়ের মাধ্যমে পুলিশ সদর দপ্তর ও, ক্ষেত্রমত, জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির নিকট প্রেরণ করা;
(ছ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করা; এবং
(জ) উপরি-উক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর একত্রে চার্জশীট প্রদান নিষিদ্ধ

১৫। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৩৯ অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুকে কোন প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর সহিত একসঙ্গে কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করিয়া একত্রে চার্জশীট প্রদান করা যাইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
শিশু-আদালত এবং উহার কার্যপ্রণালী

শিশু-আদালত নির্ধারণ, ইত্যাদি

১৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে এবং উহার অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে এবং, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় কমপক্ষে একটি আদালত থাকিবে, যাহা শিশু-আদালত নামে অভিহিত হইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, আইন ও বিচার বিভাগ, সুপ্রিমকোর্ট এর সহিত পরামর্শক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলা এবং, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকার এক বা একাধিক অতিরিক্ত দায়রা জজ এর আদালতকে শিশু-আদালত হিসাবে নির্ধারণ করিবে এবং একাধিক আদালত নির্ধারণ করা হইলে উহাদের প্রত্যেকটির আঞ্চলিক এখতিয়ার নির্দিষ্ট করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন জেলায় অতিরিক্ত দায়রা জজ না থাকিলে উক্ত জেলা'র জেলা ও দায়রা জজ তাহার নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে শিশু-আদালতের দায়িত্ব পালন করিবেন।

শিশু-আদালতের অধিবেশন ও ক্ষমতা

১৭। (১) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু কোন মামলায় জড়িত থাকিলে, যেকোন আইনের অধীনেই হউক না কেন, উক্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার কেবল শিশু-আদালতের থাকিবে।

(২) কোন মামলায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সহিত কোন শিশু জড়িত থাকিলে, ধারা ১৫ এর অধীন পৃথক চার্জশীটের ভিত্তিতে, শিশু-আদালতকে উক্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ও সংশ্লিষ্ট শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ পর্ব, একই দিবসে পৃথকভাবে পৃথক অধিবেশনে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উহা একই নিয়মে পরবর্তী কর্মদিবসে বিরতিহীনভাবে অব্যাহত থাকিবে।

(৩) শিশু-আদালত ধারা ১৮ এর বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বিধি দ্বারা নির্ধারিত স্থান, দিন এবং পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে, উহার অধিবেশন অনুষ্ঠান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত শিশু-আদালতের বিচারক তাহার স্বীয় বিবেচনায় বিচারের দিন, ক্ষণ, স্থান নির্ধারণক্রমে, উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে, উহার অধিবেশন আরম্ভ এবং সমাপ্ত করিবেন।

(৪) সাধারণতঃ যে সকল দালান বা কামরায় এবং যে সকল দিবস ও সময়ে প্রচলিত আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উহা ব্যতীত, যতদূর সম্ভব, অন্য কোন দালান বা কামরায়, প্রচলিত আদালতের ন্যায় কাঠগড়া ও লালসালু ঘেরা আদালতকক্ষের পরিবর্তে একটি সাধারণ কক্ষে এবং অন্য কোন দিবস ও সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ব্যতীত শুধুমাত্র শিশুর ক্ষেত্রে শিশু-আদালতের অধিবেশন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

শিশু-আদালতের এখতিয়ার

১৮। শিশু-আদালতের এখতিয়ার হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন দায়রা আদালতের ক্ষমতাসমূহ;

(খ) সমন জারি , সাক্ষী তলব ও উপস্থিতি, কোন দলিলাদি বা বসত্ত উপস্থাপন এবং শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারসমূহ।

শিশু-আদালতের পরিবেশ ও সুবিধাসমূহ

১৯। (১) আদালতকক্ষের ধরন, সাজসজ্জা ও আসন বিন্যাস বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) শিশু-আদালতের আসন বিন্যাস এমনভাবে করিতে হইবে যেন সকল শিশু বিচার প্রক্রিয়ায় তাহার মাতা-পিতা বা তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ বা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা ও আইনজীবীর, যতদূর সম্ভব, সন্নিকটে বসিতে পারে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া আদালতকক্ষে শিশুর জন্য উপযুক্ত আসনসহ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য, প্রয়োজনে, বিশেষ ধরনের আসন প্রদানের বিষয়টি শিশু-আদালত নিশ্চিত করিবে।

(৪) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক শিশুর বিচার চলাকালীন, আইনজীবী, পুলিশ বা আদালতের কোন কর্মচারী আদালতকক্ষে তাহাদের পেশাগত বা দাপ্তরিক ইউনিফরম পরিধান করিতে পারিবেন না।

শিশুর বয়স নির্ধারণে প্রাসঙ্গিক তারিখ

২০। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, আদালতের রায় বা আদেশে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অপরাধ সংঘটনের তারিখই হইবে শিশুর বয়স নির্ধারণের জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ।

শিশু-আদালত কর্তৃক বয়স অনুমান ও নির্ধারণ

২১। (১) অভিযুক্ত হউক বা না হউক, এমন কোন শিশুকে কোন অপরাধের দায়ে বা কোন শিশুকে অন্য কোন কারণে শিশু-আদালতে সাক্ষ্য দানের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে, আনয়ন করা হইলে এবং শিশু-আদালতের নিকট তাহাকে শিশু বলিয়া প্রতীয়মান না হইলে উক্ত শিশুর বয়স যাচাই এর জন্য শিশু-আদালত প্রয়োজনীয় তদন্ত ও শুনানি গ্রহণ করিতে পারিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তদন্ত ও শুনানিকালে যেইরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাহার ভিত্তিতে শিশুর বয়স সম্পর্কে শিশু-আদালত উহার মতামত লিপিবদ্ধ করিবে এবং শিশুর বয়স ঘোষণা করিবে।
(৩) বয়স নির্ধারণের উদ্দেশ্যে-
(ক) শিশু-আদালত যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে যেকোন প্রাসঙ্গিক দলিল, রেজিস্টার, তথ্য বা বিবৃতি যাচিতে পারিবে;
(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত দলিল, রেজিস্টার, তথ্য বা বিবৃতি উপস্থাপন করিবার জন্য আদালত যেকোন ব্যক্তির বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ওপর সাক্ষীর সমন জারি করিতে পারিবে।
(৪) এই ধারার অধীন শিশু-আদালত কর্তৃক উদ্ঘাটিত এবং কোন শিশুর ঘোষিত বয়স এই আইনের উদ্দেশ্যে উক্ত শিশুর প্রকৃত বয়স বলিয়া গণ্য হইবে এবং পরবর্তীকালে উক্ত বয়স ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইলেও উহার কারণে শিশু-আদালত প্রদত্ত কোন আদেশ বা রায় অকার্যকর বা অবৈধ হইবে না :
তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে ইতঃপূর্বে শিশু-আদালত কর্তৃক শিশু নয় মর্মে ঘোষণা করা হইলেও কোন সন্দেহাতীত দালিলিক প্রমাণ দ্বারা তাহাকে শিশু হিসাবে প্রমাণ করা সম্ভব হইলে উক্ত আদালত, যথাযথ যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক, সংশ্লিষ্ট শিশুর বয়স সম্পর্কে প্রদত্ত উহার পূর্বের মতামত পরিবর্তন করিতে পারিবে।

বিচার প্রক্রিয়ায় শিশুর অংশগ্রহণ

২২। (১) বিচার প্রক্রিয়ার সকল স্তরে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করা সংশ্লিষ্ট শিশুর অধিকার হিসাবে বিবেচিত হইবে।
(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের জন্য প্রয়োজনীয় না হইলে শিশু-আদালত, কোন মামলা বা বিচারিক কার্যধারার যেকোন পর্যায়ে, শিশুর সম্মতি সাপেক্ষে, তাহাকে ব্যক্তিগত হাজিরা প্রদান হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং তাহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মামলা বা কার্যধারা অব্যাহত রাখিতে পারিবে :
তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ক্ষেত্রে শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা শিশুর আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর উপস্থিতি নিশ্চিত করিতে হইবে।
(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী শিশুর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য পরিচালনা করা হইলে শিশু-আদালত উক্তরূপ অনুপস্থিতির কারণ নথিতে লিপিবদ্ধ করিবে এবং বিচার কার্য পরিচালনার সময় শিশুর পক্ষে যিনি আদালতে উপস্থিত থাকিবেন, তাহার মাধ্যমে আদালতের গৃহীত পদক্ষেপ ও কার্যক্রম এবং শিশুর পক্ষে বা বিপক্ষে করণীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কে শিশুকে অবহিত করিবে।
(৪) শিশুর পক্ষে নিযুক্তীয় আইনজীবী এবং প্রবেশন কর্মকর্তা আদালতের সিদ্ধান্ত ও আদেশসহ বিচার প্রক্রিয়ার ধরন ও পরিণাম বুঝিবার জন্য সংশ্লিষ্ট শিশুকে, ভাষাসহ, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা

প্রদান করিবেন।

(৫) মামলা দায়ের বা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলি সঠিকভাবে অনুসরণে শিশুবিষয়ক বা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা বা প্রবেশন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে কোন অসাবধানতা, গাফিলতি বা ব্যর্থতা শিশু-আদালতের নিকট গোচরীভূত হইলে উক্ত আদালত তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি প্রবেশন কর্মকর্তার ক্ষেত্রে, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক এবং শিশুবিষয়ক বা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষেত্রে, পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট এর নিকট, যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, প্রেরণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদ্‌কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট শিশু-আদালতকে অবহিত করিতে বাধ্য থাকিবে।

শিশু-আদালতের অধিবেশনে উপস্থিতির অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি

২৩।এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি শিশু-আদালতের অধিবেশনে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না, যথা :-
(ক) সংশ্লিষ্ট শিশু;
(খ) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য;
(গ) শিশু-আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারী;
(ঘ) শিশু-আদালতে উত্থাপিত মামলা অথবা কার্যধারার পক্ষগণ, শিশুবিষয়ক বা সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা, মামলা সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এবং প্রবেশন কর্মকর্তাসহ মামলা অথবা কার্যধারার সহিত সরাসরি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি; এবং
(ঙ) হাজির থাকিবার বা হইবার জন্য শিশু-আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

অভিযুক্ত শিশুর মাতা-পিতা বা অভিভাবকের শিশু-আদালতে উপস্থিতি

২৪। এই আইনের অধীন শিশু-আদালতে হাজিরকৃত শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বর্তমান থাকিলে এবং তিনি বা তাহারা যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে বসবাস করিলে শিশু-আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে :
তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের বাহিরে বসবাস করিলে,আদালত যুক্তিসঙ্গত সময় নির্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান করিবে।

শিশু ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তিকে শিশু-আদালত হইতে প্রত্যাহার

২৫। (১) শিশু-আদালত প্রয়োজন মনে করিলে, কোন মামলা শুনানিকালে, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে সংশ্লিষ্ট শিশু ব্যতীত ধারা ২৩ এ উল্লিখিত যেকোন ব্যক্তিকে উক্ত আদালত হইতে বহিরাগমণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আদালত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।
(২) শালীনতা বা নৈতিকতা বিরোধী কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা শুনানিকালে কোন শিশুকে সাক্ষী হিসাবে তলব করা হইলে, সংশ্লিষ্ট মামলা বা কার্যধারার সহিত সংশ্লিষ্ট আইনজীবী এবং শিশু-আদালতের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং প্রবেশন কর্মকর্তা ব্যতীত শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে যাহাদিগকে প্রত্যাহার করা যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন হইবে, শিশু-আদালত তাহাদিগকে প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত আদালত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

বিচারকালীন শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা

২৬। (১) বিচারকালীন শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখার বিষয়টি সর্বশেষ পন্থা হিসাবে বিবেচনা করিতে হইবে, যাহার মেয়াদ হইবে যথাসম্ভব স্বল্পতম সময়ের জন্য।
(২) সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরাপদ হেফাজতে রক্ষিত শিশুকে বিকল্পপন্থায় পরিচালনার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।
(৩) শিশুকে নিরাপদ হেফাজতে রাখা একান্ত প্রয়োজন হইলে শিশু-আদালত, সংশ্লিষ্ট শিশুকে উক্ত আদালত হইতে যুক্তিসঙ্গত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোন শিশুকে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী অধিক বয়স্ক শিশুদের হইতে প্রেরিত শিশুকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে।

ভাষা, দোভাষী ও অন্যান্য বিশেষ সহায়তামূলক পদক্ষেপ

২৭। (১) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম শিশুর জন্য সরল ও বোধগম্য ভাষায় পরিচালনা করিতে হইবে।

(২) শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ শিশুর বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করিবার জন্য সহায়তার প্রয়োজন হইলে আদালত বিনা খরচে শিশুকে একজন ব্যাখ্যাকারী প্রদান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিবে।

শিশু-আদালতের কার্যক্রমের গোপনীয়তা

২৮। (১) শিশু-আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় জড়িত বা সাক্ষ্য প্রদানকারী কোন শিশুর ছবি বা এমন কোন বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটে প্রকাশ বা প্রচার করা যাইবে না যাহা সংশ্লিষ্ট শিশুকে শনাক্তকরণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রকাশ করা শিশুর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হইবে না মর্মে শিশু-আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইলে উক্ত আদালত সংশিস্নষ্ট শিশুর ছবি, বর্ণনা, সংবাদ বা রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

শিশু-আদালত কর্তৃক আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর জামিনে মুক্তি প্রদান

২৯। (১) এই আইনসহ ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালতে হাজিরকৃত কোন শিশুর মামলা বিকল্প পন্থায় পরিচালনা করা না হইলে, শিশু-আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুকে, অপরাধটি জামিনযোগ্য বা অজামিনযোগ্য যাহাই হউক না কেন, জামানতসহ বা জামানত ছাড়াই জামিনে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) শিশুর নিজের মুচলেকায় অথবা শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, প্রবেশন কর্মকর্তা অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার, শিশু-আদালত যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, তত্ত্বাবধানে জামানত প্রদান সাপেক্ষে অথবা জামানত ছাড়া শিশুকে জামিন প্রদান করা যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন জামিন মঞ্জুর করা না হইলে শিশু-আদালত উক্তরূপ প্রত্যাখ্যানের কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।

শিশু-আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

৩০। এই আইনের অধীন কোন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে শিশু-আদালত নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা করিবে, যথা :-

(ক) শিশুর বয়স ও লিঙ্গ;
(খ) শিশুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা;
(গ) শিশুর শিক্ষাগত যোগ্যতা বা শিশু কোন্ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত;
(ঘ) শিশুর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক অবস্থা;
(ঙ) শিশুর পরিবারের আর্থিক অবস্থা;
(চ) শিশুর ও তাহার পরিবারের জীবন-যাপন পদ্ধতি;
(ছ) অপরাধ সংঘটনের কারণ, দলবদ্ধতার তথ্য, সার্বিক পরিস্থিতি ও পটভূমি;
(জ) শিশুর অভিমত;
(ঝ) সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন; এবং
(ঞ) শিশুর সংশোধন ও সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আনুষঙ্গিক যে সকল বিষয় বিবেচনার্থে গ্রহণ করা আবশ্যক ও প্রয়োজন।

সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন

৩১। (১) শিশুকে শিশু-আদালতে হাজির করিবার অনধিক ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে প্রবেশন কর্মকর্তা, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, শিশু-আদালতে একটি সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদন

দাখিল করিবেন এবং উহার অনুলিপি নিকটস্থ বোর্ড-এ ও অধিদপ্তরে দাখিল করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক শিশুর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, মনস্তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, পটভূমি এবং কোন্ অবস্থায় ও এলাকায় সে বসবাস করে এবং কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, ইত্যাদির বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৩) প্রবেশন কর্মকর্তার সামাজিক অনুসন্ধান প্রতিবেদনসহ শিশু সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিবেদন গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

বিচার সমাপ্তির সময়সীমা

৩২। (১) ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত উক্ত আদালতে শিশুর প্রথম উপস্থিত হইবার তারিখ হইতে ৩৬০ (তিনশত ষাট) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(২) কোন যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তব কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে বিচারকায সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে শিশু-আদালত, উক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সংশ্লিষ্ট বিচারকায সম্পন্নের সময়সীমা আরও ৬০ (ষাট) দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) শিশু-আদালতে বিচার আরম্ভ হইবার পর হইতে, বিচার কার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে, একাদিক্রমে উহার কার্যক্রম প্রত্যেক কার্যদিবসে বিনা বিরতিতে চলিতে থাকিবে।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করা না হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু, হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলা ব্যতীত, শিশু-আদালতের বিবেচনায় তাহার বিরুদ্ধে আনীত লঘু মাত্রার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং একই অপরাধের জন্য তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিচার প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অভিযুক্ত থাকিলে তাহার মামলা অব্যাহত থাকিবে।

শিশুর ওপর নির্দিষ্ট ধরনের দণ্ড আরোপে বাধা-নিষেধ

৩৩। (১) অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুকে যখন এইরূপ কোন মারাত্মক ধরনের অপরাধ সংঘটন করিতে দেখা যায় যে, তজ্জন্য এই আইনের অধীন প্রদানযোগ্য কোন আটকাদেশ আদালতের মতে পর্যাপ্ত নহে, অথবা আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে শিশুটি এত বেশি অবাধ্য অথবা ভ্রষ্ট চরিত্র যে তাহাকে কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা চলে না এবং অন্যান্য যে সকল আইনানুগ পন্থায় মামলাটির সুরাহা হইতে পারে উহাদের কোন একটিও তাহার জন্য উপযুক্ত নহে, তাহা হইলে শিশু-আদালত শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করিয়া কারাগারে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপে প্রদেয় কারাদণ্ডের মেয়াদ তাহার অপরাধের জন্য প্রদেয় দণ্ডের সর্বোচ্চ মেয়াদের অধিক হইবে না :

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কারাদণ্ডে থাকাকালীন যেকোন সময়ে শিশু-আদালত উপযুক্ত মনে করিলে এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এইরূপ কারাদণ্ডে আটক রাখিবার পরিবর্তে অভিযুক্ত শিশুকে, তাহার বয়স ১৮ (আঠারো) বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে আটক রাখিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন কোন শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করা হইলে, তাহাকে কারাগারে অবস্থানরত অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক আসামীর সহিত মেলামেশা করিতে দেওয়া যাইবে না।

শিশু-আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আটকাদেশ, ইত্যাদি

৩৪। (১) কোন শিশু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলে শিশু-আদালত তাহাকে অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর এবং অন্যূন ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে আটকাদেশ প্রদান করিয়া শিশুউন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশু মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নয় এমন কোন অপরাধে দোষী প্রমাণিত হইলে শিশু-আদালত তাহাকে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে আটকাদেশ প্রদান করিয়া শিশু উন্নয়ন কেণেদ্র আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) শিশু-আদালতের আদেশে অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর আচরণ, চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিলে এবং হত্যা, ধর্ষণ, দস্যুতা, ডাকাতি, মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন জঘন্য, ঘৃণ্য বা গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত না হইলে, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট শিশুকে মুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য, ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার অন্যূন ৩ (তিন) মাস পূর্বে, সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) হত্যা, ধর্ষণ, ডাকাতি, দস্যুতা বা মাদক ব্যবসা বা অন্য কোন গুরুতর মামলায় অভিযুক্ত শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইলে এবং মামলাটি আদালতে বিচারাধীন থাকিলে অথবা উল্লিখিত অপরাধের মামলায় আদালতের আদেশ অনুযায়ী আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুর বয়স ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইলে, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিশু-আদালতের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনতিবিলম্বে কেন্দ্রীয় বা জেলা কারাগারে প্রেরণ করিবে।

(৪) কারাগার কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রেরিত ব্যক্তিকে, কারাগারে অবস্থানরত অন্য কোন আইনের অধীনে দণ্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন আসামীদের হইতে পৃথক করিয়া ভিন্ন ওয়ার্ডে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে, যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহার আটকাদেশের মেয়াদ বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আটকাদেশের অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থান করিবেন।

(৫) কোন শিশুর বিচার প্রক্রিয়া ১৮ (আঠার) বৎসর পূর্ণ হইবার পর সমাপ্ত হইলে এবং বিচার সমাপ্তির পর তাহাকে আটকাদেশ প্রদান করা হইলে উক্ত শিশুকে শিশু-আদালত সরাসরি কেন্দ্রীয় বা জেলা কারাগারে প্রেরণ করিবে।

(৬) এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, কোন শিশুকে উপ-ধারা (১) এর অধীন শিশুউন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার পরিবর্তে যথাযথ সতর্কীকরণের পর খালাস প্রদানের অথবা সদাচারণের জন্য প্রবেশনে মুক্তি দানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) কোন শিশুকে, উপ-ধারা (৬) এর অধীন, প্রবেশনে মুক্তির ক্ষেত্রে শিশু-আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুকে প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে অথবা তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য অথবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সোপদ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিশুকে তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যের অনুকূলে সোপর্দ করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উক্ত শিশুর, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কাল, সদাচরণের জন্য দায়ী থাকিবেন মর্মে জামিনসহ বা বিনা জামিনে অথবা আদালত যেইরূপ নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপ মুচলেকা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট হইতে রিপোর্ট প্রাপ্তি অথবা অন্য কোনভাবে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, প্রবেশনে মুক্ত শিশু তাহার প্রবেশনকালে সদাচরণ করে নাই, তাহা হইলে আদালত, যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ তদন্ত করিবার পর, সংশ্লিষ্ট শিশুকে প্রবেশনের অসমাপ্ত সময়ের জন্য প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে আটক রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান

করিতে পারিবে।

নির্দিষ্ট বিরতিতে পর্যালোচনা ও মুক্তি প্রদান

৩৫। (১) শিশু-আদালতের প্রত্যেক আদেশে ইহা নির্দিষ্ট বিরতিতে পর্যালোচনা করিবার বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যাহার মাধ্যমে শিশু-আদালত ইহার প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে এবং শিশুকে শর্ত সাপেক্ষে বা বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) সরকার যেকোন সময়, ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে প্রাপ্ত সুপারিশ বিবেচনা করিয়া, আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশুকে শিশুউন্নয়ন কেন্দ্র বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হইতে বিনা শর্তে বা তদ্কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য বিষয়টি জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে পরিভাষা ব্যবহার

৩৬। (১) দণ্ডবিধিতে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে, এই আইনে যেইরূপ পরিভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে সেইরূপ পরিভাষা ব্যতীত কোন শিশু সম্পর্কে দণ্ডবিধিতে ব্যবহৃত 'অপরাধী', 'দণ্ডিত' বা 'দণ্ডাদেশ' শব্দসমূহ ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে শিশুদের ক্ষেত্রে 'অপরাধী', 'দণ্ডিত' বা 'দণ্ডাদেশ' শব্দসমূহের পরিবর্তে শিশু-আদালত যথাক্রমে 'দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি' বা 'দোষী সাব্যস্তকরণ' বা 'দোষী সাব্যস্তকরণ আদেশ' বা উক্ত আদালতের বিবেচনায় উক্ত শব্দসমূহের পরিপূরক অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিবে।

বিরোধ মীমাংসা

৩৭। (১) শিশু-আদালতের বিবেচনায় কোন শিশু লঘু প্রকৃতির অপরাধ সংঘটন করিলে, উক্ত আদালত বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রবেশন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে ধারা ৪৯ এর বিধান, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

(২) প্রবেশন কর্মকর্তা, শিশু-আদালত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতিতে, সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অপরাধের শিকার ও অপরাধ সংঘটনকারীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসার নিমিত্ত কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিবেন এবং তদানুসারে বিরোধ মীমাংসা করিবেন এবং উহা, যথাশীঘ্র সম্ভব, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৩) শিশু-আদালত উপ-ধারা (২) অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির পর বিষয়টির ওপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিবে এবং উহার ওপর করণীয়, যদি থাকে, সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করিয়া অধিদপ্তরকে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন নির্দেশনা জারি করা হইলে, অধিদপ্তর উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ উহার অগ্রগতি প্রতিবেদন আদালতকে অবহিত করিবে।

ক্ষতিপূরণ প্রদান

৩৮। (১) অপরাধের শিকার শিশুর বিরুদ্ধে কোন আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে, উক্ত শিশু বা তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, প্রবেশন কর্মকর্তা, আইনজীবী বা পাবলিক প্রসিকিউটরের অনুরোধক্রমে অথবা শিশু-আদালত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া শিশুকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আসামীর প্রতি আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কোন আদেশ প্রদান করিলে শিশু-আদালত উক্ত আদেশে তদ্কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এককালীন বা কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদালতের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য এবং শিশুর কল্যাণে উহার ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা প্রদান করিবে।

মাতা-পিতার ওপর ক্ষতিপূরণের অর্থ

৩৯। (১) অপরাধের শিকার শিশুর বিরুদ্ধে কোন শিশু দোষী সাব্যস্ত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর প্রতি শিশু-আদালত কর্তৃক আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ প্রদান করা হইলে শিশু-আদালত

প্রদান করিবার আদেশ

দোষী সাব্যস্ত শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে, উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ আদালতের মাধ্যমে পরিশোধের জন্য উক্ত আদেশে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে, যদি,ক্ষেত্রমত, শিশুটির-

(ক) মাতা-পিতা, তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়;

(খ) মাতা-পিতা, তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধে আর্থিকভাবে সচ্ছল হন; এবং

(গ) মাতা-পিতা, তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য শিশুর প্রতি যথাযথ যত্ন-পরিচর্যায় অবহেলা করিয়া তাহাকে অপরাধ সংঘটনে প্রভাবিত করিয়া থাকেন।

(২) এই ধারার অধীন আদেশ প্রদানের নিমিত্ত, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রবেশন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য আদালত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) শিশুর মাতা-পিতা, আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক শিশুর তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য কর্তৃক ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানে অপারগতার কারণে শিশুকে কারাদণ্ড প্রদান করা যাইবে না।

বিচারের ফলাফল ও মুক্তি সম্পর্কে তথ্য

৪০। (১) বিচার প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইবার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে শিশু-আদালত বিচারের ফলাফল সম্পর্কে শিশু, শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, শিশুর আইনজীবী ও প্রবেশন কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(২) কোন শিশু মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে শিশু-আদালত তাহার মুক্তি প্রদানের তথ্য, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অধিদপ্তর, প্রবেশন কর্মকর্তা বা আইনজীবীর মাধ্যমে অথবা সরাসরি উক্ত শিশু ও তাহার মাতা-পিতাকে এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করিবে।

(৩) কোন মামলায়, উপ-ধারা (২) এর অধীন, কোন শিশু মুক্তিপ্রাপ্ত হইলে এবং উক্ত মামলায় আইনের সংস্পর্শে আসা কোন শিশু জড়িত থাকিলে, শিশু-আদালত সংশ্লিষ্ট মুক্তি প্রদানের তথ্যটি, তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অধিদপ্তর, প্রবেশন কর্মকর্তা বা আইনজীবীর মাধ্যমে অথবা সরাসরি আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও তাহার মাতা-পিতাকে এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে অবহিত করিবে।

আপিল ও পুনর্বিবেচনা

৪১। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন শিশু-আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশু-আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ হাইকোর্ট বিভাগে পুনর্বিবেচনা (revision) করিবার ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(৩) এই ধারার অধীন আপিল বা, ক্ষেত্রমত, পুনর্বিবেচনার আবেদন দাখিল করা হইলে উক্ত আবেদনটি দায়েরের তারিখ হইতে অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলীর প্রযোজ্যতা

৪২। (১) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট ও ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য ও অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কৃত সকল অপরাধ আমলযোগ্য হইবে এবং এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট বিধান থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

দোষী সাব্যস্ত হইবার কারণে অযোগ্যতার অপসারণ, ইত্যাদি

৪৩। কোন শিশু এই আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইলেও-
(ক) তাহার ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ধারা ৭৫ বা ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৫৬৫ প্রযোজ্য হইবে না;
(খ) তিনি সরকারি বা বেসরকারি কোন অফিসে চাকরি পাইবার অথবা কোন আইনের অধীন কোন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
গ্রেফতার, তদন্ত, বিকল্প পন্থা, (Diversion) , এবং জামিন

গ্রেফতার, ইত্যাদি

৪৪। (১) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ৯ (নয়) বৎসরের নিম্নের কোন শিশুকে কোন অবস্থাতেই গ্রেফতার করা বা, ক্ষেত্রমত, আটক রাখা যাইবে না।
(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত কোন আইনের অধীন গ্রেফতার বা আটক করা যাইবে না।
(৩) শিশুকে গ্রেফতার করিবার পর গ্রেফতারকারী পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেফতারের কারণ, স্থান, অভিযোগের বিষয়বসত্ত, ইত্যাদি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন এবং প্রাথমিকভাবে তাহার বয়স নির্ধারণ করিয়া নথিতে লিপিবদ্ধ করিবেন :
তবে শর্ত থাকে যে, গ্রেফতার করিবার পর কোন শিশুকে হাতকড়া বা কোমরে দড়ি বা রশি লাগানো যাইবে না।
(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তা জন্ম নিবন্ধন সনদ অথবা, উক্ত সনদের অবর্তমানে স্কুল সার্টিফিকেট বা স্কুলে ভর্তির সময় প্রদত্ত তারিখসহ প্রাসঙ্গিক দলিলাদি উদ্‌ঘাটনপূর্বক যাচাই-বাছাই করিয়া তাহার বয়স লিপিবদ্ধ করিবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন শিশু কিন্তু সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করিয়াও দালিলিক প্রমাণ দ্বারা তাহা নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে এই আইনের বিধান অনুযায়ী শিশু হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।
(৫) সংশ্লিষ্ট থানায় শিশুর জন্য উপযোগী কোন নিরাপদ স্থান না থাকিলে গ্রেফতারের পর হইতে আদালতে হাজির না করা সময় পর্যন্ত শিশুকে নিরাপদ স্থানে আটক রাখিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে :
তবে শর্ত থাকে যে, নিরাপদ স্থানে আটক রাখিবার ক্ষেত্রে শিশুকে প্রাপ্তবয়স্ক বা ইতোমধ্যেই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন এইরূপ কোন শিশু বা অপরাধী এবং আইনের সংস্পর্শে আসা কোন শিশুর সহিত একত্রে রাখা যাইবে না।

মাতা-পিতা ও প্রবেশন কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ

৪৫। (১) কোন শিশুকে গ্রেফতারের পর গ্রেফতারকারী কর্মকর্তা কর্তৃক থানায় আনয়ন করিলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিধানাবলীকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে-
(ক) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে;
(খ) প্রবেশন কর্মকর্তাকে; এবং
(গ) প্রয়োজনে, নিকটস্থ বোর্ডকে;-উক্ত গ্রেফতার সম্পর্কে অবহিত করিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রমত, বোর্ডকে অবহিত করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট শিশুকে আদালতে হাজির করিবার প্রথম দিবসে উক্তরূপ বিধান অনুসরণ না করিবার কারণ সংবলিত একটি প্রতিবেদন শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আদালতে দাখিল করিতে

হইবে।

তদন্ত

৪৬। এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট ও ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন সকল তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য ও অনুসরণ করিতে হইবে।

জবানবন্দী, সতর্কীকরণ ও মুক্তি

৪৭। (১) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুর জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন।

(২) শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রকৃতি ও শিশুর মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় লইয়া শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা-

(ক) সংশ্লিষ্ট শিশু, শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর উপস্থিতিতে শিশুকে লিখিত বা মৌখিক সতর্কীকরণের পর মুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন, যাহা শিশুর বিরুদ্ধে রেকর্ড হিসাবে গণ্য হইবে না; বা

(খ) বিকল্প পন্থায় প্রেরণ করিতে পারিবেন।

বিকল্প পন্থা (diversion)

৪৮। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে গ্রেফতার বা আটকের পর হইতে বিচার কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রমের পরিবর্তে, শিশুর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনাপূর্বক, বিরোধীয় বিষয় মীমাংসাসহ তাহার সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে বিকল্প পন্থা (diversion) গ্রহণ করা যাইবে।

(২) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিশুর গ্রেফতারের পর হইতে বিচার কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালত আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিকল্প উপায়ে বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত বিকল্প পন্থা গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রবেশন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিকল্প পন্থা গ্রহণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু, তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বিকল্প পন্থার শর্ত প্রতিপালন করিতেছে কি না প্রবেশন কর্মকর্তা তাহা লক্ষ্য রাখিবেন এবং বিষয়টি, সময় সময়, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৪) শিশু, তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বিকল্প পন্থার কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে প্রবেশন কর্মকর্তা বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে লিখিত আকারে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, শিশু-আদালতকে অবহিত করিবেন।

(৫) বিকল্প পন্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর বিকল্প পন্থা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ যুগোপযোগী ও বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

পারিবারিক সম্মেলন

৪৯। (১) ধারা ৪৮ এর অধীন বিকল্প পন্থা গ্রহণ করা হইলে প্রবেশন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট বিরোধ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পারিবারিক সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) পারিবারিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ সমঝোতার ভিত্তিতে সম্মেলনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ ও অনুসরণ করিয়া শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবেন যাহা শিশু-আদালত বা, ক্ষেত্রমত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন শিশুকে বিকল্প পন্থায় প্রেরণের সময় শিশু-আদালত বা ক্ষেত্রমত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা পারিবারিক সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে এবং প্রবেশন কর্মকর্তা সেই মোতাবেক পারিবারিক সম্মেলনের আয়োজন করিবেন।

(৪) শিশু, বা তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য পারিবারিক সম্মেলনে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের শর্ত ভঙ্গ বা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে প্রবেশন কর্মকর্তা উহা লিখিতভাবে শিশু-আদালত বা, ক্ষেত্রমত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

(৫) পারিবারিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ব্যর্থ হইলে সম্মেলনটি বাতিল হইয়া যাইবে এবং ভিন্নরূপ একটি বিকল্প পন্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রবেশন কর্মকর্তা বিষয়টি শিশু-আদালত বা, ক্ষেত্রমত, শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

(৬) পারিবারিক সম্মেলনের কার্যক্রমসমূহ গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কোন ব্যক্তির কোন বক্তব্য পরবর্তীতে কোন আদালতের বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

বিকল্প পন্থার মেয়াদ

৫০। (১) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুযায়ী শিশু-আদালত বা, ক্ষেত্রমত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে বিকল্প পন্থা গ্রহণ ও সমাপ্ত করিতে হইবে।

(২) অপরাধ সংঘটনকারী শিশু বিকল্প পন্থা অবলম্বনে ইতিবাচক সাড়া প্রদান করিলে, বিকল্প পন্থা নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বেই সমাপ্ত করা যাইবে।

বিকল্প পন্থার শর্ত ভঙ্গ বা বিকল্প পন্থার আদেশ পালনে ব্যর্থতা

৫১। এই আইনের বিধান অনুসারে প্রবেশন কর্মকর্তার প্রতিবেদন প্রাপ্ত হইয়া বা অন্য কোনভাবে যদি শিশু-আদালত বা, ক্ষেত্রমত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, শিশু, শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বিকল্প পন্থার শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন বা বিকল্প পন্থা সংক্রান্ত কোন আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে বিষয়টি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক শিশু-আদালত বা, ক্ষেত্রমত শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা-

(ক) পরিবর্তিত শর্তে একই ধরনের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) শিশুটিকে গ্রেফতার করিবার জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করিতে পারিবে;

(গ) শিশুটিকে শিশু-আদালতে বা থানায় হাজির হইবার জন্য লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর নিকট সংশ্লিষ্ট শিশুর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার জন্য নথি প্রেরণ করিতে পারিবে;

(ঙ) শিশুটিকে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; অথবা

(চ) এই আইনের অধীন অন্য কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

জামিন, ইত্যাদি

৫২। (১) ফৌজদারি কার্যবিধিসহ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে গ্রেফতার করিবার পর এই আইনের অধীন মুক্তি প্রদান বা বিকল্প পন্থায় প্রেরণ করা অথবা তাৎক্ষণিকভাবে আদালতে হাজির করা সম্ভবপর না হইলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুটিকে, ক্ষেত্রমত, তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শর্ত ও জামানত সাপেক্ষে, অথবা, শর্ত ও জামানত ব্যতীত জামিনে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন শিশুকে জামিনে মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধ জামিনযোগ্য বা জামিন অযোগ্য কি না তাহা শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বিবেচনায় লইবেন

না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অপরাধের প্রকৃতি গুরুতর বা ঘৃণ্য প্রকৃতির হইলে বা জামিন প্রদান করা হইলে উহা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী হইলে বা জামিন প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু কোন কুখ্যাত অপরাধীর সাহচর্য লাভ করিতে পারে বা নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে বা জামিন প্রদান করা হইলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবার আশঙ্কা থাকিলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিশুকে জামিন বা মুক্তি প্রদান করিবেন না।

(৪) গ্রেফতারকৃত শিশুকে উপ-ধারা (৩) এর অধীন জামিনে মুক্তি প্রদান করা না হইলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, গ্রেফতারের পর আদালতে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ সময় ব্যতীত, ২৪ (চবিবশ) ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিকটস্থ শিশু-আদালতে হাজির করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) থানা হইতে জামিনপ্রাপ্ত হয় নাই এমন কোন শিশুকে শিশু-আদালতে উপস্থাপন করা হইলে শিশু-আদালত তাহাকে জামিন প্রদান করিবে বা নিরাপদ স্থানে বা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার আদেশ প্রদান করিবে।

আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু সম্পর্কে অবহিত করিবার দায়িত্ব

৫৩। কোন ব্যক্তি যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করেন যে, কোন শিশু অপরাধমূলক ঘটনার শিকার বা কোন অপরাধের সাক্ষী তাহা হইলে তিনি উহা শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী উক্ত শিশুর সার্বিক নিরাপত্তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা ও সুরক্ষা

৫৪। (১) বিচার প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বয়স, লিঙ্গ এবং অক্ষমতা ও পরিপক্কতার বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইতে হইবে।

(২) শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক বিশেষ শিশুবান্ধব পরিবেশে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে উক্ত শিশুর মাতা-পিতা অথবা তাহাদের অবর্তমানে তত্ত্বাবধায়ক অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য এবং প্রবেশন কর্মকর্তার, যাহাদের উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষাৎকার প্রদানে রাজি থাকে বা স্বাচ্ছন্দবোধ করে, উপস্থিতিতে একজন মহিলা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শিশুর সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবার জন্য শিশু-আদালত নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা :

(ক) বিচার প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সকল তথ্য গোপন রাখা এবং এমন কোন তথ্য প্রকাশ না করা, যাহার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুটিকে শনাক্ত করা যায়;

(খ) সাক্ষ্য প্রদানকারী শিশুর ছবি বা দৈহিক বর্ণনা গোপন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ অথবা শিশুর ক্ষতি প্রতিরোধ করিবার জন্য, প্রাপ্যতা সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণ করা:-

(অ) পর্দার আড়ালে;

(আ) শুনানির পূর্বে শিশু-সাক্ষীর ভিডিওকৃত সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে, তবে উক্ত ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণকালে আসামীপক্ষের আইনজীবীর উপস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট শিশুকে জেরা করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(ই) একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ও উপযুক্ত মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে;

(ঈ) দ্বারবদ্ধ (Camera Trial) অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে; বা

(উ) ভিডিও লিংকেজ পদ্ধতি চালু হইলে উক্ত পদ্ধতিতে;

(গ) আসামীর উপস্থিতিতে শিশু সাক্ষ্য প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে বা যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে শিশুটি সত্য কথা বলিতে বাধাগ্রস্ত হইতে পারে,

তাহা হইলে আসামীকে সাময়িকভাবে পুলিশের হেফাজতে আদালত পরিত্যাগের আদেশ প্রদান করা; তবে উক্ত ক্ষেত্রে আসামী পক্ষের আইনজীবীকে আদালত কক্ষে উপস্থিত থাকিতে এবং শিশুকে প্রশ্ন করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে;

(ঘ) শিশুর সাক্ষ্য গ্রহণের সময় বিরতির সুযোগ প্রদান করা;

(ঙ) শিশুর বয়স ও পরিপক্কতার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ দিন ও তারিখে শুনানির সময়সূচি নির্ধারণ করা; এবং

(চ) মামলার সাক্ষী বা ভিকটিম হিসাবে সাক্ষ্য প্রদানকালে, সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে ও পরে শিশুকে তাহার অভিভাবকসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করা; বা

(ছ) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ এবং আসামীর অধিকার বিবেচনায় আনিয়া আদালত যেইরূপ বিবেচনা করিবে, সেইরূপ অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করিবার জন্য শিশু-আদালত পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ মীমাংসার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

সপ্তম অধ্যায়
আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও সহায়তা

আইনগত প্রতিনিধিত্ব, ইত্যাদি

৫৫। (১) আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর পক্ষে আইনগত প্রতিনিধিত্ব ব্যতীত কোন আদালত কোন মামলার বিচার কার্য পরিচালনা করিবে না।

(২) শিশু তাহার আইনগত প্রতিনিধিকে নিজের ভাষায় এবং, ক্ষেত্রমত, ব্যাখ্যাকারীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদান করিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবে।

(৩) শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য কর্তৃক কোন আইনজীবী নিয়োগ করা না হইলে অথবা মাতা-পিতা অথবা তাহাদের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্য না থাকিলে অথবা আইনজীবী নিয়োগের আর্থিক সামর্থ্য না থাকিলে, শিশু-আদালত জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি বা, ক্ষেত্রমত, সুপ্রিম কোর্ট এর তালিকাভুক্ত বা প্যানেলভুক্ত আইনজীবীগণের মধ্য হইতে একজন উপযুক্ত আইনজীবীকে মামলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করিবার লক্ষ্যে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এবং উহার অধীন প্রণীত বিধিমালা, প্রবিধানমালা ও নীতিমালা অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

আইনগত প্রতিনিধির উপস্থিতি

৫৬। (১) ধারা ৫৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন শিশুর পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবীকে সংশ্লিষ্ট মামলার সকল শুনানীতে অবশ্যই হাজির থাকিতে হইবে এবং যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে তিনি মামলা পরিচালনা করিতে অপরাগ হইলে উক্ত অপারগতার কারণসহ বিষয়টি লিখিতভাবে, যুক্তিসঙ্গত সময়ে, তাহার প্রতিনিধি, শিশুর মাতা-পিতা অথবা তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা প্রবেশন কর্মকর্তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করিতে হইবে।

(২) কোন আইনজীবী উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার অপরাগতার বিষয়টি আদালতকে অবহিত করিলে, উক্ত ক্ষেত্রে একজন নূতন আইনজীবী নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানি স্থগিত থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নূতন আইনজীবী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা'র জেলা আইনগত সহায়তা কমিটি কোনক্রমেই ৩০ (ত্রিশ) দিনের অতিরিক্ত সময় অতিক্রান্ত করিবে না।

(৩) শিশুর পক্ষে শিশুর মাতা-পিতা অথবা তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য কর্তৃক আইনজীবী নিয়োগ করা হইলে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীকে সংশ্লিষ্ট মামলার সকল

শুনানিতে অবশ্যই হাজির থাকিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট আইনজীবী, প্রয়োজনে, যুক্তিসঙ্গত কারণে, শিশু আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, মামলার শুনানী হইতে অব্যাহতি যাচিতে পারিবেন।

অপর্যাপ্ত আইনগত প্রতিনিধিত্ব ও অসদাচরণ

৫৭। শিশুর পক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত আইনজীবী যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বারংবার আদালতে অনুপস্থিত থাকিলে বা মামলা পরিচালনায় তাহার সুস্পষ্ট গাফিলতি পরিলক্ষিত হইলে শিশু-আদালত তাহাকে উক্ত মামলা পরিচালনার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া বিষয়টি অসদাচরণ গণ্যে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটির চেয়ারম্যানকে এবং, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সমিতিকে নির্দেশনা প্রদান করিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশনার আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আদালতকে নির্দেশনা প্রদানের তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অবহিত করিবার বিষয়টি উল্লেখ করিবে।

সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ

৫৮। বিচার প্রক্রিয়ার যেকোন পর্যায়ে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা, ক্ষেত্রমত, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট শিশুর তত্ত্বাবধানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত শিশুর জন্য নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা :

(ক) সংশ্লিষ্ট শিশুর সহিত অভিযুক্ত ব্যক্তির সরাসরি সাক্ষাৎ পরিহার করা;

(খ) পুলিশ বা অন্য সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুর নিরাপত্তা বিধান এবং উক্ত শিশু কোথায় অবস্থান করিতেছে তাহা গোপন রাখা;

(গ) আদালত বা পুলিশের নিকট সংশ্লিষ্ট শিশুর এবং, প্রয়োজনে, শিশুর পরিবারের সদস্যদের সকল পর্যায়ে যথোপযুক্ত নিরাপত্তার জন্য আবেদন করা।

অষ্টম অধ্যায়
শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যয়ন

৫৯। (১) সরকার, বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশপ্রাপ্ত শিশু এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষে, লিঙ্গভেদে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর প্রাসঙ্গিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া সরকার, যেকোন সময়, উহার যেকোন ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠানকে শিশু অপরাধীদেরকে অবস্থানের জন্য উপযুক্ত মর্মে প্রত্যয়ন করিতে পারিবে।

(৩) সরকার উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন বা, সময় সময়, পরিপত্র জারি করিবে।

বেসরকারি উদ্যোগে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান

৬০। সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি বা নীতিমালার আলোকে, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে, নির্ধারিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে, অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

বৈধ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দণ্ড

৬১। বৈধ প্রত্যয়নপত্র ব্যতীত ধারা ৬০ এ উল্লিখিত কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা বা বিধি দ্বারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করিতে ব্যর্থ কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা অব্যাহত রাখা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক বা কর্মকর্তা ৫ (পাঁচ) মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের

৬২। ধারা ৫৯ এবং ৬০ এর অধীন সরকারি বা, ক্ষেত্রমত, বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান প্রতিটি শিশুর নাম, লিঙ্গ, বয়স ও উক্ত প্রতিষ্ঠানে শিশুকে গ্রহণ

বিষয়ে অধিদপ্তরকে অবহিতকরণ

করিবার কারণসহ গ্রহণের তারিখ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিয়া, অধিদপ্তরকে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অবহিত করিবে এবং অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য সকল তথ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড (Minimum Standards of Care)

৬৩। (১) সরকার, সময় সময়, অফিস আদেশ বা নির্দেশনা জারির মাধ্যমে প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের যথাযথ পরিচর্যার জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করিবে এবং প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ উক্ত আদেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড বজায় রাখিবে।

(২) প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের অপরাধের মাত্রা, ধরণ ও বয়স বিবেচনায় লইয়া বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করিয়া রাখিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত শ্রেণি বিভাগের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন, ৯ (নয়) বৎসরের উর্ধ্বের কোন শিশুর সহিত ১০ (দশ) বৎসরের এবং ১০ (দশ) বৎসরের উর্ধ্বের কোন শিশুর সহিত ১২ (বার) বৎসরের ঊর্ধ্বের শিশুকে একত্রে একই কক্ষে এবং ফ্লোরে রাখা না হয়;

আরও শর্ত থাকে যে, ১২ (বার) বৎসর এবং তদূর্ধ্ব বয়সের বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা, শিশুর বাড়ন্ত শারীরিক কাঠামো, সবলতা, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় লইয়া তাহাদের আবাসনের বিষয়টি সতর্কভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে এবং, যতদূর সম্ভব, তাহাদের পৃথক পৃথক কক্ষে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) দণ্ডবিধির ধারা ৮২ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে ৯ (নয়) বৎসর বয়সের কম বয়সী কোন শিশুকে কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে রাখা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কারণে ৯ (নয়) বৎসর বয়সের কম বয়সী অভিভাবকহীন কোন শিশুকে কোথাও পাওয়া গেলে তাহাকে অধিদপ্তর বা উহার নিকটস্থ কোন কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে এবং অধিদপ্তর বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বোর্ডের গোচরীভূত করতঃ সংশ্লিষ্ট শিশুকে সুবিধাবঞ্চিত শিশু গণ্যে, ক্ষেত্রমত, ধারা ৮৪ বা ধারা ৮৫ এর বিধান অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ, উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকারী, প্রত্যেক শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা এবং তাহাদের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, মানবিক আচরণ এবং যথোপযুক্ত শিক্ষাসহ কারিগরী শিক্ষা নিশ্চিত করিবে।

সরকার বা উহার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

৬৪। সরকার বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি এবং অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তদ্‌কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, দাপ্তরিক বা বিশেষ কোন প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, যেকোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে পারিবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থানান্তর

৬৫। অধিদপ্তর, বিশেষ প্রয়োজনে, একটি শিশুকে এক প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান হইতে অন্য প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

অন্য প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর

৬৬। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়িত মর্যাদা লোপ পাইলে এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের আদেশক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের অন্য কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে বদলি বা স্থানান্তর করা যাইবে।

সরকারের প্রত্যয়নপত্র প্রত্যাহারের ক্ষমতা

৬৭। কোন প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান উক্ত প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত শিশুদের যথাযথ পরিচর্যার জন্য, ধারা ৬৩ এর অধীন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিচর্যার ন্যূনতম মানদণ্ড বজায় রাখিতে ব্যর্থ হইলে, সরকার উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতি নোটিশ জারি করিয়া নোটিশে উল্লিখিত তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়ন প্রত্যাহার করা হইল মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশ জারির পূর্বে, প্রত্যয়নপত্র কেন প্রত্যাহার করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপককে যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

শিশুর ওপর জিম্মাদারের নিয়ন্ত্রণ

৬৮। এই আইনের বিধানাবলীর অধীন কোন ব্যক্তি বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে কোন শিশুকে সোপর্দ করা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উক্ত শিশুকে তাহার মাতা-পিতার ন্যায় নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন এবং সংশ্লিষ্ট শিশুর মাতা-পিতা বা অন্য কোন ব্যক্তি দাবী করা সত্ত্বেও শিশু-আদালত বা বোর্ড বা অন্য কোন আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত শিশুটিকে অব্যাহতভাবে তাহার তত্ত্বাবধানে রাখিবেন।

পলাতক শিশু সম্পর্কে করণীয়

৬৯। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান অথবা যে ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকিবার জন্য শিশুকে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার তত্ত্বাবধান হইতে কোন শিশু পলায়ন করিলে উক্ত পলাতক শিশুকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং উক্ত শিশুর কোন অপরাধ নথিভুক্ত না করিয়া বা তাহার বিরুদ্ধে পৃথক মামলা দায়ের না করিয়া তাহাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট ফেরত পাঠাইবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পলাতক হইবার কারণে উক্ত শিশু কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পলাতক কোন শিশুকে গ্রেফতার করা হইলে তাহাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট ফেরৎ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত নিরাপদ স্থানে রাখিতে হইবে।

নবম অধ্যায়
শিশু সংক্রান্ত বিশেষ অপরাধসমূহের দণ্ড

শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দণ্ড

৭০। কোন ব্যক্তি যদি তাহার হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোন শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যার কাজে ব্যবহার বা অশালীনভাবে প্রদর্শন করে এবং এইরূপভাবে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, পরিত্যাগ ব্যক্তিগত পরিচর্যা বা প্রদর্শনের ফলে উক্ত শিশুর অহেতুক দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় বা স্বাস্থ্যের এইরূপ ক্ষতি হয়, যাহাতে সংশ্লিষ্ট শিশুর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়, শরীরের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের ক্ষতি হয় বা কোন মানসিক বিকৃতি ঘটে, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের দণ্ড

৭১। কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন বা কোন শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান অথবা শিশুর হেফাজত, তত্ত্বাবধান বা দেখাশুনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে প্রশ্রয়দান করেন বা উৎসাহ প্রদান করেন বা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শিশুর দায়িত্বে থাকাকালে নেশাগ্রস্ত হইবার দণ্ড

৭২। শিশুর দেখাশুনার দায়িত্বে থাকাকালে কোন ব্যক্তিকে যদি প্রকাশ্য স্থানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এই কারণে যদি তিনি শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী মাদকদ্রব্য কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ প্রদানের দণ্ড

৭৩। যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতা বা অন্য কোন জরুরী কারণে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তারের আদেশ ব্যতীত কোন শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী মাদকদ্রব্য বা ঔষধ প্রদান করে বা করায়, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মাদকদ্রব্য কিংবা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানসমূহে প্রবেশের অনুমতিদানের দণ্ড

৭৪। যদি কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে মাদক বা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানে লইয়া যায় অথবা এইরূপ স্থানের স্বত্বাধিকারী, মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে অথবা কোন ব্যক্তি যদি অনুরূপ স্থানে কোন শিশুর গমনের কারণ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শিশুকে বাজি ধরিতে বা ঋণ গ্রহণে উসকানি প্রদানের দণ্ড

৭৫। যদি কোন ব্যক্তি মৌখিকভাবে, লিখিত শব্দ দ্বারা, কোন প্রকার ইঙ্গিত দ্বারা বা অন্য কোনভাবে কোন শিশুকে কোন বাজি ধরিতে বা পণ রাখিতে অথবা কোন বাজি বা পণভিত্তিক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে বা শেয়ার লইতে উসকানি প্রদান করে বা প্রদানের চেষ্টা করে অথবা অনুরূপভাবে কোন শিশুকে ঋণ গ্রহণ করিতে বা ঋণ গ্রহণমূলক লেনদেনে অংশগ্রহণ করিতে উসকানি প্রদান করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শিশুর নিকট হইতে দ্রব্যাদি বন্ধক গ্রহণ বা ক্রয় করিবার দণ্ড

৭৬। কোন ব্যক্তি কোন শিশুর নিকট হইতে কোন দ্রব্য, তাহা উক্ত শিশুর পক্ষ হইতে বা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ হইতে প্রদেয় হউক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শিশুকে যৌনপল্লীতে থাকিবার অনুমতিদানের দণ্ড

৭৭। (১) ৪ (চার) বৎসরের অধিক বয়সের কোন শিশুকে যৌনপল্লীতে বাস করিতে কিংবা গমনাগমন করিতে সুযোগ বা অনুমতি প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, ৪ (চার) বৎসর বয়স অতিক্রান্ত হইবার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত শিশুকে সুবিধাবঞ্চিত শিশু গণ্যক্রমে, ক্ষেত্রমত, ধারা ৮৪ বা ধারা ৮৫ এর অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরে বা উহার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শিশুকে অসৎ পথে পরিচালনা করানো বা করিতে উৎসাহদানের দণ্ড

৭৮। (১) কোন ব্যক্তি কোন শিশুর প্রকৃত দায়িত্বসম্পন্ন হইয়া বা তাহার তত্ত্বাবধানকারী হইয়া তাহাকে অসৎ পথে পরিচালিত করিলে কিংবা যৌনবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করিলে বা তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে অথবা স্বামী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির সহিত তাহার যৌন সঙ্গম করাইলে বা তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে, উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন শিশু তাহার মাতা-পিতা অথবা তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অসৎ পথে পরিচালিত হইতেছে বা যৌনবৃত্তিতে লিপ্ত হইবার ঝুঁকির সম্মুখীন হইতেছে, তাহা হইলে আদালত এইরূপ শিশুর বিষয়ে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং তদারকি করিবার জন্য একটি মুচলেকা সম্পাদন করিতে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট মাতা-পিতা, তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ, আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

[ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তি কোন শিশুকে অসৎ পথে বা যৌনবৃত্তিতে পরিচালিত করাইয়াছেন বা তজ্জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি উক্ত ব্যক্তি শিশুটিকে কোন যৌনকর্মী কিংবা ভ্রষ্ট চরিত্র বলিয়া জ্ঞাত ব্যক্তির সহিত বাস করিতে বা তাহার অধীন চাকুরিতে নিয়োজিত হইতে বা থাকিতে জ্ঞাতসারে অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন।]

শিশুর দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র বা অবৈধ ও নিষিদ্ধ বসত্ত বহন এবং সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের দণ্ড

৭৯। (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন শিশুর দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র বা অবৈধ ও নিষিদ্ধ বসত্ত বহন করান বা পরিবহন করান, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত দায়িত্বসম্পন্ন বা তত্ত্বাবধানকারী ইউক, বা না হউক, কোন শিশুকে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ এ উল্লিখিত কোন সন্ত্রাসী কার্যে নিয়োজিত করিলে বা ব্যবহার করিলে তিনি স্বয়ং উক্ত সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি উক্ত ধারায় উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

শিশুকে শোষণের দণ্ড

৮০। (১) শিশু-আদালত কর্তৃক শিশুর জিম্মাদার, রক্ষণাবেক্ষণকারী, প্রতিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভৃত্যের চাকরী বা শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান মোতাবেক কোন কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োগের কথা বলিয়া হস্তগত করে, কিন্তু কার্যতঃ শিশুকে নিজ স্বার্থে শোষণ করে, আটকাইয়া রাখে অথবা তাহার উপার্জন ভোগ করে, তাহা হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) শিশু-আদালত কর্তৃক শিশুর জিম্মাদার, রক্ষণাবেক্ষণকারী বা প্রতিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি কোন শিশুকে ভৃত্যের চাকুরী বা শ্রম আইন, ২০০৬ এর বিধান মোতাবেক কোন কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োগের কথা বলিয়া হস্তগত করে, কিন্তু কার্যতঃ শিশুকে অসৎ পথে চালিত করে বা যৌনকর্ম কিংবা নীতি-গর্হিত কোন কাজে লিপ্ত হইবার ঝুঁকির সম্মুখীন করে, তাহা হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) বা (২) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে শোষিত বা কাজে লাগানো শিশুর শ্রমের ফল ভোগ করিলে অথবা নৈতিকতা বিরোধী বিনোদনের কাজে শিশুকে ব্যবহার করিলে তিনি সংশ্লিষ্ট দুষ্কর্মের সহায়তার জন্য দায়ী হইবেন।

সংবাদ মাধ্যম কর্তৃক কোন গোপন তথ্য প্রকাশের দণ্ড

৮১। (১) এই আইনের অধীন বিচারাধীন কোন মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোন প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না, যাহার দ্বারা শিশুটিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী, সমিতি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন অনধিক ২ (দুই) মাসের জন্য স্থগিত রাখাসহ উহাকে অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

শিশুকে পলায়নে সহায়তার দণ্ড

৮২। কোন ব্যক্তি, জ্ঞাতসারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠান, নিরাপদ স্থান বা বিকল্প পন্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান হইতে কোন শিশুকে,-

(ক) পলায়ন করিতে সাহায্য করিলে বা প্রলুব্ধ করিলে; অথবা

(খ) পলায়ন করিবার পর আশ্রয় প্রদান করিলে, লুকাইয়া রাখিলে বা পুনরায় উক্ত স্থান বা ব্যক্তির নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে বাধা প্রদান করিলে বা বাধা প্রদানে সাহায্য করিলে,-

তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মিথ্যা তথ্য প্রদানের ক্ষতিপূরণ

৮৩। কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন মামলার কার্যক্রমে কোন আদালতে কোন শিশুর সম্পর্কে যদি এমন কোন তথ্য প্রকাশ করেন যাহা মিথ্যা, বিরক্তিকর বা তুচ্ছ প্রকৃতির তাহা হইলে আদালত, প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, যাহার বিপক্ষে উক্ত তথ্য প্রদান করা হয় তাহার অনুকূলে ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকার উর্ধ্বে যেকোন পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদানকারীর প্রতি নির্দেশ প্রদান করিতে এবং অনাদায়ে অনধিক ৬ (ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদানের পূর্বে, তথ্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে কেন ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করা হইবে না তদ্‌মর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং তথ্য প্রদানকারী কোন কারণ প্রদর্শন করিলে তাহা বিবেচনায় লইতে হইবে।

দশম অধ্যায়
বিকল্প পরিচর্যা, ইত্যাদি

বিকল্প পরিচর্যা (alternative care)

৮৪। (১) সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, যাহাদের বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, তাহাদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনাপূর্বক, সার্বিক কল্যাণ ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে, বিকল্প পরিচর্যার (alternative care) উদ্যোগ গ্রহণ করা যাইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণের পূর্বে ধারা ৯২ অনুযায়ী শিশুর যাচাই (assessment) সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন বিবেচনা করিতে হইবে।

(২) বিকল্প পরিচর্যার উপায় ও ধরন নির্ধারণ করিবার সময় শিশুর মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকীকরণের (re-integration) বিষয়টিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, মাতা-পিতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকিলে বা অন্য কোন কারণে তাহারা পৃথকভাবে বসবাস করিলে, যতদূর সম্ভব, শিশুর মতামতকে প্রাধান্য প্রদানপূর্বক, মাতা-পিতার মধ্যে যে কোন একজনের সহিত পুনঃএকীকরণ করিতে হইবে :

আরও শর্ত থাকে যে, শিশুর মতামতকে প্রাধান্য প্রদানের পূর্বে মাতা-পিতার পৃথকভাবে বসবাসের কারণসহ তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকীকরণ সম্ভব না হইলে, বর্ধিত পরিবারের সহিত পুনঃএকীকরণ করা যাইবে, অথবা মাতা-পিতার অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট সমাজভিত্তিক একীকরণের (community based integration) উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব না হইলে সংশ্লিষ্ট শিশুকে ধারা ৮৫ তে উল্লিখিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা যাইবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে যদি এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, শিশুর মাতা-পিতা শিশুকে কোন অনৈতিক বা বেআইনী কোন কাজে নিয়োজিত করিতে পারে তাহা হইলে, উক্ত মাতা-পিতার উক্তরূপ অবস্থা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য, শিশুকে ধারা ৮৫ তে উল্লিখিত কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিতে হইবে এবং শিশুটিকে যাহাতে তাহার মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকীকরণ করা যায় তদ্‌লক্ষ্যে সরকার সংশ্লিষ্ট মাতা-পিতাকে পুনর্বাসনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) বিকল্প পরিচর্যার প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা

৮৫। সুবিধাবঞ্চিত যে সকল শিশুর জন্য ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (২) ও (৩) অনুযায়ী মাতা-পিতাকেন্দ্রিক পরিচর্যা বা অ-প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করা যাইবে না, অধিদপ্তর, এতদুদ্দেশ্যে সরকার প্রণীত নীতিমালার আলোকে, নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাহাদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিত করিবে, যথা :

(ক) সরকারি শিশু পরিবার;
(খ) ছোটমণি নিবাস;
(গ) দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র;
(ঘ) সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র; এবং
(ঙ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠান।

বিকল্প পরিচর্যা নির্ধারণকারী

৮৬। শিশু কল্যাণ বোর্ড বা প্রবেশন কর্মকর্তা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ বিবেচনায় আনিয়া শিশুর জন্য সবচাইতে উপযুক্ত পরিচর্যার উপায় নির্ধারণ করিবেন।

অধিদপ্তর কর্তৃক বিকল্প পরিচর্যা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

৮৭। অধিদপ্তর এই আইনের অধীন বিকল্প পরিচর্যার নিমিত্ত নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা:-
(ক) শিশুর যথাযথ পরিচর্যা নিশ্চিত করিবার জন্য তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে কাউন্সেলিংসহ প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ;
(খ) শিশুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, জীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারণ এবং মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকীকরণের লক্ষ্যে কাউন্সেলিংসহ যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ;
(গ) দফা (ক) এবং (খ) তে বর্ণিত বিষয়সমূহের বাস্তব অবস্থা ও তথ্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার জন্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
(ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রাসঙ্গিক অন্য যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ।

বিকল্প পরিচর্যার মেয়াদ ও অনুসরণ (Follow-up)

৮৮। (১) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণে বিকল্প পরিচর্যার মেয়াদ স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি হইতে পারিবে।
(২) প্রবেশন কর্মকর্তা শিশু এবং তাহার পরিবারের অভিমত বিবেচনায় লইয়া গৃহীত বিকল্প পরিচর্যা নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনর্বিবেচনা করিবেন।
(৩) নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনর্বিবেচনার অংশ হিসাবে প্রবেশন কর্মকর্তা শিশুর বিকল্প পরিচর্যা নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন এবং, ক্ষেত্রমত, জেলা বা উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড বা অধিদপ্তরকে উক্ত বিষয়ে অবহিত করিবেন।
(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পুনর্বিবেচনার ওপর ভিত্তি করিয়া প্রবেশন কর্মকর্তা প্রয়োজনে, এই আইনের অধীন অন্য কোন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনার জন্য অধিদপ্তরের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন।

সুবিধাবঞ্চিত শিশু

৮৯। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত শিশুগণ সুবিধাবঞ্চিত শিশু হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:-
(ক) যে শিশুর মাতা-পিতার যেকোন একজন বা উভয় মৃত্যুবরণ করিয়াছে;
(খ) আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবকহীন শিশু;
(গ) নির্দিষ্ট কোন গৃহ বা আবাসস্থলহীন এবং জীবনধারণের জন্য দৃশ্যমান অবলম্বনহীন কোন শিশু;
(ঘ) ভিক্ষাবৃত্তি বা শিশুর মঙ্গলের পরিপন্থী কোন কার্যে লিপ্ত শিশু;
(ঙ) কারাভোগরত মাতা-পিতার ওপর নির্ভরশীল বা কারাভোগরত মাতার সহিত কারাগারে অবস্থানরত শিশু;
(চ) যৌন নির্যাতন বা হয়রানির শিকার শিশু;
(ছ) যৌনবৃত্তি বা সমাজবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা অপরাধীর বাসস্থান বা কর্মস্থলে অবস্থানকারী বা গমনাগমনকারী শিশু;
(জ) যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু;
(ঝ) মাদক বা অন্য কোন কারণে অস্বাভাবিক আচরণগত সমস্যাযুক্ত শিশু;
(ঞ) অসৎ সঙ্গে পতিত বা নৈতিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হইতে পারে অথবা অপরাধ জগতে প্রবেশের ঝুঁকির সম্মুখীন শিশু;
(ট) বস্তিতে বসবাসকারী শিশু;

(ঠ) রাস্তা-ঘাটে বসবাসকারী গৃহহীন শিশু;
(ড) হিজড়া শিশু;
(ঢ) বেদে ও হরিজন শিশু;
(ণ) এইচআইভি-এইড্স এ আক্রান্ত (infected) বা ক্ষতিগ্রস্ত (affected) শিশু; অথবা
(ত) শিশু-আদালত বা বোর্ড কর্তৃক বিবেচিত কোন শিশু, যাহার বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(২) সরকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুর বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক শিশুকে প্রেরণ, ইত্যাদি

৯০। (১) কোন ব্যক্তি বা সংস্থা সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাত জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট শিশুকে বা উক্ত সংবাদ-
(ক) নিকটস্থ থানায়, প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মীর নিকট প্রেরণ করিবেন; অথবা
(খ) অধিদপ্তর বা উহার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, উক্তরূপ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং-
(ক) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, উহার সংবাদ সংশ্লিষ্ট থানার শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্তকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন; এবং
(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, উহার সংবাদ অধিদপ্তর বা উহার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৩) অধিদপ্তর বা উহার কোন কার্যালয় সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, উক্তরূপ প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করিবে এবং-
(ক) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, উহার সংবাদ সংশ্লিষ্ট থানার শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্তকর্তার নিকট প্রেরণ করিবে; এবং
(খ) সুবিধাবঞ্চিত শিশুর বিষয়ে, ক্ষেত্রমত, ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

পুলিশ কর্তৃক শিশুকে প্রেরণ

৯১। (১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা সুবিধাবঞ্চিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুকে বা, ক্ষেত্রমত, এতদ্‌সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে, উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন শিশুকে প্রাপ্ত হইলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুর ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, ধারা ৮৪ এবং ধারা ৮৫ এর বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাহাকে অধিদপ্তর বা উহার নিকটস্থ কার্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

শিশুর যাচাই (Assessment)

৯২। (১) এই আইনের অধীন প্রাপ্ত শিশুকে ধারা ৮৫ তে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোন ‘নিরাপদ স্থানে’ রাখিয়া প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যাচাই করিবেন এবং তাহার সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) প্রবেশন কর্মকর্তা বা সমাজকর্মী শিশুর প্রকৃত অবস্থাসহ শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্যকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন।

শিশুকল্যাণ বোর্ড-এ

৯৩। (১) শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে প্রবেশন কর্মকর্তা উহার নিকট রক্ষিত ও প্রাপ্ত

তথ্য উপস্থাপন

সকল তথ্য নিয়মিতভাবে বোর্ডএর সদস্য-সচিবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিশুকল্যাণ বোর্ড-এ উপস্থাপন করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(২) জেলা এবং, ক্ষেত্রমত, উপজেলা শিশুকল্যাণ বোর্ড উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করিবে এবং শিশুর সার্বিক কল্যাণার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করিবে।

বোর্ড কর্তৃক শিশু-আদালতে প্রেরণ

৯৪। (১) কোন শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে তাহাকে তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা শিশুটির পরিচর্যা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অপসারণ করা প্রয়োজন মর্মে বোর্ড এর নিকট প্রতীয়মান হইলে, বোর্ড বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উহা শিশু-আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিষয় শিশু-আদালতে প্রেরণ করা হইলে এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে কোন শিশুকে শিশু-আদালতে হাজির করা হইলে, উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পরীক্ষা করিয়া উহার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করিবে এবং বিষয়টির অধিকতর তদন্ত করিবার পর্যাপ্ত কারণ থাকিলে তদুদ্দেশ্যে তারিখ ধার্য করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন তদন্তের জন্য ধার্য তারিখে শিশু-আদালত এই আইনের অধীন যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহার পক্ষে বা বিপক্ষে সকল প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য ও শুনানি গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করিবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিশুর পরিচর্যার উপায় নির্ধারণপূর্বক যেইরূপ যথার্থ মনে করিবে সেইরূপ সময় পর্যন্ত শিশুকে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন শিশুকে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণের আদেশ প্রদানকালে শিশু-আদালত প্রবেশন কর্মকর্তাকে শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করিবার এবং শিশুকে সৎ ও কর্মঠ জীবন-যাপনের সুযোগ প্রদান করিবার শর্তে, জামানতসহ বা বিনা জামানতে, আদালত যেইরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবে, সেইরূপ অঙ্গীকারনামা সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৫) এই ধারার বিধান অনুযায়ী শিশুকে বিকল্প পরিচর্যায় প্রেরণ করা হইলে শিশু-আদালত প্রবেশন কর্মকর্তাকে উক্তরূপ পরিচর্যার আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না তাহা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করিবে এবং তদ্‌বিষয়ে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে আদালতে দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে।

একাদশ অধ্যায়
বিবিধ বিধানাবলী

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৯৫। সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের দায়িত্ব

৯৬। সরকার এই আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে, প্রয়োজনে, নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

অস্পষ্টতা দূরীকরণ

৯৭। এই আইনের কোন বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূর করিতে পারিবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ	৯৮। এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে করা হইয়াছে বা করিবার উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বিবেচিত কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পারিবেন না।
ইংরেজীতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ	৯৯। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে। (২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।
রহিতকরণ ও হেফাজত	১০০। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Children Act, 1974 (Act No. XXXIX of 1974), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত Act এর অধীন- (ক) কৃত কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; (খ) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে; (গ) নিষ্পন্নাধীন মামলার ধারাবাহিকতায় প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে (certified institute or remand home) অবস্থানরত শিশুর অবস্থান এই আইনের বিধান অনুসারে পূর্বের ন্যায় একইরূপে অব্যাহত থাকিবে; (ঘ) দায়েরকৃত অনিষ্পন্নাধীন মামলাসমূহ যে সকল কিশোর আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে উক্ত মামলাসমূহ উক্ত শিশু-আদালতসমূহের মাধ্যমেই এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত Act রহিত ও বিলুপ্ত হয় নাই; (ঙ) প্রতিষ্ঠিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র বা নিবাসসহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠান, যে নামেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, পরবর্তী নির্দেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, এমনভাবে উহার কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবে যেন উহারা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা প্রত্যয়িত হইয়াছে; (চ) মাতা-পিতার অবাধ্য কোন শিশুকে কোন শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে আটক রাখা হইলে এবং তাহারা আটকাবস্থায় থাকিলে, যে মেয়াদের জন্য তাহাদের আটক রাখা হইয়াছে সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে মাতা-পিতা বা অভিভাবকের নিকট ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

Copyright © 2010, Legislative and Parliamentary Affairs Division
Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs

পরিশিষ্ট- ২

মাঠ জরিপকর্মের প্রশ্নমালা

কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের দিকনির্দেশনা : বাংলাদেশ সরকারের কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের উপর একটি সমীক্ষা (Directives of Islam for the Prevention of Adolescent Delinquency: A Survey on Bangladesh`s Adolescent Development Centres) শীর্ষক গবেষণাকর্মের প্রশ্নমালা

সাক্ষাৎকার নং-………..

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের অপরাধী নিবাসী কিশোর-কিশোরীর জন্য প্রশ্নমালা

[Questionnaire schedule for Adolescent Offenders of KUK’s]

সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম (Name of the interviewee):……..……………..……..……..….

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম (Name of the interviewer):………..……..…...……………..…

সাক্ষাৎকারের তারিখ (Date of interview):………………………….……………....…………………

সাক্ষাৎকারের সময়কাল (Time taken for interview):…. …………………….……....………....

১। জন্ম তারিখ (Date of birth):…………………..… ….........…………………………

২। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর লিঙ্গ (Sex of the Sample Offender):

(ক) পুরুষ (Male) (খ) মহিলা (Female)

৩। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর ধর্ম (Religion of the Sample Offender):

(ক) ইসলাম (Islam) (খ) হিন্দু (Hinduism) (গ) খ্রিষ্টান (Christianity)

(ঘ) বৌদ্ধ(Buddhism) (ঙ) অন্যান্য (Others)

৪। অভিভাবকের নাম ও স্থায়ী ঠিকানা (Name & Permanent Address of father or legal guardian):

………………...……………………………………………………………………………

৫। অভিভাবকের অস্থায়ী ঠিকানা (Present Address of father or legal guardian):

……………………………………………………………………….……….…..……

৬। অভিভাবকের সাথে সম্পর্ক (Relationship with the legal guardian):

(ক) পিতা (Father) (খ) মাতা (Mother) (গ) অন্যান্য (Others)

৭। পিতামাতা বা অভিভাবকের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? (What is the qualification of your Father / legal Guardian?):

(ক) প্রাথমিক (Primary School) (খ) এসএসসি (SSC) (গ) উচ্চ মাধ্যমিক (HSC)

(ঘ) স্নাতক (Under graduate) (ঙ) স্নাতকোত্তর (Post graduate) (চ) অন্যান্য (Others)

৮। পিতা/অভিভাবকের পেশা কী? (What is your father's / legal guardian's occupation?): ....

৯। তোমার পিতামাতার ব্যাপারে নিচের কোনটি সত্য? (Which of the following is true of your parents?):

(ক) পিতামাতা জীবিত (Both parents alive) (খ) পিতা মৃত (Father dead)

(গ) মাতা মৃত (Mother dead) (ঘ) পিতামাতা উভয়ই মৃত (Both parents dead)

১০। তোমার পরিরবারের সদস্য সংখ্যা কত? (How many members have in your family)?: ....

১১। তোমার ভাই বোনের সংখ্যা কত? (How many brothers and sisters have you)?:

(ক) ভাই (Brother)………………... (খ) বোন (Sister)……………... ……………

১২। তোমার চেয়ে বয়সে বড় ভাই ও বোনের সংখ্যা কত? (How many brothers and sisters are older than you)? ....

১৩। তোমার চেয়ে বয়সে ছোট ভাই ও বোনের সংখ্যা কত? (How many brothers and sisters are younger than you?): ……………………………………………………………………

১৪। তোমার পিতা কয়টি বিবাহ করেছেন? (How many times your father married?): ....

১৫। তোমার পিতার একাধিক বিবাহের কারণ কী? (What is the reason of your father's further marriage?):

১. মায়ের মৃত্যু (Death of mother)

২. তালাক (Divorce)

৩. আলাদা বসবাস (Separation)

৪. ধর্মীয় বিশ্বাস (Religious faith)

৫. অন্যান্য (Any other)

৬. আমি জানি না (Don't know)

১৬। তোমার মা কয়টি বিবাহ করেছেন? (How many times your mother married?):................

১৭। যদি একাধিক করে থাকে তাহলে কারণ কী (If married more than once than what is the reasons?)

১. পিতার মৃত্যু (Death of mother)
২. তালাক (Divorce)
৩. আলাদা বসবাস (Separation)
৪. ধর্মীয় বিশ্বাস (Religious faith)
৫. অন্যান্য (Any other)
৬. আমি জানি না (Don't know)

১৮। সাধারণত পিতামাতা বা অভিভাবক তোমাকে কোন ধরনের শাস্তি বেশি দিত (What type of punishment did you usually get from your parents or guardian?):

(ক) শারীরিক শাস্তি (Physical punishment)
(খ) কোন কিছু না দেওয়া (Taking away some privilege from you)
(গ) খাবার না দেওয়া (Stopping of food)
(ঘ) ঘর থেকে বের করে দেওয়া (Driving out of home)
(ঙ) কথা-বার্তা বন্ধ করে দেওয়া (Stop talking)

১৯। কে শাস্তি বেশি দিত? (Who usually punished you?):

(ক) বাবা (Father) (খ) মা (Mother) (গ) উভয়ই (Both parents)

২০। পিতামাতা দিনে কতবার ঝগড়া করতেন? (How often did your parents quarrel in a day?):

(ক) প্রায়ই (Very often) (খ) মাঝে মাঝে (Often)
(গ) কদাচিৎ (Not so often) (ঘ) কখনও না (Never)

২১। পিতামাতা বা অভিভাবক তোমার ও অন্যান্য সন্তানের মধ্যে আচরণে পার্থক্য করতেন কী? (Did your parents or guardian make distinction in their treatment between you and their other children?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No) (গ) জানি না (Don't know)

২২। তোমার পিতামাতার সামাজিক মর্যাদা কী? (What is the social status of your parents?):

(ক) উচ্চবিত্ত (High) (খ) নিম্নবিত্ত (Low)
(গ) সমাজ বিচ্ছিন্ন (Ostracized) (ঘ) জানি না (Don't know)

২৩। তুমি কি বলতে পারবে তোমার পিতা বা মাতাকে পুলিশ কখনও গ্রেফতার করেছে কি না? (Can you tell me whether your father or mother was arrested by the police?):..…........……………..

২৪। পিতা বা মাতাকে গ্রেফতারের কারণ কী? (What were reasons of their arrest?):……………

২৫। গ্রেফতারের পর তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? (What were the actions taken against them by the authority?):

(ক) কারাগারে বন্ধী করা হয়েছে (Detention in jail)

(খ) মৃত্যুদণ্ড (Capital punishment)

(গ) জরিমানা (Fine)

(ঘ) দৈহিক শাস্তি (Corporal punishment)

(ঙ) জানি না (Don’t know)

২৬। তোমার পরিবারের থাকার ঘর কেমন? (What was the housing condition of your family?):

(ক) পাকা ঘর (Pucca building) (খ) টিনসেড (Pucca house with tin sheds)

(গ) টিনের ঘর (Katcha house with tin sheds)

(ঘ) শুকনা খরের ঘর (Thatched house) (ঙ) অন্যান্য (Others)

২৭। পিতার মাসিক আয় কত (What is the monthly income of your father?):….……………

২৮। তুমি কি কোন আয়/উপার্জন করেছো? (Were you employed in any kind of job?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

২৯। তোমার মাসিক আয় কত ছিল? (What was your monthly income?): …………..………...

৩০। তুমি কি পিতা-মাতাকে টাকা দিতে (Did you give money to your parents?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৩১। আয় করার (চাকুরী পাওয়ার) পূর্বে কে তোমার খরচ বহন করতেন? (Who carried your expenses before you are employed?):………………………………………...…..……..

৩২। তুমি কেন কাজ করতে? (Why did you work?):

(ক) পরিবারের অভাব (Necessity of family)

(খ) স্বাধীন জীবন-যাপনের জন্য (Independent way of life)

(গ) জানি না (Don’t know)

৩৩। তুমি কি নিয়মিত বেতন পেতে? (Did you get your salary regularly?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৩৪। তুমি কি কখনও মালিকের নিকট থেকে দুর্ব্যবহারের শিকার হয়েছ? (Have you received any maltreatment from your master?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৩৫। তুমি কি ভুলের জন্য শারীরিকভাবে শাস্তি পেতে? (Were you physically punished for your fault?): (ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৩৬। তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? (What is your academic qualification?):

(ক) পিএসসি (PSC) (খ) জে এসসি (JSC) (গ) এসএসসি (SSC) (গ) উচ্চ মাধ্যমিক (HSC)

৩৭। তুমি কি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছিলে? (Did you stop your education?)

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৩৮। তুমি নিম্নের কি কারণে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেছ? (Why Did you stop your education?):

১. দরিদ্রতা (Poverty)

২. পিতামাতার অনিচ্ছা (Parents did not like)

৩. স্কুলের পড়া না পারা (You felt yourself dull in school)

৪. শিক্ষককে অপছন্দ হত (You didn’t like the teacher)

৫. ঘরে কাজের চাপ (Overwork at home)

৬. বন্ধুরা স্কুলে যেতনা (Because some of your friends didn’t go to school)

৭. পরীক্ষায় ফেল করা (Failure in the examination)

৮. শিক্ষকের মারার কারণে (Beating by teacher)

৯. অন্যান্য (Any other)

৩৯। তোমার স্কুলে কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে চুরি করার অভ্যাস ছিল কি? (Were there students who had the habit of stealing in the school?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৪০। তোমার মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী? (What is the education of your mother?):

(ক) শিক্ষত (literate) (খ) অশিক্ষত (Illiterate)

৪১। তুমি কি সিনেমা দেখতে যেতে? (Did you go to cinema?)ঃ

১. প্রতি দিন (Every day)

২. সপ্তাহে একবার (Once a week)

৩. মাসে একবার (Once a month)

৪. দুই/তিন মাসে একবার (Once in two/three months)

৪২। তুমি কি খেলাধুলা করতে? (Did you play any game?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৪৩। কোন খেলা তোমার বেশি পছন্দ? (What games do you prefer most?)ঃ

(ক) ক্যারাম (Carroms) (খ) হা-ডু-ডু (Ha-do-do)

(গ) কাবাডি (Kabadi) (ঘ) ফুটবল (Foot-ball)

(ঙ) ক্রিকেট (Cricket) (চ) গোল্লাছুট(Golla Chut)

(ছ) দাড়িয়া বান্ধা (Daria Bandha) (জ) মার্বেল (Marbles with pice)

(ঝ) কার্ড খেলা (Playing cards) (ঞ) অন্যান্য (Others)

৪৪। তোমার কত জন বন্ধু ছিল? (How many friends had you?)ঃ ....

৪৫। তোমার অন্য কোন বন্ধুকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে কি? (Did your any other friend was arrested by the police?)ঃ (ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৪৬। তুমি কি বন্ধুদের মাঝে আবার ফিরে যেতে চাও? (Do you like to go back to your friends circle?)ঃ (ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৪৭। তুমি কি কখনও শহরে বাস করেছো? (Did you ever live in city?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৪৮। তোমার পরিবার কি বসবাসের জন্য শহরে এসেছিলো? (Did your family migrate to the city?)ঃ

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৪৯। তুমি কি শহুরে জীবন বেশি পছন্দ কর? (Do you prefer city life?):

(ক) অনেক পছন্দ (Strongly prefer) (খ) পছন্দ (Prefer)

(গ) পছন্দ নয় (Don’t prefer)

৫০। তুমি কি গ্রাম্য জীবন বেশি পছন্দ কর? (Do you prefer village life?):

(ক) অনেক পছন্দ (Strongly prefer) (খ) পছন্দ (Prefer)

(গ) পছন্দ নয় (Don’t prefer)

৫১। তুমি যখন গ্রামে ছিলে তখন কি তুমি নামাজ পড়তে/ উপাসনা করতে? (Did you say prayer/worship when you were in the village?): (ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৫২। তুমি কি এখন নামাজ আদায় কর/উপাসনা কর? (Do you perform prayer/worship now?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৫৩। তোমার পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনরা কি তোমায় দেখতে আসে? (Do your parents or relatives come to see you?): (ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৫৪। এখানে তোমার কেমন লাগে? (How do you feel here?):

(ক) ভাল লাগে (Happy) (খ) অন্যরকম (Indifferent) (গ) ভাল লাগে না (Unhappy)

৫৫। এই প্রতিষ্ঠানের সুশৃঙ্খলজীবন তুমি কি পছন্দ কর? (Do you like the disciplined life of this institution?): (ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৫৬। তুমি কি এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে কোনভাবে উপকৃত হচ্ছো? (Are you benefited in any way by the education of this institution?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৫৭। তুমি কি মনে কর তুমি কোন ভুল করেছো যার জন্য তোমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে? (Do you think you committed a mistake for which you have been referred here?):

(ক) হ্যাঁ (Yes) (খ) না (No)

৫৮। মুক্তির পর তুমি কী করতে পছন্দ করবে? (What would you like to do after release?):

……………….……………………………………………………………………….

৫৯। তুমি কি এখান হতে মুক্তির পর পরিবারে ফিরে যেতে পছন্দ কর? (Do you like to go back to your family after release?): ....

৬০। তুমি কি কোন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সদস্য? (Are you a member of any political or cultural organization?): ....

Information from the KUK's / Institution's authority:

Date of Conviction (দোষী সাব্যস্ত হওয়ার তারিখ): ……………………….…... …….

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রেরণের তারিখ (Date of Referral):………………….……………

Cause of conviction (দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কারণ):……………………..……………

Interviewer's Comment (সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর মন্তব্য):

কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের স্থির চিত্র

চিত্র-১: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী ,গাজীপুর- এর প্রশাসনিক ভবন।

চিত্র-২: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর -এর মূল ফটক।

চিত্র-৩: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোর -এর নিবাসীদের সমাবেশের চিত্র।

চিত্র-৪: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে মাঠ সমীক্ষার কাজে গবেষক।

চিত্র-৫: কিশোরী (বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর-এর মূল ফটক।

চিত্র-৬: কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সূচীবোড।